বারীন্দ্র নাথ দাশ

ক্লাসিক প্রেস

৩।১ এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

: রচনাকাল :

এপ্রিল—অক্টোবর, ১৯৬৪

ঃ এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কর্ণফুলি

রঙের বিবি

বেগম বাহার লেন

অনুরঞ্জিতা

পূর্বরাগের ইতিহাস

অন্তরতমা

বিশাখার জন্মদিন

চায়না টাউন

রাজা ও মালিনী

মিতালীমধুর

নিশীথনিঝুম

দুলারীবাঈ

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা

ইমন বেহাগ বাহার

বাহাদুর শাহ্‌র সমাধি

চন্দ্রচকোর

অতনু ও জীবনদেবতা

নগরকন্যা

শাহজাদা

উপনায়িকা

এক বেগম, এক সুলতান

গড় নাসিমপুর

যমুনার তীরে দিল্লী

॥ এক ॥

ষোলো শ' ছেষট্টি খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ আগে বাদশাহ আওরংজেব দিওয়ান-ই-খাস থেকে গুসলখানায় চলে এলো। সঙ্গে এলো উজীর-উল্-মুল্ক্ জাফর খাঁ, আগ্রার কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ, আগ্রার শাহী কেল্লার কিলাদার রদ্-অন্দাজ খাঁ, মাড়বাড়ের মহারাজা জসবন্ত সিংহ আর মুন্সি-উল-মমালিক কবিল খাঁ। সেখানে বসলো গোপন মন্ত্রণা সভা। মুশরিফ-ই-খওয়াসকে ডেকে হুকুম দেওয়া হোলো গুসলখানার বাইরে চৌকি যেন দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়।

"খবরটা সত্যি?" বললো মহারাজা জসবন্ত সিংহ, "আমার এখনো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না।"

জাফর খাঁ বললো, "দশ-মাস আগে শিবাজী যখন মহারাজা জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করলেন, আমি ভেবেছিলাম তিনি শুধু নিজের ফৌজকে পুনর্গঠিত করার সুযোগ চাইছেন। ওই দুর্ধর্ষ মারাঠা যে আন্তরিকভাবে শাহ-ইন্-শাহ্'র বশ্যতা স্বীকার করবে একথা বিশ্বাস করতে পারিনি।"

"বিশ্বাস আমি আজো করিনা," আওরংজেব বলে উঠলো, "এজন্য আমি দিলির খাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলাম মহারাজা জয়সিংহের উপরে ভরসা না করে যে কোনো পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে।"

"মহারাজা জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্যে না পাঠিয়ে যদি দিলির খাঁকে একলা এই অভিযানের কর্তৃত্ব দেওয়া হোতো, হয়তো এতদিনে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা যেতো মারাঠাদের।"

মহারাজা জসবন্ত সিংহের অভিমত শুনে অর্ধনিমীলিত চোখে তার দিকে তাকালো বাদশাহ আওরংজেব। তারপর বললো, "সেটা হোতো কি না হোতো আমি জানিনা, তবে দারোগা-ই-সওয়ানি-নিগারের মারফত আমি এই খবর পেয়েছি যে শিবা মহারাজা জয়-সিংহের সঙ্গে সন্ধি করাতে আমাদের দিলির খাঁ অত্যন্ত হতাশ হয়েছে। তার আশা ছিলো, সে-ই শিবাকে বন্দী করে উপস্থিত করবে আগ্রার দরবারে।"

"হতাশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেই আশা কার্যে পরিণত করার সুযোগ এবার এসেছিলো আমাদের হাতে," জসবন্ত সিংহ মন্তব্য করলো।

"আমি একথাও জানি," চক্ষু নিমীলিত করে বলে গেল আওরংজেব, "হতাশ আরো অনেকেই হয়েছে। মহারাজা জয়সিংহের এই সাফল্যে আনন্দিত হয়নি, এমন ব্যক্তি আমাদের দরবারেও দু-একজন আছে।"

জাফর খাঁ হাসি চেপে আড়চোখে তাকালো জসবন্ত সিংহের দিকে। জসবন্ত সিংহের মুখ লাল হয়ে গেল, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

রদ্-অন্দাজ খাঁ বললো, "আমার ধারণা মারাঠাদের বিধ্বস্ত করার ভার সম্পূর্ণভাবে দিলির খাঁকে দিলেই ভালো হোতো। মহারাজা জয়সিংহ যতোই বিশ্বস্ত হোন না কেন, তিনি হিন্দু। একজন হিন্দুর বিরুদ্ধে আরেকজন হিন্দু কি আন্তরিকভাবে যুদ্ধ করবে?"

আওরংজেব লক্ষ্য করলো যে, একথা শুনে ঈষৎ কুঞ্চিত হোলো জসবন্ত সিংহের ভ্রূযুগল। বিরক্তি চেপে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "মহারাজা জয়সিংহ এবং মহারাজা জসবন্ত সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের দুটি স্তম্ভস্বরূপ। এঁদের আন্তরিকতায় আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।"

জসবন্ত সিংহ কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি স্বরূপ তসলিম জানালো শাহ-ইন-শাহকে।

"কে হিন্দু, কে মুসলমান এই বিচার আমি করতে চাই না," আওরংজেব বলে গেল।

জসবন্ত সিংহের ভুরু একটু উত্তোলিত হোলো একথা শুনে, কিন্তু অন্য কোনো ভাব প্রকাশ পেলো না।

"—আমি জানি শিবা বিদ্রোহী, সে মোগল রিয়াসতের দুশমন। সে অত্যন্ত ধূর্ত, অত্যন্ত চতুর। তার ফৌজী শক্তি তুচ্ছ করার মতো নয়। শক্তিমান বিদ্রোহীকে দমন করবার ভার দিতে হয় সুদক্ষ সেনানায়কের উপর। জয়সিংহ আমাদের দরবারের বিশ্বস্ত মনসবদার। সে অভিজ্ঞ, যুদ্ধ পরিচালনায় সুদক্ষ। দিলির খাঁর চাইতে জয়সিংহ অনেক বেশী বিচক্ষণ। তাই তার উপর আমি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ভার দিয়েছিলাম। এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, সে তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।"

বাদশাহ্‌র কথা শুনে শ্রোতা চারজন খুব প্রীত হয়েছে বলে মনে হোলো না। সবাই চুপ করে রইলো।

আওরংজেব একটু হাসলো, তারপর বললো, "এছাড়া আরো একটা কথা আমায় বিবেচনা করে দেখতে হয়েছে। শিবাকে দমন করার জন্যে যদি একলা দিলির খাঁকে পাঠাতাম, তাহলে এই সংঘর্ষ অন্য একটা রূপ নিতো, হিন্দুস্তানের আম-জনতা মনে করতো এটা হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ। শিবা নিজেকে হিন্দুদের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করার সুযোগ পেতো। এ সুযোগ আমি তাকে দিতে চাইনি। তাই জয়সিংহকেই পাঠিয়েছি শিবার বিরুদ্ধে।"

"দিলির খাঁ হয়তো মারাঠাদের একেবারে ধ্বংস করতো," বললো ফুলাদ খাঁ, "মহারাজা জয়সিংহের হাতে শিবাজীর তেমন কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

আওরংজেব উত্তর দিলো, "পুরন্দর, বজ্রগড়, লোহ্‌গড় প্রমুখ তেইশটা কেল্লা সে আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এসব কেল্লার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর বাৎসরিক খাজানাহ্ চার লক্ষ হুন।"

"শাহ-ইন-শাহর মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে সে যদি তিন চার বছর শান্তিতে থাকতে পারে, তাহলে যে তার ফৌজ পুনর্গঠিত করে আবার এসব কেল্লা দখল করবার চেষ্টা করবে না, তার নিশ্চয়তা কি ?"

"তাকে জায়গির দেওয়া হচ্ছে কোঙ্কন আর বিজাপুরী বালা-ঘাটের মহলগুলো। এসব এখন বিজাপুরের সুলতানের অধিকারে। এসব মহল দখল করার দায়িত্ব শিবার। কিন্তু এর জন্যে সে আমাদের দেবে চল্লিশ লক্ষ হুন। আগামী কয়েক বছর সে বিজাপুরের সঙ্গে সংঘর্ষেই ব্যস্ত থাকবে। অন্য কোনোদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে না।"

"তারপর ?" জিজ্ঞস করলো রদ্-অন্দাজ খাঁ।

"তদ্দিনে আমরা বিজাপুর দখল করবো। শিবার এলাকার চারদিকেই থাকবে আমাদের ফৌজ। প্রয়োজন হলে মারাঠাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না," বলে একটু থামলো আওরংজেব। তারপর খুব নিচু গলায় বললো, "তদ্দিন শিবা নাও থাকতে পারে মারাঠাদের নেতৃত্ব করবার জন্যে।"

সবাই একটু বিস্মিত হয়ে তাকালো আওরংজেবের দিকে।

আওরংজেব জাফর খাঁর দিকে তাকিয়ে বললো, "এই বিষয় আপনাদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করবার জন্যেই দিওয়ান-ই-খাস থেকে এখানে চলে এসেছি। জাফর খাঁ, শুধু শহরের গুজবই এঁদের কানে এসেছে। এবার আপনি এদের সংবাদটা জানিয়ে দিন।"

জাফর খাঁ অন্য সবার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, "মহারাজা জয়সিংহের আরজ-দশ্ত এসেছে শাহ-ইন-শাহর কাছে। একমাস আগে শিবাজী দাক্ষিণাত্য থেকে রওনা হয়েছেন শাহ-ইন-শাহর দরবারে হাজির হয়ে শাহ-ইন-শাহকে তসলিম জানানোর জন্যে। মির্জা রাজা জয়সিংহের নির্দেশ অনুযায়ী শিবাজীও একখানি আরজ-

দশ্ত প্রেরণ করেছেন তার রওনা হওয়ার সংবাদ জানিয়ে। এতদিনে হয়তো নর্মদা অতিক্রম করেছেন। এক মাসের মধ্যেই আগ্রায় এসে উপনীত হবেন। কুমার রামসিংহও পত্র পেয়েছেন এ সংবাদ শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে পেশ করবার জন্যে।"

রদ্‌-অন্দাজ খাঁর ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু ও গুম্ফ রাজির আড়ালে শুভ্র দন্ত-পংক্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "তাহলে শিবাজী এখানে তশরিফ আনছেন শেষ পর্যন্ত! বেশ, আসুন তিনি। পিঞ্জরের দ্বার খোলা আছে তাঁর জন্যে।"

আওরংজেব ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। কিন্তু সংযত কণ্ঠে বলে উঠলো, "শিবা আমাদের মেহমান, তার খাতিরদারিতে কোনো ত্রুটি হবে না। একথা আপনাদের মনে রাখা উচিত যে, শিবার নিরাপত্তার সমস্ত জিম্মাবারি নিয়েছেন মির্জা রাজা জয়সিংহ।"

রদ্‌-অন্দাজ খাঁ ও ফুলাদ খাঁর মুখ দেখে মনে হোলো, ওরা যেন হতাশ হোলো বাদশাহ্‌র কথা শুনে।

মহারাজা জসবন্ত সিংহ জিজ্ঞেস করলো, "শিবাজীর এই অভ্যর্থনা কি বাদশাহ্‌র শত্রুতাচরণ করার ইনাম?"

আওরংজেব উত্তর দিলো, "মহারাজা জসবন্ত সিংহ, একজন প্রবল শত্রুকে জিন্‌জির-বদ্ধ অবস্থায় আমাদের কয়েদখানায় ফেলে রাখার মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু কোনো গৌরব নেই। তাকে বশ করে আমাদের খিদমতে হাসিল করা অনেক বেশী গৌরবের। প্রথমটা করতে পারতো দিলির খাঁ, অন্যটা করতে সক্ষম শুধু মির্জা রাজা। দক্ষ শিকারী জংলী হাতিকে নিহত করতে পারে, কিন্তু তাকে পোষ মানিয়ে কাজে নিয়োজিত করতে পারে পিলখানার পোষা হাতি। শিবার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে আমি একথাই দুনিয়ার সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা নিস্ফল। আমাদের চেয়ে পরাক্রান্ত শক্তি দুনিয়ায় হতে পারে না। কিন্তু কোনো শক্তিমান ব্যক্তি যদি আমাদের পদচুম্বন

করে আমাদের খিদমতে নিয়োজিত হয়, তাকে আমি দিতে পারি মানুষের সমস্ত কাম্যবস্তু, ধন-সম্পদ, জায়গির, মান, সম্ভ্রম, মর্যাদা।"

"কিন্তু শিবাজীর এই বশ্যতা কি আন্তরিক?" জিজ্ঞেস করলো ফুলাদ খাঁ।

আওরংজেব হাসলো। বললো, "ফুলাদ খাঁ, বশ্যতা কোনোদিন আন্তরিক হতে পারে না। এ শুধু প্রবলতর শক্তির কাছে ক্ষুদ্রতর শক্তির নিস্ফলতার স্বীকৃতি। তার অন্তরে কি আছে আমি জানতে চাইনা। সে যে অতি দীনজনের মতো বিনয়বিগলিত ভাষায় আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে আরজ-দশ্‌ত পাঠিয়েছিলো, তাতেই সবাই জানবে সে কতো অক্ষম, কতো নিরুপায়। আমার অনুগ্রহ ছাড়া তার বাঁচবার অন্য পথ নেই। মুন্সি-উল-মমালিক, শিবা কয়েকমাস আগে আমাকে যে আরজ-দশ্‌ত পাঠিয়েছিলো, সেটা তোমার স্মরণ আছে?"

কবিল খাঁ তসলিম করে জানালো যে, হ্যাঁ, সেই পত্রের ভাষা তার সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ আছে।, বাদশাহ্‌র নির্দেশে সে পুনরাবৃত্তি করে শোনালো।

চুপচাপ শুনলো সবাই। আরজ-দশ্‌তের পুনরাবৃত্তি শেষ হতে জসবন্ত সিংহ বললো, "এ তো শিবাজীর ভাষা নয়। এ যে জয়সিংহের মুন্সি উদিরাজের মুসাবিদা। ওর ভাষা আমি চিনি।"

"কিন্তু মোহরের ছাপ তো শিবার।"

আওরংজেবের নির্দেশে কবিল খাঁ শিবাজীর সাম্প্রতিক আরজ-দশ্‌তও পড়ে শোনালো। শিবাজী জানিয়েছে যে, সে রওনা হয়েছে দাক্ষিণাত্য থেকে, আগামী মাসে আগ্রায় উপনীত হবে বলে সে আশা করে। যথানির্দিষ্ট দিনে সে দরবারে হাজির হয়ে বাদশাহ্‌কে তসলিম জানানোর হুকুম প্রার্থনা করেছে।

আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো, "এখন এ ব্যাপারে আপনাদের কি অভিমত আমি জানতে চাই।"

জাফর খাঁ বললো, "শাহ-ইন-শাহ মেহেরবান। দরবারে হাজির হওয়ার হুকুম আপনি নিশ্চয়ই দেবেন।"

"হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই দেবো," আওরংজেব সহাস্য মুখে উত্তর দিলো।

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"শিবাজী আগ্রায় কদিন থাকবেন সেটাই আমার প্রশ্ন।"

গম্ভীর কণ্ঠে আওরংজেব বললো, "সেটা আমারও প্রশ্ন।"

"শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুম হলে আমার একটা আরজ্ পেশ করতে পারি," বললো মহারাজা জসবন্ত সিংহ।

"পেশ করুন, কি আপনার আরজ্—?"

"শিবাজীকে যেন দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে দেওয়া না হয়, এই আমার আরজ।"

"তাকে কি ভাবে এখানে আটকে রাখবো। সে যদি ফিরে যেতে চায়, আমি কি বাধা দেবো তাকে?"

"শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুম না হলে কি কেউ ফিরে যেতে পারে তার নিজের ওয়াতনএ?" জিজ্ঞেস করলো রদ্ অন্দাজ খাঁ।

"রদ্ অন্দাজ খাঁ। এ কথা ভুলে যেও না শিবার জিম্মাবারি নিয়েছেন মির্জা রাজা জয়সিংহ।"

"কিন্তু মির্জা রাজা তো আগ্রায় উপস্থিত নেই," বললো ফুলাদ খাঁ।

"মির্জা রাজা নেই, কিন্তু তার পুত্র কুমার রামসিংহ আছে," উত্তর দিলো জাফর খাঁ।

আওরংজেব হাসলো। বললো, "সেজন্যেই রামসিংহকে আমি গুসলখানায় ইত্তলা দিই নি।"

"শিবাজী যতক্ষণ আগ্রায় আছেন ততক্ষণই মির্জা রাজা আর কুমার রামসিংহের জিম্মাবারি," বললো জসবন্ত সিংহ।

আওরংজেব খুশি হোলো একথা শুনে। জিজ্ঞেস করলো, "আমারও তাই অভিমত, এখন আপনারা কি পরামর্শ দিতে চান ?"

জাফর খাঁ বললো, "শাহ-ইন-শাহ্‌র খাদিম যে কোনো মনসবদারকে যে কোনো জায়গায় কর্মে নিযুক্ত করার অধিকার বাদশাহ্‌র আছে। যদি শাহ-ইন-শাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী শিবাজী অন্য কোথাও যান কোনো কাজের ভার নিয়ে, তাহলে মির্জা রাজার জিম্মাবারি আর থাকে না।"

"যদি শিবা রাজি না হয় ?"

"বেশ, শিবাজী ওর আপত্তি ব্যক্ত করুক। শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুম তামিল না করা গুরুতর অপরাধ," বললো রদ অন্দাজ খাঁ, "আর কেল্লার ভিতর আমার কয়েদখানায় এরকম অপরাধীর মেহমানদারি করবার জায়গা প্রচুর আছে।"

"আমার মনে হয়," আওরংজেব বললো, "শিবাকে আমি যদি দূরে কোথাও পাঠাই, মনে করুন যেমন আসামে, কিংবা কাবুলে, সে আমার হুকুম তামিল না করে পারবে না। অন্তত আমি তাকে যেতে বাধ্য করতে পারবো।"

"তারপর ?" জিজ্ঞেস করলো জাফর খাঁ।

"তারপর কতো কি হতে পারে। মানুষ অসুস্থ হতে পারে, শত্রু পক্ষের গুলি কিংবা তীর তার গলায় বিঁধতে পারে, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে নিদারুণ জখম হতে পারে," খুব আস্তে আস্তে আওরংজেব বললো।

সবাই শুনলো স্তব্ধ হয়ে।

আওরংজেব হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলো, "এই কাঁটা উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু খুব সন্তর্পনে।—ফুলাদ খাঁ !"

"হুকুম করুন জাহাঁপনা।"

"আজ থেকে শহরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করো। এক এক দল করে হরকরা লাগিয়ে দাও প্রত্যেক মহল্লায়। শিবা যে নিজের

নিরাপত্তা বা সহায়তার কোনো ব্যবস্থা না করে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় আগ্রায় আসছে একথা আমার মনে হয় না। যদি তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকে, জানবার চেষ্টা করো সেই ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ। কাউকে কয়েদ করবে না, বেশী জিজ্ঞাসাবাদ কিছু করবে না, কারো যেন কোনো সন্দেহ না হয়, এ প্রসঙ্গে যেন কোনো গুজব না ছড়ায়। সবার যেন মনে হয় কোথাও পাহারার কোনো কড়াকড়ি নেই। একটা বিলাস ফুর্তির পরিবেশ সৃষ্টি করো শহরে। সামনের মাসে আমার তখত্-এ-হাসিল হওয়ার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের দিন। সুতরাং কারো চোখে ঠেকবে না কিছুই। কিন্তু চোখ খোলা রাখো, সবার উপর নজর রাখো, বিশেষ করে কুমার রামসিংহের উপর। আমি সংবাদ চাই প্রত্যেকদিন। রদ্ অন্দাজ খাঁ!"

"হুকুম করুন শাহ-এ-আদিল।"

"কেল্লার ফৌজদের সতর্ক করে দাও। সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। যে কোন মুহূর্তে যেন ফৌজ দিয়ে ঘিরে ফেলা যায় সমগ্র আগ্রা শহর। সিলাহদারেরা যেন সবসময় হাতি-পুল দরওয়াজার কাছে মোতায়েন থাকে। জাফর খাঁ! মথুরার সড়কে দু ক্রোশ পরপর চৌকি বসিয়ে দিন। দক্ষিণে যাওয়ার পথে যেখানে যেখানে মোগল থানা আছে, সব থানাদারদের কাছে হব্স্-অল্-হকুম পাঠিয়ে দিন, সবাই মওজুদ রাখবে এক এক দল সিলাহদার। জসবন্ত সিংহ! আপনি কাবুল রওনা হওয়ার আয়োজন করুন। প্রয়োজন যদি হয়, শিবাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমার হুকুমে। দু মাসের বেশী সময় পাবেন না। দু-মাসের মধ্যেই আপনাকে আগ্রা থেকে রওনা হতে হবে।"

"দু মাস!"

"হ্যাঁ। আরো একমাস শিবার লাগবে আগ্রায় পৌঁছাতে। আর, এক মাসের বেশী আগ্রায় থাকতে দেবো না শিবাকে।

আওরংজেব খুশি হোলো একথা শুনে। জিজ্ঞেস করলো, "আমারও তাই অভিমত, এখন আপনারা কি পরামর্শ দিতে চান?"

জাফর খাঁ বললো, "শাহ্-ইন-শাহ্‌র খাদিম যে কোনো মনসবদারকে যে কোনো জায়গায় কর্মে নিযুক্ত করার অধিকার বাদশাহ্‌র আছে। যদি শাহ্-ইন-শাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী শিবাজী অন্য কোথাও যান কোনো কাজের ভার নিয়ে, তাহলে মির্জা রাজার জিম্মাবারি আর থাকে না।"

"যদি শিবা রাজি না হয়?"

"বেশ, শিবাজী ওর আপত্তি ব্যক্ত করুক। শাহ্-ইন-শাহ্‌র হুকুম তামিল না করা গুরুতর অপরাধ," বললো রদ অন্দাজ খাঁ, "আর কেল্লার ভিতর আমার কয়েদখানায় এরকম অপরাধীর মেহমানদারি করবার জায়গা প্রচুর আছে।"

"আমার মনে হয়," আওরংজেব বললো, "শিবাকে আমি যদি দূরে কোথাও পাঠাই, মনে করুন যেমন আসামে, কিংবা কাবুলে, সে আমার হুকুম তামিল না করে পারবে না। অন্তত আমি তাকে যেতে বাধ্য করতে পারবো।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলো জাফর খাঁ।

"তারপর কতো কি হতে পারে। মানুষ অসুস্থ হতে পারে, শত্রু পক্ষের গুলি কিংবা তীর তার গলায় বিঁধতে পারে, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে নিদারুণ জখম হতে পারে," খুব আস্তে আস্তে আওরংজেব বললো।

সবাই শুনলো স্তব্ধ হয়ে।

আওরংজেব হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলো, "এই কাঁটা উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু খুব সন্তর্পনে।—ফুলাদ খাঁ!"

"হুকুম করুন জাহাঁপনা।"

"আজ থেকে শহরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করো। এক এক দল করে হরকরা লাগিয়ে দাও প্রত্যেক মহল্লায়। শিবা যে নিজের

নিরাপত্তা বা সহায়তার কোনো ব্যবস্থা না করে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় আগ্রায় আসছে একথা আমার মনে হয় না। যদি তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকে, জানবার চেষ্টা করো সেই ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ। কাউকে কয়েদ করবে না, বেশী জিজ্ঞাসাবাদ কিছু করবে না, কারো যেন কোনো সন্দেহ না হয়, এ প্রসঙ্গে যেন কোনো গুজব না ছড়ায়। সবার যেন মনে হয় কোথাও পাহারার কোনো কড়াকড়ি নেই। একটা বিলাস ফুর্তির পরিবেশ সৃষ্টি করো শহরে। সামনের মাসে আমার তখত্-এ-হাসিল হওয়ার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের দিন। সুতরাং কারো চোখে ঠেকবে না কিছুই। কিন্তু চোখ খোলা রাখো, সবার উপর নজর রাখো, বিশেষ করে কুমার রামসিংহের উপর। আমি সংবাদ চাই প্রত্যেকদিন। রদ্ অন্দাজ খাঁ!"

"হুকুম করুন শাহ-এ-আদিল।"

"কেল্লার ফৌজদের সতর্ক করে দাও। সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। যে কোন মুহূর্তে যেন ফৌজ দিয়ে ঘিরে ফেলা যায় সমগ্র আগ্রা শহর। সিলাহদারেরা যেন সবসময় হাতি-পুল দরওয়াজার কাছে মোতায়েন থাকে। জাফর খাঁ! মথুরার সড়কে দু ক্রোশ পরপর চৌকি বসিয়ে দিন। দক্ষিণে যাওয়ার পথে যেখানে যেখানে মোগল থানা আছে, সব থানাদারদের কাছে হব্স্-অল্-হকুম পাঠিয়ে দিন, সবাই মওজুদ রাখবে এক এক দল সিলাহদার। জসবন্ত সিংহ! আপনি কাবুল রওনা হওয়ার আয়োজন করুন। প্রয়োজন যদি হয়, শিবাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমার হুকুমে। দু মাসের বেশী সময় পাবেন না। দু-মাসের মধ্যেই আপনাকে আগ্রা থেকে রওনা হতে হবে।"

"দু মাস!"

"হ্যাঁ। আরো একমাস শিবার লাগবে আগ্রায় পৌঁছাতে। আর, এক মাসের বেশী আগ্রায় থাকতে দেবো না শিবাকে।

"কিন্তু, কাবুলে অন্য কাউকে পাঠানো যেতো না? ধরুন মহাবত খাঁ কি রুস্তম খাঁ—"

"না, জসবন্ত সিংহ, কোনো মুসলমান মনসবদারের সঙ্গে শিবাজী দূর দেশে যেতে রাজী হবে না। আপনি হিন্দু ক্ষত্রিয়, আপনার সঙ্গে পাঠালে ওর মনে কোনো সন্দেহ হবে না। মুন্সি-উল-মমালিক!"

"হুকুম করুন আলমপনা!"

"ফরমান প্রেরণ করা হবে শিবার কাছে, উজীর-উল-মুল্‌কএর মারফত। তার মুসাবিদা করো। তাকে জানাও যে মির্জা রাজার পরামর্শ অনুযায়ী, সে যে আমার কাছে আরজ-দশ্‌ত পাঠিয়েছে আমার দরবারের চৌকাঠকে তসলিম জানাবার বাসনায় রওনা হয়েছে সে খবর জানিয়ে, সেই আরজ-দশ্‌ত পেশ করা হয়েছে আমার সামনে, এবং তার প্রতি আমার মেহেরবানি আরো বর্ধিত হওয়ার কারণ হয়েছে তার আরজ-দশ্‌ত। শিবা যেন অবিলম্বে এখানে হাজির হয় নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে এবং আমার মেহেরবানির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসে। আমার দর্শন পাওয়ার পর সে আমার অনুগ্রহ দ্বারা গৌরবান্বিত হবে। তারপর নিজের দেশে প্রত্যাগমন করবার হুকুম দেওয়া হবে তাকে। যথাবিহিত সম্মানের জন্যে তাকে এই সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে একটা চমকদার খিলাত। তারিখ,—আমার রাজত্বের নবম সালের দশই শওয়াল,—রসালতুন উজীর-উল-মুলক্ জাফর খাঁ।"

বলে গেল বাদশাহ আওরংজেব, আর সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিলো মুন্সি-উল-মমালিক কবিল খাঁ। আওরংজেব উঠে দাঁড়ালো, বললো, "এবার আমরা বিশ্রাম করবার জন্যে এই আলোচনা স্থগিত রাখতে পারি। কাল আবার এখানে আপনারা হাজির হবেন দরবারের পর। জাফর খাঁ, কুমার রামসিংহকে জানাবেন আমার হয়ে, শিবার খাতিরদারিতে যেন কোনো ত্রুটি না হয়, খাজিনাহ্-ই-আমারা থেকে

তার জন্যে অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করা হবে। শিবার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত রকম বন্দোবস্তই যেন হয়।"

আওরংজেব চলে যাচ্ছিলো, রেওয়াজ অনুযায়ী সবাই দাঁড়িয়ে ছিলো বাদশাহ দৃষ্টিবহির্ভূত হওয়ার জন্যে, সে পর্যন্ত কেউ বেরোবে না গুসলখানা থেকে। দরজার কাছে গিয়ে আওরংজেব ফিরে দাঁড়ালো।

"রদ্ অন্দাজ খাঁ!"

"জাহাঁপনা।"

"কেল্লার ভিতরে কয়েদখানায় একটা কুঠরি খালি রাখবে। লোহার জিন্‌জিরগুলো পরীক্ষা করে নেবে। আট প্রহর চৌকি মোতায়েন থাকবে সেই কুঠরির বাইরে!"

রদ্ অন্দাজ খাঁ হাসিমুখে তসলিম করলো। "হ্যাঁ জাহাঁপনা, মেহমানদারির ব্যবস্থা সর্বাঙ্গীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে আরো একঘড়ি সময় অতীত হয়েছে। কেল্লার বাইরে প্রশস্ত রাজপথে লোকজন আর দেখা যায় না। এপ্রিলের উত্তপ্ত হাওয়া ধুলোর ঝড় তুলে প্রবল হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। অনুচরদের সঙ্গে মহারাজা জসবন্ত সিংহ ফিরে চললো নিজের মঞ্জিলে। মুখে চিন্তার ছায়া। প্রখর মধ্যাহ্ন রৌদ্রের দ্যুতিতে চোখ দুটো সঙ্কুচিত হয়ে আছে।

মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে জসবন্ত সিংহের প্রাক্তন অভিজ্ঞতা খুব প্রীতিপ্রদ নয়, সুতরাং মহারাজা জয়সিংহের এই সাফল্য তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিলো। গুসলখানা থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাবতে শুরু করেছিলো কি ভাবে মহারাজা জয়সিংহকে অপদস্থ করা যায়। বাদশাহ যে শিবাজীকে তারই হেফাজতে কাবুল পাঠাবার গোপন পরিকল্পনা করছে, এই ব্যবস্থাও তার ভালো লাগছিলো না। জসবন্ত সিংহের মনে একটা আশা ছিলো তাকে

নিযুক্ত করা হবে কাবুলের সুবাদার। কিন্তু জাফর খাঁর কাছে কাল শুনেছে যে সুবাদারের পদ তাকে দেওয়া হবে না, তাকে নিযুক্ত করা হবে থানাদারের পদে। থানাদার হয়ে কাবুল সীমান্তে যাওয়ার ইচ্ছে তার মোটেও ছিলো না। অশ্বচালনা করতে করতে জসবন্ত সিংহ ভাবছিলো, কি করে কাবুলে যাওয়ার এই নির্দেশ এড়ানো যায়।

কেল্লায় যাওয়ার বড়ো রাস্তা ছেড়ে শাহগঞ্জের রাস্তায় মোড় ফিরতেই হঠাৎ কানে এলো ঘোড়ার খুরের দ্রুত আওয়াজ। সামনের দিকে তাকিয়ে জসবন্ত সিংহ দেখলো ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে একটা বাদামী রঙের ঘোড়া। কাছে আসতে দেখলো ঘোড়ার সওয়ার জসবন্ত সিংহের নিজস্ব জোধপুরী ফৌজের একজন যোদ্ধা।

সে জসবন্ত সিংহের সামনে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলো। তারপর অভিবাদন করে বললো, "মহারাজ, কুমার রাম সিংহ সংবাদ পাঠিয়েছেন যে অপরাহ্নে তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। সে সময় যদি আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়, তাহলে তিনি আপনার খাস-দরবারে উপস্থিত হবেন।"

জসবন্ত সিংহ একথা শুনে বিস্মিত হোলো। অম্বর ও মাড়বাড়ের দুই দরবারের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব আছে, কোনো আনুষ্ঠানিক উপলক্ষ ছাড়া কেউ করো দরবারে যায় না। আজ কছওয়া রাজকুমার রামসিংহ যখন এভাবে রাঠোর জসবন্ত সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে তখন এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। যাই হোক, এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলো না জসবন্ত সিংহ। গম্ভীর মুখে বার্তাবহের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলো, "অপরাহ্নের অনেক বিলম্ব আছে, শক্তিসিংহ। এই সংবাদ জানানোর জন্যে মাঝপথে আমার গতিরোধ করার এমন বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিলো না, আমি মহলে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতে।"

একথা শুনে তরুণ রাঠোর শক্তিসিংহ অপ্রতিভ হয়ে বললো, "আমায় মার্জনা করবেন মহারাজ, কুমার রামসিংহের কাছ থেকে এই নির্দেশ পেয়েছি যে, তাঁকে যেন জানানো হয় মধ্যাহ্নের পর দু-ঘড়ি সময়ের মধ্যেই। আপনার আসতে বিলম্ব দেখে শাহী কেল্লার দিকে যাচ্ছিলাম যাতে আপনার সম্মতি নিয়ে সোজা অম্বর মহারাজার মহলে চলে যেতে পারি।"

"কিন্তু এমন কি গুরুতর পরিস্থিতি যে কুমার রামসিংহকে সংবাদ দিতে হবে দু-ঘড়ির মধ্যেই ?"

"ওঁর সঙ্গে আসবেন কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। কে তিনি, সে কথা জানাননি। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হলে বোধ হয় এমন কোনো ব্যবস্থা করতে হবে, যার জন্যে কিছু সময় প্রয়োজন।"

একটা ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিলো জসবন্ত সিংহ রাঠোরের মুখে। "কছওয়াদের আদব কায়দার বাড়াবাড়ি বড় বেশী। মোগলদের গোলামী করে করে—" বলতে বলতে থেমে গেল জসবন্ত সিংহ। কি যেন ভাবলো, তারপর শক্তিসিংহ রাঠোরের দিকে ফিরে বললো, "যাও, বিলম্ব কোরো না। কুঁবর-সা'কে জানিয়ে এসো যে অপরাহ্ণে আমি সাগ্রহে কুঁবর-সা' এবং তাঁর সম্মানিত সঙ্গীর প্রতীক্ষা করবো। কছওয়া কুমার রাঠোর মহলে পদার্পণ করলে রাঠোর দরবার সম্মানিত বোধ করবেন।"

শক্তি সিংহ রাঠোর অশ্বে আরোহন করে সত্বর অদৃশ্য হোলো পথের বাঁকে।

আগ্রা শহরের উপকণ্ঠে নিজের মহলের দিকে রওনা হোলো মহারাজা জসবন্ত সিংহ।

খোজা ফিরোজার বাগে অম্বরের কছওয়া ফৌজের ছাউনি। মাঝখানে কুমার রাম সিংহের মঞ্জিল। বাইরে সিংহদ্বারের দুপাশে পাহারারত ছিলো চারজন রাজপুত প্রহরী। শক্তিসিংহ মঞ্জিলের

সামনে এসে উপস্থিত হতে ওরা বর্শা উদ্যত করে তার গতিরোধ করলো। তাদের হয়তো নির্দেশ দেওয়া ছিলো আগের থেকে। মহারাজা জসবন্ত সিংহের মহল থেকে আসছে শুনে ওরা তার পথ ছেড়ে দিলো। শক্তি সিংহ রাঠোর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে লাগাম ধরে পদব্রজে সিংহদ্বার অতিক্রম করে ভিতরে চলে গেল।

বাইরে কিছু দূরে পথের বাঁকে একটা প্রাচীন অশথ্ গাছের আড়ালে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো দুজন লোক। তাদের একজন আমাদের পরিচিত,—আগ্রার কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ। সে তার সঙ্গীকে বললো, "মহম্মদ হুসেন, লোকটা আমাদের পরিচিত বলে মনে হচ্ছে—।"

মহম্মদ হুসেন উত্তর দিলো, "হ্যাঁ মালিক, ও মহারাজা জসবন্ত সিংহের ফৌজের লোক। মহারাজার খুব প্রিয়পাত্র।"

ফুলাদ খাঁ মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে। একটা হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

"মহম্মদ হুসেন, খেলটা ভালো জমছে। কুমার সাহাবের লোক গেল মহারাজা জসবন্ত সিংহের মঞ্জিলে। মহারাজার লোক এলো কুমার সাহাবের মঞ্জিলে। কোনো একটা চক্রান্তের সূচনা বলেই মনে হচ্ছে। শাহ-ইন-শাহ শুনতে পেলে খুশী হবেন। এই আসা যাওয়ার পালা আরো চলবে মনে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে কজন সওয়ার আছে?"

"তিনজন।

"কোতোয়ালি থেকে আরো দুজন আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে যখনই কেউ কোথাও রওনা হবে, তার পেছনে পাঠিয়ে দেবে একজনকে। তবে, টের না পায় যেন। হরকরারা দূরে দূরেই থাকবে। এখন শুধু চাই খবর। তুমি এখানেই থেকো। সন্ধ্যার পর কোতোয়ালিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আমি এখন

চললাম। কয়েকজন হরকরা পাঠাতে হবে মহারাজা জসবন্ত সিংহের মঞ্জিলের উপর নজর রাখবার জন্য।"

ফুলাদ খাঁ কিছুক্ষণ ধরে আরো কয়েকটা নির্দেশ দিলো তার বিশ্বস্ত হরকরা মহম্মদ হুসেনকে। এমন সময় হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এলো তাদের কানে। দুজনে মুখ ফিরিয়ে দেখলো একজন ঘোড় সওয়ার কুমার রামসিংহের প্রাসাদ থেকে নির্গত হয়ে খুব দ্রুত ছুটলো পশ্চিম দিকে।

"এতো শহরের বাইরে যাওয়ার পথ? লোকটা যাচ্ছে কোথায়? ওর অনুসরণ করতে পাঠাও," বলে উঠলো ফুলাদ খাঁ।

কাছেই এক জীর্ণ অট্টালিকার দেওয়ালের আড়াল থেকে একজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এলো মহম্মদ হুসেনের শিস শুনে। নির্দেশ পেয়ে সেও ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো সেদিকে।

ফুলাদ খাঁ চলে যাচ্ছিলো, মহম্মদ হুসেন হঠাৎ ডেকে বললো, "মালিক কোতোয়াল সাহাব, একটা গুজব শুনছি—"

"কি?"

"শিবাজী নাকি আগ্রায় আসছেন শাহ-ইন-শাহর দরবারে তসলিম পেশ করবার জন্যে। কথাটা সত্যি?"

ফুলাদ খাঁ হেসে উত্তর দিলো, "মহম্মদ হুসেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে শহরে নানারকম ঘটনা ঘটবে। তুমি যদি তোমার কর্তব্য ঠিক মতো পালন করতে পারো, আমি নিজে শাহ-ইন-শাহর কাছে সুপারিশ করবো তোমায় খাঁ উপাধিতে ভুষিত করবার জন্য।"

"বুঝলাম," বলে হাসলো মহম্মদ হুসেন।

"বুঝলে তো? এবার মিঞা, মুখ বন্ধ করে নিজের কর্তব্য করে যাও।"

কুমার রামসিংহের মুন্সি গিরধরলালজী নিজে শক্তিসিংহ রাঠোরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির করেছিলো কুমারের সামনে। মহারাজা

জসবন্ত সিংহ সাক্ষাৎ করতে স্বীকৃত হয়েছেন শুনে প্রীত হোলো রামসিংহ। নিজের একজন পার্শ্বচরকে আদেশ দিলো অবিলম্বে একজন সওয়ারকে বেগমপুরায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। তারপর গিরধরলালকে বললো, "মুন্সিজী শক্তিসিংহ রাঠোর প্রখর রৌদ্রের মধ্যে এখানে এসেছেন। উনি পরিশ্রান্ত। আপনি নিজে এর যথাবিহিত সৎকারের ব্যবস্থা করবেন।"

রাম সিংহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শক্তি সিংহ বেরিয়ে এলো মুন্সি গিরধরলালজীর সঙ্গে।

"বেগমপুরা তো শহর থেকে দূরে," বললো শক্তি সিংহ, "সেখানে সওয়ার পাঠানো হোলো কেন?"

গিরধরলাল চারদিকে তাকালো, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো, "ওসব আপনার জানবার কথা নয়, তবে আপনাকে জানতে আমার দ্বিধা নেই। এমন একটা পরিস্থিতি আসছে যখন আমাদের সবাইকে নির্ভর করতে হবে পরস্পরের উপর। আপনার সাহায্যও আমাদের প্রয়োজন। আপনি আজ আমারই গৃহে অতিথি। সেখানে গিয়ে সব কথা আপনাকে খুলে বলবো!"

"আপনার গৃহে?"

"হ্যা, দূরে নয়, এই মহলেই। সামনের উদ্যানের অন্য প্রান্তে ওই যে ছোটো বাড়িটা দেখছেন, ওখানেই আমি থাকি।"

উদ্যানের পাশ দিয়ে হেঁটে দুজনে উপস্থিত হোলো মুন্সি গিরধরলালের গৃহে। একজন পরিচারক কাংস্য ভৃঙ্গারে জল নিয়ে এলো। হাত মুখ প্রক্ষালন করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো শক্তি সিংহ রাঠোর।

ছোটো ঘর, আরো ছোটো গবাক্ষটি রুদ্ধ। তাই ভেতরটা আধো অন্ধকার। কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। বাইরের উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে ভিতরের সুশীতল আবহাওয়ার মধ্যে এসে শক্তিসিংহ তৃপ্তি বোধ করলো। এক পাশে নানা রঙীন চিত্র রঞ্জিত জাজিম পাতা।

সেখানে একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে পড়লো। গিরধরলাল চলে গেল বাড়ির ভিতর। শক্তিসিংহ চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তিনদিকের দেওয়ালে নীল কালো আর সাদা রঙে হাতি ও ঘোড়-সওয়ারের চিত্র আঁকা। গৃহের প্রবেশ পথে বাইরের দেওয়ালেও ছিলো এমনিতরো চিত্র। আরেকটি দেওয়ালের এক কোণে লাল সিঁদুরে আঁকা লক্ষ্মী গণেশের ছবি। জোধপুরে নিজের গৃহটির কথা মনে পড়লো শক্তিসিংহের। এমনি চিত্র আঁকা থাকে প্রত্যেক বাড়িতে। মনে হোলো সেদেশ থেকে যেন একখানি বাড়ি তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে এই আগ্রা শহরে। বাইরের দিকে তাকালে যেন দেখতে পাওয়া যাবে দিগন্তবিস্তৃত বালুকারাশি।

গিরধরলাল ফিরে এলো। বললো, "ভোজনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ততক্ষণ চন্দনচূর্ণের ঠাণ্ডাই খেতে খেতে আমরা একটু গল্প করি। কি বলেন?"

গিরধরলাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো শক্তিসিংহকে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আপনার দেশ কোথায়?"

শক্তি সিংহ উত্তর দিলো, "বিয়াওয়ার। আমার পিতা ছিলেন সেখানকার ঠাকর। আমি এখন জোধপুরেই থাকি।"

"পিতা জীবিত আছেন?"

"না।"

"মা?"

"না। উনিও স্বর্গারোহন করেছেন।"

"দারপরিগ্রহ করেছেন?"

"না," হাসলো শক্তি সিংহ রাঠোর।

"কেন?"

"আমাদের মহারাজার সঙ্গে বাইরে বাইরেই ঘুরছি। তাই এবিষয়ে চিন্তা করার কোনো অবকাশ পাইনি।"

লঘু পদক্ষেপের সঙ্গে রুপোর পাঁয়জোড়ের মৃদু আওয়াজ কানে এলো। চোখ তুলে তাকালো শক্তিসিংহ। দুহাতে ঠাণ্ডাইএর পানপাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকছে উদ্ভিন্নযৌবনা এক রূপবতী কন্যা। গোলাপী ঘাগরা আর সবুজ আঙ্গিয়া জড়িয়ে আছে রুপালী জরির ফুলকাটা স্বচ্ছ চুন্‌রি। তার এক প্রান্ত মাথার উপর তুলে দিয়েছে অবগুণ্ঠনের মতো, মুখের খানিকটা ঢাকা পড়েছে তাতে। সিঁথির উপর মস্ত বড়ো সোনার বোর্‌লা, অবগুণ্ঠন একটু উঁচু হয়ে আছে সেখানে। স্বচ্ছ চুন্‌রির আড়ালে ঈষৎ চপল দুটি আয়ত চোখের আভাস। পলকের জন্যে দুজনে তাকালো দুজনের দিকে। তারপর শক্তি সিংহ নিজেই অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামিয়ে ফেললো। মেহ্‌দী-রঞ্জিত দুটি হাত সামনে নামিয়ে রাখল দুটি পানপাত্র। পাঁয়জোড়ের মৃদু নিক্কণ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দ্বারপ্রান্তে।

"ও আমার পালিতা কন্যা পান্না।"

"পালিতা!" খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো শক্তিসিংহ।

"হ্যাঁ, পান্না ক্ষত্রিয়কন্যা। ওর পিতা ছিলো আমার বিশেষ বন্ধু। সে ছিলো শাহজাদা দারার ফৌজে। কান্দাহারের যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। তখন এই কন্যা একেবারে শিশু। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার জননীকে হারায়। তখন থেকে আমার স্ত্রীর কাছেই মানুষ। আমার স্ত্রী মারা গেছে তিন বছর আগে। সংসারে আমার আপন বলতে এই মেয়েটিই আছে।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হোলো গিরধরলাল মুন্সির বুক ঠেলে। মৃদুকণ্ঠে বললো, "মা আমার বড়ো হয়ে গেছে। এবার তো ওর বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।"

গিরধরলালের সঙ্গে শক্তিসিংহের পরিচয় বেশীক্ষণের নয়। এরই মধ্যে তার পারিবারিক ইতিহাসের বিবরণ শুনতে হওয়ায় বিব্রত বোধ করছিলো সে। একটু কেসে গলা সাফ করে জিজ্ঞেস

করলো, "কুঁবর সা' আজ যে আমাদের মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন, তার কি কোনো বিশেষ উপলক্ষ ঘটেছে ?"

গিরধরলাল তাকালো শক্তিসিংহের দিকে। তারপর বললো, "আপনি কি কিছু শোনেন নি ?"

"হ্যাঁ, একটা কথা বলাবলি করছে সবাই—"

"কথাটা সত্যি। শিবাজী আগ্রায় আসছেন। আর একমাসের মধ্যে তিনি এখানে উপস্থিত হবেন।"

"তাহলে শিবাজী বাদশাহ্‌র বশ্যতা স্বীকার করেছেন—?"

"আমাদের মহারাজা জয়সিংহ শিবাজীর হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি শিবাজীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে ওঁর কোনো অমর্যাদা হবে না। সেজন্যেই শিবাজী আগ্রায় আসতে রাজী হয়েছেন। তা নইলে কেউ শিবাজীকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে পারতো না শাহ-ইন-শাহ্‌র দরবারে।"

"কুঁবর-সা' কি এই উপলক্ষেই আমাদের মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের মহারাজা কিন্তু শিবাজীর প্রতি কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাতে চান না," বললো শক্তি সিংহ।

"সেকথা আমাদের অজানা নেই। যাই হোক, শিবাজীর সম্বন্ধে আপনার কিরকম ধারণা ?"

শক্তিসিংহ রাঠোর একটু হাসলো, তারপর বললো, "মুন্সিজী, আমি মহারাজা জসবন্ত সিংহের সেবক।"

গিরধরলালজীর চোখদুটো একটু জ্বলে উঠলো। ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললো, "আমি জোধপুরের মহারাজার সেবকের কাছে জোধপুর মহারাজার প্রাক্তন প্রতিপক্ষের সম্বন্ধে কোনো অভিমত জানতে চাইনি। আমি শুধু এক রাঠোর বীরপুরুষের কাছে এক মারাঠা বীরপুরুষ সম্বন্ধে তার কি ধারণা সেকথা জানতে চেয়েছি।"

শান্ত কণ্ঠে শক্তিসিংহ উত্তর দিলো, "ক্ষত্রিয় মাত্রেই যোদ্ধাকে, বীরপুরুষকে শ্রদ্ধা করে মুন্সিজী।"

"এই শ্রদ্ধা কেন? শিবাজী শুধু যোদ্ধা বলে, শুধু বীরপুরুষ বলে?"

"না," অকপটে উত্তর দিলো শক্তিসিংহ রাঠোর।

"তাহলে?"

"আমরা যা মনে মনে স্বপ্ন দেখি, শিবাজী সেটা বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করছেন, এজন্যেই তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।"

এ উত্তর শুনে খুশী হোলো গিরধরলাল মুন্সি। বললো, "শক্তিসিংহ, মোগল বাদশাহ্‌র অনুগত রাজপুত যোদ্ধা অনেক আছে। কিন্তু অনেকের মনে আজ স্বজাতিপ্রেম ম্লান হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ, স্বার্থসিদ্ধি এবং পদোন্নতি, এই তাদের একমাত্র কাম্য। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি তাদের মতো নন। প্রয়োজন হলে কি আমরা আপনার সহায়তা আশা করতে পারি?"

"মুন্সি গিরধরলাল, আমি মোগল বাদশাহ্‌র অনুগত নই, আমি রাঠোরদের রাজা জসবন্ত সিংহের অনুগত। স্বামীধর্ম ক্ষুণ্ণ না করে আমার যথাসাধ্য আমি করবো। কিন্তু আমাকে প্রয়োজন হবে কোন ব্যাপারে?"

"শক্তিসিংহ, হয়তো এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন প্রত্যেক রাজপুতের সহায়তা আমাদের প্রয়োজন হবে রাজপুতের মুখের কথার মান রাখতে।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মুন্সিজী, আপনি কি বলতে চাইছেন।"

"বলছি, শুনুন। আমাদের মহারাজা জয়সিংহ শিবাজীর নিরাপত্তা ও সম্মানের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি আগ্রায় আসতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সন্দেহ করবার কারণ ঘটেছে যে, আগ্রায় এলে শিবাজীর নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে। কোনো

একটা গূঢ় ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি হচ্ছে, তার পূর্ণ বিবরণ আমরা এখনো জানতে পারিনি। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাদশাহ যদি জানতে পারেন যে আগ্রার সমস্ত কছওয়া ও রাঠোর রাজপুত একযোগে শিবাজীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় কৃতসংকল্প, তাহলে তেমন কোনো গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব নাও হতে পারে। বাদশাহ আওরংজেব মহারাজা জয়সিংহ ও মহারাজা জসবন্ত সিংহ দুজনকেই একসঙ্গে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করবেন না।"

"আমাদের মহারাজা জসবন্ত সিংহ রাজপুত ক্ষত্রিয়," বললো শক্তিসিংহ, "তিনি কি শিবাজীর কোনো অমর্যাদা সহ্য করবেন বলে আপনার মনে হয় ?"

"না, সেকথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তবে শিবাজীর কাছে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাঁর মনে ওঁর প্রতি একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়—।"

"না, মুন্সিজী। আমাদের মহারাজা সম্মুখযুদ্ধে হারেন নি। শিবাজী সম্মুখযুদ্ধ বড় একটা করেন না। সম্মুখযুদ্ধে রাঠোরেরা প্রাণ দেয়, কিন্তু হার মানে না! আর একথাও জেনে রাখুন, শিবাজীর প্রতি আমাদের মহারাজার কোনো বিরূপ মনোভাব নেই। প্রবল প্রতিপক্ষকে রাজপুত শ্রদ্ধা করে, শিবাজীকেও আমাদের মহারাজা শ্রদ্ধা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে, কিন্তু যিনি আগ্রায় আসছেন অতিথি হয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।"

"যদি আগ্রায় শিবাজীর প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা হয় ?"

"আমাদের মহারাজা রাজপুত, তিনি রাজপুতের যোগ্য কাজই করবেন।"

"যদি আমরা আপনার কোনো সহায়তা প্রার্থনা করি ?"

"আমি রাঠোর, রাঠোরের অযোগ্য কিছু করবো না। আমাদের মহারাজা যা নির্দেশ দেবেন তাই করবো।"

ভৃত্য এসে সংবাদ দিলো আহারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। গিরধর-লাল মুন্সি শক্তিসিংহকে ভিতরে নিয়ে গেল।

আহারে বসে গুরুতর আলোচনা কিছুই আর হোলো না। দেশ থেকে দূরে স্বজাতীয়েরা মিলিত হলে দেশের নানা রকম খুঁটিনাটি বিষয়ের যে রকম আলোচনা হয়, তাই হোলো সমস্তক্ষণ। সে সময় অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে, বিদেশে দুর্লভ্য দেশের নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য, তরিতরকারী ও রান্নার কথা ওঠে, দেশের বিভিন্ন উৎসব সিন্‌হারা পূজো পার্বনের বর্ণনা হয়। কথা প্রসঙ্গে গিরধরলাল ও শক্তিসিংহ পরস্পরকে নিজেদের পারিবারিক অনেক সংবাদ জানালো। মহারাজা জয়সিংহ যখন দারার পশ্চা-দ্ধাবন করেছিলো, তখন গিরধরলাল মুন্সি ছিলো জয়সিংহের ফৌজের সঙ্গে। সেসব যুদ্ধের অনেক কাহিনী শোনালো গিরধরলাল। শক্তিসিংহ ছিল মহারাজা জসবন্ত সিংহের সঙ্গে। শিবাজীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য সে জানে। সেসব সংবাদ পরিবেশন করলো শক্তিসিংহ। মারাঠাদর সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুত এবং মারাঠা উভয়পক্ষের নানারকম শৌর্য ও বীরত্বের কাহিনী শোনা গেল তার মুখে।

বিভিন্ন রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছিলো পান্না। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলো শক্তিসিংহ। পান্না নিজের হাতে দুজনের থালায় পরিবেশন করেছিলো পুরু করে মাখন লাগানো গরম গরম বাজরার রুটি। দধি সহযোগে বাজরার রুটি খেতে খেতে শক্তিসিংহ বললো, "দেশ ছেড়ে আসবার পর এসব ব্যঞ্জন কতোদিন খাই নি। সাঙ্গরের সাগ্,—আহা—মরুভূমির দেশের এই সব্‌জির মধুর স্বাদ, তার কাছে কোথায় লাগে এসব উর্বরা দেশের তরি-তরকারি। কোথায় পেলেন এ জিনিস, এখানে তো পাওয়া যায় না, দেশ থেকে আনিয়েছেন বুঝি?" ঘি-ভাতে চিনি মেখে এক গ্রাস মুখে পুরে বললো, "জানেন মুন্সিজী, দিল্লি আগ্রার লোকেরা চাল খায় নোনতা

তরকারি দিয়ে। দেখলে আমার হাসি পায়। আমরা চালে সক্কর মিশিয়ে মিষ্টি করে খাই দেখলে আবার এরাও হাসে।"

গিরধরলাল হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, "রান্না কি রকম লাগলো ?"

"চমৎকার," বলে উঠলো শক্তিসিংহ, "এরকম আগে কোনো-দিন খেয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।"

"পান্না, শুনলে তো ?"

পান্নার সুগৌর মুখ রক্তিমাভ হয়ে উঠলো। মৃদু হাসির আভাস দেখা দিলো তার অধরপ্রান্তে।

শক্তিসিংহ পান্নাকে উদ্দেশ করে বললো, "দুপুরের এই গরমে আমার জন্যে এত আয়োজন করতে আপনার খুবই কষ্ট হোলো।"

অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে উত্তর এলো, "আপনি অতিথি।"

সাধারণ দুটি কথা, কিন্তু এতেই যেন তরুণ রাঠোরের মন ভরে গেল। তার মুখে কোনো কথা এলো না অনেকক্ষণ। গিরধর-লাল নানা কথা বলে যাচ্ছিলো, কিছু তার কানে ঢুকলো, কিছু ঢুকলো না।

ভোজন সমাপ্ত হোলো। পান মুখে দিয়ে সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। এবার ফিরে যেতে হবে। জসবন্ত সিংহের মহলে হাজির হতে হবে কুমার রামসিংহ উপস্থিত হওয়ার আগেই।

মুন্সি গিরধরলাল সঙ্গে এলো সিংহদ্বার পর্যন্ত। আসতে আসতে শক্তিসিংহ একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিলো। দেখতে পেলো উন্মুক্ত গবাক্ষের রঙিন কাচের পুঁতির পর্দার আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে দুটি চোখ। সে ফিরে তাকাতে চোখ দুটি সরে গেল।

শক্তিসিংহের ঘোড়া নিয়ে এলো একজন পরিচারক।

"পরে আবার দেখা হবে," বললো গিরধরলাল।

শক্তিসিংহের হঠাৎ মনে পড়লো একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি।

"আচ্ছা মুন্সিজী, বেগমপুরায় হরকরা গেল কার কাছে ?"

গিরধরলাল চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর খাটো গলায় বললো, "কথাটা প্রকাশ করবার নয়, তবে আপনি আমার বন্ধু, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই। শিবাজী কৃষ্ণাজী আপ্তে নামে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে আগ্রার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে। সে তার দুজন অনুচরের সঙ্গে বেগমপুরায় এক বানিয়ার গৃহে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের কুঁবর সা' তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আপনাদের মহারাজের কাছে।"

শক্তিসিংহ বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো গিরধরলাল। তারপর পেছন ফিরেই লক্ষ্য করলো আরেকজন এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

"তুমি এখানে কি করছো তেজসিংহ ?"

"দেখছি ?"

"কি দেখছো ?"

"তুমি যা দেখছো , আমিও তাই দেখছি।"

গিরধরলাল হাসলো। বললো, "জানো তেজসিংহ, আমাদের কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ একটা গাধা। তার ধারণা, আমরা কিছু টের পাইনা।"

"তার এই ধারণাই কিছুদিন থাক," তেজসিংহ উত্তর দিলো, "সবার পেছনে হরকরা লাগিয়ে মনে করুক যে তার নজর এড়িয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। যেদিন নিজের ভুল বুঝবে, সেদিন আর কিছু করার থাকবে না।"

"কুঁবর সা' রওনা হচ্ছেন কখন ?"

"আর দুঘড়ি পরে।"

"কৃষ্ণাজী আপ্তে খবর পেয়েছেন ?"

"উনি এখন কুঁবর সা'র সঙ্গে গোপনে বসে সলা-পরামর্শ করছেন।"

"এরই মধ্যে পৌঁছে গেছেন এখানে ?"

"মারাঠাদের চেনো না ? ওদের গতিবিধি অত্যন্ত দ্রুত।"

জোধপুর-মহারাজার মঞ্জিলের এক নিভৃত কক্ষে মিলিত হোলো অম্বরের রাজকুমার রামসিংহ আর জোধপুরের মহারাজা জসবন্ত সিংহ। রামসিংহের সঙ্গে ছিলো তেজসিংহ আর কৃষ্ণাজী আপ্তে। জসবন্ত সিংহের সঙ্গে ছিলো দেবীদাস রাঠোর আর শক্তিসিংহ। দেবীদাস মহারাজা জসবন্ত সিংহের দিওয়ান আসকরণজীর পুত্র। এসময় দেবীদাস তরুণ যুবক মাত্র, কিন্তু সেদিন থেকে বারো বছর পরে দেহান্তরিত জসবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহকে আওরংজেবের হাত থেকে বাঁচিয়ে মাড়বাড়ের স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব করে ইতিহাসে নাম রেখে গেছে। তেজসিংহ অম্বর দরবারের একজন বিশিষ্ট সর্দার এবং কুমার রামসিংহের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। মহারাজা জসবন্ত সিংহের কাছে কৃষ্ণাজী আপ্তের বিশদ পরিচয় দিলো কুমার রামসিংহ। কৃষ্ণাজী পুণা-মহলের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের দেশমুখ এবং শিবাজীর ফৌজের এক তরুণ সর-ই-লশকর।

"আমাদের পরম সৌভাগ্য," বললো জসবন্ত সিংহ, "শিবাজী ভোঁসলে আগ্রায় পদার্পন করছেন। শাহ্-ইন-শাহর রাজত্বের ইতিহাসে এই ঘটনা একটা বিশেষ মর্যাদা পাবে।"

"কতোখানি মর্যাদা পাবে সেটা নির্ভর করছে আপনাদের সহযোগিতার উপর," বললো কৃষ্ণাজী।

"শাহ্-ইন-শাহর মনসবদারেরা সব সময় পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে," জসবন্ত সিংহ উত্তর দিলো।

পলকের জন্যে যেন জ্বলে উঠলো কৃষ্ণাজীর ছোটো ছোটো দুটো চোখ। কিন্তু আত্মসংবরণ করে বললো, "শিবাজী এখনো মোগল দরবারের কোনো মনসব গ্রহণ করেন নি। শুধু শিবাজীর পুত্র

শম্ভুজীকে পাঁচ হাজারী মনসব দেওয়া হয়েছে। শিবাজী আগ্রায় আসছেন মোগল বাদশাহর আমন্ত্রণ পেয়ে।"

"শাহী মেহমানের যোগ্য মর্যাদা শাহ-ইন-শাহ্ই দেবেন।" একটু ব্যঙ্গ অনুভূত হোলো জসবন্ত সিংহের কণ্ঠে।

কুমার রামসিংহ বলে উঠলো, "আমাদের শাহ-ইন-শাহ অসীম করুণাময়, শিবাজীর যথাযোগ্য সমাদরের নির্দেশ তিনি নিশ্চয়ই দেবেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার।"

"কি বিষয়ে কুমার রামসিংহ?"

"শিবাজী যে শাহ-ইন-শাহর মিত্র বলে পরিগণিত হন, এটা দরবারের অনেকেরই কাম্য নয়। হয়তো তাঁরা শিবাজীর অসম্মান করার সুযোগ খুঁজবেন।"

"শাহী মেহমানের অসম্মান করে এমন সাহস কার আছে?" জিজ্ঞেস করলো জসবন্ত সিংহ।

"তেমন সাহস যাতে কারো না হয় তার জন্যে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার," বললো রামসিংহ।

"কুমার রামসিংহ, আপনি কি কোনো বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন?"

"হ্যাঁ মহারাজ। বিশেষ কোনো প্রস্তাব না থাকলে আমরা এখানে এসে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতাম না।"

"শোনা যাক, কী প্রস্তাব।"

"শিবাজী যেরকম নির্বিঘ্নে দাক্ষিণাত্য থেকে হিন্দুস্তানে এসেছেন, সেরকম নির্বিঘ্নে যাতে হিন্দুস্তান থেকে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে পারেন, তার জন্যে আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকবো। যদি প্রয়োজন হয়, আগ্রার সমস্ত কছওয়া এবং রাঠোর রাজপুত ফৌজ সম্মিলিত ভাবে শিবাজীর সহায়তা করবে। এব্যাপারে আপনি এবং আমি সহযোগিতা করলে শিবাজীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনো ভাবনা আমার থাকবে না।"

জসবন্ত সিংহ তাকিয়ে দেখলো রামসিংহের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কুমার রামসিংহ, আপনার মনে কি এমন কোনো সন্দেহ আছে যে, শাহ-ইন-শাহ শিবাজীকে নির্বিঘ্নে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে দেবেন না ?"

"না, মহারাজ, ও কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। আমি শুধু একথা বলতে চাই, আমার পিতা মহারাজা জয়সিংহের আশ্বাসের উপর ভরসা করেই শিবাজী আগ্রায় আসছেন। আমার পিতার মুখের কথার মর্যাদা যেন থাকে। রাজপুতের কাছে মুখের কথার দাম অনেক। আমার পিতা এখানে অনুপস্থিত। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আশ্বাসের মর্যাদা রাখার দায়িত্ব আমার। এই দায়িত্ব প্রতিপালনে একজন রাজপুতকে সাহায্য করা অন্য রাজপুতের জাতি-ধর্ম। আমি একজন রাজপুত হিসেবে আপনার সহায়তা প্রার্থনা করছি।"

"আপনার পিতা আমার বন্ধুস্থানীয়," বললো জসবন্ত সিংহ, "তিনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে পারতেন।"

"পত্র ব্যবহার করা সব সময় নিরাপদ নয়। আমি তাঁর নির্দেশেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।"

"আপনার কাছে এই নির্দেশ কি লিখিত পত্র মারফত এসেছে ?"

"না মহারাজ, আমার কাছে মৌখিক নির্দেশ এসেছে হরকরার মারফত।"

"ও।" কিছুক্ষণ চিন্তা করলো জসবন্ত সিংহ। তারপর বললো, "কুমার রামসিংহ, সমস্ত বিষয়টা অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে চিন্তা করা উচিত। আপনার পিতা এবং আমি উভয়েই শাহ-ইন-শাহর খাদিম। তিনি বিরূপ হন এরকম কোনো কাজ করা আমাদের কারো পক্ষেই উচিত হবে না। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনাকে যথাসাধ্য সহায়তা করার ইচ্ছা আমার আছে।

আর একথাও আপনাকে আমি বলতে পারি যে শিবাজীর প্রসঙ্গে আজ শাহ-ইন-শাহ গুসলখানায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন উজীর জাফর খাঁ ও আমার সঙ্গে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, শাহ-ইন-শাহ শিবাজী ভোঁসলের যথাযোগ্য সমাদর করবার জন্যে নির্দেশ দেবেন। এবং যথাসময়ে তাঁকে নিজের দেশে ফিরে যেতে হুকুম দেওয়ায় তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। তিনি জানেন যে, শিবাজীর বিন্দুমাত্র অসম্মান কি অমর্যাদা হলে মহারাজা জয়সিংহ এবং আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো। শাহ-ইন-শাহ কছওয়া কি রাঠোর কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চান না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কুমার রামসিংহ। কৃষ্ণাজী আপ্তে, আজ শাহ-ইন-শাহ নিজে উজীর-উল-মুল্‌কের মারফত হব্‌স্‌-অল-হুকুম পাঠিয়েছেন আপনার প্রভুর কাছে। এই পত্র পাঠ করে তিনি নিশ্চিন্ত মনেই আগ্রায় আসবেন, শাহ-ইন-শাহ্‌র আশ্বাসের পর আমাদের আর কারো কোনো আশ্বাস নিষ্প্রয়োজন।"

"যদি কোনো ব্যতিক্রম হয়?" কুমার রামসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"আপনিও আছেন, আমিও আছি। তখন যা হোক একটা কিছু বিচার বিবেচনা করে দেখা যাবে।"

রামসিংহ ও তার সঙ্গীরা বিদায় গ্রহণ করবার পর মহারাজা জসবন্ত সিংহ দেবীদাস ও শক্তিসিংহের দিকে ফিরে বললো, "আমি মহারাজ জয়সিংহকেও বিশ্বাস করিনা, শিবাজী ভোঁসলেকেও বিশ্বাস করিনা। ওদের কোনো জটিলতার মধ্যে আমি নিজেকে জড়াতে রাজী নই।"

"আমি কিন্তু বাদশাহ আওরংজেবকেও বিশ্বাস করিনা," বললো দেবীদাস রাঠোর।

জসবন্ত সিংহ তাকিয়ে দেখলো দেবীদাসের দিকে! একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। আস্তে আস্তে বললো, "শাহ-ইন-শাহ্‌ও বিশ্বাস করেন না কাউকে, তবে আমার চাইতে

মহারাজা জয়সিংহের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস অনেক কম। সাত বছর আগে শাহজাদা শুজার সঙ্গে যখন আওরংজেবের যুদ্ধ হয়, তখন খজওয়ার রণক্ষেত্রে আমি তাঁর অসুবিধার সৃষ্টি করেছিলাম বলে আজও আওরংজেব মনে মনে আমার প্রতি বিরূপ। জয়সিংহ শাহজাদা দারা ও সুলেমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছিলো বলে তার প্রতি শাহ-ইন-শাহর খুব নেকনজর। এবার আমার সুযোগ আসছে। আমি শাহ-ইন-শাহর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো যে, মহারাজা জয়সিংহের উপরও ভরসা করতে পারে না মোগল বাদশাহ্।" বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো জসবন্ত সিংহ। কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পদচারণা করলো কয়েকবার। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, "ভেবে দেখ দেবীদাস, কী অবিচার! জয়সিংহ সুবাদারের পদমর্যাদা পেতে পারে, কিন্তু আমাকে উপযুক্ত মনে করা হয় না কাবুলের সুবাদারের পদের জন্যে, এমনকি কাবুল শহরের ফৌজদারের পদের জন্যেও নয়, আমাকে পাঠাতে চায় খাইবার-গিরিবর্ত্মের কাছে জামরুদের সামান্য থানাদার করে। জিজ্ঞেস করো শক্তিসিংহকে, তিন বছর আগে তো সে আমার সঙ্গে ছিলো দাক্ষিণাত্যে, মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে যে রাঠোরেরা বেশী সাফল্য লাভ করতে পারেনি, সে কি রাঠোরদের শৌর্যের অভাব বলে, না আওরংজেবের প্রিয়পাত্র সুবাদার শায়েস্তা খাঁর অক্ষমতার জন্যে? আওরংজেব জয়সিংহকে যে রকম সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন, আমার বেলা কি সেই বিবেচনা দেখিয়েছিলেন?"

শক্তিসিংহ রাঠোর আনমনে কি যেন ভাবছিলো। জসবন্ত সিংহ লক্ষ্য করলো এই অন্যমনস্কতা।

"শক্তিসিংহ!" ডাকলে মহারাজা জসবন্ত সিংহ।

সে হঠাৎ সচকিত হয়ে শুনতে পেলো তাকে জসবন্ত সিংহ বলছে, "তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছো। চিন্তার কোনো বিশেষ কারণ ঘটেছে কি?"

"না মহারাজ, আমি শুধু ভাবছিলাম—," বলতে বলতে সে থেমে গেল।

"কি ভাবছিলে?"

"শিবাজীর সঙ্গে আমাদের বাদশাহ্‌র একটা স্থায়ী সন্ধি হওয়া কি খুব বাঞ্ছনীয়?"

জসবন্ত সিংহ হাসলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না কিছুক্ষণ। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো, "শক্তিসিংহ রাঠোর, আজ থেকে তিন বছর আগেকার সেই দিনটির কথা তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ মহারাজা, মনে আছে বৈ কি।"

জসবন্ত সিংহ দেবীসিংহ রাঠোরের দিকে ফিরে বললো, "শায়েস্তা খাঁ তখন পুণার লাল-মহলে আরাম করছেন। কিছু দূরে যে সড়ক চলে গেছে দক্ষিণে সিংহগড়ের দিকে, তারই একপাশে আমার ফৌজের ছাউনি। কেউ জানে না যে, সেদিন আমাদের শক্তিসিংহ রাঠোর গোপনে শিবাজীর বিশ্বস্ত 'সহচর চিমনাজী বাপুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার শিবিরে ফিরে এসেছে। সেদিন রাত্রিকালে শিবাজী দুশোজন সৈন্যের সঙ্গে আচম্বিতে শায়েস্তা খাঁর মহল আক্রমণ করেছিলো। অনেকের সন্দেহ হয়েছিলো, শিবাজী এই হামলা করতে পেরেছে আমারই যোগসাজসে। এরকম সন্দেহ হওয়ার কোনো প্রমাণ ছিলো না, কিন্তু এখানে নিজেদের মধ্যে আমরা স্বীকার করতে পারি যে, এই সন্দেহ অমূলক নয়। বাদশাহ অসন্তুষ্ট হয়ে শায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়ে দিলো বাংলায়, তারপর আমাকে সরিয়ে এনে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিলো মহারাজা জয়সিংহকে। তোমরা যারা আমাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানো, কোনোদিন কি তোমাদের এই ধারণা হওয়া উচিত যে, শিবাজী আর আওরংজেবের মধ্যে একটা স্থায়ী সন্ধি হওয়াটাকে আমি বাঞ্ছনীয় মনে করবো?"

"কিন্তু মহারাজ, আপনি কুঁবর-সা'র সঙ্গে একটু কঠিন হয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, তার কারণ, সে কছওয়া-রাজার পুত্র। তাছাড়া, একথা আমি কাউকেই জানতে দিতে চাইনা যে, আমি শিবাজীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,—আওরংজেবকেও জানতে দিতে চাইনা, রামসিংহকেও না। শিবাজী কৃষ্ণাজী আপ্তের মুখে আজকের সাক্ষাতের বিবরণ শুনে হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি কিছুতেই বাদশাহকে ভালো ব্যবহার করতে দেবো না শিবাজীর সঙ্গে। আমি চাই, বাদশাহ শিবাজীর অসম্মান করুক, শিবাজী হতাশ হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাক দাক্ষিণাত্যে। শিবাজীর যদি কোনো বিপদ হয় আমি রক্ষা করবো তাকে। তবে কেউ জানবে না সেকথা। বাদশাহ জানবে জয়সিংহ আর রামসিংহের সঙ্গে শিবাজীর একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমি সামান্য থানাদার হয়ে জামরুদ যাবো না, আমি দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার নাও বা যদি হই, অন্তত মোগল ফৌজের মির বকশি হয়ে ফিরে যাবো দাক্ষিণাত্যে। আমি শিবাজীকে সাহায্য করবো স্বাধীন নৃপতি হিসেবে বাদশাহর স্বীকৃতি পেতে। আওরংজেব ধারমতের যুদ্ধে আমাকে এবং আমার রাঠোরদের চরম অসম্মান স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলো। সে অপমান আমি ভুলিনি। এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।"

থামলো জসবন্ত সিংহ, তারপর এগিয়ে এসে দুহাত রাখলো দেবীদাস রাঠোর ও শক্তিসিংহের কাঁধে। বললো, "একাজে তোমরা হবে আমার সহায়। তবে—কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।

-

আওরংজেব তখ্‌তএ হাসিল হওয়ার পর বৃদ্ধ বাদশাহ শাহজাহান যেই কবছর আগ্রার কেল্লায় বন্দী অবস্থায় বেঁচে ছিলো, আওরংজেব থাকতো দিল্লীতে। কিন্তু এবছরই কয়েক মাস আগে

জানুয়ারিতে শাহজাহানের মৃত্যু হয়। আওরংজেব ফেব্রুয়ারী মাসে চলে এলো আগ্রার কেল্লায়। এতদিন আওরংজেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বড়ী বেগম সাহিবা জাহান-আরা আগ্রার কেল্লাতেই থাকতো। কিন্তু আওরংজেবের আগ্রায় আসবার পর সে আর থাকতে চাইলো না সেখানে। আগ্রা শহরের কেন্দ্রে ছিলো আলি মরদন খাঁর মঞ্জিল। সেটি ছেড়ে দেওয়া হোলো জাহান-আরাকে। দারার পুত্রকন্যাদের নিয়ে জাহান-আরা উঠে এলো আলি মরদন খাঁর মঞ্জিলে। রওশন-আরা আর গওহর-আরা আগ্রার কেল্লায় থেকে গেল আওরংজেবের সঙ্গে। মুরাদের কিশোর পুত্র ইজিদ বক্স রইলো গওহর-আরার সঙ্গে।

তখন আওরংজেব তখত-এ-হাসিল হওয়ার পর সাত বছর কেটে গেছে। জনসাধারণের মন থেকে প্রায় মুছে যাচ্ছে গৃহযুদ্ধের বেদনাময় স্মৃতিগুলো। দারার মৃত্যুর পর তখন সাত বছর কেটে গেছে, গোয়ালিয়র দুর্গে মুরাদের মৃত্যুর পর পাঁচ বছর। সেই দুর্গেই সুলেমান শিকো নিহত হয়েছে, তাও চার বছর হতে চললো। ছ' বছর ধরে শুজাও আরাকানে নিখোঁজ। মগদের হাতে তার করুণ মৃত্যুর গুজব লোকে আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আওরংজেবের জ্যেষ্ঠ সন্তান সপ্তবিংশবর্ষ বয়স্ক শাহজাদা মহম্মদ সুলতান প্রায় ছ-বছর ধরে গোয়ালিয়র দুর্গে কয়েদ হয়ে আছে। তার কথাও কেউ বড় একটা উল্লেখ করে না। সবাই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে নতুন জীবনযাত্রার সঙ্গে।

যেদিন অপরাহ্ণে কুমার রামসিংহ মহারাজা জসবন্ত সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো, সেদিন সন্ধ্যায় আলি মরদন খাঁর মঞ্জিলে বড়ী বেগম সাহিবাকে তসলিম জানাতে এসেছিলো আওরংজেবের পুত্রকন্যারা। পুত্রদের মধ্যে তরুণ শাহজাদা মহম্মদ মুয়াজ্জম আগ্রায় উপস্থিত ছিলো না। সে তখন দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ শহরে। অন্য দুজন তখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক,—মহম্মদ

আজমের বয়েস ত্রয়োদশ, মহম্মদ আকবরের নয়। তাদের জননী দিলরসবানু বেগম স্বর্গারোহন করেছে প্রায় ন-বছর আগে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে দুজনেই। ওরা ভগিনীদের সঙ্গে এলো পাল্কি চড়ে।

যথাবিহিত রীতিতে খবর পাঠানো ছিলো আগে থেকেই। দেউড়ি দিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করতেই বেগম সাহিবার মহলদার এসে অভ্যাগতাদের অভ্যর্থনা করে মহলের ভিতর নিয়ে গেল। সেখানে অপেক্ষা করেছিলো দারার পুত্রকন্যারা এবং সুলেমান শিকোর দুই কন্যা। ওরা আওরংজেবের পুত্র কন্যাদের খাতিরদারি করতে লাগলো। সাড়া পড়ে গেল মহলের মধ্যে। খাদিমান ও খোজা খাদিমেরা বয়ে নিয়ে এলো শরবত আর মেওয়া। শাহজাদীরা বসলো মুখোমুখি। দারার পুত্র সিপিহ্‌র শিকো এখন দ্বাবিংশ-বর্ষীয় যুবক। মহম্মদ আকবর আর মহম্মদ আজমকে নিয়ে সে বসলো একটু তফাতে।

দারা-সুলেমানের সঙ্গে যতোই শত্রুতা থাক আওরংজেব তাদের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে চিরকালই খুব সদয় ব্যবহার করেছিলো। এজন্যে দারা ও আওরংজেবের পুত্রকন্যাদের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিলো। পরবর্তীকালে আওরংজেবের কন্যা জুবদত-উন-নিসার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো সিপিহ্‌রের, দারার কন্যা জাহানজেব বানুর সঙ্গে হয়েছিলো আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ আজমের পরিণয়, এবং সুলেমান শিকোর কন্যা সলিমাবানুর সঙ্গে মহম্মদ আকবরের। সেদিন থেকে কয়েক বছর পরে মুরাদ বক্‌স্‌এর পুত্র ইজিদ বক্‌স্‌ বিবাহ করেছিলো আওরংজেবের কন্যা মেহের-উন-নিসাকে।

আওরংজেবের পাঁচ কন্যা, দারার তিন আর সুলেমান সিকোর দুই,—এই দশজন শাহজাদীর উপস্থিতিতে যেন রূপের মেলা বসে গেল সেখানে। দারার দুই কন্যা পাক-নিহাদ বানু আর জাহানজেব-বানু তখন পূর্ণ যুবতী, একজনের বয়েস পঁচিশ, অন্যজনের কুড়ি।

দারার তৃতীয়া কন্যা আমল-উন-নিসা আর সুলেমান শিকোর কন্যা সলিমাবানু তখন কিশোরী মাত্র, সুলেমানের অন্যতমা কন্যার— ইতিহাস যার নাম স্মরণ রাখেনি—শৈশব চলছে তখনো।

আওরংজেবের পাঁচ কন্যার মধ্যে স্বর্গগতা দিলরসবানু বেগমের গর্ভজাত কন্যা জেব-উন-নিসা ও জিনত-উন-নিসা তখন পূর্ণ যৌবনা, একজন আটাশ, অন্যজন তেইশ। রহমত-উন-নিসা বেগমের গর্ভজাত উনবিংশতিবর্ষীয়া কন্যা বদর-উন-নিসাও প্রাপ্তবয়স্কা। দিলরসবানুর তৃতীয়া কন্যা জুবদত-উন-নিসা সবে চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করেছে, আওরঙ্গাবাদী মহলের কন্যা মেহের-উন-নিসা মাত্র পাঁচ বছরের শিশু।

খানদানী রেওয়াজ অনুযায়ী কুশল বিনিময়ের পর জেব-উন-নিসা বড়ী বেগম সাহিবার খোঁজ করলো। পাক-নিহাদ বানু উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করলো। জাহানজেব বানু হেসে জানালো বেগম সাহিবা ইত্তলা দিয়েছেন আগ্রার কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ ও দিওয়ান-ই-খাসের দারোগাহ্ আকিল খাঁকে। ওরা হাজির হয়েছে দেউড়িতে। বেগম সাহিবা একজন খোজা খাদিমের মারফত বাক্যালাপ করছেন তাদের সঙ্গে।

আকিল খাঁর নাম শুনে জেব-উন-নিসার মুখমণ্ডল আরক্ত হোলো। দশবছরের একটা পুরোনো স্মৃতি জড়ানো আছে এই নামের সঙ্গে। সবাই তখন দাক্ষিণাত্যে, আকিল খাঁও তখন আওরঙ্গাবাদে আওরংজেবের জিলওদার। তারপর ফৌজ নিয়ে আওরংজেব রওনা হোলো হিন্দুস্তান, স্ত্রী-কন্যাদের রেখে গেল দৌলতাবাদের কেল্লায়। কেল্লার কিলাদারের পদে নিযুক্ত করা হোলো আকিল খাঁকে, তারপর দৌলতাবাদের ফৌজদার। স্বপ্নের মতো মনে হয় সেই দিনগুলোর কথা। মাঝখানে কতো বছর দেখা হয়নি। রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে সে নিষ্কর্মা হয়ে বসেছিলো লাহোরে। সম্প্রতি বছর দুয়েক বাদশাহর অনুগ্রহ লাভ করে আবার

হাজির হয়েছে বাদশাহ্‌র খিদমতে, তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস। কিন্তু আজকাল আর দেখা হয় না। জেব-উন-নিসা খুদ শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র কন্যা। আদবকায়দার অনেক কড়াকড়ির মধ্যে তাকে থাকতে হয়, মাতৃহীন ভাই দুটোর দেখাশোনা করতে হয়, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখার ফুরসত কোথায়?

সিপিহ্‌র শিকো জিজ্ঞেস করলো, "একটা গুজব শুনছি, সেটা কি সত্যি?"

"কি গুজব ভাই?" জানতে চাইলো জিনত-উন-নিসা।

"সবাই বলছে শিবাজী নাকি আগ্রায় আসছেন।"

বদর-উন-নিসা উত্তর দিলো, "হ্যাঁ সত্যি, আমি খুদ হজরত শাহ-ইন-শাহ্‌র মুখে শুনেছি।"

জাহানজেব বানু বললো, "যদ্দুর মনে হচ্ছে বেগম সাহিবা ফুলাদ খাঁ আর আকিল খাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন শিবাজীর সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যেই। ওরা দুজন শাহ-ইন-শাহ্‌র অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। ওদের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই।"

মহম্মদ আজম এই কিশোর বয়েসেই অত্যন্ত রুক্ষ ও দাম্ভিক। সে বলে উঠলো, বেগম সাহিবাকে হজরত শাহ-ইন-শাহ্‌র খাদিমদের শরণাপন্ন হতে হবে কেন? হজরত শাহ-ইন-শাহ কি তাঁকে খাতির করেন না? হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজা আমির ওমরাহ্‌ সবাই কি ছুটে আসেনা তাঁর হুকুম তামিল করতে? এরা দুজন তো সাধারণ মনসবদার মাত্র।"

জিনত-উন-নিসা উত্তর দিলো, "রাজনীতি যে কি বস্তু তুমি কি বুঝবে ভাই? আরেকটু বড়ো হও, দেখবে তোমার মতো জবরদস্ত শাহজাদাকেও এক এক সময় হজরত শাহ-ইন-শাহ্‌র গুর্‌জ্‌বরদারের খোসামোদ করতে হচ্ছে।"

"কিন্তু বেগম সাহিবা তো আলা-হজরতের মৃত্যুর পর কোনো

বিষয়ে কোনোরকম আগ্রহ দেখান না," বললো জুবদত-উন-নিসা, "আজ উনি হঠাৎ এই পাহাড়ী ডাকাতের সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন কেন?"

"মানুষের সব স্বার্থের মূল যেখানে সেখানেই যে ঘা পড়েছে বোন," বলে উঠলো জাহানজেব বানু।

"কোথায় ভাই? কিসের স্বার্থে?" জিজ্ঞেস করলো বদর-উন-নিসা।

"টাকার স্বার্থে।"

"আমাদের ফুফীজান! আমাদের বেগম সাহিবা!" বিস্ময় প্রকাশ করলো জুবদত-উন-নিসা, "উনি তো এসব স্বার্থের উর্ধ্বে বলেই জানতাম।"

"আজকাল কেউই এসব স্বার্থের উর্ধ্বে নয়," উত্তর দিলো জাহানজেব বানু।

"কিন্তু কেন? বেগম সাহিবার অভাব কিসের?"

জাহানজেব বানু হাসলো। বললো, "আলা হজরত তাঁর জীবদ্দশায় সুরাট বন্দরের আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের সমস্ত আয় ভোগ করবার অধিকার দিয়েছিলেন বেগম সাহিবাকে। বছরে কয়েক লক্ষ টাকা আসে সুরাট থেকে। বছর দুয়েক আগে শিবাজী যে সুরাট লুঠ করেছিলেন, তাতো সবাই জানো। শিবাজী প্রায় এক কোটি টাকা নিয়ে গেছে সুরাট থেকে। শাহ-ইন-শাহ বন্দরের সমস্ত শুল্ক মাফ করে দিয়েছেন এক বছরের জন্যে। বেগম সাহিবার কতো টাকার লোকসান হোলো ভাবো তো!"

পাঁচ বছরের শিশু মেহের-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো, "এই শিবাজী লোকটা কি খুব বুড়ো? আম্মি বলছিলো সে নাকি ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের থলিতে পুরে নিয়ে পালিয়ে যায়।"

সবাই হাসলো তার কথা শুনে। সিপিহর্ জিজ্ঞেস করলো,

"সত্যি, শিবাজীর নাম কয়েকবছর থেকে শুনছি। উনি কি আমাদের হজরত শাহ-ইন-শাহ্‌র মতোই মধ্যবয়স্ক ?"

"হজরত শাহ-ইন-শাহ এখন আটচল্লিশ," বললো জিনত-উন-নিসা। সে অনেক খবর রাখতো। হিসেব করে বললো, "শিবাজীর বয়েস এখন উনচল্লিশের বেশী নয়।"

"শুনেছি ওঁর নাকি দাড়ি আছে," বলে উঠলো সলিমা বানু।

"দেখতে সুপুরুষ বলেই তো জানি," উত্তর দিলো জিনত-উন-নিসা।

"কে বলেছে ?"

"আকিল খাঁ বলেছে। সে নাকি একবার দেখেছে শিবাজীকে।"

শিবাজীর সম্বন্ধে সারা হিন্দুস্তানে নানারকম কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে পুনায় শায়েস্তা খাঁর মহল চড়াও হওয়ার এবং কয়েক বছর আগে আফজল খাঁকে নিহত করার ঘটনাগুলো নিয়ে। যেমনি আলোচনা হোতো দিল্লী আগ্রা অম্বর জোধপুরের বাজারে, তেমনি আলোচনা হোতো রাজা বাদশাহ্‌র রংমহলে, ছোটো বড়ো সবার মধ্যে। এসব আলোচনার পুনরাবৃত্তি জেব-উন-নিসার আর ভালো লাগছিলো না। সে পাক-নিহাদ বানুকে নিয়ে উঠে পড়লো মহলের চামেলি-বাগের নতুন ফোয়ারাগুলো দেখবার অছিলায়। পাক-নিহাদ বানু লক্ষ্য করেছিলো তার মনের অশান্ত ভাব। শাহজাদীদের মধ্যে অজানা ছিলো না আকিল খাঁর সঙ্গে জেব-উন-নিসার পূর্ব প্রণয়ের কথা। সে জেব-উন-নিসাকে নিয়ে এগিয়ে চললো চামেলি-বাগের দিকে যাওয়ার পথ ধরে, কিন্তু অন্য শাহজাদীদের চোখের আড়াল হতেই বললো, "চামেলি-বাগে পরে যাবো, আগে চলো দেখে আসি আমাদের ফুফীজান বেগম সাহিবা কি করছেন।"

"সে কি করে হয় ? ফুফীজান রাগ করবেন যে !" বলে উঠলো জেব-উন-নিসা।

"উনি জানতে পারবেন না।"

জেব-উন-নিসা একটু বিস্মিত হয়ে তাকালো পাক-নিহাদ বানুর দিকে।

পাক-নিহাদ বানু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "আকিল খাঁকে এক নজর দেখে নিতে ইচ্ছে করে না?"

জেব-উন-নিসার মুখ ঈষৎ রাঙা হোলো। বললো গম্ভীর হয়ে, "আমি বাদশাহ্‌র কন্যা, পাক-নিহাদ বানু—।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বাদশাহ্‌র কন্যা, বাদশাহজাদীর মতোই দেখবে।"

"সে কি করে সম্ভব?"

"এসো আমার সঙ্গে। ওপাশের মহলের উপর তলার বুরুজে একটি ঝরোকা আছে, সেখান থেকে দেউড়ির ওদিকটা পরিষ্কার দেখা যায়।"

দুজনে উঠে এলো দক্ষিণ দিকের মহলের উপরতলার একটি বুরুজে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো জেব-উন-নিসা। দেখলো কেউ কোথাও নেই, এদিকটা বেশ নির্জন। পাক-নিহাদ বানুর পেছন পেছন একটি ঝরোকার সামনে এসে দাঁড়ালো।

"ওই দেখ," বললো পাক-নিহাদ বানু।

জেব-উন-নিসা নিচে তাকিয়ে দেখলো। প্রশস্ত মর্মর অলিন্দে একটি মর্মর-জালির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। সসম্ভ্রমে মাথা নিচু করে আছে দুজনেই, চোখ তুলে জালির দিকে তাকাবে না ওরা, সেটা বে-আদবি।

জালির ওপারে কে আছে এখান থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জাহান-আরা বেগম সাহিবার অদৃশ্য ব্যক্তিত্ব ওরা এখান থেকেই বুঝতে পারলো। নিজের খাস খোজা খাদিমের মারফতে ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলছে বেগম সাহিবা।

আকিল খাঁকে চিনতে পারলো জেব-উন-নিসা। তার দীর্ঘ

সুসংবদ্ধ দেহগঠন দূর থেকেই চোখে পড়ে অনেকের মাঝখানেই। পাশে যে ছিলো, সে ঈষৎ স্থূলকায়, জেব-উন-নিসা বুঝতে পারলো সে লোকটিই আগ্রার কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ। তার দিকে জেব-উন-নিসা তাকালোই না, তুচোখ ভরে দেখতে লাগলো আকিল খাঁকে। ওর সঙ্গে আজকাল আর যোগাযোগ নেই, যোগাযোগ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কখনো কখনো দূর থেকে এমনি করে একটুখানি দেখে নেওয়ার সুযোগ হয়,—মাঝে মাঝে আম-দরবারে, দেওয়ালের পেছনে বেগমদের জন্মে নির্দিষ্ট অলিন্দে বসে ক্ষুদ্র ঝরোকার ঘন জাফরির ভিতর দিয়ে, মাঝে মাঝে পর্ব-উৎসব উপলক্ষে কুচ কাওয়াজের সময় দূরের মহলে বাতায়নের আড়াল থেকে। কিন্তু সেখানে থাকে আরো অনেকের ভিড়, সংযত রাখতে হয় নির্লিপ্ত চোখের অভিজাত দৃষ্টি। শাহজাদী কার দিকে তাকাচ্ছে, কতক্ষণ ধরে তাকাচ্ছে, কি ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে এসব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার মতো কেউ নেই এখানে, কোনো সম্ভাবনা নেই সামান্য অসংযত ভঙ্গির দরুণ কোনো অকারণ গুজব শুরু হওয়ার। তাই প্রাণভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো জেব-উন-নিসা। মনে পড়লো আওরঙ্গাবাদ আর দৌলতাবাদের স্বপ্নের মতো দিনগুলো। আস্তে আস্তে তু চোখ জলে ভরে উঠলো।

কিন্তু মনের কোনো তুর্বলতা প্রকাশ করতে চাইলো না পাক-নিহাদ বানুর সামনে। তার দিকে না ফিরেই সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "ফুফীজান অতো কি আলোচনা করছে ওদের সঙ্গে?"

পাক-নিহাদ বানু উত্তর দিলো, "যদ্দূর মনে হয়, ওদের মারফতে শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে এই প্রস্তাব তোলাতে চান যে, শিবাজীর সুরাট লুণ্ঠন করার ফলে ফুফীজানের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, ওর কাছ থেকে যেন তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়।"

"ফুফীজান কি শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে এই আরজ সোজাসুজি পেশ করতে পারেন না?"

"সেটা উনি নিজের থেকে করতে চান না, এ ব্যাপারে যে ওঁর নিজের কোনো আগ্রহ আছে এটা জানতে দিতে চান না।"

জেব-উন-নিসা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না, একটু ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে। কারণ ফুলাদ খাঁ ও আকিল খাঁ তখন সামনে ঝুঁকে পড়ে তসলিম করছে। বাদশাহ আওরংজেব তখনো খুদ্ বাদশাহ ছাড়া শাহী খানদানের অন্য কোনো ব্যক্তিকে তসলিম জানানোর রেওয়াজ বন্ধ করে দেওয়ার কানুন জারি করে নি।

ওরা দুজন সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। মহলের নাজির যখন জানালো যে বেগম সাহিবা চলে গেছেন, তখন ওরা মাথা তুলে ফিরে দাঁড়ালো। নিজেদের মধ্যে দু চারটা কথা বললো, তারপর এগিয়ে চললো দেউড়ির দরওয়াজার দিকে। আগে আগে চলছিলো ফুলাদ খাঁ, পেছন পেছন আকিল খাঁ। বুরুজের ঠিক নিচে আসতেই জেব-উন-নিসা নিজের কবরী থেকে একটি লাল গোলাপের কুঁড়ি তুলে নিয়ে ফেলে দিলো ঠিক তার সামনে।

আকিল খাঁর সামনে পড়লো গোলাপের কুঁড়ি। সে চট করে তুলে নিলো। তাকিয়ে দেখলো উপর দিকে। কিন্তু শাহজাদী তখন সরে গেছে সেখান থেকে। আকিল খাঁ বুঝলো। এ তাদের অনেক দিনের পুরোনো সংকেত। সে গোলাপের কুঁড়ি চকিতে কপালে ঠেকিয়ে লুকিয়ে রাখলো জামাহ্‌র ভিতরে।

ঈষৎ হাওয়ায় ঝিরঝির করে উঠলো বাগিচার ফুলগাছের পাতাগুলো। আড়াল থেকে জেব-উন-নিসা তাকিয়ে রইলো যতোক্ষণ না দরওয়াজায় আড়ালে অদৃশ্য হোলো আকিল খাঁ।

দুটি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। পাক-নিহাদ বানুর সঙ্গে নিচে ফিরে এলো জেব-উন-নিসা।

জাহান-আরা বেগম সাহিবা ততক্ষণে এসে যোগ দিয়েছে মেহমানদের মজলিসে। সাদর কুশল সম্ভাষণ করছে সবার সঙ্গে, এমন সময় সেখানে ফিরে এলো জেব-উন-নিসা ও পাক-নিহাদ বানু।

জাহান-আরা জেব-উন-নিসাকে দেখে বললো, "তুমি আমার গরীব-খানায় তশরীফ এনে আমাকে অত্যন্ত বাধিত করেছো। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। কিছু কথা ছিলো। এরা এখানে বসে বাক্যালাপ করুক। পাক-নিহাদ বানু আমার হয়ে মেহমানদারি করবে। তুমি এসো আমার সঙ্গে। একটু নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে।"

জাহান-আরা জেব-উন-নিসাকে নিয়ে এলো নিজের কিতাব-খানায়। কোনো ভূমিকা না করেই বললো, "শিবা আগ্রায় আসছে, শুনেছো বোধ হয়।"

"হ্যাঁ।"

"আওরংজেব যে ওর এত খাতিরদারি করার ইন্তেজাম করছে, সেটা আমার ভালো লাগছে না।"

"শিবাজী আমাদের মেহমান।"

"শিবা এক সামান্য লুঠেরা, বাদশাহ্‌র মেহমান হবার যোগ্য সে নয়।"

"শান-ইন-শাহ যে কোনো অবিবেচনার কাজ করবেন, সেকথা মনে করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, বেগম সাহিবা।"

ক্রোধে জাহান-আরার মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু সংযম না হারিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে গেল, "আমাদের চাঘতাইয়া খানদানের মেয়েদের অনেক দায়িত্ব আছে। মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যে, চাঘতাইয়া খানদানের ইজ্জতের প্রয়োজনে মহলের বেগম সাহিবাদের প্রভাবিত করতে হয় হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌কে। আজ আমার সেই প্রভাব নেই। নবাববাঈ কি আওরঙ্গাবাদী মহল, কারো কথা আওরংজেব কানে তুলবে না। তোমার জননী দিলরসবানুর সে প্রভাব ছিলো, কিন্তু সে তো আজ আর বেঁচে নেই। উদিপুরী মহলকে আমি কিছু বলতে চাই না, আমি আলা হজরত ফিরদৌস আশয়ানি শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ শাহ-জাহানের কন্যা, আমায়

একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয়। আওরংজেব শুধু মানতে পারে তোমার কথা। তোমার এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।"

"কি দায়িত্ব বেগম সাহিবা?"

"জেব-উন-নিসা! সুরাট মহল আমার খাস তরফ্। আলা হজরত ফিরদৌস আশয়ানি সেটি আমায় ইনাম দিয়েছিলেন। সুরাট লুঠ করে শিবা চাঘতাইয়া খানদানের এক শাহজাদীর অসম্মান করেছে। এটা সমস্ত শাহী খানদানের অসম্মান, তোমারও অসম্মান। এর প্রতিকার চাই।"

জেব-উন-নিসা চুপ করে রইলো।

"একথা তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার পিতাকে।"

জেব-উন-নিসা কোনো উত্তর দিলো না।

জাহান-আরা বলে গেল, "যদি উজীর জাফর খাঁ থেকে শুরু করে দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস আকিল খাঁ পর্যন্ত সবাই একথা আওরংজেবকে বলতে শুরু করে, যদি মহলের বেগম সাহিবারাও তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, এ বিষয়ে তাদের মনোভাব কতো কঠিন, আওরংজেব মেনে নিতে বাধ্য হবে। আওরংজেব কোনোদিন আমাদের খানদানের বেইজ্জতি সহ্য করতে পারবে না। নানাকারণে এদিকটা তার চোখে পড়েনি, সুতরাং তোমাকে এ বিষয়ে অবহিত করতে হবে তোমার পিতাকে।"

"আপনি নিজে একথা শাহ-ইন-শাহ্‌কে জানালে ভালো হোতো।"

"আগে তোমরা জানাও। তখন আওরংজেব আমার পরামর্শ গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই। আমি সে সময় জানাবো আমার নিজের অভিমত।"

একটু ইতস্তত করে জেব-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো, "উজীর-উল-মুলক আর দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস এঁরা কি এ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলতে রাজী হয়েছেন?"

"উজীর-উল-মুলকের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয় নি। ও মির্জা রাজা জয়সিংহের লোক। তাকে শিবার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করা কঠিন হবে। তবে, কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ আর দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস আকিল খাঁ আমার কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করে নিয়েছে।"

জেব-উন-নিসা কি যেন ভাবছিলো। জাহান-আরা লক্ষ্য করলো তার অন্যমনস্কতা। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা আছে এই বিষয়ে?"

জেব-উন-নিসা চুপ করে রইলো।

"তুমি যেন কিছু একটা চিন্তা করছো খুব গভীর ভাবে।"

আসল কথাটা বেগম সাহিবাকে বলা যায় না। ওর অনেক কথাই জেব-উন-নিসার কানে যায় নি। তার মনে তখনো ভাসছে আকিল খাঁর স্মৃতি। জাহান-আরার মন্তব্য শুনে জেব-উন-নিসার কর্ণমূল ঈষৎ আরক্ত হোলো, তাড়াতাড়ি বললো, "হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম যদি ছোটী বেগম সাহিবাকে বলা যেতো—"

"জেব-উন-নিসা!"

জাহান-আরার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক গাম্ভীর্যে জেব-উন-নিসা বিস্মিত হোলো।

জাহান-আরা বললো, "শোনো জেব-উন-নিসা, অতীতের নানা ঘটনায় নানা কারণে আওরংজেব রোশন-আরার প্রতি সুপ্রসন্ন। ইদানীং কোনো গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ রোশন-আরার হয়নি। তাকে এই সুযোগ দিও না। তাহলে আবার আওরংজেবের উপর তার প্রভাব বেড়ে যাবে। তোমার জননীর অবর্তমানে তুমিই রংমহলের অধিশ্বরী। তোমায় সরিয়ে সেই স্থান নিয়ে নেওয়ার সুযোগ রোশন-আরা যেন না পায়।"

জেব-উন-নিসার মুখের ভাব একটু কঠিন হোলো, সূক্ষ্ম অধরে

ফুটে উঠলো একটা সংকল্পের আভাস। রোশন-আরাকে সে পছন্দ করতো না।

জাহান-আরা মনে মনে খুশী হোলো।

সেদিন সন্ধ্যায় আওরংজেব দিওয়ান-ই-খাস থেকে গাত্রোত্থান করে সংলগ্ন মসজিদে নামাজ করবার পর যখন রংমহলে ফিরে এলো। জেব-উন-নিসা গিয়ে সাক্ষাৎ করলো পিতার সঙ্গে। তাকে দেখে বিস্মিত হোলো আওরংজেব, কারণ এটা বাদশাহ্‌র পাঠ অধ্যয়নের সময়, কেউ এসময় আসেনা বাদশাহ্‌র কাছে। যখন ভোজনের সময় দস্তরখান পাতা হয় তখন এসে যোগ দেয় মহলের বেগম ও শাহজাদীরা।

কিন্তু জেব-উন-নিসাকে দেখে আওরংজেব খুশিই হোলো। এই কন্যা ছিলো বাদশাহ্‌র অত্যন্ত স্নেহভাজন। সস্নেহে উপবেশন করার অনুমতি দিয়ে কুশল প্রশ্ন করলো।

"আপনার কাছে একটা আরজ নিয়ে এসেছি আলমপনাহ্‌।"

"বলো, কি তোমার আরজ।"

"আলমপনাহ্‌, শিবাজী যখন সুরাট লুঠ করেন, তখন বড়ী বেগম সাহিবার প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয় বলে শুনেছি।"

"হ্যাঁ। কয়েক লাখ টাকার মাশুল থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী।"

"আলমপনাহ্‌, জেব-ই-খাস থেকে সেই অর্থ বেগম সাহিবাকে দিয়ে দেওয়ার হুকুম হোক।"

আওরংজেব একথা শুনে কিছুক্ষণ শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কন্যার দিকে, তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

"তাহলে হয়তো শিবাজী আগ্রায় আসবার পর অনেকে অকারণ উত্তেজিত হবার কোনো উপলক্ষ পাবে না।"

আওরংজেব হাসলো একথা শুনে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে বাদশাহ্‌র দিকে তাকালো জেব-উন-নিসা।

আওরংজেব আস্তে আস্তে বললো, "আমি জানি যে, আমার পুত্র কন্যারা আজ বড়ী বেগম সাহিবার মহলে গিয়েছিলো ওঁকে সালাম জানাতে। আর—হ্যাঁ, একথাও জানি যে, বড়ী বেগম সাহিবা আজ ইত্তলা দিয়েছিলেন ফুলাদ খাঁ ও আকিল খাঁকে। সন্ধ্যার পর দিওয়ান-ই-খাস্‌এ উপস্থিত ছিলো আকিল খাঁ।"

ঈষৎ আরক্ত হোলো জেব-উন-নিসার মুখমণ্ডল, আর কিছু বলতে পারলো না।

আওরংজেব স্নেহভরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো কন্যার মুখের দিকে। তারপর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আমি বাদশাহ, রিয়াসতের বৃহত্তর স্বার্থ আমায় বিবেচনা করতে হয় সব সময়। তবে এটুকু ভরসা আমার উপর সবারই করা উচিত, যারা আমার অনুগত, তাদের হতাশ হতে হবে না শেষ পর্যন্ত।"

উজীর-উল-মুলক জাফর খাঁর মঞ্জিলে রুদ্ধদ্বার মজলিস-খানায় নিভৃতে বসে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আলোচনা করছিলো জাফর খাঁ ও মহারাজা জসবন্ত সিংহ।

জাফর খাঁ বললো, "তাহলে বুঝতেই পারছেন, আপনার কাবুল যাওয়া বাতিল করা আমার পক্ষে অসম্ভব। শাহ-ইন-শাহ এবিষয়ে কৃতসংকল্প। আপনাকে শাহ-ইন-শাহ আগ্রায় থাকতে দেবেন না, জোধপুরেও থাকতে দেবেন না। অথচ, আপনাকে দক্ষিণেও পাঠানো যাবে না। সেখানে আছে মির্জা রাজা জয়সিংহ স্বয়ং। সুতরাং আপনাকে কাবুলে যেতে হবে।"

"সামান্য থানাদার হয়ে?"

"সুবাদার উনি আপনাকে করবেন না, সেকথা তো আপনি জানেন।"

“কিন্তু এতে তো আমি রাজী হতে পারি না। উপায় একটা স্থির করতেই হবে।”

“কোনো উপায় নেই। তবে যদি—” বলতে বলতে থেমে গেল জাফর খাঁ।

“যদি ?”

“যদি মির্জা রাজা দাক্ষিণাত্যে সাফল্য লাভে ব্যর্থ হতেন, তাহলে হয়তো তাঁর জায়গায় আপনাকে পাঠানো যেতো।”

“জয়সিংহের ব্যর্থতার কোনো সম্ভাবনা তো আমি দেখছিনা,” বললো জসবন্ত সিংহ, “উনি ভাগ্যবান লোক।”

“তাই কি ?” খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো জাফর খাঁ।

“কেন ?” জসবন্ত সিংহ বিস্মিত হোলো।

“আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়,” ধীর কণ্ঠে বলে গেল জাফর খাঁ, “মির্জা রাজার সাফল্য অবধারিত। শাহ-ইন-শাহ ওঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছেন দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। প্রথমত, শিবাজীকে পদানত করে মারাঠাদের দুর্বল করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বিজাপুর রাজ্য দখল করা। শেষোক্ত উদ্দেশ্যটা খুবই গোপন, আপাতত কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি। প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করে আগ্রা আসছে শাহ-ইন-শাহ্‌কে নজরানা দিতে। যদি শিবাজীর সহায়তা পাওয়া যায়, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল করতেও বেশী বেগ পেতে হবে না।”

“যদি জয়সিংহ বিজাপুর দখল করতে সক্ষম হন, তাহলে তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবেন। যতদূর শুনেছি, শিবাজী জয়সিংহের গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছে।”

“কিন্তু শিবাজীর মতো লোক জয়সিংহের প্রতি এতটা অনুগত হবে, এটা কি বাঞ্ছনীয় ?” অর্ধমুদিত নেত্রে জাফর খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

“আমিও তো সেকথাই ভাবছি,” বলে জসবন্ত সিংহ হাসলো।

"শাহ-ইন-শাহও একই কথাই ভাবছেন।"

"শাহ-ইন-শাহ কি চান না যে, জয়সিংহ বিজাপুর দখল করুক?"

"সেটা উনি চান। তবে শিবাজীর সহায়তায় নয়। উনি চান শাহজাদা মুয়াজ্জম আর দিলির খাঁর সহযোগিতায় বিজাপুর দখল করুক মির্জা রাজা। শিবাজীকে উনি মির্জা রাজার কাছ থেকে দূরে রাখতে চান। এবং সেইজন্যে ওঁর গোপন বাসনা এই যে, আপনার সঙ্গে শিবাজীকেও কাবুলে পাঠাবেন।"

জসবন্ত সিংহ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, ওখানে তো কোনো যুদ্ধ করতে হবে না, তাই কোনো গৌরব অর্জন করার সুযোগও হবে না আমার বা শিবাজীর। শুধু উপজাতীয়দের আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমন করতেই আমাদের সময় কেটে যাবে। ইতিমধ্যে মহারাজা জয়সিংহ বিজাপুর দখল করে বিজয় গৌরবে আগ্রা ফিরে আসবেন।"

"আমার তো সেটাই ভয়," খুব নিচু গলায় জাফর খাঁ বললো।

"ভয়!"

"ভাই মহারাজা সাহাব, আপনার কি মনে আছে মির্জা রাজা দারা শিকোর সঙ্গে কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধাচরণ করলো কেন? অনেক কারণের একটা কারণ হোলো, তার খুব আশা ছিলো মির জুমলাকে উজীরের পদ থেকে অপসারিত করার পর সে নিজে উজীর হবে। এ পর্যন্ত কোনো হিন্দু উজীর হয়নি। সাদুল্লা খাঁর মৃত্যুর পর মির জুমলার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত রাজা রঘুনাথ কিছুদিনের জন্যে দিওয়ান হয়েছিলো। কিন্তু উজীরের পদটি সে পায়নি। জয়সিংহের আশা ছিলো, সেই হবে প্রথম হিন্দু উজীর। যখন দেখলো আমার উজীর হওয়া একরকম সুনিশ্চিত, তখন থেকে সে দারার প্রতি বিরূপ হয়ে গেল। তবু

যদ্দিন আওরংজেবের জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেনি, তদ্দিন ত্যাগ করেনি দারাকে। আপনি তো জানেন এসব কথা।"

"হ্যাঁ জানি, সে আমাকেও প্ররোচিত করেছিলো দারা শিকোর পক্ষ ত্যাগ করার জন্যে।"

"থাক, থাক, ওসব কথা থাক," ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো জাফর খাঁ, "এখন কেউ যেন বুঝতে না পারে যে আপনার মনে কোনো ক্ষোভ আছে। সবাই ভুলে গেছে পুরোনো দিনের কথা। "শাহ-ইন-শাহ আলমগীর বাদশাহ দীর্ঘজীবি হোন, সলামত হোন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম,—মির্জা রাজা আজো ওই স্বপ্ন দেখেন। মোগল হুকুমতের প্রথম হিন্দু উজীর-উল-মুল্‌ক।"

"শাহ-ইন-শাহ কি কোনো হিন্দুকে উজীর করবেন? মির জুমলা যখন আসামে যুদ্ধ করতে গেল, তখনও তো দিওয়ান-ই-আলার কার্যভার ছিলো রাজা রঘুনাথের উপর, কিন্তু উজীরের খিতাব তাঁকে তো দেওয়া হয়নি।"

"মহারাজা জসবন্ত সিংহ, 'বাদশাহ সলামতকে আপনি এখনো চেনেন না? নিজের কাজ আদায় করার ব্যাপারে ওঁর চোখে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নেই। জয়সিংহের উপর পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দাক্ষিণাত্যে, শাহজাদা মুয়াজ্জমকে সরিয়ে নিতে কোনো দ্বিধা তিনি করেন নি। বিজাপুরের পর বাদশাহ সলামত চান সমগ্র রাজস্থান, বিশেষ করে উদয়পুর। ওঁর ধারণা, আমার রাজস্থান সম্পর্কিত নীতি সফল হচ্ছে না। একাজে তাঁর সবচেয়ে বড়ো সহায় কে হতে পারে? একমাত্র মির্জা রাজা জয়সিংহ।"

"জয়সিংহ কোনোরকম দ্বিধাবোধ করবে না," উত্তর দিলো জসবন্ত সিংহ, "নিজের উচ্চাভিলাষ সিদ্ধ করতে কোনো কাজই ওর নীতিতে বাধে না। ওর বিবেক বলে কিছু নেই।"

"ওটা সমস্ত বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরই একটা প্রধান গুণ। যাই হোক, এই পরিস্থিতি আমার ভালো লাগছে না। জসবন্ত

সিংহ, আপনি আর আমি অনেক দিনের বন্ধু। একথা আমার কাছে আপনি নিশ্চয়ই অকপটে স্বীকার করবেন যে, আমার জায়গায় মির্জা রাজা উজীর হলে আপনার একটু অসুবিধে হবে।"

"একটু! কি রকম অসুবিধে হবে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। তার আগে আমি মনসবদারি থেকে ইস্তফা দিয়ে জোধপুরে ফিরে যাবো।"

"তাতে আখেরে কারো লাভ হবে না মহারাজা সাহাব, শুনুন, আমার কথা। আপনি আমি দোস্ত?"

"চিরকালের জন্য।"

"হাত মেলান।"

দুজনে পরস্পরের করমর্দন করলো।

"শুনুন মহারাজা জসবন্ত সিংহ, একথা আপনি স্বীকার করেন যে, জয়সিংহ বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় নয়?"

"হ্যাঁ, স্বীকার করি।"

"দাক্ষিণাত্যে তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এবার ব্যর্থ হওয়া প্রয়োজন।"

"তাতে ভালোই হয়।"

"হ্যাঁ, তখন আমি শাহ-ইন-শাহ্‌কে সলাহ্‌ দিতে পারি তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। তাহলে আপনাকে আর কাবুলে যেতে হয়না। দাক্ষিণাত্যে যেতে পারবেন আপনি। সুবাদার হতে পারবেন না, শাহজাদা মুয়াজ্জমের জন্যে ওই পদ, কিন্তু ফৌজের মির-বকশি নিশ্চয়ই হতে পারবেন।"

"আপনার কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো জাফর খাঁ।"

"তাহলে এই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে, যাতে জয়সিংহের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়া যায়।"

"আলবৎ।"

"কিন্তু খুব সাবধান। আমি বাদশাহ্‌র উজীর, আপনি বাদশাহ্‌র

দরবারের সম্মানিত মনসবদার, শাহ-ইন-শাহ সন্দেহ করলে মহা অনর্থ হবে।"

"কিন্তু কি আমাদের পরিকল্পনা?"

"সে আপনাকে যথাসময়ে জানাবো, জসবন্ত সিংহ। উপস্থিত শুধু আপনার সহায়তার আশ্বাস চাই।"

"সমস্ত রাঠোরের সহায়তা আপনি পাবেন, জাফর খাঁ।"

"মহারাজা, আপনি কিন্তু আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।"

"সে কি! একথা আপনার মনে হচ্ছে কেন?"

"একটা কথা আপনি আমাকে এখনো বলেন নি।"

"কি কথা?" জসবন্ত সিংহের ভুরু দুটি কুঞ্চিত হোলো।

"আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে শিবাজীর এক বিশ্বস্ত অনুচর। তার নাম, কৃষ্ণাজী আপ্তে।"

জসবন্ত সিংহ চমকে উঠলো একথা শুনে। কিন্তু মুখের ভাব সামলে নিয়ে বললো, "ওই সাক্ষাতে আমি এমন কোনো গুরুত্ব আরোপ করিনি, কোনো বিশেষ কথাও হয়নি আমাদের মধ্যে।"

"ইদানীং কারো সঙ্গে কারো বিশেষ কোনো কথা হচ্ছে না। যা হচ্ছে শুধু সংযোগ স্থাপন!"

"কিন্তু কৃষ্ণাজী আপ্তের কথা আপনি কি করে জানেন?" জসবন্ত সিংহ জিজ্ঞেস করলো।

একটা রহস্যজনক হাসি হাসলো মোগল সাম্রাজ্যের উজীর-উল-মুলক্ জাফর খাঁ, তার চারদিকে তাকিয়ে খুব নিচু গলায় বললো, "মহারাজা জসবন্ত সিংহ, কৃষ্ণাজী আপ্তে আমার কাছেও এসেছিলো।" হস্ত প্রসারিত করে একটি মহার্ঘ পান্নার অঙ্গুরীয় দেখালো জাফর খাঁ। বললো, "শিবাজী লোকটার রুচি আছে। এই পান্নার অঙ্গুশতরি সে নিজে পছন্দ করে পাঠিয়েছে আমার জন্যে।"

জসবন্ত সিংহ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলো জাফর খাঁর দিকে।

নিজের প্রাসাদে ফিরে জসবন্ত সিংহ ডেকে পাঠালো শক্তিসিংহ আর দুর্গাদাস রাঠোরকে। জাফর খাঁর সঙ্গে যেসব কথা আলোচনা হয়েছে তার বিন্দুমাত্র আভাসও না দিয়ে শুধু বললো, "যা বুঝছি শিবাজীর সম্বন্ধে দরবারের উদ্দেশ্য সাধু নয়। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। হিন্দু হিন্দুকে না দেখলে কে দেখবে? শিবাজীকে সাহায্য করতে হবে। তবে সাবধান, এ খুব গোপন কথা, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।"

শক্তিসিংহ বিস্মিত হোলো একথা শুনে। শুধু দুর্গাদাস রাঠোর একটু হাসলো। সে তার প্রভুকে চিনতো।

দুতিন দিন কেটে গেল। ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠলো শক্তি সিংহ। তার মনে একটা আশা ছিলো মুন্সি গিরধরলালের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার সুযোগ হবে, তাকে কোনো না কোনো কাজের উপলক্ষে আবার কুমার রামসিংহের মঞ্জিলে যাওয়ার সুযোগ দেবে মহারাজা জসবন্ত সিংহ। প্রথম যেদিন পান্নাকে দেখেছিলো গিরধরলালের গৃহে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত শক্তিসিংহের চোখে ঘুম আসেনি, একটা দুর্বোধ্য নিঃসঙ্গতা অনুভব করছিলো মনে মনে। কারণটা সেদিন অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু পরদিন দ্বিপ্রহরে আহার করতে বসে যখন বিস্বাদ মনে হোলো রুটি আর ব্যঞ্জন, বার বার মনে পড়লো পূর্বদিনের একজনের রান্না আর পরিচর্যা, নিমেষে বুঝে গেল তার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে, আরেকটি অধ্যায় শুরু করবার প্রয়োজন এসে গেছে। সে ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, একথা মনে হওয়ার পর কাব্যের নায়কের মতো নীল আকাশ, সবুজ গাছপালা আর স্নিগ্ধ চাঁদের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে উদাস মনে বসে থাকার ধৈর্য তার নেই। সারাদিন একলা ঘরে বসে নিজের অস্ত্রশস্ত্র নিজে মেজে ঘষে সাফ করে রাখলো, অশ্বশালায় গিয়ে নিজের অশ্বটির তদারক পরিচর্যা করলো, তারপর অপরাহ্ণ অতিবাহিত

করলো শহরতলির ফাঁকে মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে, শহরতলির পথগুলি ধরে চারদিক পরিক্রমা করে। ফেরার পথে এলো কুমার রামসিংহের মঞ্জিলের পাশ দিয়ে, প্রধান ফাটকের সামনে থামলো না, অনেক এগিয়ে বাঁক ফিরে দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীরের কাছে থেমে, ঘোড়ার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে প্রাচীরের উপর দিয়ে দূরে মুন্সি গিরধরলালের গৃহের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। একসময় দেখতে পেলো পান্নাকে। গৃহের পেছন দিকে একটি কূপ আছে, সেখানে এসেছে জল নিতে। পান্না তাকে দেখতে পায়নি। জল তুলে সে ফিরে গেল গৃহের অভ্যন্তরে। শক্তিসিংহ ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলো জোধপুর মহারাজার মহলে। জানলো না যে, তার অনেক পশ্চাতে দৃষ্টির আড়ালে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর এক হরকরা সারা অপরাহ্ন অশ্বপৃষ্ঠে তার অনুসরণ করে করে গাত্রবেদনায় কাতর হয়ে উঠেছে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো শক্তিসিংহও। ইচ্ছে ছিলো নিজের কক্ষে ফিরে এসে শয্যাগ্রহণ করবে। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো শয্যার উপর এসে বসে আছে দেবীদাস রাঠোর।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"ঘোড়দৌড় অভ্যেস করছিলাম।"

"আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার অপেক্ষা করছি। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো,—কাল যখন কুঁবর সা'র মঞ্জিলে গিয়েছিলে, কেউ কি তোমার অনুসরণ করেছিলো ?"

"না তো!" অশ্চর্য হয়ে শক্তিসিংহ বললো।

"আজ শাহ-ইন-শাহ মহারাজাকে জিজ্ঞেস করছিলেন।"

"কি ?"

"কুঁবর সা' মহারাজার কাছে গোপনে আসেন নি, সুতরাং সেকথা বাদশাহ্‌র না জানবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তুমি যে মুন্সি গিরধরলালের গৃহে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলে, এবং মুন্সিজীর

সুন্দরী কন্যা স্বয়ং অতিথিসেবার ভার নিয়েছিলেন, একথা বাদশাহ জানলেন কি করে ?"

আকাশ থেকে পড়লো শক্তিসিংহ। জিজ্ঞেস করলো, "মহারাজাকে কি বলেছেন শাহ-ইন-শাহ ?"

"বিশেষ কিছু নয়। একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন,—'রান্নায় কে বেশী পটু, রাঠোর কন্যা, না কছওয়া রাজপুতানী।' মহারাজা উত্তর দিলেন,—'কছওয়া রাজপুতের রান্নায় আগ্রা-দিল্লীর মোগলাই প্রভাব বেশী, খাঁটি রাজপুতিয়া রান্না জানে রাঠোর কন্যা।' শাহ-ইন-শাহ তখন বললেন,—'আমি শুনেছি কছওয়া রাজপুতানীর রান্না রাঠোর যুবকদের খুব ভালো লাগে।' একথা শুনে মহারাজার মুখ লাল হয়ে গেল। এ একেবারে ইজ্জতের প্রশ্ন। কছওয়া রাজপুতদের কোনো রকম প্রশংসা তিনি সহ্য করতে পারেন না। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,— 'শাহ-ইন-শাহকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে।' বাদশাহ হাসি মুখে বললো,—'আমি জানিনা, কথাটা কানে এলো তাই জিজ্ঞেস করলাম। শক্তিসিংহ রাঠোরকে জিজ্ঞেস করবেন, সে হয়তো বলতে পারবে। শুনেছি, কাল মুন্সি গিরধরলালের কন্যার রান্না খেয়ে সে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।"

শক্তিসিংহ অবাক হয়ে দেবীদাসের কথা শুনছিলো। দেবীদাস বলে গেল, "এখন কথাটা হচ্ছে এই,—আমাদের আলমগীর বাদশাহ আর যাই হোন কৌতুকপ্রিয় নন্। তুচ্ছ একটা কথা নিয়ে এরকম রসিকতা তিনি করবেন না। আসলে হয়তো তিনি আভাষে আমাদের মহারাজাকে জানাতে চাইছিলেন যে রাঠোর ও কছওয়াদের মধ্যে যে একটা নতুন যোগাযোগ হবার সূত্রপাত হয়েছে সে খবর তিনি রাখেন। আমাদের মহারাজা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তুমি একটু সাবধান থেকো। যদি কুমার রামসিংহের মঞ্জিলে আবার যাওয়ার উপলক্ষ হয়, নজর রেখো যাতে কেউ তোমার অনুসরণ করতে না পারে।"

সেদিন দেবীদাস এর বেশী কিছু বললো না।

শক্তিসিংহের মনে মনে আশা ছিলো দু তিন দিনের মধ্যে আবার হয়তো কুমার রামসিংহের মঞ্জিলে যাওয়ার উপলক্ষ হবে, কিন্তু পরদিন সে আশা নির্মূল হোলো। দেবীদাসের মুখে শুনলো, মহারাজা হুকুম দিয়েছেন কোনো রাঠোর যেন কোনো কছওয়া রাজপুতের সঙ্গে ইদানীং বেশী মাখামাখি না করে। আওরংজেবের হয়তো সন্দেহ হচ্ছে যে মহারাজ জসবন্ত সিংহ কুমার রামসিংহের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেনো একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে চলেছেন। এ ধারণা যাতে বদ্ধমূল না হয়, সেজন্যে এতটা কড়াকড়ি।

সারাদিন শক্তিসিংহ নানা কাজে ব্যস্ত থেকে মনের অস্থিরতা চাপতে চাইল, কিন্তু দিনের শেষে আর পারলো না, আবার লুকিয়ে চলে গেল কুমার রামসিংহের মঞ্জিলের কাছে, দূর থেকে লুকিয়ে একটুখানি দেখে নিলো পান্নাকে।

সন্ধ্যে নাগাদ নিজের কক্ষে ফিরে এসে দেখলো দেবীদাস তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তাকে দেখে দেবীদাস একটু হাসলো। তারপর বললো, "একটা গুরুতর কাজের ভার আছে তোমার উপর।"

"বলো।"

"মহারাজা জসবন্ত সিংহ শিবাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। সে জন্যে তোমাকে গোপনে দেখা করতে হবে কৃষ্ণাজী আপ্তের সঙ্গে।"

"কিন্তু ও কোথায় থাকে আমি তো জানি না। মুন্সি গিরধর-লালকে জিজ্ঞেস করতে হয়।"

দেবীদাস হেসে বললো, "শক্তিসিংহ, কছওয়াদের সঙ্গে তো কোনো রাঠোর এখন যোগাযোগ রাখতে পারবে না। সেটা আমাদের মহারাজার স্বার্থে অবাঞ্ছনীয়।"

"আমি এমন ভাবে যাবো যে কোনো লোক জানতে পারবে না।"

"সেটা সম্ভব নয়। কুঁবর-সা'র মঞ্জিলের চারদিকে বাদশাহ্‌র গুপ্তচরদের কড়া নজর। ওদের চোখ এড়িয়ে সেখানে ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া মহারাজা এই যোগাযোগটা করতে চান কুঁবর-সা'র অজ্ঞান্তে।"

"তাহলে আর কি উপায় আছে আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।" বললো শক্তিসিংহ।

ক্ষণিক নীরবতার পর দেবীদাস রাঠোর বললো, "আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি।"

"কি উপায়?"

"দেখ, কছওয়া রাজপুতানীর রান্না খেয়ে বিমোহিত হওয়ার অপবাদ তো একবার হয়েছে। এ কথাটাই গেছে শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে। এই অপবাদ কাজে লাগাতে হবে।"

"কি করে?"

"আচ্ছা, শক্তিসিংহ, একটা কথা সত্যি করে বলো, তুমি কি ইতিমধ্যে গিরধরলালজীর কন্যার সঙ্গে একবারও দেখা করবার চেষ্টা করো নি?"

লাল হয়ে গেল শক্তিসিংহের মুখ, দু-চার বার কেশে গলা সাফ করে বললো, "না, দেখা করবার চেষ্টা ঠিক করিনি—"

"তাহলে?"

"দূর থেকে দেখবার চেষ্টা করেছি।"

দেবীদাস প্রথমটা ঠিক বুঝলো না। শক্তিসিংহ জানালো যে গিরিধরলালের গৃহের কাছে প্রাচীরের বাইরে থেকে ঘোড়ার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে পান্নাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। সে তখন কুয়ো থেকে জল তুলছিলো।

"ওর নাম পান্না?" দেবীদাস রাঠোর হাসলো, "যাক, ভালোই করেছো। বাদশাহ্‌র হরকরারা দেখেছে, তুমি পরপর দুদিন লুকিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছো পান্নাকে। বাদশাহ্‌র কানে গেছে সে কথা।

এবার তাঁর একথা শোনার উপলক্ষ হোক যে, তুমি প্রাচীর লঙ্ঘন করে পান্নার সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়েছো।"

"মানে?"

"তুমি গোপনে সাক্ষাৎ করবে পান্নার সঙ্গে। একদিন দুদিন গৃহের বাইরে কুয়োর পাশে। তারপর একদিন পান্না তোমায় ঘরের ভিতর নিয়ে যাবে। বাদশাহ দিনের পর দিন এ খবর শুনতে শুনতে ত্যক্ত হয়ে হরকরাদের জানাবেন যে তোমার উপর আর নজর রাখবার দরকার নেই। এসব ইশক্‌বাজীর খবরাখবর নেওয়ার জন্যে শহরের কোতোয়ালি নয়।—তখন তুমি একদিন কৃষ্ণাজী আপ্তের সঙ্গে গোপনে দেখা করবে।"

"কিন্তু ওর ঠিকানা?"

"ওটা পান্নার সাহায্যে যোগাড় করে নিতে হবে। মহারাজার স্বার্থে তুমি একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে পারবে না?"

শক্তিসিংহের মুখের শিরাগুলো ফুলে গেল। বললো, "পান্নাবাঈ সম্ভ্রান্ত রাজপুত ক্ষত্রিয়কন্যা। তাঁর কোনো অসম্মান আমি করতে পারবো না।"

দেবীদাস হেসে ফেললো। তারপর বললো, "সবার সম্মান বজায় রেখে কি ভাবে কার্যসিদ্ধি করতে হবে সে উপায় নির্ধারণ করতে হবে তোমাকে। আমি শুধু মহারাজার আদেশ তোমায় জানিয়ে গেলাম। তোমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে কৃষ্ণাজী আপ্তের সঙ্গে এবং এমনভাবে যাতে কেউ জানতে না পারে।"

দেবীদাস রাঠোর বলেছিলো সময় নষ্ট না করতে। শক্তিসিংহ বিনাবাক্যব্যয়ে রাজী হয়ে গেল। সেদিনই সন্ধ্যায় আবার ফিরে গেল কুমার রামসিংহের মঞ্জিলের দিকে।

কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর অনুচর মহম্মদ হুসেন দূরে একটি গাছের

ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলো, শক্তিসিংহের বাদামী ঘোড়াটি এসে দাঁড়িয়েছে মুন্সি গিরধরলালের গৃহের কাছে প্রাচীরের বাইরে। চকিতে চারদিকে তাকিয়ে নিলো শক্তিসিংহ। তারপর ঘোড়ার পিঠের উপর ভর দিয়ে উঠে পড়লো প্রাচীরের উপর, সেখান থেকে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো।

মহম্মদ হুসেন দাঁড়িতে হাত বুলালো, দু হাতে তা দিলো সযত্ন-লালিত গুম্ফে, তারপর গাছে চড়ে বেছে নিলো একটি সুবিধেমতো মোটা ডাল। সেখানে বসে দেখা যায় প্রাচীরের ওধারে। কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদের আলো এসে পড়েছে কুয়োর পাশে। সারাদিনের দুঃসহ গরমের পর প্রকৃতি এখন শীতল স্নিগ্ধ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ঝিরঝির করে বয়ে আসছে পূবের হাওয়া।

চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, তার সঙ্গে মিশে আছে যুঁই ফুলের গন্ধ। দু হাতে দুটো ঘড়া নিয়ে নিজের মনে গুনগুন করতে করতে পান্না কুয়োর দিকে এগিয়ে এলো। কাছে একটি গাছের শাখায় পাখা ঝটপট করে উঠলো কোনো এক পাখি, চকিত হয়ে একবার তাকালো সেদিকে, তারপর দড়ি টেনে জল তুলে ভরতে লাগলো একটি ঘড়ায়।

হঠাৎ যেন মনে হোলো শুকনো পাতা মরমর করে উঠলো পাশেই কোথাও। চোখ তুলে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলো না। আবার যখন জল ভরছে, তখন কানে এলো কেউ যেন নিচু গলায় তাকে ডাকছে।

"বাঈ-সা' !"

"কে ?" চমকে উঠলো পান্না। মনে হোলো আওয়াজটা যেন চেনা, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না।

"আমি।"

"কে আপনি ?"

"আমি শক্তিসিংহ।"

"শক্তিসিংহ! শক্তিসিংহ রাঠোর?" এবার পান্না বিস্মিত হোলো।

শক্তিসিংহ বেরিয়ে এলো ছায়ার আড়াল থেকে।

"আপনি এখানে? এ সময়?" পান্নার ইচ্ছে হোলো ক্রোধ প্রকাশ করার। কিন্তু দেখলো রাগ আসছে না। তবু শালীনতা বজায় রাখবার জন্যে গাম্ভীর্য অবলম্বন করলো। মন বললো, আমি জানতাম তুমি আসবে, তোমার চোখ দুটো আমায় একথা বলেছিলো সেদিন অপরাহ্লে। মুখে বললো, "আপনাকে সেদিন আমরা যথেষ্ট সমাদর করেছিলাম। আজ আপনাকে এখানে এভাবে দেখলে আমার পিতা দুঃখিত হবেন, অসন্তুষ্টও হতে পারেন।"

"আপনিও নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

"বিস্মিত হয়েছি। আপনার কাছে থেকে এরকম প্রত্যাশা করিনি। আপনি রাজপুত, ক্ষত্রিয়। এভাবে এখানে আশা উচিত নয়।"

"কেন এভাবে এসেছি সে কথা না জেনে আমাকে দোষী করবেন না।"

"আপনি না বললেও বেশ বুঝতে পারছি।"

"না, আপনি ভুল বুঝছেন আমায়। আমি সামনের দরওয়াজা দিয়ে আসতে পারলেই খুশী হতাম। কিন্তু আমার সে উপায় নেই।"

"কেন?"

"কোতোয়ালের হরকরা আর পিয়াদারা গোপনে নজর রেখেছে এই মঞ্জিলের উপর। আমি চাইনা যে ওরা আমাকে এখানে দেখতে পায়।"

পান্না এবার মনে মনে একটু আহত হোলো। কিন্তু শান্তকণ্ঠে বললো, "কুঁবর-সা'র মহলে যাওয়ার পথ ওদিক দিয়ে।"

"আমি তো কুঁবর-সা'র কাছে আসিনি।"

"তাহলে?"

"আমি এসেছি আপনার কাছে।"

পান্নার মন আবার দুলে উঠলো। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো, "আমার কাছে! কেন?"

"আপনার সাহায্য চাই।"

"আমার সাহায্য? কি ব্যাপারে?"

"আমায় একবার কৃষ্ণাজী আপ্তের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনি আমায় সহায়তা করতে পারেন।"

ম্লান হয়ে গেল পান্নার মুখখানি। কিন্তু সেভাব সামলে নিয়ে বললো, "কৃষ্ণাজী আপ্তে বলে কাউকে তো আমি চিনি না।"

"কৃষ্ণাজী আপ্তে শিবাজীর একজন অন্তরঙ্গ সহচর। আপনার পিতা গিরধরলালজী ওঁর সন্ধান জানেন।"

পান্না একটু চিন্তা করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আমার পিতার কাছে কি আপনার কথা উল্লেখ করবো?"

"না, না," ব্যস্ত হয়ে উঠলো শক্তিসিংহ, "আমি যে এভাবে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়েছি সেকথা জানাবেন না।"

পান্নার অধরপ্রান্তে একটা হাসি দেখা দিয়ে আবার চকিতে মিলিয়ে গেল। সে উত্তর দিলো, "আচ্ছা, আমি কৃষ্ণাজীর সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা করবো।"

এমন সময় হঠাৎ দুজন লোকের গলার সাড়া পাওয়া গেল। শক্তিসিংহ তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করলো ছায়ার আড়ালে। পান্না কুয়ো থেকে জল তুলে ভরতে লাগলো তার ঘড়ায়। আড়চোখে দেখলো গিরধরলালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক ব্যক্তি। সে ঈষৎ খর্বাকৃতি, ঈষৎ মলিনবর্ণ, কিন্তু দেহের আঁট-বসন ভেদ করে ফুটে উঠেছে বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত মাংসপেশী। দূর থেকে সে একবার তাকিয়ে দেখলো পান্নাকে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গিরধরলাল মুন্সিও তাকিয়ে দেখলো, তারপর কিছু একটা যেন বললো সেই ব্যক্তিকে। সে এক পলক তাকিয়ে

দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলো। তারপর দুজনে কথা বলতে বলতে চলে গেল অন্য দিকে।

ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো শক্তিসিংহ। বললো, "ওই লোকটাই কৃষ্ণাজী আপ্তে।"

"ওই লোকটা!" একটু যেন বিস্মিত হোলো পান্না। "ওকে আমি দু-একবার দেখেছি। আমার পিতার কাছে আসে মাঝে মাঝে।"

"ওর সঙ্গে আমায় একবার দেখা করিয়ে দিতে হবে।"

পান্না শান্ত কণ্ঠে বললো, "আচ্ছা, আমি চেষ্টা করবো।"

"আমি আবার কাল আসবো।"

"হ্যাঁ, আসবেন। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কালই ওর সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।"

"শুধু কাল কেন, তিন চার দিন লেগে যেতে পারে। কিন্তু আমি যদি প্রত্যেকদিন একবার এসে খবর নিয়ে যাই, আপনার কি অসুবিধে হবে?"

"না, আমার কোনো অসুবিধে হবে না," পান্না বললো একটু হেসে, "বেশ, কাল একবার আসবেন।"

"এখানেই—।"

"হ্যাঁ।"

"এরকম সময়—।"

পান্না মুখটিপে একটু হেসে উত্তর দিলো, "আপনার পক্ষে হয়তো তাই সুবিধে।"

শক্তিসিংহের কান দুটো ঈষৎ উত্তপ্ত হোলো। সে চলে যাচ্ছিলো, আবার ফিরে এলো। কিছু একটা বোধ হয় বলতে চাইছিলো, কিন্তু একটু ইতস্তত করে বললো, "আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে।"

পান্না কৌতুকবোধ করলো তার কুণ্ঠিত ভাব দেখে। জিজ্ঞেস করলো, "শুধু একথা বলতেই কি আপনি ফিরে এলেন ?"

সচেষ্ট প্রয়াসে এক নিমেষের জন্যে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠলো শক্তিসিংহ। বললো, "না, আরো একটা কথা বলার ছিলো। কিন্তু বলতে গিয়ে মনে হোলো, এখনো সময় আসেনি।"

পান্না মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে খুব সহজ হয়ে হাসিমুখে শক্তিসিংহের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বললো, "আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে।"

ম্লান হয়ে গেল শক্তিসিংহের মুখখানি। সে চলে যাচ্ছিলো ধীর পদক্ষেপে। হঠাৎ শুনতে পেলো পান্না ডাকছে পেছন থেকে।

"শুনুন—।"

শক্তিসিংহ ফিরে দাঁড়ালো।

পান্না খুব মৃদুকণ্ঠে বললো, "আমি জানি যে,—" বলতে বলতে সে থেমে গেল।

"কি জানেন ?" জিজ্ঞেস করলো শক্তিসিংহ রাঠোর।

পান্নার কণ্ঠস্বর আরো মৃদু, প্রায় অস্ফুট হয়ে এলো।

"আমি জানি যে, আজ দুদিন ধরে সন্ধ্যার আবছায়ায় লুকিয়ে আপনি আসছেন, ওখানে ওই প্রাচীরের ওপারে—।"

বলে সে আব দাঁড়ালো না। জলের ঘড়া দুটো তুলে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল সেখান থেকে।

এই ঘটনার দুদিন পরের কথা। সন্ধ্যা নেমেছে আগ্রায়। চারদিকে বিভিন্ন মহল মঞ্জিল হাবেলি ঝাড়-ফানুসের আলোয় ঝলমল করছে। প্রধান সড়কগুলোতে চল্লিশ পঞ্চাশ হাত অন্তরে গাছের গায়ে গায়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে জ্বলন্ত মশাল।

একটি সড়ক চলে গেছে মমতাজ-আবাদের পাশ দিয়ে। সেই সড়ক থেকে কয়েকটি সরু সরু আঁকাবাঁকা আধো অন্ধকার গলি প্রবেশ

করেছে মমতাজ-আবাদের ভিতর। তার একটিতে দেখা গেল এক শৌখীন খাঁ সাহেবকে। পরনে রেশমী গোলাপী কাবা, শাদা চুড়িদার পাজামা, পায়ে জরির কাজ করা নাগরাই। এক হাতে চন্দন কাঠের হ্রস্ব যষ্ঠি, অন্য হাতের কব্জিতে সবুজ রুমালি বাঁধা। আতরের গন্ধ ছড়িয়ে এগিয়ে গেল খাঁ সাহেব। পথের এখানে সেখানে জটলা করছিলো ছু-চার পাঁচজন লোক। খাঁ সাহেবকে দেখে অনেকে ফিরে তাকালো, কেউ কেউ সালাম আলিকুম জানালো। তাদের প্রত্যভিবাদন করে, একটা ছুটো সৌজন্যসূচক কথা বলে খাঁ সাহেব এগিয়ে গেল বনেদী চালে। মাঝে মাঝে এপাশে কিংবা ওপাশের বাড়ির খিড়কি থেকে ভেসে এলো গানের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তবলার আওয়াজ। ছু-একবার মুখ তুলে তাকালো খাঁ-সাহেব, কিন্তু থামলোনা। এগিয়ে চললো ধীর মন্থর পদক্ষেপে। কিছুক্ষণ পরে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো চারদিকে, তারপর সদর দরজা পেরিয়ে সামনের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে উপরে উঠে এলো। সেখানে আতরদান হাতে দাঁড়িয়েছিলো একজন প্রৌঢ় ভৃত্য শ্রেণীর লোক। সে সামনে ঝুঁকে তাকে অভিবাদন করে একটুখানি আতর ছিটিয়ে দিলো তার গায়ে। খাঁ সাহেব তাকে অতিক্রম করে রঙীন কাচের পুঁতির পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলো একটি প্রশস্ত কক্ষে। সেখানে কক্ষের মাঝ খানে বসে নিজের মনে খুব আস্তে আস্তে পায়ে তাল দিচ্ছিলো এক সুন্দরী তওআয়ফ। তার পেছন দিকে দেওয়ালের কাছাকাছি বসে সারেঙ্গির সুর বাঁধছিলো একটি লোক। তার পাশে বসে তবলায় একটা বোল তুলবার চেষ্টা করছিলো আরেকজন।

তওআয়ফকে দেখে খাঁ সাহেব গোঁফে তা দিয়ে ডাকলো, "মোতিজান!"

মোতিজান উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানালো খাঁ-সাহেবকে, মধুর কণ্ঠে বললো, "তশরীফ রাখুন খাঁ-সাহেব। আমার খুবই

খুশ-কিসমতি যে আপনি আজ আমাকে য়াদ করেছেন। দু-দিন আপনার দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।"

"মোতিজান, আজকাল একেবারে ফুরসত পাইনা। দিনরাত শহরে টহল দিতে হয়। খুদ বাদশাহ সলামত আমার উপর নানা রকম দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

"খুদ বাদশাহ সলামত!" মোতিজানের চক্ষু বিস্ফারিত হোলো।

খাঁ সাহেব চারদিকে তাকিয়ে মোতিজানের দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় বললো, "কাউকে বোলো না, উজীর-উল-মুল্‌ক নিজে বাদশাহ্‌র কাছে আমার নাম সুপারিশ করেছেন।

"কেন খাঁ সাহেব? আপনাকে কি পাঁচহাজারী মনসব দেওয়া হচ্ছে।"

"না।"

"তা হলে?" চোখ পাকিয়ে বললো মোতিবিবি, "উজীর-উল-মুলক্‌এর নাতনীর সঙ্গে আপনার শাদী হওয়ার কথা হচ্ছে?"

"না, বিবিজান," হাসি মুখে বললো খাঁ-সাহেব, "শোনো-ই না।"

"বলুন।"

"এবার আমাকে আগ্রা শহরের কোতোয়াল করে দেওয়া হবে," বলে খাঁ-সাহেব আবার গোঁফে তা দিলো।

"তাই নাকি! কি ভালো নসীব আমাদের। শহরের কোতোয়াল হচ্ছেন আমাদেরই মালিক আবিদ হুসেন খাঁ সাহাব! ভালোই হোলো, আর শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র মুহতাসিবেরা এসে আমাদের বিরক্ত করবে না।"

"সাহস করবে না," বলে আবিদ হুসেন গোঁফে তা দিয়ে কান থেকে আতরে ভেজানো রুই বার করে শুঁকলো, তারপর আবার রেখে দিলো যথাস্থানে।

"কিন্তু—।"

"কিন্তু কি ?"

"কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ সাহাবের কি হবে ? ওঁকে কি কোতল করার হুকুম হয়েছে ?"

"না, বিবিজান। ফুলাদ খাঁ কাজে ইস্তফা দিয়ে মক্কা চলে যাবে।"

"কেন খাঁ-সাহাব ?"

"ওর খানা হজম হচ্ছে না।"

"সে কি কথা ? কেন ?"

"শোনো নি ?"

"কি ?"

"সেই বাগী মারাঠা রাজা শিবাজী আগ্রায় আসছে। বাজারে জোর গুজব শিবাজী একদিন রাত্রে শাহী মহল লুঠ করবে, আগ্রা শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে। তার সৈন্যরা লুকিয়ে লুকিয়ে আগ্রায় প্রবেশ করছে। কিন্তু ফুলাদ খাঁ কারো হদিশ পাচ্ছেনা। শাহ-ইন-শাহ ফুলাদ খাঁর মনসব কমিয়ে দেবেন বলে শাসিয়েছেন। আর শিবাজীর ভয় তো আছেই। পুণায় শায়েস্তা খাঁর মহল কি ভাবে লুঠ করেছিলো শোনো নি ?"

"ওরে বাবা, তাহলে আমাদের কি হবে ?" কপট ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো মোতিজানের চোখে মুখে।

"তোমার ভাবনা কি ? আমি তো আছি।"

"আপনি ?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"আপনি রুখতে পারবেন শিবাজীকে ?"

"আমি পারবো না ?" আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসলো আবিদ হুসেন খাঁ। গোঁফে তা দিলো বুক ফুলিয়ে। বললো, "জানো, আমি খজওয়ার যুদ্ধে একা একদল বক্সারিয়ার মুকাবিলা করে ছিলাম ?"

"সে তো অনেকবার শুনেছি খাঁ-সাহেব, কতো বড়ো বাহাদুর লোক আপনি। কিন্তু এরা যে মারাঠা।"

"আমি ফুঁ দিলে তিনজন মারাঠা বারগির উড়ে যাবে একসঙ্গে। এরা কিরকম ছোটোখাটো মানুষ তুমি জানো না। কেউ সাড়ে তিন হাতের বেশী নয়। খজওয়ার যুদ্ধে আমার বীরত্বের কাহিনী খুদ শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে পর্যন্ত উঠেছে। উনি আমার তারিফ করেছেন। কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে জানো?"

"কি?"

"আমার ফুফার চাচেরা ভাই কিলাদার রদ্‌-অন্দাজ খাঁ নিজে ফৌজ নিয়ে রক্ষা করবে বাদশাহ্‌র হারেম। আর আমি কোতোয়ালির পিয়াদাদের নিয়ে আগ্রা শহরের আম-জনতাকে রক্ষা করবো।

"আর ফুলাদ খাঁ?"

"ফুলাদ মিঞা? সে তো দুদিন বাদে মক্কা রওনা হবে।"

"বেচারা ফুলাদ খাঁ।"

"ও একটা বেওকুফ। ওর আব্বাজান শাহ-ইন-শাহ্‌র পেয়ারের লোক, তাই ও কোতোয়াল। ওর কি বুদ্ধি আছে, না হিম্মত আছে? নাও, বার করো শরাবের ঝারি, ভরে দাও কাচের পিয়ালা, তারপর শুনিয়ে দাও তোমার একটা অনবদ্য গান। তোমার পায়ের ঘুংরুর তালে তালে—"

"খাঁ সাহেব, নাচে গানে তো আপত্তি নেই, কিন্তু শরাব এখন না হলে নয়?"

"কেন?"

"বাদশাহ সলামতের মুহ্‌তাসিবেরা আজকাল বড় উৎপাত করছে। কাল ওদিকের মহল্লা থেকে তিনজন তওআয়ফকে ধরে নিয়ে গেছে কয়েদখানায়।"

"ভয় নেই। আমি আছি।"

"আপনার কথা ওরা শুনবে?"

"আমার কথা শুনবে না? আমাকে আগ্রা শহরে কে না চেনে। কে না জানে আমি আগ্রার ভাবী কোতোয়াল? কে না জানে আমি শাহী কেল্লার কিলাদার রদ্-অন্দাজ খাঁর চাচেরা ভাইয়ের শালার পুত্র। নাও, নাও, ভরে দাও শরাবের পিয়ালা, তারপর—"

শরাবের ঝারি বার করে পিয়ালা ভরে দিলো মোতিজান। আবিদ হুসেন খাঁ পিয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়েছে, এমন সময় ঘরের ভিতর ছুটে এলো মোতিজানের প্রৌঢ় ফরাশ, যে আতরদান হাতে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো বাইরে।

"মোতি বিবি!" সে বলে উঠলো আতঙ্ককম্পিত কণ্ঠে।

"কি হয়েছে আব্দুল আজিজ?"

"সরিয়ে ফেলুন, শরাবের পিয়ালা, শিগ্‌গির সরিয়ে ফেলুন।"

"কেন?"

"শাহ-ইন-শাহ্‌র মুহ্‌তাসিব।"

"কোথায়?" আতঙ্ক দেখা দিলো মোতিজানের চোখেমুখে।

"সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে।"

সিঁড়িতে শোনা গেল ভারী লাঠির ঠকাঠক শব্দ।

মুহ্‌তাসিবের নাম শুনে ইতিমধ্যে ঠক-ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে খাঁ-সাহেব। শরাবের পিয়ালা থেকে অনেকখানি উছ্‌লে পড়লো জাজিমের উপর। মোতিজান তার হাত থেকে পিয়ালা কেড়ে নিলো। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললো শরাবের ঝারি আর পিয়ালা।

কৃষ্ণশ্মশ্রু পরিশোভিত মুখমণ্ডল দেখা দিলো দ্বারপ্রান্তে। হাতে সোনায় বাঁধানো মোটা বেতের ভারী লাঠি। নাক টেনে সে বাতাসের ঘ্রাণ গ্রহণ করলো, তারপর প্রবেশ করলো ঘরের ভিতর।

"বেতমিজ," সে গর্জে উঠলো আবিদ হুসেনকে লক্ষ্য করে,

"শরাব? শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র হুকুম অমান্য করা হচ্ছে এখানে?"

"না, মালিক," আবিদ হুসেন খাঁ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, "এখানে শরাব কোথায়?"

"জাজিমে এটা কি পড়ে সবটা ভিজে গেছে?"

"এটা? না, এ কিছু না,—"

"চুপ কর পাজী—।"

"মালিক মুহ্‌তাসিব সাহাব," বিনীত কণ্ঠে মোতিজান বললো, "ইনি শরবত পান করছিলেন, হাত থেকে হঠাৎ পিয়ালা পড়ে গিয়ে—।

মোতিজানের কথায় বাধা দিয়ে মুহ্‌তাসিব বলে উঠলো, "শরবত? শরবতের এত বদবু!"

"কোথায় বদবু? এতো আতরের খুশবু," বলে আবিদ হুসেন হাতের আতর মাখা রুমালি নাড়তে লাগলো জোরে জোরে।

"চলো," বললো মুহ্‌তাসিব।

"কোথায়?"

"কোতোয়ালিতে।"

একথা শুনে আর্তনাদ করে উঠলো আবিদ হুসেন খাঁ। কাতর কণ্ঠে বললো, "আমাকে এবারকার মতো মাফ করা হোক মুহ্‌তাসিব সাহাব।"

"শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আলমগীরের হুকুম, যাকে শরাবী বলে সন্দেহ হবে তাকে নিয়ে যাবে কোতোয়ালিতে, দিনের আলোয় কোতোয়ালির চবুতরায় দাঁড় করিয়ে তার পিঠে লাগাবে পাঁচ কোরা।"

এ কথা শুনে আবিদ হুসেন প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করলো। বিনিয়ে বিনিয়ে বললো, "আমি আর শরাব খাবো না। এবারকার

মতো মাফ করা হোক আমায়। মোতিবিবি আমায় সাধাসাধি করলো বলে একটু চুমুক দিলাম, তা নইলে—"

মুহ্‌তাসিব মোতিজানের দিকে ফিরলো। কঠোর কণ্ঠে বললো, "তোমার এখানে শরাব রাখো ?"

"না, না, ও মিছে কথা বলছে," বলে উঠলো মোতিজান।

"চলো কোতোয়ালিতে—"

"আমার কথা বিশ্বাস করুন মালিক, ও বাইরে কোথাও খেয়ে এসেছে—"

"দুজনেই চলো কোতোয়ালিতে।"

"আমি কসম খাচ্ছি মুহ্‌তাসিব সাহাব," কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে উঠলো আবিদ হুসেন খাঁ, "আর কখনো—"

এমন সময় বাইরে ভারিক্কী চালের জুতোর আওয়াজ শোনা গেল।

"কি হচ্ছে এখানে ?" একজন ঘরের ভিতর প্রবেশ করে বললো।

সবাই ফিরে তাকালো।

"রদ-অন্দাজ খাঁ ?" বললো বাদশাহ্‌র মুহ্‌তাসিব, "সালাম আলিকুম। এ লোকটা বাদশাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে এখানে শরাব পান করেছে।"

রদ-অন্দাজ খাঁ হেসে বললো, "এখানে সবাই শরাব পান করে মিঞা—।"

"আপনি একজন ওমরাহ্‌, আপনাকে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি বাদশাহ্‌র খাদিম, বাদশাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী এদের গিরফ্‌তার করে কোতোয়ালিতে নিয়ে যেতে আমি বাধ্য।"

"কাদের কোতোয়ালিতে নিয়ে যাচ্ছো আশরফ খাঁ ?" আরেকজন বলে উঠলো পেছন থেকে। সে কখন ঘরে ঢুকেছে কারো খেয়াল নেই।

"ফুলাদ খাঁ, আপনি এখানে ?"

"হ্যাঁ, আমার দোস্ত রদ-আন্দাজ খাঁর তল্লাশে এখানে এসেছি। কিন্তু এই কলহ কিসের?"

অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে শোনালো বাদশাহ্‌র মুহ্‌তাসিব আশরফ খাঁ। বললো, "আমি বাদশাহ্‌র খাদিম। শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র হুকুম তামিল করতে আমি বাধ্য।"

"আমরা সবাই বাদশাহ্‌র খাদিম আশরফ খাঁ," ফুলাদ খাঁ হেসে বললো।

রদ-অন্দাজ খাঁকে দেখে আবিদ হুসেন খাঁর সাহস ফিরে এসেছে। এবার সে সগর্বে বলে উঠলো, "জানেন আমি কে? আমার পিতা রদ-আন্দাজ খাঁর চাচেরা ভায়ের শালা। খুদ উজীর-উল-মুল্‌ক আমাকে কতো খাতির করেন।"

মোতিজানের অধরপ্রান্তে দেখা গেল একটা বাঁকা হাসি। সে চোখ ঘুরিয়ে বললো, "আরেকটা গোপন খবর আমাদের মুহ্‌তাসিব সাহাবএর জানা নেই। ফুলাদ খাঁ সাহাব যখন মক্কা যাত্রা করবেন,—"

"আঃ, কি বলছো মোতিজান,—"

"—তখন খুদ উজীর-উল-মুল্‌কের সুপারিশে বাদশাহ সলামত আমাদের আবিদ হুসেন খাঁকেই নিযুক্ত করবেন এই শহরের কোতোয়াল।"

রদ-আন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ হেসে উঠলো একথা শুনে। রদ-আন্দাজ খাঁ বললো, "এবার কোতোয়াল? কিছুদিন আগে শুনছিলাম আবিদ হুসেন খাঁ উড়িয়্যার নাইব নাজিম হবে।"

ফুলাদ খাঁ হাসি মুখে বললো, "সেদিন কে যেন বললো তোমার কাছে শুনেছে, বুখারার আমীরের ফুফীর ছেলে তোমার সঙ্গে তার শালার মেয়ের শাদীর কথা তুলেছে, তার কি হোলো আবিদ হুসেন?"

আবিদ হুসেনের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। ঢোক গিলে বললো, "এসব রটনা আমার শত্রুদের কাজ। আমি এরকম কথা

বলি নাকি? দরবারের অনেকে আমায় খাতির করে বলে কোনো কোনো লোক আমায় এত হিংসে করে যে বলার নয়। ওরা আমাকে অপদস্থ করার জন্যে এসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"কিন্তু খাঁ সাহাব," মোতিজান বললো, "কোতোয়াল হওয়ার কথা তো আপনি নিজের মুখে আমায় বলেছেন।"

"আমি কি সেকথা বলেছি নাকি?" প্রতিবাদ করলো আবিদ হুসেন, "আমি শুধু বলেছি যে, আলমগীর বাদশাহ্‌র রাজত্বে যোগ্যতার সমাদর আছে। আমি শুধু বলেছি যে, এমন কি আমার মতো লোক, যাকে কোতোয়ালিতে নিযুক্ত করা হয়েছে কাজ শিখবার জন্যে, সেই আমিও আশা করতে পারি একদিন না একদিন শহরের কোতোয়াল পদের জন্যে সুপারিশ করা হবে আমার নাম, যদি আমি কাজে দক্ষতা দেখাতে পারি। আমি কোনো অন্যায় কথা বলেছি?"

"না, না, কোনো অন্যায় কথা তুমি বলো নি," ফুলাদ খাঁ হাসতে হাসতে বললো, "কিন্তু ভাই আবিদ হুসেন, আমি যে মক্কা যাত্রা করবো একথা তুমি কার কাছে শুনলে?"

আবিদ হুসেন কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই রদ্-অন্দাজ খাঁ বললো, "থাক থাক, ওসব কথা এখন থাক। আমরা সবাই এখানে একটু আমোদ ফুর্তি করতে এসেছি, সারা দিনের মেহনতের পর একটু জিরিয়ে নিতে এসেছি, আর আমাদের বেদরদ মুহ্‌তাসিব সাহাব এলো আমাদের রসভঙ্গ করতে—।"

"আমি শুধু আমার কর্তব্য করছিলাম," উত্তর দিলো মুহ্‌তাসিব আশরফ খাঁ।

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এই যে বিবিজান, দেখি এবার তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো। বার করো শরাবের ঝারি আর কয়েকটা পিয়ালা।"

মোতিজান মুহ্‌তাসিবের দিকে তাকালো। মুহ্‌তাসিব অন্যদিকে

মুখ ফিরিয়ে নিলো। চোখ টিপলো রদ্-অন্দাজ খাঁ। বললো, "একটা পিয়ালা আমাদের মুহ্তাসিবের জন্যে।"

"আমি এবার যাই," বলল মুহ্তাসিব আশরফ খাঁ, "এখানে এখন আপনি আছেন, খুদ কোতোয়াল সাহাব আছেন, আমি আর কি বলবো।"

"ভাই রাগ করো কেন," বললো রদ্-অন্দাজ খাঁ, "দেখি হাতটা। দাও ভাই, বাড়িয়ে দাও তোমার হাত।"

মুখ না ফিরিয়েই বাদশাহ্‌র মুহ্তাসিব, শহরের নৈতিক আবহাওয়ার জিম্মাদার আশরফ খাঁ হাত বাড়িয়ে দিলো। রদ্-অন্দাজ খাঁ চারটে আশরফি গুঁজে দিলো তার প্রসারিত হাতে। আশরফ খাঁ বিনা বাক্যব্যয়ে হাতটা জামাহ্‌র ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো, আশরফিগুলো রাখলো ভিতরের জেব-এ।

মোতিজান শরাবের পিয়ালা এগিয়ে দিলো আশরফ খাঁর দিকে।

"নাও ভাই," বললো ফুলাদ খাঁ, "শাহ-ইন-শাহ তো এখানে দেখতে আসছেন না।"

শরাবের পিয়ালা শেষ হোলো। আশরফ খাঁ চলে যাচ্ছিলো, রদ্-অন্দাজ খাঁ বললো, "এখনই? আরো দু-চার পিয়ালা হোক—।"

"আমাকে অন্য মহল্লায়ও টহল দিতে হবে—।"

"আজকাল খুব আশরফি আমদানি হচ্ছে বুঝি?" ফুলাদ খাঁ চোখ টিপে হেসে বললো।

"বাদশাহ সলামত হোন। শরাবের বিক্রি আর ব্যবহার বন্ধ করার জন্যে তিনি যতো কড়াকড়ি করবেন, আমাদের দু চার পয়সা রোজগার করার সুযোগ ততো বাড়বে। দরবার থেকে তনখা যা পাই তাতে কি কুলোয়? আলা হজরত ফিরদৌস আশয়ানি শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ শাহজাহানের আমল তো আর নেই। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। তখন ছিলো এক তঙ্কায় দেড় মন চাল, এখন হয়েছে তঙ্কায় পঁয়ত্রিশ সের। কি করে চলে?"

"কে কাকে বলছে," রদ্‌-অন্দাজ খাঁ হাসতে হাসতে বললো, "মুহ্‌তাসিবের এই রোজগারের একটা ভাগ যে আমাদের কোতোয়াল সাহেবও পায়, সেকথা কি আমরা জানি না?"

ফুলাদ খাঁ জোর গলায় প্রতিবাদ করে উঠলো, সবার হাসির তোড়ে ডুবে গেল তার কথাগুলো।

আরো দুই পিয়ালা শরাব পান করে শহরের মদ্য নিবারণ অধিকর্তা আশরফ খাঁ বিদায় নিলো। ফুলাদ খাঁ বললো, "শুনছি, শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ সমস্ত সুন্দরী তওআয়ফদের শহর থেকে বার করে দেওয়ার হুকুম জারি করবেন—।"

"কী সর্বনাশ!" বলে উঠলো আবিদ হুসেন খাঁ, "কার কাছে যাবো তখন!"

"কিছু ভেবো না," রদ্‌-অন্দাজ খাঁ বললো, "তওআয়ফ শহরে ঠিকই থাকবে, শুধু আমাদের কোতোয়াল সাহাব্‌এর রোজগার বেড়ে যাবে। দারা শিকোহ্‌ বাদশাহ হলে কি আমরা এসব সুযোগ পেতাম?"

"আমি তো মক্কা যাত্রা করবো," ফুলাদ খাঁ হাসলো, "শিকে ছিঁড়বে আমাদের আবিদ হুসেনের কপালে।"

আবিদ হুসেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো, তাকে বাধা দিয়ে রদ-অন্দাজ খাঁ জিজ্ঞেস করলো ফুলাদ খাঁকে, "কিন্তু তুমি এসময় হঠাৎ এখানে কেন? শুনছিলাম আজকাল তোমার নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই।"

"এসেছিলাম ভাই তোমারই খোঁজে। জানি যে, এসময় তোমায় এখানেই পাওয়া যায়। আবিদ হুসেনকেও পেয়ে গেলাম, ভালোই হোলো। ওকে কোতোয়ালিতে কাজ শিখবার নির্দেশ তো বাদশাহ দিয়েছেন, কিন্তু কি কাজ দেবো তা ভেবে পাচ্ছিলাম না এদ্দিন। ওর বাপ নামজাদা ওমরাহ ছিলো, ওকে দিয়ে কি সব কাজ করানো চলে! ওহে আবিদ হুসেন, শোনো, তোমার একটা মনের মতো কাজ পেয়েছি।,"

"কি কাজ ভাইজী ?"

"একজনের সঙ্গে দোস্তি করতে হবে, দোস্তির ছুতোয় নজর রাখতে হবে তার উপর।"

রদ-অন্দাজ খাঁ তাড়াতাড়ি বললো, "না না, এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ওর উপর দেওয়ার দরকার নেই। কোতোয়ালিতে কি লোকের অভাব ?"

"গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিছুই নয়। একজনের উপর নজর রাখতে হবে, কিন্তু সে ইশক্‌বাজী ছাড়া আর কিছু করছে না। তার জন্যে মহম্মদ হুসেনের মতো একজন সুদক্ষ লোকের সময় নষ্ট হতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মহম্মদ হুসেনকে আমি অন্য কাজে নিযুক্ত করবো। আবিদ হুসেনকে যে কাজ দিতে চাই ওটা খুব হাল্কা। ও নিশ্চয়ই পারবে।"

"নিশ্চয়ই পারবো," বলে আবিদ হুসেন খাঁ গোঁফে তা দিলো।

"শোনো," বললো ফুলাদ খাঁ, "মহারাজা জসবন্ত সিংহের একজন অনুচর আছে, শক্তিসিংহ তার নাম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার পর সে লুকিয়ে সাক্ষাৎ করে কুমার রামসিংহের মুন্সি গিরধরলালের কন্যার সঙ্গে। কিছুই নেই এর মধ্যে। চারদিকে এরকম অজস্র হচ্ছে। কিন্তু বাদশাহ্‌র কড়া হুকুম, যে যে রাঠোর-রাজপুত কছওয়া-রাজপুতের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখবে তার উপর যেন নজর রাখা হয়। শক্তিসিংহ হোলো রাঠোর, গিরধরলালের কন্যা কছওয়া। সুতরাং বাদশাহ্‌র হুকুম তামিল করতে হবে এক্ষেত্রেও। অনর্থক সময়ের অপব্যয়, তবু উপায় নেই। পারবে না আবিদ হুসেন খাঁ ? ওদের বিরক্ত করবে না। বরং যদি পারো শক্তিসিংহের সঙ্গে দোস্তি পাতাবে। আর যদি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানাবে। আমি তখন অন্য লোক লাগিয়ে দেবো।"

আবিদ হুসেন খাঁ উল্লসিত হোলো কাজের ভার পেয়ে।

"এখানে এসেও কাজের কথা?" বললো রদ-অন্দাজ খাঁ, "এবার একটু নাচ গান হোক।"

সারেঙ্গিতে সুর তুললো সারেঙ্গিওয়ালা। তবলিয়া চাঁটি মারলো তবলায়। মোতিজানের পায়ের ঘুঙুর বেজে উঠলো। সুরেলা গলায় গান ধরলো সুন্দরী তওআয়ফ।

আবিদ হুসেন শরাবের পিয়ালা হাতে মাথা নাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে মশগুল হয়ে গেল নাচ গান বাজনায়। রদ-অন্দাজ খাঁ আস্তে আস্তে সরে এলো ফুলাদ খাঁর দিকে। নিচু গলায় বললো, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো জরুরী কাজে, সেকথা বুঝতে পেরেছি। ব্যাপার কি?"

ফুলাদ খাঁ চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। কেউ তাকাচ্ছে না তাদের দিকে। গলা খাটো করে উত্তর দিলো, "কৃষ্ণাজী আপ্তে নামে একজন মারাঠা আগ্রায় আছে। সে এখানে নানারকম লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তাকে কয়েদ করতে পারলে ভালো হোতো। কিন্তু শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুম, তাকে যেন বুঝতে দেওয়া না হয় যে, আমরা তার গতিবিধির সমস্ত খবর রাখি। সে শিবাজীর খুব অন্তরঙ্গ এবং বিশ্বাসভাজন। তাই তাকে কয়েদ করা চলবে না। শিবাজীর মনে যেন কোনো রকম সন্দেহ না হয়। আমার ধারণা, সে দু-চারদিনের মধ্যে আগ্রা থেকে চলে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে কয়েকজনের পত্র। তাকে আটক করা যাবে না, কিন্তু সে সব পত্রের বিষয়বস্তু এবং প্রেরকদের নাম আমাদের জানা দরকার। আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। মনে হোলো তুমি আমি মিলে পরামর্শ করে হয়তো একটা উপায় বার করতে পারি।"

মোতিবিবির ঘুঙুরের দ্রুত বোলের সঙ্গে তবলার জবাব খুব জমে উঠেছে। রদ-অন্দাজ খাঁ অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকিয়ে দেখলো সেদিকে।

তারপর বললো, "ফুলাদ খাঁ, ডাকাত তো অনেক ধরেছো, এক বার নিজেরা ডাকাতি করলে কেমন হয় ?"

ফুলাদ খাঁ প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলো না। তারপর তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কৃষ্ণাজী আপ্তে ইদানীং প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আসতো গিরধরলাল মুন্সির কাছে। আগ্রায় শিবাজীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাসম্পর্কিত কথাবার্তাই হোতো সাধারণত। গিরধরলাল মুন্সি সরল লোক। সে খুব আগ্রহের সঙ্গেই আলোচনা করতো কৃষ্ণাজীর সঙ্গে। মনে কোনো রকম সন্দেহ হয়নি যে, সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় কুয়োর পাশে পান্নাকে দূর থেকে দেখে কৃষ্ণাজীর মনে এখানে নিয়মিত আসবার উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। বারবার সে আড় চোখে তাকাতো গৃহের অভ্যন্তরের দিকে। ক্বচিৎ কদাচিৎ শুনতে পেতো অন্তরাল-বর্তিনীর বালা বাজুবন্দ্ আর পায়জোড়ের অস্পষ্ট আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোড়ন জেগে উঠতো মনের মধ্যে।

সেদিন পান্না একসময় গিরধরলালকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "আপনার কাছে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা যিনি আসছেন, তিনি কে ?"

গিরধরলাল সোৎসাহে উত্তর দিলো, "উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। শিবাজীর ফৌজের একজন সর-ই-লস্কর। তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ। আমার সঙ্গে প্রত্যেকদিনই পরামর্শ করতে আসেন। খুব খাতির করেন আমাকে।"

"তাই নাকি!" বিস্ময়ের অভিব্যক্তি দেখা গেল পান্নার মুখের উপর। নাম জিজ্ঞেস করলো এই বিশিষ্ট ব্যক্তির।

"কৃষ্ণাজী আপ্তে," উত্তর দিলো গিরধরলাল। সে আর কি করে জানবে যে পান্না শক্তিসিংহের কাছে আগেই শুনেছে কৃষ্ণাজীর নাম।

"বিদেশী লোক, এতদূর থেকে হিন্দুস্তানে এসেছেন!" বললো পান্না, "আমাদের উ।চত ভালো ভাবে তাঁর আদর আপ্যায়ন করা।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," সায় দিলো গিরধরলাল।

এই কদিন কৃষ্ণাজীর জন্যে মেওয়া মিঠাই শরবত নিয়ে এসেছে গিরধরলালের ভৃত্য। সেদিন সূক্ষ্ম মলমলের চওড়া জরিপাড় লুগ্ড়ি ভালো করে জড়িয়ে মাথার উপর থেকে মুখের উপর অবগুণ্ঠনের মতো নামিয়ে মেওয়া মিঠাইয়ের রূপোর থালা আর শরবতের পান-পাত্র হাতে নিজেই অতিথির সামনে এলো পান্নাবাঈ। গিরধরলাল একটু বিস্মিত হলেও খুশী হোলো মনে মনে। কৃষ্ণাজী সেদিন গর্ব করে বলছিলো যে মারাঠা মেয়েদের মধ্যে পর্দা নেই। এবার সে নিজের চোখে দেখুক যে হিন্দুস্তানের মেয়েদের মধ্যে পর্দা থাকলেও বিদেশী অতিথির আদর-আপ্যায়ন করতে তারা কুণ্ঠিত নয়।

"আমার পালিতা কন্যা পান্না," বললো গিরধরলাল, "এর পিতা ছিলো রাজপুত ক্ষত্রিয়, খুব বীর এবং মহৎ ব্যক্তি।" এভাবে সবাইকে পান্নার পরিচয় দেয় গিরধরলাল, কৃষ্ণাজীকেও দিলো।

কৃষ্ণাজী হাত তুলে নমস্কার করলো। বললো, "রাজপুত ক্ষত্রিয় মাত্রেই বীর এবং মহৎ। হবে না? রাজপুত নারীদের মতো যাদের জননী, তারা বীর এবং মহৎ হবে না তো কে হবে!"

গিরধরলাল আনন্দে এবং গর্বে বিগলিত হোলো। পান্না প্রতিনমস্কার করে চলে গেল গৃহের অভ্যন্তরে। কৃষ্ণাজী রাজপুতদের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে কয়েকটা শিষ্টভাষণ করলো, গিরধরলাল তখন অন্য প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে রাজবাড়ার নানারকম কাহিনী কিংবদন্তী শোনাতে লাগলো কৃষ্ণাজীকে। গিরধরলাল ছিলো দরজার দিকে পেছন ফিরে, সে লক্ষ্য করলো না, কিন্তু কৃষ্ণাজীর চোখে পড়লো যে, ভেজানো দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে গিরধরলালের কন্যা।

হঠাৎ বাইরে একটা চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল।

গিরধরলালের ভ্রূক্ষেপ নেই। দরজা খুলে পান্না ভেতরে এসে বললো, "আপনি একবার বেরিয়ে দেখুন তো কি ব্যাপার। জম্‌নালাল সব সময় সুখসিংহ নাথাওয়াতের ভৃত্যের সঙ্গে কলহ করে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। আজ বোধ হয় সে ওধারে ঘাস কাটতে এসেছে সুখসিংহজীর ঘোড়ার জন্যে আর আমাদের জম্‌নালাল তাকে অনর্থক কটূক্তি করে শোনাচ্ছে। আপনি একবার বলে দিলে আর এরকম করবে না। বাড়িতে অতিথি এসেছেন, উনি কি মনে করবেন ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, গৃহে অতিথি, বাইরে শোরগোল করছে আমারই ভৃত্য, একি অন্যায় কথা," বলতে বলতে গিরধরলাল মুন্সি বাইরে চলে গেল। পান্নাও যাচ্ছিলো বাড়ির ভিতরের দিকে, গিরধরলাল দৃষ্টির অন্তরাল হতেই পান্না আবার ফিরে এলো। তার মুখে একটা অদ্ভুত মৃদু হাসি, আবছা দেখা গেল সূক্ষ্ম লুগ্‌রির অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে। কৃষ্ণাজী চতুর লোক। সে বুঝলো যে, পান্না একটা ছুতো করে বাইরে পাঠিয়েছে গিরধরলালকে। পান্নার দিকে তাকিয়ে সেও হাসলো একটুখানি।

পান্না কাছে এসে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো, "এক ঘড়ি পরে আপনি কি একবার ওদিকে কুয়োর ধারে আসতে পারবেন ?"

কৃষ্ণাজী বিস্মিত হোলো একথা শুনে, স্পষ্ট ভাষায় এরকম আমন্ত্রণ সে আশা করেনি। জিজ্ঞেস করলো, "কেন ?"

"আপনার সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে।"

"হ্যাঁ আসবো, নিশ্চয়ই আসবো," বললো কৃষ্ণাজী।

"কিন্তু গোপনে। কেউ যেন জানতে না পারে। আমার পিতাজীও যেন টের না পান।"

"কেউ টের পাবে না," কৃষ্ণাজী উত্তর দিলো, "মারাঠা যখন গোপনে আসে সংসারে এমন কেউ নেই যে বুঝতে পারবে তার উপস্থিতি।"

পান্না চলে গেল বাড়ির ভিতর। ইতিমধ্যে ফিরে এলো গিরধরলালজীও। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করলো কৃষ্ণাজী আপ্তে। গিরধরলালজী তাকে সঙ্গে করে এগিয়ে দিলো কছওয়া ফৌজের উর্দুর প্রবেশদ্বার পর্যন্ত।

কৃষ্ণা দশমীর এক ফালি চাঁদ তখন ঢলে পড়েছে পিপুল গাছের আড়ালে। এমন সময় প্রাচীর অতিক্রম করে নিয়মিত রীতিতে শক্তিসিংহ উপস্থিত হোলো সেই কুয়োর কাছে। পান্না অপেক্ষা করছিলো সেখানে। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো, সেখানে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে। কিন্তু সে শক্তিসিংহকে নির্দেশ দিলো ছায়ার আড়ালে সরে দাঁড়াতে।

শক্তিসিংহ বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালো পান্নার দিকে।

পান্না হাসি মুখে বললো, "সে কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে আসছে।"

"কে? কৃষ্ণাজী আপ্তে?"

"হ্যাঁ।"

"তাকে কি জানিয়েছেন আমার কথা?"

"না। শুধু আসতে বলেছি।"

"আর কেউ জানে না তো?"

"না।"

"তার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করলেন?"

"সুযোগ তৈরী করে নিতে হয়েছে।"

শক্তিসিংহ আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। কি যেন চিন্তা করলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, "ওকে যা বলবো, সে কথা আপনার সাক্ষাতেই হবে। কিন্তু কথাটা গোপনীয়, অত্যন্ত গোপনীয়। আপনি আমার মান রাখবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।"

"বিশ্বাস না করে আপনার উপায় কি?" কিঞ্চিৎ রূঢ় শোনালো পান্নার গলা, "কিন্তু এখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজনই বা কি?"

"প্রয়োজন আছে।" চারদিকে তাকিয়ে দেখলো শক্তিসিংহ। বললো, "হয়তো—আমার ধারণা সত্যি নাও হতে পারে, তবু হয়তো খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে বাদশাহ্‌র গুপ্তচরেরা। কৃষ্ণাজীর সঙ্গে আমায় বাক্যালাপ করতে দেখলে কথাটা ঠিক বাদশাহ্‌র কানে উঠবে। তাই এখানে আপনার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।"

"কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন?" পান্না বললো বিস্মিত হয়ে।

"কৃষ্ণাজী এখানে নিশ্চয়ই গোপনে আসবেন। আমি ওর সাড়া পেলেই তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করবো ছায়ার আড়ালে। যদি বাদশাহ্‌র হরকরারা দূর থেকে লক্ষ্য করে, ওরা শুধু দেখবে, কৃষ্ণাজী দাঁড়িয়ে আছেন আপনার সামনে, আর আমি তাড়াতাড়ি সরে গেছি দৃষ্টির অন্তরালে।"

"তারপর?"

"অন্তরাল থেকেই তাকে যা বলার আমি বলবো।"

কঠিন হয়ে গেল পান্নার মুখের ভাব। নিরস কণ্ঠে বললো, "বুঝলাম। বাদশাহ জানবেন, এক রাঠোর যুবক আমার সঙ্গে প্রত্যেকদিন গোপনে দেখা করতে আসেন। একদিন এলো আরেকজন। আমি যতক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, ততক্ষণ সেই রাঠোর গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলো। এই তো?"

"দেখুন বাঈ-সা', আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি সময় মতো সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলবো আপনাকে। আপনার সঙ্গে—আপনার সঙ্গে আমার অন্য কথাও আছে।"

"আমাকে কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না," কঠিন হয়ে উঠলো

পান্নার কণ্ঠস্বর, "আমি বেশ বুঝতে পারছি। দরবারে সবার কানে একথা উঠবে। কছওয়া রাজপুতানীকে নিয়ে একটা সরস আলোচনার উপলক্ষ পাবে বাদশাহ্‌র আমীর ওমরাহেরা।"

"না, না," আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলো শক্তিসিংহ, "আপনাকে নিয়ে কোনো রকম অশিষ্ট আলোচনার কারণ আমি ঘটতে দেবো না—।"

"কৃষ্ণাজী আসছেন।"

"কোথায়?"

"ওদিকে বাইরে থেকে উঠবার চেষ্টা করছেন প্রাচীরের উপর। ওঁর উষ্ণীষ দেখতে পাচ্ছি। আপনি আত্মগোপন করুন— ।"

পাশেই ছিলো মল্লিকার ঝাড়। শক্তিসিংহ চোখের পলকে তার আড়ালে সরে গেল। সেখানে গাঢ় ছায়া।

প্রাচীরের ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়লো কৃষ্ণাজী। দেখলো ম্লান চাঁদের আলোয় একলা দাঁড়িয়ে ঘড়ায় জল ভরছে সেই সুন্দরী রাজপুতানী। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। পান্না ফিরে দাঁড়ালো তার দিকে। কৃষ্ণাজী কাছে এসে দাঁড়ালো।

পান্না অবনত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো অল্প কিছুক্ষণ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেখানে। অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে একখানি সুন্দর মুখ। কৃষ্ণাজীর মনখানি দুলে উঠলো বার বার।

"আপনার বান্দা হাজির," নিচু গলায় বললো কৃষ্ণাজী।

"আপনাকে এখানে আসতে বলেছি একটা বিশেষ প্রয়োজনে।" খুব শান্ত স্নিগ্ধ শোনালো পান্নার কথাগুলো।

"আমাদের পরিচিত আরেক ব্যক্তি আপনার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে অভিলাষী। প্রাকাশ্যে আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ করা নিরাপদ নয়। তাই এভাবে ব্যবস্থা করতে হয়েছে।"

কৃষ্ণাজী বিস্মিত হোলো। কিন্তু সে সৈনিক, চোখের পলকে

বুঝতে পারে পরিস্থিতির গুরুত্ব। তাই বিস্ময়ের ভাব সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কে তিনি?"

"আপনি তাকে চেনেন। তাঁর নাম শক্তিসিংহ রাঠোর। সেদিন মহারাজা জসবন্ত সিংহের সঙ্গে তাঁকে দেখেছেন।"

"শক্তিসিংহ রাঠোর! কোথায় তিনি?"

"অন্য কোনো দিকে তাকাবেন না," সংযত কণ্ঠে পান্না বললো, "আমার দিকেই তাকিয়ে থাকুন। কেউ যেন বুঝতে না পারে যে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে আপনি অবহিত আছেন।"

"কেন?" আরো বিস্মিত হোলো কৃষ্ণাজী আপ্তে, কিন্তু তাকালো না কোনো দিকে, চোখ সরালো না পান্নার মুখের উপর থেকে। জিজ্ঞেস করলো, "কে বুঝতে পারবে? কেউ তো কোথাও নেই। কেউ তো জানেনা আমি এখানে এসেছি।"

"হয়তো জানে।"

"কে জানে?"

"খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে আছে বাদশাহ্‌র হরকরাদের কড়া নজর, একথা কি আপনার জানা নেই?"

"কিন্তু এই মুহূর্তে, এখানে—"

"হ্যাঁ, এখানে আমাদের উপরও নজর থাকতে পারে।" বলতে বলতে মুখ নিচু করলো পান্না। দূর থেকে কেউ দেখলে ভাববে সে শরমে কুণ্ঠায় ব্রীড়াবনতা হয়ে আছে, বুঝতে পারবে না যে সে আর যোগ দিচ্ছে না কোনো কথোপকথনে, বাক্যালাপ চলছে আরেকজন অন্তরালবর্তীর সঙ্গে।

মুখ নিচু করে পান্না বললো, "শক্তিসিংহ রাঠোর, আমাদের হাতে সময় বেশী নেই।"

কৃষ্ণাজী পান্নার মুখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "শক্তিসিংহ, আপনি কোথায়?"

"এখানে, এই ঝাড়ের আড়ালে। আমাকে চিনতে পারছেন?"

"হ্যাঁ, আপনার কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত, সেদিন যখন মহারাজা জসবন্ত সিংহের মঞ্জিলে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে দেখেছি আপনাকে!"

"কৃষ্ণাজী, আপনার সঙ্গে এভাবে সাক্ষাৎ করলাম বলে আমাকে মার্জনা করবেন।"

কৃষ্ণাজী হাসলো। "এরকম পরিস্থিতিতে নানাভাবেই সাক্ষাৎ হয়। আমাদের অভ্যেস আছে। বলুন, শুনছি।"

"মহারাজা জসবন্ত সিংহ কুমার রামসিংহকে জানতে দিতে চাননা শিবাজীর প্রতি তাঁর আসল মনোভাব। তা ছাড়া কছওয়াদের সঙ্গে এরকম সময় কোনোরকম যোগাযোগও রাখতে চান না।"

"হ্যাঁ সেকথা আমি আঁচ করতে পারছি। মহারাজা জসবন্ত সিংহ যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তখন শিবাজীর সঙ্গে তাঁর যে গোপন যোগাযোগ হয়েছিলো সেকথা যে অল্প দুচারজন জানে, আমি তাদের অন্যতম। এবং তাঁর দূত হয়ে সেনাপতি চিমনাজী বাপুজীর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করেছিলেন আপনিই, সেকথাও আমি অবগত আছি।"

"এসব কথা বাদশাহ যদি জানতে পারেন, তাহলে মুশকিল হবে।"

"অন্তত কোনো মারাঠার মুখ থেকে জানতে পারবেন না আপনাদের বাদশাহ।"

"কৃষ্ণাজী, মহারাজা জসবন্ত সিংহ আপনার মারফতে কয়েকটি কথা শিবাজীকে জানাতে চান। মন দিয়ে শুনুন কথাগুলো।"

"বলুন।"

শক্তিসিংহ বলতে শুরু করলো। পান্নার শোনবার ইচ্ছে ছিলো না। অন্য কথা ভাবতে গিয়ে সে আনমনা হয়ে গেল। তার চোখ ফেটে জল আসছিলো। কোনোরকমে আত্মসংবরণ করে ছিলো সে।

বার বার মনে হচ্ছিলো,—সে কি এই কদিন ভুল ভেবেছে শক্তি সিংহকে? শক্তিসিংহ রাঠোর তাকে শুধু এভাবে ব্যবহার করার জন্যেই এখানে আনাগোনা করেছে? বাদশাহ্‌র হরকরাদের মনে এক সম্ভ্রান্ত রাজপুতকন্যার সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়ে দিতে তার রাজপুত-সম্মানে বাধলো না? এসব কথাই ভাবতে ভাবতে একসময় শুনলো, শক্তিসিংহ বলছে, "যখন শিবাজী আগ্রায় উপস্থিত হবেন, তখন আমরা আবার আপনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবো।"

"শিবাজীর পক্ষ থেকে আমি মহারাজাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি," বললো কৃষ্ণাজী, "আপনাদের এই বন্ধুত্ব ও শুভকামনার জন্যে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।"

"আমাদের আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা ঠিক হবে না," শক্তি সিংহ বললো ঝাড়ের আড়াল থেকে, "আপনি চলে গেলে পরে আমি এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারবো। যতক্ষণ আপনি না যাচ্ছেন, ততক্ষণ আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে এখানে।"

কৃষ্ণাজী তাকিয়ে দেখলো পান্নাকে। এতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শক্তিসিংহের সঙ্গে কথা বললেও, পান্নার উপস্থিতির কথা যেন ভুলেই ছিলো। এবার বাইরের কঠিন রাজনীতির জগৎ থেকে ফিরে এলো তার নিজের মনের জগতে। দেখতে পেলো, লুগ্‌ড়ির অবগুণ্ঠনের আড়ালে মুখ নিচু করে আছে সে।

তার চোখ দুটো যেন একটু বেদনাতুর হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো পান্নাকে উদ্দেশ করেই, "আমায় কি এখন যেতে হবে?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লো পান্না।

কৃষ্ণাজী কি একটা যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। কিন্তু এতক্ষণ একটি বারও তাকায়নি মল্লিকার ঝাড়ের দিকে। এবার চোখ তুলে আকাশের চাঁদের দিকে তাকালো।

পান্না মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো,

"আপনি যাবেন না? অকারণ বিলম্ব করা ঠিক হবে না। কেউ হয়তো এসে পড়তে পারে।"

কৃষ্ণাজী বললো, "যাওয়ার আগে একবার আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই। শক্তিসিংহের সঙ্গে এভাবে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিয়ে আপনি আমাকে—"

হঠাৎ কাছে কোথায় শুকনো পাতার উপর পায়ের সাড়া শোনা গেল। কার যেন কাশির আওয়াজ এলো ওদিক থেকে।

"আপনি যান। তাড়াতাড়ি," ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো পান্না।

চোখের পলকে কৃষ্ণাজী প্রাচীর অতিক্রম করে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। একটু পরেই বাইরে সড়কের উপর শোনা গেল কৃষ্ণাজী আপ্তের ঘোড়ার দ্রুতধাবমান খুরের শব্দ।

কেউ কোথাও নেই। আর কোনো সাড়াশব্দও নেই। মল্লিকার ঝাড়ের আড়াল থেকে শক্তিসিংহ বেরিয়ে এলো অতি সন্তর্পনে।

পান্না জিজ্ঞেস করলো, "আপনার ঘোড়া কোথায় রেখেছেন?"

"কেন?"

"কৃষ্ণাজী আপ্তের চোখে পড়তে পারতো এমন কেনো জায়গায় আপনার ঘোড়া না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি আছে বলে যে কৃষ্ণাজীর জানা ছিলো না, বাদশাহ্‌র কোনো হরকরা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবে না যদি সে দেখে যে কৃষ্ণাজী আপনার ঘোড়া দেখতে পেয়েও নির্ভাবনায় ভিতরে চলে এলো।"

শক্তিসিংহ একটু হাসলো।

"হাসছেন কেন?"

"আপনার সতর্কতা দেখে। আপনি এতখানি ভেবেছেন? তবে একথা আমি স্বীকার করবো যে, আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। এত গোপনে অথচ এত সহজে যে আপনি ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারবেন আমি ভাবতেই পারিনি।"

স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের আড়ালে পান্নার মুখ ম্লান হয়ে গেল। ভাবলো, —মানুষ কতো হৃদয়হীন হয়ে উঠেছে আজকাল।

দু-তিন মুহূর্ত চুপ করে রইলো দুজনেই। তারপর পান্না জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আপনার কি নিশ্চিত ধারণা যে, এ মুহূর্তে বাদশাহ্‌র কোনো না কোনো হরকরা এখানে আমাদের উপর নজর রেখেছে?"

শক্তিসিংহ উত্তর দিলো, "যদি তাই হয় তো আমি আশ্চর্য হবো না।"

"যাক, আপনার কাজ হয়ে গেল," সহজ হবার চেষ্টা করলো পান্না।

"আপনার এই সহায়তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি যে আপনার কাছে কতো কৃতজ্ঞ তা আর ভাষায় প্রকাশ করে বোঝাতে পারবো না।"

"বোঝাবার দরকারই বা কি?"

শক্তিসিংহ মনে একটা দুর্বোধ্য বেদনা বোধ করলো, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না তার মুখে। সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

"আপনার যাবার সময় হোলো," আস্তে আস্তে বললো পান্না।

"হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। কি জানেন, এই কটা দিন, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায়, এই যে এখানে, আর আপনার সঙ্গে দেখা হোলো, প্রত্যেকটা মূহূর্ত—"

অসংবদ্ধ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে পান্না বলে উঠলো, "আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না। আমি এবার যাই।"

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ কণ্ঠে শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো, "আমাদের কি আর দেখা হবে না?"

"কেন দেখা হবে না?" নিরাসক্ত কণ্ঠে পান্না উত্তর দিলো, "আবার দেখা হতেও পারে। আপনার যখন প্রয়োজন মনে হবে

নিশ্চয়ই আসবেন। গোপনে প্রাচীর লঙ্ঘন করা তো আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে। বাদশাহ্‌র হরকরারা উপভোগ করবে সেই দৃশ্য। আমার সম্বন্ধে, একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুতকন্যার জন্যে, ওরা যা ভাববে ভাবুক, আপনাদের কি তাতে আসে যায়?"

শক্তিসিংহ অবাক হয়ে তাকালো পান্নার দিকে।

আস্তে আস্তে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলো পান্না। চাঁদের আলোয় আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে তার মুখখানি। তার অনবগুণ্ঠিত রূপমাধুরী এই প্রথম দেখলো শক্তিসিংহ। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, দেখতে পেলো পান্নার চোখ দুটো জলে টলটল করছে।

শক্তিসিংহের মনের মধ্যে ঝড় উঠলো। কোনো রকমে আত্ম-সংবরণ করে বললো, "বাঈ-সা'! আমি—"

"আর কোনো কথা নয়। আপনি এবার যান।" শক্তিসিংহের চোখের দিকে প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো পান্না।

"আমি বুঝতে পারছি না কেন—"

বাধা দিয়ে পান্না উত্তর দিলো, "আপনি যান। আমাকেও ফিরে যেতে হবে।"

"কাল যদি এসময় একবার আসি—," কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললো শক্তিসিংহ।

"না, আসবেন না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শক্তিসিংহ উত্তর দিলো, "বেশ, তাই হবে। আমি আর আসবো না।"

পান্না মুখের উপর অবগুণ্ঠন নামিয়ে দিয়ে জলের ঘড়া তুলে নিয়ে চলে গেল। শক্তিসিংহ আস্তে আস্তে ফিরে চললো খোজা ফিরোজার বাগের প্রাচীরের দিকে।

প্রথমটা দেখতে পায়নি শক্তিসিংহ। ঈষৎ আনমনা হয়ে প্রাচীর অতিক্রম করে বাইরে লাফিয়ে পড়লো। কাছেই

এক-জায়গায় বাঁধা ছিলো তার ঘোড়া। লাগামের গ্রন্থি খুলে ঘোড়ার উপর চড়ে বসে মুখ ফেরাতেই চোখে পড়লো, কাছেই আরেকটি ঘোড়ার পিঠের উপর পা রেখে প্রাচীরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন মোগল যুবাপুরুষ। পোষাক দেখে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে বলেই মনে হোলো। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপর। শক্তিসিংহের দিকে তাকিয়ে আছে হাসিমুখে।

শক্তিসিংহের হাত চলে গেল তলোয়ারের হাতলে। রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "কে তুমি?"

সে লোকটি জিনের উপর দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে লাফিয়ে উপবিষ্ট হোলো ঘোড়ার পিঠে। তারপর ঘোড়াটিকে নিয়ে এলো শক্তিসিংহের কাছে। হাসিমুখে বললো, "শহরের দিকে ফিরছো তো? আমিও সেদিকে যাচ্ছি। চলো এক সঙ্গে যাওয়া যাক।"

"কে তুমি? ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?"

"আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কাজ দেওয়া হয়েছে।"

শক্তিসিংহ বিস্মিত হোলো। "মানে? কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না।"

"আর ভাই বোলো না," উত্তর দিলো সেই মোগল, "এখানে বেশ নিরিবিলি, তাই মন খুলে বলতে বাধা নেই। আলমগীর বাদশাহ্‌র রাজত্বে কোনো শৌখীন লোক শান্তিতে বাস করতে পারবে না। এক পিয়ালা শরাব পান করার উপায় নেই, বাদশাহ্‌র মুহ্‌তাসিব সোনায় বাঁধানো লাঠি নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। সন্ধ্যার পর নিরিবিলি বসে কোনো হাসীনা তওআয়ফের গান শোনার উপায় বোধ হয় থাকবে না। শুনেছি বাদশাহ নর্তকী তওআয়ফ সবাইকে শহর থেকে বার করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। এখন দেখছি কোনো আশিক যে তার মাশুকের সঙ্গে প্যার করবে, মহব্বত করবে, ইশ্‌কবাজি করবে তারও উপায় থাকবে না, তাদের উপরও নজর রাখবে কোতোয়ালির লোক।"

ওর কথা শুনে বিস্মিত হোলো শক্তিসিংহ। দুজনে আস্তে আস্তে অশ্ব চালনা করছিলো ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ছায়াঘন প্রশস্ত পথ ধরে।

"কে কার উপর নজর রাখছে?" শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"এই যেমন, আমি তোমার উপর নজর রাখছি।"

"তুমি! আমার উপর!" শক্তিসিংহ ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"আরে, থামলে কেন? চলো, চলো।—ব্যাপারটা কি জানো? আমি হলাম আগ্রার কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁর চাচেরা ভায়ের শালা মহম্মদ হুসেন খাঁর ছেলে। নিশ্চয়ই আমার পিতার নাম শুনেছো। উনি ছিলেন বাদশাহ্‌র দরবারের একজন ওমরাহ্। ওঁর মৃত্যুর পর ওর অর্থসম্পত্তি বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়াল-এ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল, কারণ তিনি মুতালিবাদার অবস্থায় পরলোক গমন করেন। উনি মুতালিবা নিয়েছিলেন বহু টাকার, তাই খাজিনাহ-ই-আমারা ওঁর কাছে প্রচুর অর্থ পায়। দিওয়ান-ই-বুয়ুতাতের সঙ্গে ওঁর সদ্ভাব ছিলো না, তাই এখন পর্যন্ত হিসেব পরিষ্কার হয়নি, আমিও কোনো সম্পত্তি ফেরত পাইনি।"

অপরিচিত লোকের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী শোনবার ধৈর্য শক্তিসিংহের ছিলো না। অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো, "কিন্তু তোমাকে কে নিযুক্ত করেছে আমার উপর নজর রাখতে?"

"সে কথাই তো বলছি। আমার হাতে টাকাকড়ি নেই, আমি তো পড়লাম মুশকিলে, খুদ উজীর-উল-মুলক্ আমাকে খুব খাতির করেন। তিনি আরজ করলেন বাদশাহ্‌র কাছে। বাদশাহ মেহেরবান। উনি হুকুম দিলেন আবিদ হুসেন খাঁকে কোতোয়ালিতে নিযুক্ত করা হোক।"

"তুমি কোতোয়ালির লোক?"

"শোনো না কি বলছি। নিযুক্ত তো হলাম। কিন্তু আমাকে দেখে ফুলাদ খাঁ পড়লো ফাঁপরে। কি কাজ দেবে আমায়। ছোটো কাজ তো দিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেকদিন একবার করে কোতোয়ালিতে হাজিরা দিই, মুখ দেখিয়ে চলে আসি, মাসের শেষে তনখা উস্থল করি, আর অন্য সময় কাফিখানায় আড্ডা দিয়ে মোতি-জানের গান শুনে কাটাই। কাল ফুলাদ খাঁ বললে, তোমায় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিচ্ছি। তুমি রাঠোর শক্তিসিংহের উপর নজর রাখো। তার মহব্বত চলছে এক কছওয়া রাজপুতানীর সঙ্গে, কি ব্যাপার খবর নাও। হুকুম তামিল না করে উপায় নেই। কিন্তু শুনে এমন রাগ হোলো যে কি বলবো। এ কেমন বাদশাহ্‌র রাজত্ব! শরাব খেলে মুহ্‌তাসিব এসে গিরফতার করবে, তওআয়ফদের শহর থেকে বার করে দিতে চাইবে, ইশ্‌ক মহব্বত করলে কোতোয়ালির লোক পেছনে ঘুরতে শুরু করবে। আসলে কি ব্যাপার জানো? মোতি-জান আমাকে প্যার করে। এটা ফুলাদ খাঁ আর রদ-অন্দাজ খাঁর সহ্য হচ্ছে না। তাই সন্ধ্যেবেলা আমায় মোতিজানের কাছ থেকে দূরে রাখতে চাইছে। বেশ, রাখুক। মোতিজানের দিল আমার জন্যে বিকিয়ে আছে। দেখি ওরা কি করতে পারে। ইতিমধ্যে আমার কাজ আমি করি। তাই আজ দেখতে এলাম তুমি কি ভাবে হাজিরা দাও তোমার মাশুকের কাছে। কিন্তু ভাই, কেউ কি কোনোদিন শান্তিতে প্যার মহব্বত করতে পেরেছে? বেশ কথা বলছিলে রাজপুতানীর সঙ্গে। আবার কে একজন এসে গেল। কিছুতেই যায় না সেই ব্যাটা। বুঝলাম লুকিয়ে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। আরে বাবা, এই অভিজ্ঞতা তো আমাদেরও আছে। তাই গলা খাঁকরি দিলাম, পায়ের আওয়াজ করলাম, আর লোকটা অমনি চোঁচা দৌড় মারলো।"

"আচ্ছা, ওই আওয়াজ তুমি করেছিলে?" শক্তিসিংহ খুব জোরে হেসে উঠলো।

"ভালো করিনি? আমার উপর যখন হুকুম হয়েছে তোমার সঙ্গে দোস্তি করবার, তখন ভাবলাম আগেই দোস্তির একটা নমুনা দেখিয়ে দিই। কি বলো? হবে আমার দোস্ত? হাত মিলাও।"

শক্তিসিংহ হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"বেশ, কাল থেকে আমরা একসঙ্গে এদিকে আসবো, কি বলো," বললো আবিদ হুসেন খাঁ, "বেড়ানোও হবে, তোমার সঙ্গে গল্প করাও হবে, তোমার উপর নজর রাখাও হবে। তবে, একটা কথা কি জানো, ফুলাদ খাঁ লোকটা ভালো নয়। ও ঈর্ষা করে আমায়। ওর ধারণা, আমার কিছু অভিজ্ঞতা হলে বাদশাহ সলামত আমাকে কোতোয়াল বানিয়ে দেবে। ওকে আমি জব্দ করবো, দেখে নিও তুমি।"

শক্তিসিংহ একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললো। আবিদ হুসেন খাঁকে সে চিনে নিয়েছে এক মুহূর্তে। সে যে কৃষ্ণাজী আপ্তেকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি বা আর কিছু বুঝতে পারেনি, এতে সে নিশ্চিন্ত হোলো।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আবার দেখা হোলো আবিদ হুসেন খাঁর সঙ্গে। চওক-বাজারের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলো শক্তিসিংহ। মন তার খুব বিষণ্ণ। শুধু মনে পড়ছিলো আগের দিন সন্ধ্যার কথা। একবার ভাবলো, যদি আরেকবার দেখা হয় পান্নার সঙ্গে। কিন্তু সে মানা করে দিয়েছে। শক্তিসিংহ স্থির করলো, সে আর কোনোদিন খোজা ফিরোজার বাগের ধারে কাছেও যাবে না। সন্ধ্যের সময় নানা দোকানে নানা জাতের ক্রেতাদের ভিড়, উচ্চকণ্ঠের কলরব। শক্তিসিংহ আনমনে তাই দেখতে দেখতে যাচ্ছিলো। এমন সময় মনে হোলো কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলো পেছনে আরেকটি ঘোড়ায় চেপে

আসছে আবিদ হুসেন খাঁ। ঘোড়াটি রুগ্ন, শীর্ণকায়। দেখে মনে হয়, এখনই যেন মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। কিন্তু আবিদ হুসেন দক্ষ ঘোড়সোয়ারের ভঙ্গিতে তাকে প্রাণপণে ছোটাচ্ছে।

কাছে এসে আবিদ হুসেন খাঁ বললো, "আমি যাচ্ছিলাম খোজা ফিরোজার বাগের দিকে। পথে দেখলাম, তুমি এদিক দিয়ে যাচ্ছো। তাই ছুটতে ছুটতে এলাম।"

"ভালোই করেছো," শক্তিসিংহ হেসে বললো, "একা একা আমার ভালো লাগছিলো না। এবার বেশ গল্প করতে করতে টহল দেওয়া যাবে।"

"তা, এদিকে কেন? খোজা ফিরোজার বাগের দিকে যাওয়ার পথ তো এটা নয়।"

"খোজা ফিরোজার বাগে যাচ্ছে কে?"

"কেন?"

"আমার আর ওদিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।"

"সে কি!" আবিদ হুসেন খাঁর চোখ কপালে উঠলো, "তাহলে আমি ফুলাদ মিঞাকে বলবো কি? ও ঠিক ভাববে, আমি যে ওদিকে যাচ্ছি সেটা তুমি টের পেয়ে গেছ, তাই আর যাচ্ছো না। আমি যে একটা কাজ এতদিনে পেলাম, তাও যাবে।"

শক্তিসিংহ হাসতে লাগলো ওর কথা শুনে।

"চলো, চলো," বললো আবিদ হুসেন, "ফিরোজা বাগের ভেতরে না যাও, অন্তত আশেপাশে খোলা ময়দানে একটু ঘোড়া ছোটাবে। আমি ফুলাদ মিঞাকে বলতে পারবো তুমি ফিরোজা বাগের কাছে ঘোরাঘুরি করছিলে। যার আসার কথা, সে হয়তো এলো না, তাই তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো শক্তিসিংহ। তারপর বললো, "আচ্ছা, চলো।"

শক্তিসিংহ খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। আবিদ হুসেন

পেছন থেকে চিৎকার করতে লাগলো,—"আস্তে ভাই, একটু আস্তে। আমার ঘোড়া অতো জোরে ছুটতে পারে না।"

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পরে বাদশাহ আওরংজেব মোতি মসজিদে নামাজ সেরে দিওয়ান-ই-খাসে এসে বসলো। চারদিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে কর্পূর-নির্যাসিত শামা, মশাল আর সোনালী ফানুস।

সেদিন রদ্-অন্দাজ খাঁর মহল-চৌকির পালা। সে বর্ম ও অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে নিজের অধীনস্থ নিম্নবর্গের মনসবদারদের নিয়ে বাদশাহ্‌র সামনে এসে তসলীম জানালো দৈনন্দিন কায়দা অনুযায়ী। তারপর বাদশাহ্‌র অনুমতি নিয়ে চলে গেল মহল-চৌকির দায়িত্ব পালন করতে।

তারপর শুরু হোলো রেওয়াজী নাচ আর গান। তখ্‌ত্‌এর উপর নিস্পৃহ গম্ভীর মুখে বসে রইলো বাদশাহ। দরবারের এই রেওয়াজ বাদশাহ্‌র পছন্দ নয়। কিন্তু তখনো এই রেওয়াজ বাতিল করা হয়নি। দিওয়ান-ই-খাসে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় নাচ গানের রেওয়াজ বাতিল করার হুকুম হয়েছিলো আরো দুবছর পরে, ষোলো শ' আটষট্টি খৃস্টাব্দে।

দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা আকিল খাঁকে এসময় উপস্থিত থাকতে হয় বাদশাহ্‌র কাছে। দৈনন্দিন কর্মসূচী যথাযথ ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা এর তদারক করা তার দায়িত্ব।

নাচগানের পালা শেষ হোলো। উজীর-উল-মুল্‌ক্ জাফর খাঁ বাদশাহ্‌র তখ্‌ত্‌এর কাছে এগিয়ে এসে তসলীম জানালো। তার হাতে একতাড়া কাগজপত্র, বেশির ভাগই বাদশাহী ফরমানের মুসাবিদা। একটি একটি করে পড়িয়ে শোনাতে লাগলো বাদশাহকে, মাঝে মাঝে বাদশাহ্‌র দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হোলো।

খাসমহলের নাজির খোজা ইফ্‌তিকার-উদ্দিন নিয়মিত রীতিতে

কতকগুলো কাগজপত্র দিয়ে গেল আকিল-খাঁকে। মহল থেকে কাগজপত্র আসে দিওয়ান-ই-খাসের দারোগার কাছে, দারোগার মারফতে যায় উজীরের কাছে। বেশির ভাগই অন্দারুন-ই-মহলের দৈনন্দিন হিসেবের বিবরণী, আর কিছু জরুরী আর্জি। আকিল খাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো খাঁ-ই-সামান, তার পাশে বাদশাহ্‌র খাস মুন্সি কাবিল খাঁ। আকিল খাঁ একটি একটি করে কাগজ পড়ে দেখলো। তার কাজ এটা, সে-ই স্থির করে কোনো কাগজ বা আর্জি দিওয়ান-ই-খাসে উজীরের মারফত বাদশাহ্‌র কাছে পেশ করার উপযুক্ত কিনা। একটি একটি করে কাগজ পড়ে তুলে দিলো খাঁ-ই-সামানের হাতে। খাঁ-ই-সামান তাতে নিজের সই দিয়ে এগিয়ে দিলো খাস মুন্সির হাতে। খাস-মুন্সির কাছ থেকে কাগজগুলো যথা সময় নিয়ে নেবে উজীর জাফর খাঁ।

কাগজ একটা একটা করে পড়ে খাঁ-ই-সামানের হাতে দিতে দিতে আকিল খাঁ হঠাৎ থেমে গেল। মহলের খরচা সংক্রান্ত দু তিনটে আর্জির পর একটি ভাঁজ করা কাগজ তুলে আকিল খাঁ দেখতে পেলো তার উপর খুব সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে,—এই পত্র শুধু আকিল খাঁর জন্যে। সে দুপাশে তাকিয়ে দেখলো। খাঁ-ই সামান খুব নিচু গলায় কি যেন বলছে কাবিল খাঁকে। জাফর খাঁ একটি ফরমানের মুসাবিদা পড়ে শোনাচ্ছে। মুদিত নেত্রে চুপচাপ শুনছে আওরংজেব। কারো দৃষ্টি নেই তার দিকে। আকিল খাঁ চট করে কাগজটি নিজের জামাহ্‌র অভ্যন্তরে সংগোপিত করলো।

খাঁ-ই-সামান যখন তার দিকে ফিরেছে, সে তখন যথাবিহিত ভাবে আরেকটা কাগজ এগিয়ে দিচ্ছে তার দিকে।

কিছুক্ষণ পরে দিওয়ান-ই-খাসের কর্মসূচী যখন সমাপ্ত হোলো, বাদশাহ অন্যান্য উমারাহ্‌দের সঙ্গে আবার চলে গেল মোতি মসজিদে নামাজ করতে।

দরবার ভঙ্গ হোলো।

এবার দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস আকিল খাঁর ছুটি। সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো বাইরের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে। একপ্রান্তে শ্বেতমর্মরের বেষ্টনী, সেখানে উপর থেকে ঝোলানো আছে সোনালী ফানুস। বসনের অভ্যন্তর থেকে কাগজ বার করে পড়তে লাগলো সেই ফানুসের স্নিগ্ধ আলোয়।

বেশি কিছু নয়, একটি দু পংক্তি ফারসী বয়েৎ ঃ—গোলাপ বুলবুলের কাছে পাঠিয়ে দিলো নিজের ঠিকানা, বুলবুল কি আকাশের নীলিমার নেশায় মশগুল হয়ে থাকবে ?—তার নিচে শুধু লেখা আছে ঃ জোধ্‌বাঈয়ের আরামগাহ্‌তে, কাল সন্ধ্যার পর।

কে পাঠিয়েছে এই চিঠি, কিছু লেখা নেই। কিন্তু আকিল খাঁ বুঝলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো সে। ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। সে চিঠিখানি সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকালো, তারপর রেখে দিলো বসনের অভ্যন্তরে।

ঠিক যে সময় দিওয়ান-ই-খাসে আকিল খাঁর হাতে সেই চিঠি এসে পৌঁছেছিলো, সেই সময় খোজা ফিরোজার বাগে মুন্সি গিরধরলালের গৃহের পশ্চাদভাগে সেই কুয়োর কাছে শূন্য ঘড়া এক পাশে রেখে পান্না একা চুপ করে বসেছিলো। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে সেখানে, একরাশ জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে ফুলের ঝাড়গুলোর আশেপাশে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভরে আছে নিশিপুষ্পের হাল্কা সৌরভ।

ধারে কাছে লোকজন নেই। গিরধরলালের গৃহের একটি ঝরোকায় দেখা যাচ্ছে প্রদীপের আলো। অনেক দূরে কছওয়া সৈন্যদের ছাউনিতে একটা অস্পষ্ট কলরব শোনা যাচ্ছে, দিনের শেষে ছাউনির সামনে জড়ো হয়ে সৈন্যেরা দল বেঁধে গান জুড়ে দিয়েছে।

পান্নার মন বিষাদে ভরে আছে, সারাদিন ধরে কোনো কাজে উৎসাহ নেই। বসে বসে ভাবছিলো, কেন কাল অতো রুক্ষ ব্যবহার

করলাম শক্তিসিংহের সঙ্গে। তার কাজ হয়ে গেছে, এমনিতেই সে আর আসতো না, রুক্ষ কথায় অনর্থক একটা তিক্ততার সৃষ্টি হোলো। কিছু না বললে কি আর হোতো, না হয় খেয়াল হলে মাঝে মাঝে আসতো। বেশী বাড়াবাড়ি করলে, পরে ভদ্রভাবে মানা করে দিলেই হোতো।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এবার জল নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। পান্না আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। কুয়ো থেকে জল তুলে ঘড়ায় ভরলো। তারপর ঘড়া তুলে নিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে। জলের ঘড়া পড়ে গেল হাত থেকে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণা আপ্তে। সে কখন এসেছে পান্না টেরই পায়নি।

"আপনাকে এভাবে চমকে দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিলো না," কৃষ্ণা আপ্তে ধীর কণ্ঠে বললো, "আমি ভাবতে পারি নি যে আপনি হঠাৎ ভয় পাবেন। আমায় মার্জনা করবেন।"

"না, আমি ভয় পাইনি," পান্না উত্তর দিলো, "তবে আপনি এরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে আসবেন আমি আশা করতে পারিনি।"

"আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, আপনার তো খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কথা।"

"যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা না করে পারলাম না।"

"আমার সঙ্গে কি আপনার বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে?" পান্না জিজ্ঞেস করলো।

দুতিন মুহূর্ত চুপ করে রইলো কৃষ্ণাজী আপ্তে। তারপর বললো, "হ্যাঁ, আছে।"

"বলুন আমি কি ভাবে আপনার সেবায় লাগতে পারি।"

কৃষ্ণাজী কিছু একটা ভাবছিলো। মনে হোলো সে যেন স্থির

করতে পারছে না কিভাবে পেশ করবে তার বক্তব্য। একটু ভেবে সে শুরু করলো।

"বাঈসা', আপনাকে—ম্, হ্যাঁ—আপনাকে প্রথম দেখলাম সেদিন। আপনি নিজের হাতে থালায় করে মেওয়া মিঠাই নিয়ে এলেন বিদেশী অতিথির জন্যে, নিয়ে এলেন শরবত। তার আগেও একদিন সন্ধ্যায় দেখেছি। তবে দূর থেকে। কুয়ো থেকে জল তুলছেন। আমার মনে পড়ে গেল আমার দেশের মেয়েদের কথা। তারাও এমনি করে অতিথির পরিচর্যা করে, বাড়ির কাজ করে।"

"সব দেশের মেয়েরাই করে কৃষ্ণাজী।"

কৃষ্ণাজী বলে গেল, "আমার সময় বেশির ভাগ কাটে ঘোড়ার পিঠে, তা নইলে রাজসভায়। ঘর সংসার করার কথা আমি ভাবিনি কোনোদিন। আমার জননী স্বর্গারোহণ করেছেন অনেকদিন, আমার ভগ্নীরও বিবাহ হয়ে গেছে। এখন সংসারে আমি একা। একেবারে একা।"

"আপনি কৃতী ব্যক্তি। শিবাজীর অন্তরঙ্গ। আপনাদের দেশের অনেক সুযোগ্য কন্যা নিশ্চয়ই সাগ্রহে আপনার সংসারের দায়িত্ব নিতে রাজী হবে।"

"আমি তাদের কথা ভাবছি না পান্নাবাঈ।"

"আপনার ব্যক্তিগত জীবনের এসব কথা আমাকে বলার কি কোনো প্রয়োজন আছে?" পান্না জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।"

কৃষ্ণাজীর কথা শুনে পান্না বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো।

"পান্না!"

অন্তরঙ্গ সম্বোধন শুনে পান্না ঈষৎ শঙ্কিত বোধ করলো।

"পান্না, তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি, সেদিনই মনস্থির করে ফেলেছি যে, তোমায় জিজ্ঞেস করবো একটি কথা।"

"কি কথা?"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

"আপনার সঙ্গে!"

"হ্যাঁ, তুমি পূর্ণ করবে আমার গৃহলক্ষ্মীর শূন্য আসন।"

পান্না স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলো কৃষ্ণাজীর দিকে।

"তোমায় যখন প্রথম দেখলাম," কৃষ্ণাজী বলে গেল, "মনে হোলো তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলেই যেন আমার নিয়তি আমায় আগ্রায় নিয়ে এসেছে সেই সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে। মনে হোলো—"

"কৃষ্ণাজী!"

পান্নার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে কৃষ্ণাজী আপ্তে থেমে গেল।

"কৃষ্ণাজী," পান্না বললো, "আপনার মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, এ ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।"

পান্নার কথার ভঙ্গিতে কৃষ্ণাজী ঈষৎ অপ্রতিভ হোলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেভাব সামলে নিয়ে বললো, "পান্না, তুমি বোধ হয় এখনো জানো না শিবাজীর রাজসভায় এবং সেনাবাহিনীতে আমার কি স্থান। যে কোনো নারী আমার এই প্রস্তাব শুনে সম্মানিত বোধ করবে।"

এই দাম্ভিক উক্তি শুনে পান্নার মুখমণ্ডলে দেখা দিলো বিরক্তির ভাব।

"আপনি মারাঠাদের রাজা হলেও," সে উত্তর দিলো, "আমার বক্তব্য একই থাকতো।"

পান্না আর অপেক্ষা না করে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু কৃষ্ণাজী আপ্তে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

"আমায় যেতে দিন কৃষ্ণাজী, আমার দেরি হয়ে গেছে।"

"না, আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে যেতে হবে।"

"আমার আর কিছু শোনার ইচ্ছে নেই।"

"না, শুনতে হবে," বলে কৃষ্ণাজী আপ্তে পান্নার একটা হাত চেপে ধরলো। পান্না হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু

পারলো না। কৃষ্ণাজী শক্তিমান পুরুষ, সে খুব জোরে চেপে ধরেছে তার হাত।

"এই বর্বরতা আপনার শোভা পায় না, কৃষ্ণাজী," পান্না হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার শেষ চেষ্টা করে বললো।

"হ্যাঁ, পান্না, আমি বর্বর। পর্বত কন্দরে, অরণ্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে আমার দিন কাটে, তোমাদের এই সুসভ্য শহরের আদব-কায়দা আমি জানবো কোত্থেকে? আমি শুধু একটা কথা জানি যে, আমি পুরুষ, যে নারী আমার কাম্য, তাকে জয় করবার অধিকার আমার আছে।"

সে হয়তো আরো কিছু বলতো, এমন সময় দেখলো পান্নার দৃষ্টি চলে গেছে তাকে পেরিয়ে। পেছনে একজনের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো, "আপনি এসে পড়েছেন?"

কৃষ্ণাজী পান্নার হাত ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো এক হাত তরবারির হাতলে ন্যস্ত করে। দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে শক্তিসিংহ রাঠোর।

"আপনি!" বলে উঠলো কৃষ্ণাজী আপ্তে।

"হ্যাঁ, আমি। আপনি আমাদের আতিথ্যের অমর্যাদা করেছেন। রাজপুত নারীর প্রতি এই অসম্ভ্রম তো আমি রাজপুত হয়ে মার্জনা করতে পারি না। যাই হোক আপনি শিবাজীর অনুচর। শিবাজী আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন, তাই আপনাকে কোনো রকম ভাবে অপমান করতে চাই না। কিন্তু আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমার এই উদারতা বেশীক্ষণ নাও থাকতে পারে। সুতরাং, আমি আত্মসংযম হারানোর আগেই আপনি এস্থান ত্যাগ করুন, এই আমার অনুরোধ। বিলম্ব হলে আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে।"

কৃষ্ণাজী কোনো উত্তর না দিয়ে খাপ থেকে তলোয়ার আধখানা বার করতে না করতেই শক্তিসিংহ চোখের পলকে তার তরবারি কোষমুক্ত করলো।

"এখানে নয়, এখানে নয়," ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো পান্না।

কৃষ্ণাজী পান্নার দিকে তাকালো, তারপর শক্তিসিংহের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, "পান্নার সঙ্গে আমি একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলাম। আপনি এসে বাধা দেওয়ার কে?"

শক্তিসিংহ শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "পান্না আমার বাগদত্তা ভাবী পত্নী।"

একথা শুনে পান্নার সমস্ত শরীর হঠাৎ শিউরে উঠলো, মুহূর্তের জন্যে দুহাতে মুখ ঢাকলো সে, তারপর আবার মুখ তুললো। দেখতে পেলো কৃষ্ণাজী চলে যাচ্ছে।

"একি বললেন আপনি," বিহ্বল কণ্ঠে কৃষ্ণা বলে উঠলো।

"পান্না," শক্তিসিংহ বললো, "তোমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কি করে হঠাৎ একথা বলতে পারলাম জানি না। বোধ হয় তোমায় বিষণ্ণ দেখে উত্তেজনার মাথায় একথা বলে ফেলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, একথা আমার মনের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এসেছে। কালই আমার বলা উচিত ছিলো, কিন্তু সাহস করে বলতে পারি নি। আজ বলে ফেললাম, আমায় মার্জনা কোরো।"

"না, আপনি কোনো অপরাধ করেন নি," পান্না উত্তর দিলো অস্ফুট কণ্ঠে, "অপরাধ আমার। আমি আপনার যোগ্য নই।"

"এ প্রশ্ন নিয়ে তর্ক করবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার কাছে তুমি অসামান্যা।"

পান্নার সারা মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে সে বললো, "আপনি আজ আসবেন এ প্রত্যাশা আমার ছিলো না। কাল আপনার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছি।"

"আমি আসতাম না পান্না। কিন্তু এক বন্ধুর সঙ্গে এপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এখান দিয়ে যেতে যেতে তোমায় একটিবার দেখবার জন্যে খুব আগ্রহ হোলো। প্রাচীরের পাশে ঘোড়ার পিঠের উপর

দাঁড়িয়ে দেখি কৃষ্ণাজী তোমার হাত চেপে ধরেছে। আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।"

"আপনি না এলে ও আজ আমায় অসম্মান করতো।"

"এখানে গোলমাল বাধাতে চাইনি। অন্য কোথাও হলে তলোয়ার দিয়ে ওর নাক কান কেটে নিতাম।"

"আমাকে এবার যেতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

"আবার কবে দেখা হবে?" শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"আমি জানি না। আপনার যা ইচ্ছে," বলে পান্না জলের ঘড়া তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে।

শক্তিসিংহ রাঠোর প্রাচীর অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এলো আস্তে আস্তে। পথের ওপারে গাছের নিচে ঘোড়ার উপর বসেছিলো আবিদ হুসেন খাঁ। শক্তিসিংহ নিজের ঘোড়ার কাছে আসতেই পাশের অন্ধকারের আড়াল থেকে কৃষ্ণাজী আপ্তে বেরিয়ে এলো খোলা তলোয়ার হাতে।

"শক্তিসিংহ রাঠোর!"

শক্তিসিংহ ফিরে তাকালো।

কৃষ্ণাজী বললো, "খোজা ফিরোজার বাগের অভ্যন্তরে আমি কোনো রকম গণ্ডগোল করতে চাইনি কারণ তাতে পান্নার অসুবিধে হোতো। কিন্তু এখানে আপনি আর আমি একা।"

শক্তিসিংহ আবিদ হুসেন খাঁর দিকে তাকালো মুখ ফিরিয়ে।

কৃষ্ণাজী বললো, "আপনার ওই সহচরের সাহায্য আপনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে না। আপনি অস্ত্রধারণে সক্ষম বলেই আমার ধারণা।"

"না, আমার কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না কোনোদিন।"

"শক্তিসিংহ, পান্নার সামনে আপনি আমার প্রতি অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করেছেন। মারাঠা অসম্মানের প্রতিশোধ নেয় তলোয়ারের সাহায্যে।"

"তলোয়ার ধরতে আমিও জানি, কৃষ্ণাজী," শক্তিসিংহ উত্তর দিলো।

উন্মুক্ত তরবারি হাতে দুজন দুজনের সম্মুখীন হোলো আবছা চাঁদের আলোতে। সবে শুরু হয়েছে অসির ঝনঝনা, এমন সময় পথের ওধারে অন্ধকারের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলো আট দশজন মোগল অশ্বারোহী। ওরা এসে ঘিরে ফেললো এদের দুজনকে।

ফুলাদ খাঁর গলা শোনা গেল, "শক্তিসিংহ, তলোয়ার নামাও।"

শক্তিসিংহ আর কৃষ্ণাজী দুজন দুদিকে এক এক পা করে সরে গেল।

"শক্তিসিংহ," বললো শহরের কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ, "শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র হুকুম আপনি নিশ্চয়ই জানেন, শহরের ভিতর বাদশাহ্‌র কোনো প্রজা একজন আরেকজনের সঙ্গে লড়বে না হাতিয়ার নিয়ে। আপনি সে আদেশ অমান্য করেছেন।"

"ইনি আমায় আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন," শক্তিসিংহ উত্তর দিলো।

ফুলাদ খাঁ অন্য দিকে ফিরবার আগেই হঠাৎ দ্রুত অশ্বপদশব্দ শ্রুত হোলো। দু তিনজন মোগলের ঈষৎ অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণাজী আপ্তে চোখের পলকে এক লাফে নিজের ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। দু তিনজন সে মুহূর্তেই তার পশ্চাদ্ধাবন করতে উদ্যোগী হোলো, কিন্তু ফুলাদ খাঁ ডেকে বললো, "যেতে দাও মহম্মদ হুসেন, ওকে যেতে দাও। শক্তিসিংহকে নিয়ে চলো কোতোয়ালিতে। আবিদ হুসেন কোথায় ?"

দেখা গেল, সেও সেখান থেকে অন্তর্ধান করেছে।

কোনো মনসবদারের অধীনস্থ ব্যক্তিকে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে এলে কোতোয়ালি থেকে তার কাছে একটা খবর পাঠানোটা

রেওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হোলো মহারাজা জসবন্তসিংহের ছাউনিতে। সেখান থেকে খবর চলে গেল মহারাজার মহলে।

মহারাজার কাছে খবর নিয়ে এলো দুর্গাদাস রাঠোর। বললো, "খোজা ফিরোজার বাগের কাছে শক্তিসিংহ কৃষ্ণাজী আপ্তের সঙ্গে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলো বলে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ তাকে কোতোয়ালিতে ধরে এনেছে।"

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মহারাজা জসবন্ত সিংহের মুখখানি। জিজ্ঞেস করলো, "কৃষ্ণাজীকে ধরে নি?"

"না। ও পালিয়ে গেছে।"

"ভালোই হয়েছে," বললো মহারাজা জসবন্ত সিংহ, "কিন্তু শক্তি সিংহ হঠাৎ কৃষ্ণাজীর সঙ্গে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হোলো কেন?"

দুর্গাদাস হেসে উত্তর দিলো, "গিরধরলাল মুনশীর কন্যাকে উপলক্ষ করে ওদের দুজনের মধ্যে একটা বিবাদ বেধেছিলো।"

হেসে উঠলো জসবন্ত সিংহ। বললো, "বাহাদুরের মতো কাজ করেছে শক্তিসিংহ। সবাই জানবে যে, ওই রাজপুতানীর জন্যে খোজা ফিরোজার বাগের ওদিকে যাতায়াত করে আমাদের শক্তি সিংহ। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে, কৃষ্ণাজী আপ্তে তার মারফতে আমার সংবাদ পেয়েছে। ফুলাদ খাঁ আর নজর দেবে না শক্তিসিংহের দিকে। বাদশাহ্‌র মনেও কোনো সন্দেহ থাকবে না।"

"শক্তিসিংহকে কোতোয়ালি থেকে খালাস করে আনবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে," দুর্গাদাস জানালো।

"হ্যাঁ। আমাদের লোককে এভাবে কোতোয়ালিতে ধরে রাখবার অধিকার তো কোতোয়ালের নেই। এক কাজ করো। কাউকে পাঠিয়ে দাও ফুলাদ খাঁর কাছে। না, তুমি নিজেই যাও। ফুলাদ খাঁকে শুনিয়ে শক্তিসিংহকে বোলো যে, কছওয়াদের ছাউনিতে শক্তিসিংহ যাতায়াত করে শুনে আমি খুব অসন্তুষ্ট

হয়েছি। এতে আমার আদেশ অমান্য করা হয়েছে। ফুলাদ খাঁকে জানিয়ো যে এই অপরাধে আমি শক্তিসিংহকে আমার মহলের তহ্‌খানায় তিনদিন কয়েদ করে রাখবার হুকুম দিয়েছি।"

দুর্গাদাস রাঠোর অভিবাদন করে চলে যাচ্ছিলো। মহারাজা জসবন্ত সিংহ ডেকে বললো, "শোনো, তহ্‌খানায় শক্তিসিংহের সব রকম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করে দিয়ো। সে যেন কোনো রকম কষ্ট না পায়।"

দুর্গাদাস রাঠোর একটু হেসে চলে গেল।

ছয় সাত দিন পরের কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। মমতাজ-আবাদের সরু গলিটির আশেপাশে বিভিন্ন তওআয়ফদের মাইফিলখানা থেকে ভেসে আছে গান ও ঘুঙুর।

"কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে?" শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"এসো না," বললো আবিদ হুসেন খাঁ, "তোমার মাশুককে আমি দেখলাম, আমার মাশুককে তুমি একবার দেখবে না?"

"কিন্তু তোমার মাশুক আমার সামনে বেরোবে?"

"আমার মাশুকের পর্দা মুখের উপর নয়," আবিদ হুসেন খাঁ উত্তর দিলো, "ওর পর্দা মনের উপর। ওর নাম মোতিজান। নামের সঙ্গে মানুষের এরকম মিল খুব কমই দেখা যায়। একেবারে সাচ্চা মোতি। তোমার পান্না, আমার মোতি, হাঃ হাঃ হা—," নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলো আবিদ হুসেন।

সিঁড়ির মুখে ফরাশ দাঁড়িয়ে আছে আতরদান হাতে। আবিদ হুসেন ও শক্তিসিংহকে দেখে সে অবনত হয়ে সালাম করলো, তারপর আতর ছিটিয়ে দিলো তাদের উপর। ওরা মাইফিলখানার ভিতরে এসে দেখলো, আর কেউ নেই, শুধু মোতি বিবি একা বসে আছে। একটু দূরে ঘরের কোণে বসে সারঙ্গির সুর মেলাচ্ছে এক

বুড়ো মিঞা সাহেব। তবলিয়া তার পাশে বসে চুপচাপ পান চিবোচ্ছে।

ওদের ঢুকতে দেখে মোতিজান চোখ তুলে তাকালো।

আবিদ হুসেনের সঙ্গে নতুন লোক দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত মুখ নিচু করে সালাম করলো নিখুঁত কায়দায়।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে পড়লো আবিদ হুসেন, বললো, "কাকে নিয়ে এলাম জানো?"

মোতিজান একটু হেসে বললো, "বুঝতে পেরেছি।"

"দোস্ত্," শক্তিসিংহের দিকে ফিরে আবিদ হুসেন বললো, "মোতি বিবিকে আমি বলেছি তোমার কথা।"

মোতিজান হাসলো। বললো, "সেদিন আপনাকে যখন গিরফ্‌তার করে কোতোয়ালিতে নিয়ে গেল, খাঁ সাহেব হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এলো আমার কাছে। বললো, রদ্-অন্দাজ খাঁ ও ফুলাদ খাঁকে যেন বলি আপনার হয়ে। ওর কী ভাবনা আপনার জন্যে!"

"রদ্-অন্দাজ খাঁ ও ফুলাদ খাঁ বুঝি আপনার কথা খুব মানেন?" শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

মোতিজান কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই আবিদ হুসেন খাঁ চোখ বড়ো বড়ো করে ঝুঁকে পড়লো শক্তিসিংহের দিকে। বললো, "দোস্ত, তুমি এখনো জানো না? এ কি জিজ্ঞেস করলে তুমি? তামাম হিন্দুস্তানের হুকুমত চালাচ্চে এদেরই মতো এক একজন। প্রত্যেক কোতোয়াল, প্রত্যেক ফৌজদার, সুবাদার, প্রত্যেক উমরাহ, মায় উজীর-উল-মুল্‌ক, এমন কি," চারদিক সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখে নিলো আবিদ হুসেন, তারপর গলা নামিয়ে বললো, "এমন কি খুদ বাদশাহ,—প্রত্যেকের পেছনে ছায়ার মতো আছে এক হাসিনা মাশুক, তারাই হুকুমত চালায়, তাদের কথাই চলে।"

শক্তিসিংহ হাসলো।

"বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা! আরে ভাই রাজপুত, আগ্রায় বাদশাহ্‌র চেয়ে বড় বাদশাহ হোলো উদিপুরী মহল, উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁর উইজারত আসলে চালায় উর্দুবাজারের লছমীবাঈ, আমাদের কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর—"

বাধা দিয়ে মোতিজান বলে উঠলো, "আমি বুঝি রদ্‌-অন্দাজ খাঁ কি ফুলাদ খাঁর মাশুক ?"

"আরে না, আমি কি বলেছি সেকথা ? ওরা তোমার খাদিম। তুমি আমার মাশুক।" আবিদ হুসেন ফিরে তাকালো শক্তিসিংহের দিকে, "বুঝলে দোস্ত, এখানে যখন আসি তখন নিজেকে তামাম দুনিয়ার বাদশাহ মনে হয়," বলতে বলতে রুপোর তশতরি থেকে সোনালী তবক মোড়া গিলৌরী তুলে মুখে পুরলো।

এমন সময় মোতিবিবির ফরাশ এসে জানালো রদ্‌-অন্দাজ খাঁ ও ফুলাদ খাঁ আসছে। মূহূর্তে বাদশাহী ভঙ্গি ভুলে গিয়ে আবিদ হুসেন খাঁ উঠে দাঁড়ালো, শক্তিসিংহকে বললো, "চলো ভাই, অনেক রাত হয়ে এলো, তোমার মহলের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যাবে প্রথম প্রহরের সঙ্গে সঙ্গে।"

শক্তিসিংহ একটু মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু মোতিজানের মুখ হঠাৎ ম্লান হয়ে উঠলো দেখে মুছে গেল তার মুচকি হাসি। মোতিজানের এক পলক নজর তাকে অনুভব করিয়ে দিলো কি রকম একটা গভীর অনুরাগ আছে এদের দুজনের মধ্যে।

মোতিজানের কণ্ঠস্বরে কিন্তু সেভাব প্রকাশ পেলো না। সহজ কণ্ঠে আবিদ হুসেনকে বললো, "এরকম সময়ে অনেকে আসেন, মাইফিলের সময় এটা, বাতচিত করবার অবসর হয় না। একদিন অপরাহ্ণে নিয়ে আসবে তোমার বন্ধুকে। তখন ওঁর যথাযোগ্য খাতিরদারি করতে পারবো।"

ওরা বেরিয়ে পড়বার আগেই রদ-অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ ভিতরে ঢুকলো। আবিদ হুসেন আর মোতিজান ওদের অভিভাদন

করলো। শক্তিসিংহের দিকে তাকিয়ে দেখলো রদ-অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ। দুজনের মধ্যে একটা নির্বাক দৃষ্টি বিনিময় হোলো।

রদ-অন্দাজ খাঁ আবিদ হুসেনকে জিজ্ঞেস করলো, "এমন সময় তুমি এখানে?"

আবিদ হুসেন বিগলত কণ্ঠে বলে উঠলো, "খোজা ফিরোজার বাগের আশে পাশে বড্ড মশা। তাই ভাবলাম, ওখানে ঘোরাফেরা করার চাইতে যদি কাজের উপলক্ষটাকে এদিকে চালান করে দেওয়া যায়, তাহলে কাজও হয়, সময়টাও কাটে।"

ফুলাদ খাঁ আড়চোখে একবার শক্তিসিংহের দিকে তাকালো, তারপর অগ্নিদৃষ্টি হানলো আবিদ হুসেনের দিকে।

কিন্তু রদ-অন্দাজ খাঁ হেসে উঠলো। "তোমার এত বুদ্ধি! মনে হচ্ছে একদিন তুমিই উজির হবে।"

আবিদ হুসেনের কথা শুনে শক্তিসিংহেরও হাসি পেয়েছিলো, কিন্তু সে গম্ভীর হয়ে রইলো। তার দিকে ফিরে ফুলাদ খাঁ বললো, "মোতিজান খুব ভালো গায়িকা। রসিক ব্যক্তি মাত্রেই এর অনুরাগী। তবে খোজা ফিরোজার বাগ থেকে মমতাজ-আবাদে আপনার আগ্রহ স্থানান্তরিত হোলো দেখে আমি বিস্মিত হইনি বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। মহারাজা সাহাব নিশ্চয়ই কোনো নির্মম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। আমি কি আপনার হয়ে মহারাজাকে কোনো অনুরোধ করতে পারি?"

শক্তিসিংহের একটা খুব রুক্ষ উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে হোলো। কিন্তু সে সুসভ্য শহরের সভ্য নাগরিক। আত্মসংবরণ করে মুখে হাসি এনে বললো, "আপনার খুব মেহেরবানি, কিন্তু বহুত শোকরিয়া, কিছু বলতে হবে না।"

ওরা পথে নেমে এলো। আবিদ হুসেন খাঁ খুব হাল্কা গলায় বললো, "সবারই দিন সমান থাকে না। এই ফুলাদ খাঁকে আমি

একদিন দেখে নেবো। একদিন আমি এই শহরের কোতোয়াল হবোই।”

আবিদ হুসেন খাঁ ও শক্তিসিংহ রাঠোর দৃষ্টির বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত রদ-অন্দাজ খাঁ ও ফুলাদ খাঁ তাকিয়ে রইলো, তারপর আসন গ্রহণ করলো চুপচাপ। দুজনের মুখমণ্ডলই গম্ভীর।

একজন খাদিম শরাবের ঝারি ও পিয়ালা এনে রাখলো তাদের সামনে। মোতিজান পিয়ালায় শরাব ঢেলে দিলো। তারপর তুলে দিলো দুজনের হাতে।

ফুলাদ খাঁ জিজ্ঞেস করলো, “আবিদ হুসেন এখানে আসে কেন? আমি পছন্দ করি না।”

মোতিজান নম্র কণ্ঠে উত্তর দিলো, “ওর আপনার জন বলতে তো কেউ নেই। তাই মাঝে মাঝে আসে। বেশীক্ষণ তো থাকে না, অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে যায়।”

রদ-অন্দাজ খাঁ হেসে বললো, “হ্যাঁ, ও গরীব মানুষ, তোমাদের সন্তুষ্ট করবার মতো অর্থ তো ওর কাছে নেই, বেশীক্ষণ থাকতে পারবে কেন। ফুলাদ মিঞা, তোমার মন বড় ছোটো। আবিদ হুসেন সামান্য লোক, অনর্থক তার জন্যেও তোমার ঈর্ষা? কবে দেখবো এখানকার খাদিম আর ফরাশদেরও তুমি ঈর্ষা করতে শুরু করেছো। কি বলো মোতিজান? তবে কথাটা কি জানো, ফুলাদ মিঞা তোমায় খুব প্যার করে কিনা, তাই তার মনে এত ঈর্ষার জ্বালা।”

মোতিজান একটু অধরদংশন করলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

ফুলাদ খাঁ রাগে গরগর করতে করতে বললো, “আজ ওই রাজপুতটাকে নিয়ে এসেছে, কাল দেখবো রাস্তা থেকে কুত্তা বিল্লী ধরে নিয়ে আসছে।”

মোতিজানের সমস্ত শরীর জ্বলে উঠলো একথা শুনে, কিন্তু মুখের উপর শান্তভাব বজায় রেখে সালাম করে বললো, "যদি আপনাদের ফরমাশ হয় তাহলে এবার—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই," বলে উঠলো রদ-অন্দাজ খাঁ, "সারাদিন এত মেহনত হয়েছে, এখন একটু নাচ গান না হলে আর দিল চাঙ্গা হচ্ছে না। জানো মোতিজান, আজ সারা অপরাহ্ণ শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে খিল্‌ওয়াত-গাহ্‌তে ছিলাম। নানারকম জরুরী বিষয়ে মাথা লাগাতে হয়েছে। শাহ-ইন-শাহ স্থির করেছেন শহরের নৈতিক আবহাওয়ার সংস্কার করতে উঠে পড়ে লাগতে হবে এখন থেকে। আমাদের দোস্ত কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর উপর হুকুম হয়েছে এই শহরে কতো তওআয়ফ আছে, কোথায় শরাব বিক্রী হয় তার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্যে। এই বছরের মধ্যে সব বন্ধ করে দিতে হবে," বলে শরাবের পিয়ালায় চুমুক দিলো।

ফুলাদ খাঁ মোতিজানের দিকে তার শূন্য পিয়ালা এগিয়ে দিয়ে একটা বিস্তৃত হাসি হাসলো। বললো, "কাজ শুরু করতে হয় শাহ-ইন-শাহ্‌র খাস-মহল থেকে। কিন্তু সেকথা বললে আমার গর্দন যাবে।" মোতিজান হেসে তার পিয়ালায় শরাব ঢেলে দিল।

মোতিজান উঠে গিয়ে বসলো ঘরের মাঝখানে। সারেঙ্গিতে সুর তুললো শুভ্রকেশ মিঞা সাহাব। তবলায় চাঁটি পড়লো। বাঁ হাতে কান ঢেকে ডান হাত প্রসারিত করে গান ধরলো তওআয়ফ মোতিজান।

অন্তরায় গিয়ে গলা যখন সুরের উঁচু পর্দায় উঠলো, রাগের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠলো বুড়ো মিঞার সারেঙ্গিও, রদ-অন্দাজ খাঁ ফুলাদ খাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লো। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, "খবর পেয়েছো?"

"হ্যাঁ।"

"কৃষ্ণাজী কবে রওনা হচ্ছে ?"

"কাল।"

"কখন ?"

"সন্ধ্যার পর।"

"আমাদের জন্যে সব চাইতে সুবিধাজনক সময়। লোকজন ঠিক করেছো ?"

"সব ব্যবস্থাই করা আছে।"

"আমারও কি সঙ্গে থাকা প্রয়োজন ?"

রদ-অন্দাজ খাঁর এ প্রশ্ন শুনে ফুলাদ খাঁ একটু ভাবলো, তারপর উত্তর দিলো, "না, আমরা যে কজন আছি, তাই যথেষ্ট। জানাজানি হয়ে গেলেও, আমি একটা কৈফিয়ত দিতে পারবো। আমি শহরের কোতোয়াল, রাত্রে টহল দিতে গিয়ে এক অপরিচিত লোককে সন্দেহজনকভাবে শহরের বাইরে যেতে দেখে রুখবার চেষ্টা করেছি, এটা কারো কাছে অস্বাভাবিক ঠেকবে না। কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। ওরা ভাবতে পারে আমরা আগের থেকে একটা মতলব এঁটে একাজ করেছি। শিবাজীর মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হতে দেওয়া ঠিক হবে না। শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে কথাটা উঠলে খুব অসন্তুষ্ট হবেন।"

"আমি তোমার জন্যে কোতোয়ালিতে অপেক্ষা করতে পারি।"

"হ্যাঁ, এ মতলব মন্দ নয়।"

"কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তুমি যে শহরের কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ, একথা যেন কৃষ্ণাজী কিছুতেই বুঝতে না পারে।"

"না, বুঝতে পারবে না। ডাকচৌকি পেরিয়ে গেলে জোধা-বাইয়ের আরামগাহ্‌। ওদিকটা খুব নির্জন। সন্ধ্যার পর কেউ যায় না ওপথ দিয়ে। খবর নিয়েছি, কৃষ্ণাজী আপ্তে যাবে ওপথ

ধরে। আজকাল ডাকাত লুঠেরারা বড়ো হামলা করে, কে জানে হয়তো তাদের কেউ অন্ধকারে তাকে ধরতে পারে।”

ফুলাদ খাঁর কথা শুনে রদ-অন্দাজ খাঁ চোখ টিপে হাসলো।

ডাকচৌকি পেরিয়ে সোজা চলে গেছে নির্জন পথ। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে পথ জুড়ে। দু'পাশের বড়ো বড়ো গাছগুলো কালো কালো ছায়া ফেলেছে পথের এপার থেকে ওপারে। সারাদিনের দুঃসহ গরমের পর সন্ধ্যার হাওয়ায় স্নিগ্ধ শীতল হয়ে উঠেছে চারদিক। ঘোড়ার পিঠে চেপে গাছের ছায়ায় ছায়ায় আকিল খাঁ এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এসে গেল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পত্নী জোধাবাইয়ের আরামগাহ্‌র কাছে। আরামগাহ্‌তে এখন কেউ থাকেনা। মাঝে মাঝে শাহীমহল থেকে বেগমেরা আসে অবসর-বিনোদন করতে। সেদিনও এসেছিলো। উচ্চ প্রাচীরের ওপার থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছিলো নারীকণ্ঠের অস্ফুট কাকলি। আকিল খাঁ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে থামলো। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না। ভাবলো, জেব-উন-নিসা বেগম তার পত্রে তো জানিয়েছে আরামগাহ্‌র কাছে আসতে। কিন্তু কিভাবে তার সন্ধান নেবে, তা তো জানায় নি। আরামগাহ্‌র উচ্চ প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে দেখলো মুখ তুলে। ভাবলো, প্রাচীরের উপর উঠবার চেষ্টা করা কি নিরাপদ হবে? কি করা যায় সে ভেবে পেলো না।

এমন সময় শুকনো পাতার উপর মৃদু আওয়াজ শুনে সে ফিরে তাকালো। দেখতে পেলো, এক ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

“কে তুমি?” আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

“আমি মক্‌ফির খাদিম। আপনি?”

“আমার নাম রাজি।”

“আসুন আমার সঙ্গে।”

রাজি আকিল খাঁর ছদ্মনাম। এ নামে ফারসী বয়েৎ লিখে সে সুপরিচিত হয়েছে। ঘোড়া হাঁকিয়ে সেই খোজার পেছন পেছন চললো আস্তে আস্তে। খানিকটা এগিয়ে পথ ছেড়ে ওরা মাঠের মধ্যে নামলো। সেখানে অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ। একটি গাছের ছায়ায় আবছা দেখা গেল একজনকে। আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে দিয়ে সরে গেল সেই খোজা খাদিম।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে আকিল খাঁ এগিয়ে গেল তার দিকে। কাছে এসে চিনতে পারলো। অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও মহার্ঘ আতরের ওই সৌরভ তার অনেকদিনের চেনা। দৌলতাবাদের পুরোনো দিনগুলোর একটা রেশ তার মনে হঠাৎ একটা দোলা দিয়ে গেল।

"মক্ফি?"

"রাজি!"

কবিতা রচনা করতো জেব-উন-নিসাও। মক্ফি তারই ছদ্মনাম। পুরুষের পোশাক পড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। বললো, "খোজা মনসুরের সঙ্গে এভাবেই বেরিয়ে এলাম আরামগাহ্ থেকে। দরওয়াজায় চৌকি সন্দেহ করলো না। ভাবলো, মহলের কোনো খোজাই হবে।"

দুজনেই হাসলো। আট নয় বছর আগে নানারকমের ছল চাতুরী করে দেখা করতে হয়েছে, কতো গোপনে, কতো সাবধানে, কিন্তু খোজা খাদিমের ছদ্মবেশে শাহী সড়কের কাছে এভাবে সাক্ষাৎ হওয়াটা একেবারে অভিনব। আকিল খাঁ বললো, "শাহ-ইন-শাহ স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না তাঁর প্রিয়তম জ্যেষ্ঠা কন্যা এভাবে এই পোশাকে এখানে এসে মিলিত হয়েছে তাঁর দিওয়ান-ই-খাসের দারোগার সঙ্গে।"

"কতো বছর তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, রাজি।"

"হ্যাঁ, অনেক বছর।"

ছয় বছর অনেক দিন। তের বছর আগে, ষোলোশ' তিপ্পান্ন খৃস্টাব্দে তুজনের প্রথম দেখা হয়েছিলো আওরঙ্গাবাদে। জেব-উন-নিসার বয়েস তখন পনেরো, আকিল খাঁর সাতাশ। তখন আকিল খাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরংজেবের জিলওদার। পাঁচ বছর পরে, ষোলোশ' আটান্নর প্রারম্ভে, আওরংজেব ফৌজ নিয়ে হিন্দুস্তান রওনা হোলো তাজ ও তখ্ত্এর দখল নেওয়ার জন্যে। শাহজাদার পরিজনবর্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো দৌলতাবাদের কেল্লায়। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হোলো আকিল খাঁর উপর। তু বছর দৌলতাবাদের ফৌজদার ও কিলাদাররূপে সেই দায়িত্ব পালন করলো আকিল খাঁ। ষোলোশ' ষাট খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, আওরংজেবের অভিষেকের নয় মাস পরে, আকিল খাঁ ফিরে এলো দিল্লীতে। তারপর থেকেই আর দেখা হয়নি জেব-উন-নিসার সঙ্গে।

দিল্লী ফিরে প্রথম একবছর আকিল খাঁ ছিলো মিঞা-দোয়াবের ফৌজদার। তার পরই পড়লো বাদশাহ আওরংজেবের কুনজরে। মহল থেকে কোনো গুজব বোধ হয় কানে এসেছিলো। আকিল খাঁ কাজে ইস্তাফা দিয়ে চলে গেল লাহোর। সে বাদশাহ্র পুরাতন সহকর্মী, সুতরাং তার জন্যে বরাদ্দ হোলো সাতশো টাকা মাসোহারা। ষোলোশ' তেষট্টির শেষ দিকে বাদশাহ্ কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে লাহোরে ছিলো কিছুদিন।

হ্যাঁ, তখন একদিন জেব-উন-নিসাকে দেখেছিলো আকিল খাঁ। জেব-উন-নিসা ছিলো মহলের ছাদে, আকিল খাঁ দেখতে পেয়েছিলো দূর থেকে। কিন্তু সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো অবকাশ হয়নি। বাদশাহ্র রাগ তদ্দিনে পড়ে গেছে, আকিল খাঁকে দিওয়ান-ই-খাসের দারোগার পদমর্যাদা দিয়ে নিলো এলো দিল্লীতে। এবছর কয়েক মাস আগে বাদশাহ শাহজাহানের মৃত্যু হওয়ার পর মোগল দরবারের সঙ্গে চলে এলো আগ্রায়।

এদ্দিন আর দেখা হয়নি। দীর্ঘ ছয় বছর পর এই প্রথম।

কিন্তু এখন আর আগের দিনের সেই উচ্ছ্বাস নেই। বয়েস হয়ে গেছে দুজনেরই। জেব-উন-নিসার আটাশ, আকিল খাঁর চল্লিশ। আকিল খাঁ বিয়ে করে সংসার করছে, ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। আগের দিনের কবিত্বময় ভাবপ্রবণ ভাষার বন্যা আর এলো না। জেব-উন-নিসা শুধু জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ভালো আছো?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো আকিল খাঁ, "তুমি?"

"হ্যাঁ, বেশ আছি।"

"মক্‌ফি!"

"কি, রাজি!"

"আমাদের এরকম মাঝে মাঝে দেখা হলে বেশ হয়,—না?"

মাঝে মাঝে! আকিল খাঁর অজ্ঞাতে জেব-উন-নিসা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলো। সে কি জানে না, তারই জন্যে শাহজাদী আজো বিবাহ করে নি, হয়তো করবেও না কোনোদিন!

"রাজি, দেখা হওয়ার অসুবিধে অনেক। সুযোগ পাওয়া যায় না।"

"হ্যাঁ মক্‌ফি, তুমি তো এখন শাহজাদী, আমি এক সাধারণ মনসবদার।"

আগের দিন হলে জেব-উন-নিসার চোখে জল আসতো, হয়তো রাগ করতো, কলহ করতো। আজ কিন্তু জেব-উন-নিসা চুপ করে রইলো। হয়তো বা ঈষৎ বেদনায় টনটন করে উঠলো তার মন, কিন্তু তাও গ্রাহ্য করলো না।

"মক্‌ফি, পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ রাজি, মাঝে মাঝে একটু একটু মনে পড়ে। কী ছেলে-মানুষ ছিলাম তখন!"

একথা শুনে আকিল খাঁ অধরদংশন করলো। অন্ধকারে জেব-উন-নিসা দেখতে পেলো না।

এমনি করে অল্পস্বল্প কথা হচ্ছিলো তাদের মধ্যে। পরস্পরের জন্যে ভাবানুভূতির গভীরতা সম্বন্ধে দুজনেই সচেতন, কিন্তু ভাষায় সেই আবেগ আর নেই। ছয় বছরে যেন একটা দুর্বোধ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে, যে ব্যবধান আর এজীবনে অতিক্রম করা যাবে না। তবু দুজন দুজনের সঙ্গ মাধুর্যে তন্ময় হয়ে রইলো, খেয়াল করলো না যে তিনজন অশ্বারোহী খুব আস্তে আস্তে এসে আত্মগোপন করলো কিছু দূরে আরেকটা গাছের নিচে। চারদিকে নিথর অন্ধকার, এদেরও ওরা দেখতে পেলো না। একজন শুধু চাপা গলায় বললো, "হাতিয়ার বার করে তৈরী থাকো, সে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।

ওদের কথা এদের কানে এলো না। আকিল খাঁ তখন জিজ্ঞেস করছিলো, "আবার কবে দেখা হবে, মক্‌ফি ?"

জেব-উন-নিসা উত্তর দিলো, "সুযোগ হলেই পত্র লিখে জানাবো।"

সেখান থেকে প্রায় একশো হাত দূরে এসে পড়লো আর দুজন অশ্বারোহী। এরা কেউ ওদের দেখতে পায়নি। ওদেরও জানবার উপায় ছিলো না এদের উপস্থিতি। দুজনে গল্প করতে করতে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছিলো খুব মন্থরগতিতে।

"শক্তিসিংহ, প্রথম প্রহর এখনো হয়নি।"

"না, এখনো অনেক দেরি, আবিদ হুসেন। হলে দূর থেকে ঘড়িয়ালির আওয়াজ শুনতে পেতাম। শহরের দরওয়াজাও বন্ধ হয়ে যেতো।"

"এবার তাড়াতাড়ি চলো। এসব অঞ্চলে এখনো ডাকাতেরা নিঃসঙ্গ মুসাফিরদের উপর হামলা করে মাঝে মাঝে।"

"রাঠোর রাজপুত ওসবের ভয় করে না আবিদ হুসেন। আমি একা তিনজন ডাকাতের মহড়া নিতে পারি।"

"আরে না, না, আমি সেজন্যে তাড়াতাড়ি যেতে বলছিনা," বললো আবিদ হুসেন, "আমি ভাবছি হাবেলিতে ফেরার আগে এক-বার মোতিজানের ওখানে হয়ে যাবো। এক পিয়ালা শরাব পান করার ইচ্ছে আছে। ওই দুটো মিঞা এতক্ষণে নিশ্চয়ই চলে গেছে। আমি দুচোখে দেখতে পারি না ওই ফুলাদ আর রদ্-অন্দাজকে। ওরা বাদশাহ্র পেয়ারের লোক, নইলে কবে ওদের মেরে ভাগাতাম মোতিজানের মাইফিলখানা থেকে।"

শক্তিসিংহ হেসে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় খুব দ্রুত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো। পূব আকাশে তখন চাঁদ দেখা দিয়েছে। ঘনবৃক্ষরাজির ডালপালা ভেদ করে ফিকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে পথের উপর। আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলো পথের অন্যদিক থেকে খুব দ্রুত বেগে ছুটে আসছে একজন অশ্বারোহী।

"ওই দেখ, ডাকাত আসছে তোমায় ধরতে," শক্তিসিংহ হেসে বললো।

আবিদ হুসেন বিজ্ঞের হাসি হেসে বললো, "আরে ইয়ার, আমাকে অতো বোকা মনে কোরো না। ডাকাত একা আসে না। কেউ বোধ হয় দরওয়াজার দিকে ছুটে যাচ্ছে প্রথম প্রহরের ঘড়িয়ালির সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে।"

"এরকম সময় একজন লোক শহরের বাইরে যাচ্ছে কেন?" শক্তিসিংহ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"বোধহয় ওর মাশুকের সঙ্গে মিলবার সময় হয়েছে।"

এরা এগিয়ে যাচ্ছিলো খুব আস্তে আস্তে, হঠাৎ দেখলো পথের পাশের অন্ধকার থেকে আর তিনজন অশ্বারোহী আচমকা বেরিয়ে এসে লোকটির উপর চড়াও হোলো। চাঁদের ফিকে আলোয় ঝলসে উঠলো চারটে তলোয়ার। ঠনঠন শব্দ শোনা গেল এখান থেকে।

"আরে, সত্যি সত্যি ডাকাত। এসো তাড়াতাড়ি," বলে শক্তিসিংহ তলোয়ার খুলে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো সামনের দিকে। আবিদ হুসেনও নিজের তলোয়ার বার করে হাঁকডাক করতে করতে ছুটে এলো পেছন পেছন। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু শক্তিসিংহের সামনে প্রকাশ করতে চাইলো না এই ভীতি।

আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখা গেল অসি চালনায় খুব সুদক্ষ। একজনকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সে নিয়ে গেল পথের অন্য পাশে। শক্তিসিংহ এসে চড়াও হোলো অন্যজনের উপর। তৃতীয়জন ঘোড়া পেছনে হটিয়ে পথের এপাশে সরে আসতে আবিদ হুসেন পৌঁছে গেল তার কাছে। এতক্ষণে তার রক্তও গরম হয়ে গেছে। উৎসাহের মাথায় সে ঘোড়াশুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে লোকটার উপর। সে বোধহয় প্রস্তুত ছিলো না এর জন্যে। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। আবিদ হুসেনও ঘোড়ার উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেল তার দিকে। কিন্তু দেখা গেল সে লোকটি চোখের পলকে মাটি থেকে উঠে পড়ে আবিদ হুসেন খাঁর আঘাত প্রতিহত করে তাকে পাল্টা আক্রমণ করেছে। সেও অসিচালনায় সুদক্ষ। আবিদ হুসেনের মতো আনাড়ি নয়। আবিদ হুসেন প্রমাদ গুণলো।

আকিল খাঁ আর জেব-উন-নিসা ছিলো এদের খুবই কাছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাদের চোখে পড়েছে। দুজনেই গাছের গা ঘেষে অন্ধকারের মধ্যে একেবারে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

জেব-উন-নিসা শঙ্কিত হয়ে চুপিচুপি বললো, "রাজি, শোরগোল শুনে যদি আরামগাহ্ থেকে পিয়াদারা বেরিয়ে আসে, এদের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাদের উপস্থিতিও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।"

"কোনো ভয় নেই।" আকিল খাঁ আশ্বাস দিয়ে বললো, "এই দ্বন্দ্ব এখনই খতম হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। ওই দেখ, ও দুজন ডাকাত

ক্রমশ পেছনে হটছে। বাঃ বাঃ, আক্রান্ত ব্যক্তি এবং ওর সহায়ক বাহাত্বর বটে। তলোয়ার ধরতে জানে।”

“কিন্তু এদিকে দেখ, এ লোকটি বিপদে পড়েছে, এ তলোয়ার চালাতে জানেনা। ডাকাতটা একে খতম করে দেবে। আরে, লোকটা হটতে হটতে যে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে!”

“দাঁড়াও, আমি একটা উপায় করছি।” আকিল খাঁ খুব আস্তে নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করলো যেন কোনো শব্দ না হয়। তার পর আবিদ হুসেন পিছু হটতে হটতে গাছতলার অন্ধকারে এসে পড়তেই আকিল খাঁ তাকে হঠাৎ আরো অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে নিজে তলোয়ার উদ্যত করে আক্রমণ করলো সামনের লোকটিকে। ফিকে চাঁদের আলো পড়েছে এধারে। দুজনে দুজনের আকৃতি দেখতে পেলেও কেউ কারো মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। সে বুঝতে পারলো না যে এ লোকটি তার আগের প্রতিপক্ষ নয়, গাছের ছায়ার অন্ধকারে লোক বদল হয়ে গেছে। সে হঠাৎ প্রতিপক্ষের অসিচালনার কৌশল দেখে বিস্মিতই হোলো। এতক্ষণ তার অসিচালনা ছিলো আক্রমণাত্মক, এখন সে আত্মরক্ষায় তৎপর হয়ে উঠলো।

আবিদ হুসেন ভেবেছিলো তার অন্তিমকাল বোধহয় সমাগত, হঠাৎ কি হলো তার বোধগম্য হচ্ছিলো না। তার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। ভয়ে সে জড়িয়ে ধরলো পাশের লোকটিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ছেড়ে দিলো, এত উত্তেজনার মধ্যেও সে অনুভব করতে পারলো যে, অন্ধকারের লোকটি পুরুষ নয়, সে নারী। আতরের একটা মদীর গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে। আতরের গন্ধে সে ঈষৎ সুস্থ বোধ করলো। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, যে লোকটি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আক্রমণ করেছিলা অন্য লোকটাকে, সে তার প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে তারই মাথার পাগ দিয়ে তার মুখ হাত বাঁধছে, দূরে পড়ে আছে তার তালোয়ার। আবিদ হুসেন

সামনে এগিয়ে গেল। আকিল খাঁ গলা যথাসম্ভব ভারী ও বিকৃত করে চাপা গলায় বললো, "একে কোতোয়ালিতে নিয়ে যাও।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি তো কোতোয়ালিরই লোক," বললো আবিদ হুসেন খাঁ, "কিন্তু এ বেহুঁস হোলো কি করে? জখম তো হয়নি!" সে সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলো। সে জানতো না যে লোকটির হাত থেকে যখন তলোয়ার খসে পড়লো, তখন সে পালাতে গিয়ে গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে মাথায় খুব জোর চোট পেয়েছিলো।

কয়েক মুহূর্ত পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো। সে তাকালো চোখের পাতা মেলে। কিছু বোধহয় বলতে গেল, কিন্তু তার মুখ বন্ধ তারই পাগড়ি, শুধু একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোলো। আবিদ হুসেন তার জন্মের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কয়েকটি তীক্ষ্ণ গালাগাল শোনালো, যাতে ছিলো তার পিতৃকুল মাতৃকুলের উল্লেখ। ইতিমধ্যে কানে এলো খুব দ্রুত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। মুখ তুলে দেখলো, দুজন অশ্বারোহী ছুটে যাচ্ছে শহরের দিকে, আরেকজন ছুটে যাচ্ছে শহরের বাইরের দিকে। শক্তিসিংহ এগিয়ে আসছে তার দিকে।

"জখম হওনি তো! আরে, ওকে একেবারে বেঁধে ফেলেছো? বাঃ, বেশ বাহাদুর তুমি। তুমি যে এতো চমৎকার তলোয়ার চালাও আমি ভাবতে পারিনি। আমি ওই লোকটার সঙ্গে লড়তে লড়তে দুএকবার মুখ ফিরিয়ে তোমার কেরামতি দেখলাম।"

"আমি নয়, আমি নয়," বলে উঠলো আবিদ হুসেন, "আরেকজন। এই অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে।"

"কোথায়?"

"তাইতো, কোথায় গেল? এই মাত্র ছিলো এখানে। আরে!

আরো একজন ছিলো। পুরুষ নয়। স্ত্রীলোক। চমৎকার আতরের খুশবু। আমি ভুল করে জড়িয়ে ধরেছিলাম তাকে।"

শক্তিসিংহ হেসে উঠলো। বললো, "বাঃ, এই অবস্থায়ও তোমার যতোসব বানানো কথা? এরই মধ্যে একটা জিন, একটা হুরী তৈরী করে ফেললে? তুমি হুরীর সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলে, আর জিন এসে এলোকটাকে তারই পাগ দিয়ে হাত মুখ বেঁধে ফেললো। নাঃ, তোমার কল্পনাশক্তি আছে বটে।"

আবিদ হুসেন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

"কি দেখছো?" শক্তিসিংহ বললো, "লোকটাকে নিয়ে চলো কোতোয়ালিতে। ওর ঘোড়াটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে নিয়ে এসো, তারপর দুজনে মিলে ধরাধরি করে একে তোলা যাক ঘোড়ার উপরে। আজ ফুলাদ খাঁ খুশী হবে তোমার উপর। একা একটি ডাকাতকে ধরেছো, তোমার খাতির হবে।"

"আমি ধরেছি!" আবিদ হুসেন কাঁপা গলায় বললো।

"আশ্চর্য লোক তুমি। এরকম বিনয় আমি আর দেখিনি। স্বচক্ষে দেখলাম লোকটার সঙ্গে লড়লে, ওকে বাঁধলে, আর এখন তুমি আমায় জিন আর হুরীর গল্প শোনাচ্ছো!"

নিরুপায় হয়ে শক্তিসিংহের কথাই মেনে নিলো আবিদ হুসেন। জিজ্ঞেস করলো, "অন্য দুজন পালিয়ে গেল? ওদের ধরতে পারলে না?"

"কি করে ধরবো বলো? সবাই তো তোমার মতো ওতো বাহাদুর নয়। তুমি তো আরম্ভেই নিজের ঘোড়া দিয়ে ধাক্কা মেরে লোকটা ঘোড়া থেকে ফেলে দিলে। আমরা ঘোড়ার উপর বসেই লড়ছিলাম। ওরা বেগতিক দেখে পালিয়ে গেল।"

"কিন্তু অন্য লোকটিও পালিয়ে গেল কেন? সে তো আমাদের সঙ্গে কোতোয়ালিতে যেতে পারতো!"

"কি জানি কেন," নিরস কণ্ঠে উত্তর দিলো শক্তিসিংহ। তার

যেন সন্দেহ হয়েছিলো আক্রান্ত লোকটি কৃষ্ণাজী আপ্তে। একসময় দস্যু দুজনের সঙ্গে লড়তে লড়তে দুজনের ঘোড়া পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো। তখন তার মুখ আবছা দেখতে পেয়েছিলো এক মুহূর্তের জন্যে। তবে ভালো করে তাকিয়ে দেখবার অবসর হয়নি। কিন্তু কৃষ্ণাজীও কি চিনতে পেরেছিলো শক্তিসিংহকে? এক সময় চিৎকার করে ওকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ায় প্রয়োজন হয়েছিলো। হয়তো গলার আওয়াজ শুনে সে চিনতে পেরেছিলো।—যাই হোক, তার মনের এসব সন্দেহের কথা আবিদ হুসেনের কাছে প্রকাশ করলো না।

আবিদ হুসেন ধরে নিয়ে এলো এ লোকটির ঘোড়া। লোকটিকে ঘোড়ায় তুলবার সময় সে একটু প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলো। ডাকাতদের সম্বন্ধে আবিদ হুসেনের ভীতি খুব। সে নির্মমভাবে লোকটির পশ্চাৎপ্রদেশে পদাঘাত করে নিজের মনের ঝাল ঝাড়লো। বললো, "বুঝেছো ইয়ার, চোর ডাকাতের দশদিন আর কোতোয়ালির লোকের একদিন। চেনো আমাকে? আমি আবিদ হুসেন খাঁ, যাকে শাহ-ইন-শাহ একদিন এই শহরের কোতোয়াল নিযুক্ত করবে।" কথা শেষ করে একই স্থানে আবার আরেকটি পদাঘাত করলো। তারপর তাকে ঘোড়ায় তুলে দুজনে চললো শহরকেন্দ্রে কোতোয়ালির দিকে।

সারাটা পথ আবিদ হুসেন মোতিজানের গল্প করতে করতে এলো। কী খুশী হবে মোতিজান, আজকের এই ঘটনার কথা শুনলে। তার প্যারের আবিদ হুসেন এত বড় বাহাদুর!

রদ্-অন্দাজ খাঁ একটু অস্থির হয়ে পদচারণা করছিলো কোতোয়ালির ভিতর। ফুলাদ খাঁর দেখা নেই, এসে পড়া উচিত ছিলো এতক্ষণে। তারপর দুজনের একসঙ্গে মোতিজানের মাইফিল-খানায় যাওয়ার কথা।

হঠাৎ একসময় একটা শোরগোল শোনা গেল বাইরে। রদ্-অন্দাজ খাঁ দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালো দরজার দিকে। দেখলো হাতমুখ বাঁধা একটি লোককে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের ভিতর ঢুকছে শক্তিসিংহ আর আবিদ হুসেন খাঁ। ভিতরে এসে আবিদ হুসেন লোকটির পশ্চাৎপ্রদেশে তার চরণস্পর্শ দান করলো আরেকবার। তারপর রদ্-অন্দাজকে জিজ্ঞেস করলো, "ফুলাদ খাঁ কোথায়?"

"কেন?"

"আজ আমি একটি ডাকাত ধরেছি," বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলো আবিদ হুসেন। এতক্ষণে তার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে সে নিজেই ধরেছে লোকটাকে। ওই জিন আর হুরী শুধু তার মনের ভ্রান্তি।

রদ-অন্দাজ খাঁর কাছ থেকে কোনো উত্তর বা প্রশংসাবাক্য না পেয়ে আবিদ হুসেন খাঁ আহত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। দেখলো রদ-অন্দাজ খাঁ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কয়েদির দিকে। দেওয়ালের গায়ে লাগানো আছে একটি মশাল। তার আলো কাঁপছে লোকটার মুখের উপর। ভালো করে তাকিয়ে দেখে রদ-অন্দাজ খাঁ হঠাৎ বলে উঠলো, "সর্বনাশ! করেছো কি?"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো আবিদ হুসেন।

রদ-অন্দাজ খাঁ এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি লোকটির হাতের ও মুখের বাঁধন খুলে দিলো। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি? তোমার এ অবস্থা কি করে হোলো?"

কোনো উত্তর না দিয়ে লোকটি ফিরে দাঁড়ালো আবিদ হুসেনের দিকে। মুখে তার তীব্র ক্রোধের বীভৎস চেহারা। আবিদ হুসেন দু পা পেছনে সরে গেল, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, "আরে! ফুলাদ খাঁ?"

ফুলাদ খাঁ এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল তার দিকে, সেও

পেছন দিকে সরে যাচ্ছিলো এক পা এক পা করে। হঠাৎ তার কি মনে হোলো কে জানে, ভাবলো, কেন আমি সহ্য করবো এর এই ব্যবহার? আবিদ হুসেন দু পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। বদলে গেল তার মুখের ভাব, একটা স্পর্ধার হাসি দেখা দিলো তার অধরপ্রান্তে। ফুলাদ খাঁর মনে পড়লো, কিছুক্ষণ আগে পথের ধারের অভিজ্ঞতার কথা। সেও থমকে দাঁড়ালো। একটা ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার মুখের উপর। এবার আবিদ হুসেন এগিয়ে এলো দু কদম, আর ঠিক দু কদম পশ্চাদপসরণ করলো ফুলাদ খাঁ।

রদ-অন্দাজ খাঁ কিছুই বুঝতে না পেরে একবার আবিদ হুসেন একবার ফুলাদ খাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো।

শক্তিসিংহ আবিদ হুসেনের বাহু আকর্ষণ করে বললো, "চলো। এখানে আমাদের আর কিছু করবার নেই।"

কথাটা চাপা রইলো না। সাধারণ'লোকে জানতে না পারলেও মোগল দরবারের প্রায় সবার কানেই কথাটা উঠলো। একটা হাসাহাসি পড়ে গেল ওমরাহদের মধ্যে, মনসবদারদের মধ্যে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কে এই আবিদ হুসেন? কে? মহম্মদ হুসেন খাঁর ছেলে! কোন মহম্মদ হুসেন খাঁ, যার সঙ্গে দিওয়ান-ই-বুয়ুতাতের অসদ্ভাব ছিলো, সেই মহম্মদ হুসেন খাঁ? আহা, লোকটা বড়ো ভালো ছিলো, দিওয়ান-ই-বুয়ুতাতকে ঘুস দিতো না বলে লোকটার মৃত্যুর পর বুয়ুতাত ওর সমস্ত সম্পত্তি বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়াল-এ বাজেয়াপ্ত করে নিলো। কিন্তু ফুলাদ খাঁ রাস্তায় ডাকাতি করতে গেল কেন? কোতোয়ালেরা তো চুরি জোচ্চুরি ঘুস নানারকম ভাবে টাকা রোজগার করে জানি। আজকাল কি ডাকাতিও শুরু করেছে নাকি? নিশ্চয়ই উজীর-উল-মুল্‌কের সঙ্গে একটা ভাগাভাগির ব্যবস্থা আছে। থাক, চুপ করে যাও, কে জানে

কি ব্যাপার। খুদ বাদশাহ সলামতও যখন সব কথা শুনে চুপ মেরে গেলেন, তখন নিশ্চয়ই নানাজনের নানারকম স্বার্থ আছে এর মধ্যে।

হ্যাঁ, কথাটা উঠেছিলো শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আলমগীরের কানেও। ফুলাদ খাঁকে মিলওয়াত-গাহ্‌তে ইত্তলা দিয়ে জানতে চেয়েছিলো, কি ব্যাপার। সব শুনে উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "কে এই আবিদ হুসেন?"

উজীর পরিচয় দিলো।

"খুব বাহাদুর ছেলে," আওরংজেব বললো।

ফুলাদ খাঁর মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

"বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়ালএ ওর ওয়ালিদের কতো টাকা বাজেয়াপ্ত করা আছে?"

উজীর জানতো না। বুয়ুতাতকে ইত্তলা দিয়ে জেনে নেওয়া হোলো।

"হিসাব পরিষ্কার হয়েছে?"

বুয়ুতাত মাফ চাইলো শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে, হিসেব দেখাই হয়নি।

"কদ্দিন লাগবে?"

বুয়ুতাত জানালো, চার পাঁচ মাস তো লাগবে।

"এক মাসের মধ্যেই হিসাব চাই," বাদশাহ হুকুম দিলো, "কিন্তু এতদিন হয়ে গেছে, ওর একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিলো। নিশ্চয়ই অর্থাভাবে খুব কষ্ট পাচ্ছে আবিদ হুসেন। ওর পিতার হিসাব থেকে পাঁচ হাজার টাকা খালাস করে দেওয়া হোক।" উজীরকে বললো, "এই আবিদ হুসেনের উপর দৃষ্টি রাখো। ওর সম্বন্ধে যখন যা জানবে, আমাকে যেন জানানো হয়। এরকম উপযুক্ত লোককে আমি দরবারের খিদমতে বহাল করতে চাই।"

উজীর জাফর খাঁ, কিলাদার রদ্‌-অন্দাজ খাঁ, দিওয়ান-ই-বুয়ুতাত

কুতুব খাঁ, কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ সবাই বাদশাহকে একযোগে তসলিম জানালো।

বাদশাহ সলামত বড়ো মেহেরবান—।

আগ্রা থেকে মেঘরাজ শাহ্‌র একখানা পত্র পেলো অম্বরের দিওয়ান কল্যাণদাস। পত্র রাজওয়াড়ার ডিঙ্গল ভাষায় লেখা।

পত্রে জানানো হোলো, আগ্রায় জোর গুজব জোধপুরের মহারাজার সঙ্গে অম্বরের রাজকুমার রামসিংহের খুব বিবাদ চলছে। জোধপুরের মহারাজা জসবন্ত সিংহ শিবাজীকে অপদস্থ করতে কৃত-সঙ্কল্প। আগ্রায় রাঠোর আর কছওয়াদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় কলহ বিবাদ হয়ে গেছে। দুদিন আগে চওকবাজারে দু দলের মধ্যে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই বেধে গিয়েছিলো। কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ এসে কয়েকজনকে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে গেছে। বাদশাহ হুকুম দিয়েছেন আগ্রা শহরে কোনো রাজপুত হাতিয়ার নিয়ে পথে বেরোবে না। কুমার রামসিংহ নিজের ফৌজের লোকদের সর্বসময় খোজা ফিরোজার বাগের ইলাকার মধ্যেই থাকতে আদেশ দিয়েছেন!

অম্বরের দিওয়ান কল্যাণদাসের পত্র গেল দাক্ষিণাত্যে মহারাজা জয়সিংহের কাছে।

আগ্রা থেকে বল্লুশাহ, পরকালদাস, মনোহরদাস, নাথুরাম, গরিবদাস এবং অম্বর দরবারের অন্যান্য ওয়াকাইনবিস ও খুফিয়া-নবিসেরা যে সব গোপন আখবুরাত পাঠাচ্ছে তাতে জানা যাচ্ছে যে জোধপুরের মহারাজা কয়েকদিন ধরে বাদশাহ্‌র দরবারে যাচ্ছেন না। কুমার রামসিংহের মুনশী গিরধরলালের পালিতাকন্যা পান্নাবাঈকে উপলক্ষ করে জোধপুর দরবারের শক্তিসিংহ রাঠোর এবং শিবাজীর সর-ই-লস্কর কৃষ্ণাজী আপ্তের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিলো, তার পর থেকে

রাঠোরেরা মারাঠাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠেছে। কুমার রামসিংহের পত্নী স্বয়ং পানাবাঈকে মহলে ইত্তলা দিয়ে কঠোর ভর্ৎসনা করেছেন। কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ কৃষ্ণাজী আপ্তেকে কিছু না বলে শুধু শক্তিসিংহকে গিরফতার করার ফলে রাঠোরেরা মোগলদের উপরও খুব বিরূপ হয়েছে। যদিও জোধপুর মহারাজার হস্তক্ষেপের ফলে শক্তিসিংহকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়, মোগল ও রাঠোরদের মধ্যে অসদ্ভাব মুছে যায়নি। জানা গেছে যে কিছুদিন আগে শক্তিসিংহ তার এক মোগল বন্ধুর সহায়তায় ফুলাদ খাঁকে হাত মুখ বেঁধে কোতোয়ালিতে এনে প্রকাশ্যে অপদস্থ করেছে। যদিও এই ঘটনা একটা ভুলের দরুণ হয়েছে বলে সে জানায়, সে ফুলাদ খাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাজী হয়নি। উজীর-উল-মুল্‌কের নাকি তাই নির্দেশ ছিলো। বলা বাহুল্য, মহারাজা জসবন্ত সিংহের সমর্থন না থাকলে শক্তিসিংহ রাঠোর এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে সাহস করতো না। রদ-অন্দাজ খাঁ প্রমুখ মোগল উমরাহদের ধারণা, শক্তিসিংহ যে ভুল করে কিছু করেছিলো তা নয়, ও কাজ তার ইচ্ছাকৃত। কিন্তু যে কাজের জন্যে উজীর জাফর খাঁ শক্তি সিংহ রাঠোরকে ফুলাদ খাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ পাঠিয়েছিলো, সেই কাজে তার সহায়তা করবার জন্যে তার মোগল বন্ধু আবিদ হুসেনের স্বর্গগত পিতার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি থেকে পাঁচ হাজার টাকা খালাস করে দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন বাদশাহ। শোনা যাচ্ছে যে আবিদ হুসেনকে একটা ছোটোখাটো মনসব ও জায়গির দেওয়ার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। বিচারের এই তারতম্যতায় রাঠোরেরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে আছে। তাদের বক্তব্য, আলমগীর বাদশাহ্‌র রাজত্বে হিন্দুরা কোনো সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারেনা। এই কথা বাদশাহ্‌র কানে উঠেছে। মোগল বাদশাহ যে হিন্দুর প্রতি সুবিচার করতে পারে, এটা প্রমাণ করবার জন্যে বাদশাহ কৃত-সংকল্প বলে জানা যাচ্ছে। প্রমাণ করা হবে শিবাজীর ক্ষেত্রে।

শিবাজী মারাঠা বাগী, রাজদ্রোহী, তবু তাকে দয়া ও ক্ষমা করে সর্ব প্রকার করুণা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যে নানারকম পরিকল্পনা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বাদশাহ্‌র জন্মদিনে শিবাজী দরবারের চৌকাঠকে তসলিম করতে হাজির হবে। মারাঠাদের ও কছওয়া রাজপুতদের প্রতি শাহ্‌-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র এই বিশেষ মেহেরবানিতে রাঠোরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

—ষোলো শ ছেষট্টি খৃস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে এরকম অনেক পত্রের আদান প্রদান হয়েছিলো আগ্রা, দিল্লী, অম্বর, আওরঙ্গাবাদের মধ্যে। অম্বরের মহারাজা জয়সিংহ, দিওয়ান কল্যাণদাস, কুমার রামসিংহ, এবং বল্লু শাহ, পরকালদাস, বিমলদাস, গরিবদাস, মনোহরদাস, নাথুরাম, মেঘরাজ, মুকুন্দদাস শাহ প্রমুখ ওয়াকাইনবিস, খুফিয়ানবিস, অর্থাৎ দরবারের গোপন সংবাদদাতারা এসমস্ত পত্রের লেখক। ডিঙ্গল ভাষায় লেখা এসমস্ত গোপন পত্র বহুকাল সযত্নে রক্ষিত ছিলো জয়পুর দরবারের দস্তাবেজখানায়। তারপর একদিন ঐতিহাসিকেরা সে সব পত্রের অনেকগুলোর পাঠোদ্ধার করে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন। এসমস্ত পত্র থেকেই ঐতিহাসিকেরা জেনেছেন ঠিক সেই সময়কার হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

এপ্রিল মাসের শেষদিকে মহারাজকুমার রামসিংহ শিবাজীকে পত্র লিখে জানালো মে মাসের এগারো তারিখের মধ্যে আগ্রায় উপনীত হওয়ার জন্যে। পরদিন বাদশাহ আলমগীরের জন্মদিন। বিশেষ দরবার হবে সেই উপলক্ষে। সেখানেই শিবাজীকে বাদশাহ্‌র দর্শন লাভ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

মে মাসের প্রথম দিকে একদিন দরবারের ফারসী ভাষায় লেখা দৈনিক আখবারাতে এই সংবাদ পরিবেশন করা হোলো :

শিবাজী আগ্রা শহরে প্রবেশ করবেন বাদশাহ্‌র জন্মদিনের আগের দিন সকাল বেলা। পরদিন আম দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে বাদশাহ তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন। মির্জা রাজা যে সব কছওয়া রাজপুত সর্দারকে শিবাজীর সঙ্গে পাঠিয়েছেন, তারাও একই সঙ্গে আগ্রায় প্রবেশ করবে। বাদশাহ মহারাজকুমার রামসিংহ ও ফিদাই খাঁকে হুকুম দিয়েছেন, ওরা দুজনে যেন একদিনের পথ এগিয়ে গিয়ে শিবাজীকে পথেই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে, তারপর তাকে পথ দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে আগ্রায়। প্রাক্তন বিদ্রোহীর প্রতি পরম মেহেরবান শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র এই করুণায় আগ্রা শহরের কি হিন্দু কি মুসলমান সবাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাদশাহ্‌র গুণগান করছে।

॥ দুই ॥

ষোলো শ ছেষট্টি খৃস্টাব্দের এগারোই মে সকাল বেলা। শিবাজী সদলবলে উপনীত হোলো আগ্রা শহরের উপকণ্ঠে। শিবাজীর সঙ্গে ছিলো তাঁর বালক পুত্র শম্ভুজী, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিরাজী ফরজন্দ, সভাকবি কবীন্দ্র কবীশ্বর পরমানন্দ, ন্যায়াধীশ নিরাজী রাওজী, দত্ত ত্রিম্বক, রঘু মিত্র, কৃষ্ণাজী আপ্তে, মহারাজা জয়সিংহের দরবারের দুতিনজন কছওয়া রাজপুত সর্দার, এবং ।শবাজীর ফৌজের আরো চারজন বিশ্বাসী সেনাধ্যক্ষ। এ ছাড়া ছিলো আরো আড়াই শো সৈন্য। তাদের মধ্যে একশো জন সিলাহদার, বাকি সবাই বারগির ও পিয়াদা।

নগরপ্রাকারের ঠিক বাইরেই মুল্‌কচাঁদের সরাইখানা। শিবাজী প্রথম এসে উঠলো সেখানে। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণাজী এসে জানালো মহারাজকুমারের মুন্‌শী গিরধরলালজী মহারাজার দর্শন লাভ করতে হাজির হয়েছেন।

শিবাজী তখন কয়েকটা গুরুতর বিষয় আলোচনা করছিলো নিরাজী রাওজী ও দত্ত ত্রিম্বকের সঙ্গে। বললো, “মুন্‌শীকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।”

মুন্‌শী গিরধরলাল কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে শিবাজীকে অভিবাদন করলো। তার পেছন পেছন এলো একজন ভৃত্য। তার হাতের মস্তো বড়ো রুপোর থালায় এক প্রস্থ মহার্ঘ সর্‌-ও-পা।

গিরধরলাস মুন্‌শী মাথা নিচু করে বললো, “আমার প্রভু অম্বরের মহারাজকুমার আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন এই সর্‌-ও-পা আর একটি

বারগির অশ্ব। অশ্বটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে নিচের প্রাঙ্গনে। মহারাজকুমার আমাকে আদেশ দিয়েছেন আপনার সমক্ষে উপনীত হয়ে আপনাকে তাঁর রাম-রাম জ্ঞাপন করবার জন্যে।"

শিবাজীর কাছে নিয়ে আসা হোলো সেই মহার্ঘ সর্-ও-পা। শিবাজী রেওয়াজ মতো ডান হাত দিয়ে সেই সর্-ও-পা স্পর্শ করলো। তখন রুপোর থালা নামিয়ে রাখা হোলো একপাশে।

আরেকজন ভৃত্য একটি দীর্ঘ মুকুর এনে প্রলম্বিত করলো কক্ষের বাম দিকের দেওয়ালে। সেটি সামনের দিকে ঝুকিয়ে ঝোলানো হোলো অনেক উঁচুতে। কক্ষের ডান দিকে উন্মুক্ত বাতায়ন। নিচে প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের প্রতিবিম্ব পড়লো বৃহৎ মুকুরে। সেখানে দেখা গেল ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন ভৃত্য। ঘোড়ার জিনে রুপোর নানারকম কারুকার্য। এখান থেকেই বোঝা গেল কারুকার্যের বৈচিত্র্য।

শিবাজী সর্-ও-পা ও অশ্বের প্রশংসা করে মহারাজকুমারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।

গিরধরলাল বিনীতভাবে জানালো, অভ্যর্থনার কি ব্যবস্থা হয়েছে তার বিবরণ শিবাজী মহারাজাকে জানানোর জন্যে তার আগমন। কাল বাদশাহ্‌র জন্মদিবস উপলক্ষে আম দরবার অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে শিবাজীকে। প্রভাতেই গিরধরলাল আবার আসবে শিবাজীকে সঙ্গে করে পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শহরের দরওয়াজায় মহারাজকুমার, মুখলিস খাঁ এবং ফিদাই খাঁ মহারাজা শিবাজীর অভ্যর্থনা করবেন। তারপর কি ভাবে মহারাজকুমারের মঞ্জিলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর কোন পথ ধরে কি ভাবে তাঁকে দিওয়ান-ই-আমএ নিয়ে যাওয়া হবে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার পর মুন্‌শী গিরধরলাল বিদায় প্রার্থনা করলো।

বিদায়ের সময় শিবাজী নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করবার জন্যে গিরধরলালকে দিলো একটি সর্-ও-পা আর নগদ দুশো টাকা।

সে রাত শিবাজী অতিবাহিত করলো মুল্‌কচাঁদের সরাইখানায়।

পরদিন বারোই মে। বাদশাহ্‌র জন্মদিবস। সকাল থেকেই আগ্রায় উৎসবের কোলাহল পড়ে গেল। কেল্লা থেকে ঘন ঘন শোনা গেল তোপের ধ্বনি। নহবতখানার শানাই নাকারার আওয়াজ যমুনার তীরে প্রতিধ্বনিত হোলো। সমস্ত প্রধান রাজপথ, বিশেষ করে যেপথ দিয়ে শিবাজী দরবারে আসবে সে পথে সাজানো হোলো নানা বিচিত্রবর্ণের পতাকা। দলে দলে লোক চললো কেল্লার দিকে। ভেতরে যেতে না পারুক, অভিজাত মনসবদারবর্গ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যে যার মিস্‌ল্‌ নিয়ে যে হাজির হবে একজনের পর একজন, সেসব তো দেখা যাবে।

সেদিন আবার দেওরি-চৌকির ভার পরেছে মহারাজকুমার রাম সিংহের উপর। মহারাজকুমারের ফুরসত নেই একটুও। খুব সকাল করেই যেতে হয়েছে শাহী কেল্লায়। মুন্‌শী গিরধরলালকে পাঠিয়ে দিলো শিবাজীকে সঙ্গে নিয়ে মুলুক্‌চাঁদের 'সরাইখানা থেকে রওনা হওয়ার জন্যে। নিজে কেল্লায় গিয়ে সৈন্যদের সারবন্দী করে কুচ-কাওয়াজ করিয়ে তাদের মহল ও কেল্লার বিভিন্ন জায়গায় যথারীতিতে সুবিন্যস্ত করে মুখলিস খাঁর সঙ্গে চললো শহরের দরওয়াজার দিকে শিবাজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

ফারসী ভাষায় লিখিত দরবারের তৎকালীন আখবার এবং ডিঙ্গল ভাষায় লেখা অম্বর দরবারের নানাচিঠিপত্রে শিবাজীর আগ্রায় প্রবেশ করার বিবরণ বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। রামসিংহের মুন্‌শী গিরধরলাল মুল্‌কচাঁদের সরাইখানায় গিয়েছিলো খুব সকাল করেই। কিন্তু শিবাজী পথশ্রমে ক্লান্ত। এজন্যে সদলবলে রওনা হতে হতে দেরী হয়ে গেল। এদিকে কেল্লায় চৌকিতে সেনা সংস্থাপিত করে শিবাজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে রওনা হতে দেরী হয়ে গেল মহারাজকুমার রামসিংহেরও।

তারপর আরো একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। মুন্‌শী গিরধরলাল শিবাজীকে, নিয়ে এলো দহর-আরা বাগের রাস্তা দিয়ে। কিন্তু মহারাজকুমার রামসিংহ আর মুখলিস খাঁ গেল খোজা ফিরোজার বাগের পথ ধরে। সেখানেই শিবাজীকে নিয়ে আসবার কথা। তাই রামসিংহ ভেবেছিলো যে পথ খোজা ফিরোজার বাগের দিকে গেছে, সে পথ ধরেই আসবে শিবাজীর মিস্‌ল্‌। কিন্তু অনেকটা এগিয়ে লোকজন কোথাও বিশেষ দেখা গেল না। রামসিংহ একটু চিন্তান্বিত হোলো। শিবাজীকে দেখবার জন্যে পথের দুধারে যে লোক জড়ো হবে, একথা তার কানে এসেছিলো। কয়েকজন লোক খুব দ্রুতপদে অন্যদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের জিজ্ঞেস করতে ওরা বললো, ওরা দেখতে যাচ্ছে শিবাজী মারাঠাকে। ওদের মুখেই শোনা গেল শিবাজী আসছে দহর-আরা বাগের পাশ দিয়ে।

মহারাজকুমারের দলে ছিলো রামদাস রাজপুত আর ডুঙ্গরমল চৌধুরী। ওরা জিজ্ঞেস করলো রামসিংহকে, "মহারাজকুমার, তাহলে কি আমরাও যাবো দহর-আরা বাগের দিকে ?"

"না," উত্তর দিলো রামসিংহ। সে রাজকুমার, অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে, আম-জনতার মতো শিবাজী কোথায় আছে শুনে সেদিক ছুটে যাবে না। খোজা ফিরোজার বাগের কাছে শিবাজীকে অভ্যর্থনা করে বাগের ভিতর মহারাজকুমারের মঞ্জিলে নিয়ে যাওয়ার কথা। এই পরিকল্পনার একচুল এদিক ওদিক হবে না। শিবাজীকে আসতে হবে খোজা ফিরোজার বাগের পথ ধরে। রামসিংহ যাবে না। সে ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করবে। ডুঙ্গরমল আর রামদাসকে বললো, "তোমরা গিয়ে শিবাজীকে পথ দেখিয়ে এদিকে নিয়ে এসো।"

ওরা গিয়ে শিবাজীকে জানালো যে ব্যবস্থায় একটু গলদ হয়ে গেছে। দহর-আরা বাগের রাস্তায় ওঁর অভ্যর্থনা হবে না, হবে খোজা ফিরোজার বাগের রাস্তায়। শিবাজীর মিস্‌ল্‌কে যেতে হবে সেদিকে।

সকাল থেকেই সব কিছু এরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শিবাজী এবার একটু বিরক্ত হোলো। মুখে আর কিছু বললো না।

দহর-আরা বাগের রাস্তা থেকে ফিরোজাবাগের রাস্তায় যাওয়ার পথ ঘিঞ্জি বাজারের ভিতর দিয়ে। সেখানে লোকজনে ঠাসাঠাসি। এমনিতে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়, তার উপর উৎসবের দিনের জনতা, এর পর সবাই শিবাজীর নাম শুনে আরো ভিড় করলো। দিনটা গরমও খুব। বেলা বেড়ে উঠছে। শিবাজী এতক্ষণ ছিলো পাল্কির মধ্যে। গরম আর সহ্য হোলো না। পাল্কির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপলো, এগিয়ে এলো মিস্‌ল্‌এর পুরোভাগে। এতক্ষণ জনতার ধাক্কাধাক্কি ধ্বস্তাধ্বস্তির ভিতর দিয়ে কিছুতেই এগোতে পারছিলো না মারাঠাদের মিস্‌ল্‌। কিন্তু এবার শিবাজীর তেজোদৃপ্ত শুভ্র সৌম্য রাজসিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখে পথের জনতা শোরগোল বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। দুপাশে সরে গিয়ে যাওয়ার পথ করে দিলো শিবাজীকে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে গর্বদৃপ্ত ভঙ্গিতে অশ্বারোহণে চলতে লাগলো শিবাজী। পথের দুপাশের জনতা অবনত মস্তকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো এই মারাঠা বীরকে, যার সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী হাটে বাজারে সবার মুখে শোনা যাচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। এ সেই বীর বিদ্রোহী যে দাক্ষিণাত্যে একদিকে বিজাপুরী সেনা অন্য দিকে মোগল ফৌজকে তটস্থ করে রেখেছে! শায়েস্তা খাঁ, জসবন্ত সিংহ কেউ দাঁড়াতে পারেনি তাঁর প্রবল আক্রমণের সামনে। বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র মাতুল এবং বড়ী সাহিবার ভ্রাতা অতোবড়ো শক্তিমান যোদ্ধা আফজল খাঁকে কয়েক বছর আগে স্বহস্তে নিহত করেছে এই সুন্দর রূপবান মারাঠা বীর? সবাই বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় দুচোখ ভরে দেখতে লাগলো শিবাজীকে।

সেই জনতা অতিক্রম করে মারাঠাদের মিস্‌ল্‌ আস্তে আস্তে এসে পড়লো খোজা ফিরোজার বাগের রাস্তায়। ততক্ষণে বেশ দেরী

হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো মহারাজ কুমার রামসিংহ আর মুখলিস খাঁ। ভাবছিলো, কি হয়েছে দেখবার জন্যে গোপীরাজ মোহতাকে পাঠাবে কিনা। এমন সময় শোরগোল শুনতে পেলো। একটু পরেই দেখতে পেলো সরু পথ ধরে খোজা ফিরোজার বাগের বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে শিবাজী ও তার সঙ্গীরা। রামসিংহ আর মুখলিস খাঁ আরেকটু এগিয়ে গিয়ে নুরগঞ্জ বাগের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। শিবাজী যে পথ ধরে আসছিলো সে পথ খোজা ফিরোজার বাগের বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছে সেখানেই। শিবাজী বড়ো রাস্তায় পৌঁছে সামনে একদল অশ্বারোহীকে দেখে ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়িয়ে পড়লো। একজন কছওয়া রাজপুত শিবাজীকে বললো, "উনিই মহারাজকুমার রাম সিংহ।" একথা বলে সে এগিয়ে এলো রামসিংহের কাছে। অভি-বাদন করে বললো, "মহারাজকুমার, ওই অগ্রবর্তী সাদা ঘোড়ার উপর যে বীরপুরুষ উপবিষ্ট আছেন, তিনিই হলেন মহারাষ্ট্রগৌরব শিবাজী ভোঁসলে। আপনার পিতা আমাদের মহারাজার নির্দেশে আমরা তাঁর সঙ্গে আগ্রায় এসেছি আপনাকে মহারাজার এই আদেশ জানাতে যে, শিবাজী আগ্রায় কছওয়া রাজপুত দরবারের পরম মিত্র-রূপে আগমন করেছেন। তাঁর ইজ্জত এবং কছওয়া দরবারের ইজ্জত এক। মহারাজকুমার যেন এক নিমেষের জন্যেও সেকথা বিস্মৃত না হন।"

"শিবাজী যদ্দিন আগ্রায় আছেন," মহারাজকুমার রামসিংহ উত্তর দিলো, "তদ্দিন তাঁর সম্মান ও নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব আমার।"

শিবাজী আর রামসিংহের মধ্যে কয়েক হাত মাত্র ব্যবধান। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলো। শিবাজীর এ সময় বয়েস উনচল্লিশ বছর, যৌবনকাল শেষ হয়ে এলেও মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েনি। আশ্চর্য শুভ্র তার দেহের বর্ণ, মুখে গোলাপী আভা। এতদিন ধরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছে, কিন্তু ক্লান্তির কোনো

ছাপ নেই মুখের উপর। কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুর তু-চারগাছি সাদা হয়ে এলেও চোখে পড়ে না। প্রশস্ত আয়ত চক্ষু, স্নিগ্ধ কিন্তু একটা আশ্চর্য দীপ্তিতে ভাস্বর। আয়েসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কোমল কমনীয় মুখমণ্ডল, লাগামের উপর অতি কোমল তুখানি শুভ্র হাত, কিন্তু শরীরের আঁট পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠছে পাহাড়ী দেশের অক্লান্তকর্মী কৃষকের মতো সুসংবদ্ধ দেহগঠনের প্রত্যেকটা মাংসপেশী। দেখে দেখে চোখ ভরে না, মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয় এ যেন মহান মহতোমহীয়ান এক নেতৃপুরুষ, দরবারের জাঁকজমকের মধ্যে অভিজাত ওমরাহমণ্ডলী পরিবেষ্টিত সিংহাসনে জন্মাধিকারসূত্রে অধিষ্ঠিত তথাকথিত ঐশ্বরিক অধিকারের দাবিদার রাজকীয় নেতা নয়, সাধারণ কৃষিজীবী পরিশ্রমজীবী জনপদ-বাসীর বিপ্লবী প্রতিরোধ শক্তির নিয়ন্তা, শোষক দিল্লী হুকুমতের বিরুদ্ধে দরিদ্র প্রত্যন্তদেশের বিদ্রোহী জনশক্তির নেতা। তাঁকে দেখে মহারাজকুমার রামসিংহের মন শ্রদ্ধায় নুয়ে এলো।

রামসিংহ এসময় তরুণ বয়স্ক। রাজপুত যোদ্ধার মতো দীর্ঘ শালপ্রাংশুকান্তি, অতি প্রশস্ত গর্বস্ফীত বক্ষ, বঙ্কিম গুম্ফরেখা-পরিশোভিত মুখমণ্ডলে একটা আভিজাত্যের ঔদ্ধত্য। কিন্তু চোখ তুটি সরল। মনে হয় একটা অসাধারণ সম্ভ্রমবোধ আছে এই যোদ্ধার, নির্ভর করা যায় এর সততার উপর। তার ব্যক্তিত্বের একটা সহজাত মাধুর্য আছে। শিবাজীর মনে একটা সৌহার্দের সঞ্চার হোলো।

তুজনেই স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো তুজনের দিকে। কেউ কারো দিকে এগোলো না। শিবাজীর মনে মনে এই বাসনা ছিলো যে রামসিংহই প্রথম অভিবাদন করুক তাকে। এজন্যে সে ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। একটু পরে দেখা গেল মহারাজ কুমার রামসিংহই এগিয়ে যাচ্ছে শিবাজীর দিকে। তুজনের ঘোড়া পাশাপাশি ঘেষে দাঁড়াতে রামসিংহ সামনে ঝুঁকে শিবাজীকে

আলিঙ্গন করে স্বাগত জানালো। শিবাজীও সৌজন্য প্রকাশ করলো যথাবিহিত ভাষায়। কিন্তু কেউই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলো না।

রামসিং বললো, "আপনার নাম শুধু দক্ষানে নয়, সারা হিন্দুস্তানেই সুবিদিত। আপনার মতো একজন মহাবীর যোদ্ধাকে আমাদের অতিথিরূপে পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি।"

শিবাজী উত্তর দিলো, "আপনার কথা আমি আপনার পিতা আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন হিতৈষী মহারাজা জয়সিংহের কাছে এত শুনেছি যে আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার বহুপূর্বেই আপনার প্রতি গভীর অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছি। আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে উপলব্ধি করলাম যে, কল্পনা ও বাস্তবে কোনো অমিল নেই। আপনার যে রূপ আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো, এখন তাই প্রত্যক্ষ করছি।"

এমন সময় আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মুখলিস খাঁ। শিবাজী রাজসিক ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো। কুমার রামসিংহ মুখলিস খাঁর পরিচয় দিলো।

মুখলিস খাঁ মুসলমানী রীতিতে অভিবাদন করে বললো, "শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আলমগীরের হুকুমে আমি আপনাকে আগ্রার দরবারে স্বাগত করতে হাজির হয়েছি। শাহ-ইন-শাহ আপনাকে জানাতে বলেছেন যে আপনি নির্বিঘ্নে নিরাপদে সুস্থ দেহে আগ্রায় উপস্থিত হতে পেরেছেন বলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাকে আজই দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি দিয়ে তিনি আপনার মতো একজন বিশিষ্ট প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন।"

এক নিমেষের জন্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো শিবাজীর চোখে। কিন্তু চকিতে সে ভাব সামলে নিয়ে শিবাজী সৌজন্যমার্জিত কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলো, "আপনাদের শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ খুব মেহেরবান। আম-দরবারে তাঁকে তসলিম জানিয়ে আমি ধন্য বোধ

করবো।" কথা শেষ করে শিবাজী হাসিমুখে খুব সৌজন্যপূর্ণ অবহেলার সঙ্গে হাত নাড়লো, যে ভাবে হাত নেড়ে কোনো রাজাধিরাজ তার ভৃত্যকে সম্মুখ থেকে সরে যেতে বলে। হতচকিত হয়ে মুখলিস খাঁ পেছন দিকে সরে গেল, শিবাজীর ব্যক্তিত্বের সামনে অতি ক্ষুদ্র বোধ করলো নিজেকে। সে এসেছিলো খুব একটা উদ্ধত মনোভাব নিয়ে,—সে দরবারের একজন মধ্যবর্গীয় মনসবদার, আনুষ্ঠানিক ভাবে দরবারের পক্ষ থেকে আগ্রার প্রবেশ পথে স্বাগত জানাবে এক পরাজিত আত্মসমর্পিত পার্বত্য বিদ্রোহীকে, যে শেষ পর্যন্ত তারই সমান পর্যায়ের মনসব গ্রহণ করবে বাদশাহ্‌র দরবারে। এ হেন ব্যক্তিকে নিয়ে এই কদিন আগ্রায় এত উত্তেজনার কি কারণ তার বোধগম্য হচ্ছিলো না। কিন্তু শিবাজীর সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হোলো সে যেন উপস্থিত হয়েছে এক পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্তীর দরবারে, যার সামনে তার নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে নিষ্প্রভ। সে যে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে দুটো কথা বললো, তাই যেন পরম অনুগ্রহ। এত বছর ধরে এতরকম নিন্দাবাদ শুনেছে শিবাজীর সম্বন্ধে, কিন্তু শিবাজীর সান্নিধ্যে এসে তার মন এক নিমেষে শ্রদ্ধাপ্লুত হোলো। মনে হোলো,—না, যে যাই বলুক, ইনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। মুখলিস খাঁ আওরংজেবের বশংবদ মনসবদার, বাদশাহ্‌র প্রতি তার মনে একটা নতুন শ্রদ্ধা গড়ে উঠলো। ভাবলো, সত্যি, কী অসাধারণ শক্তিমান আমাদের বাদশাহ, শিবাজীর মতো একজন অসামান্য ব্যক্তিত্বশালী যোদ্ধাকেও পরাজিত করে, বশীভূত করে, আগ্রার দরবারে আকর্ষণ করতে পেরেছে! মনে মনে অভিনন্দন জানালো, মুবারকবাদ জানালো বাদশাহ্‌কে।

শিবাজী মুখলিস খাঁর দিকে আর তাকালোই না, রামসিংহের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললো, অন্য সবাই এলো পেছন পেছন।

রামসিংহের সঙ্গে ছিলো আটটা হাতি। শিবাজী বললো,

"এদের আনা হয়েছে কেন। আমার সঙ্গে ঘোড়া আছে, পাল্কি আছে, উট আছে, বানজারা আছে, তার উপর এই হাতিগুলো থাকলে পথে একটা ভিড় হবে অনর্থক। সংবাদ পেয়েছি যে শহর-কেন্দ্রে প্রচুর লোক অপেক্ষা করছে আমায় দেখবার জন্যে।"

রামসিংহের আদেশে হাতিগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হোলো।

"আমরা কি এখান থেকে সোজা দরবারে যাচ্ছি?"

"আপনার যা ইচ্ছে। তবে এতক্ষণে আম-দরবার আরম্ভ হয়ে গেছে।"

"আপনি কি বলেন?"

"দরবার শেষ হতে দেরী আছে। আপনি যদি কিছুক্ষণ খোজা ফিরোজার বাগে বিশ্রাম করে যেতে চান তো, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

"আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা যেখানে করা হয়েছে সেখানেই যেতে চাই," বললো শিবাজী। তার মনের ইচ্ছে, একটু দেরী করেই যাবে বাদশাহ্‌র দরবারে, যাতে তার আগমন সবারই চোখে পড়ে, যাতে তার জন্যে অপেক্ষা করে করে সবাই একটু অধৈর্য হয়ে পড়ে, যাতে সে সবাইকে অনুভব করাতে পারে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

রামসিংহ উত্তর দিলো, "খোজা ফিরোজার বাগে আমার ফৌজের শিবিরের কাছেই আপনার জন্যে শিবির সংস্থাপিত করা হয়েছে।"

"এ অতি উত্তম ব্যবস্থা," বললো শিবাজী, "আমি আপনার কাছে কাছে থাকতে পারলেই খুশী হবো।"

মহারাজকুমার রামসিংহের সঙ্গে শিবাজী খোজা ফিরোজার বাগে এসে উপনীত হোলো। সেখানে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও নহবতধ্বনির সঙ্গে মহাসমারোহে শিবাজীর অভ্যর্থনা করা হোলো।

আমাদের কাহিনীর প্রয়োজনে শিবাজীর আগ্রায় আগমন এবং রামসিংহ ও মুখলিস খাঁ কর্তৃক শিবাজীর অভ্যর্থনা, এর বেশী আর কিছু উল্লেখ করার দরকার ছিলো না। শুধু পাঠকপাঠিকার কৌতূহল

মেটানোর জন্যে শিবাজীর আগ্রা প্রবেশের বিস্তৃত বিবরণ দিলাম,—ঐতিহাসিক নথিপত্রে যে ভাবে সমস্ত ঘটনা উল্লিখিত আছে, ঠিক সেভাবে।

সেদিন, বাদশাহ্‌র সিংহাসনারোহণের বার্ষিকী। সাত বছর আগে ঠিক এই দিনে খলিফত-উজ-জমানি জিল-ই-সুভানি আমির-উল-মুমিনিন শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আলমগীর মহিউদ্‌দিন মহম্মদ আওরংজেব দিল্লীর তখত্‌-এ-তাউসে হাসিল হয়েছিলো। যদিও বাদশাহ্‌র জন্মের তারিখ হোলো চব্বিশে অক্টোবর তবু সিংহাসনারোহণের দিনই বাদশাহ্‌র জন্মদিনও প্রতিপালন করা হোতো। সেদিন উনিশ শো ছেষট্টি খৃস্টাব্দের বারোই মে, রাজ্যব্যাপী আনন্দ উৎসব। রাজধানীতে উৎসব হবে পাঁচদিন ধরে। মনসবদারদের মধ্যে নানা প্রকার উপহার বিনিময়ের রেওয়াজ সেদিন। নাচ গান দাওয়াতের আয়োজন হয়েছে সর্বত্র। জায়গায় জায়গায় কবিদের মুশারেয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শহরের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে চলছে নানা রকমের জুয়াখেলা। তখনো আলমগীরের রাজত্বের নৈতিক কড়াকড়ি শুরু হয়নি, পরিকল্পিত হচ্ছে মাত্র। বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত রুচি এসবের সমর্থন না করলেও কোনোরকম বাধা নিষেধ আরোপিত হয়নি তখন পর্যন্ত।

নওরোজের দিনের মতো সুসজ্জিত করা হয়েছে শাহীমহল, দিওয়ান-ই-আম ও দিওয়ান-ই-খাস। বাদশাহ রাজ্যের প্রধান ওমরাহদের মিস্‌ল্‌ নিয়ে এলো দরবারে। প্রথমে হোলো জর-ই-ওয়জন্‌ অনুষ্ঠান, স্বর্ণরৌপ্যরত্নাদি দিয়ে ওজন করা হোলো বাদশাহ্‌কে। বাদশাহ্‌র ওজন বেড়েছে কয়েক সের, চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। শাহজাদা মহম্মদ আজম আর শাহজাদা মহম্মদ আকবরেরও ওজন নেওয়া হোলো। তারপর সেই সমস্ত

মহার্ঘ বস্তু দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার হুকুম হোলো। নানারকম পিঞ্জরাবদ্ধ পশু পাখি এনে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হোলো। এসব অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর বাদশাহ তখত্-এ-তাউসে সমাসীন হোলো। বাদশাহ্‌র হুকুমে ওমরাহ মনসবদারদের মধ্যে টাঁকশালে নতুন তৈরী স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা এবং স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত বাদাম আখরোট প্রভৃতি ফল বিতরিত হোলো। অনেক মনসবদারকে সম্মানিত করা হোলো খিলাত ও সর্-ও-পা দিয়ে। আরো অনেকের মনসব বাড়িয়ে দেওয়া হোলো, হুকুম হোলো নতুন জায়গিরের।

আমির ওমরাহ মনসবদারেরা লক্ষ্য করলো এবারের জাঁকজমক যেন অন্যান্যবারের থেকে অনেক বেশী। সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে আজ শিবাজী হাজির হবে দরবারে, শিবাজীকে বাদশাহ্‌র বৈভব, সম্পদ ও শক্তি দেখানোর জন্যেই এই জাঁকজমক। দাক্ষিণাত্যে যদি মারাঠাদের প্রতিকূলতা নির্মূল করা যায়, তাহলে অচিরেই বিজাপুর রাজ্য দখল করতে সক্ষম হবে বাদশাহ আলমগীর। কয়েকশো বছরের ইতিহাসে এত বিস্তৃত রাজ্য হিন্দুস্তানে আর হয়নি।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে লাগলো। শিবাজীর দেখা নেই। অধৈর্য হয়ে উঠলো সবাই। শিবাজী যে আগ্রা শহরে প্রবেশ করেছে এখবর এসে গেছে। মহারাজকুমার রামসিংহ আর মুখলিস খাঁ যে তার অভ্যর্থনা করতে গেছে একথাও সবাই জানে। সুতরাং এত বিলম্ব হওয়ায় কোনো কারণ নেই।

অধৈর্য হয়ে উঠলো বাদশাহ আলমগীরও। দরবারের অনুষ্ঠান সূচী প্রায় সমাপ্ত হয়ে আসছে। আর বেশীক্ষণ দরবারে থাকা যাবে না। শিবাজী আসবে বলে দরবারের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেও বসে থাকা যায় না। আওরংজেবের নির্দেশে বিলম্বিত করা হোলো দরবারের অনুষ্ঠান। দেখা গেল, এমন অনেককে খিলাত,

সর্-ও-পা, জায়গির ও মনসবের পদোন্নতির হুকুম দেওয়া হচ্ছে, যাদের জন্যে কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিলো না। যারা যারা তখনো কোনো ইনাম পায়নি, তারা মনে মনে কামনা করতে লাগলো শিবাজী যেন আরো দেরী করে আসে। আওরংজেবের গোপন নির্দেশে লোক পাঠানো হোলো শিবাজীর খবর নেওয়ার জন্যে। কিছুক্ষণ পরে উজীর জাফর খাঁ বাদশাহকে চুপি চুপি জানালো যে ফিরোজাবাগে মহারাজকুমার রামসিংহের দিওয়ানখানায় বসে শিবাজী এবং রামসিংহ গোপনে নানা বিষয় আলোচনা করছে। মহারাজা জসবন্ত সিংহ এমন কিছু দূরে ছিলো না। কথাগুলো তার কানে পরিষ্কার না গেলেও, সে ব্যাপারটা মোটামুটি আঁচ করতে পারলো। মুখে কিছু বললো না। আম দরবারে খোলাখুলি কোনো মন্তব্য করা বে-আদবি। কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। নিজের মনে গুম্ফাগ্রে তা 'দিলো মহারাজা জসবন্ত সিংহ। আওরংজেব আড় চোখে লক্ষ্য করলো। গম্ভীর হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল। কপালে দেখা দিলো ক্রূর ভ্রূকুটি। ওমরাহ মনসবদার কাছাকাছি যারা ছিলো, সবাই লক্ষ্য করলো। আকিল খাঁ আর রদ-অন্দাজ খাঁ দুজনে দুজনের দিকে তাকালো। আগ্রার কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদ খাঁ আর আগ্রার ফৌজদার ফিদাই খাঁ দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে, ওরা দুজন দুজনের গা টিপে একটু হাসলো। ফুলাদ খাঁ বললো, "পার্বত্যমূষিক পশুরাজ সিংহের লাঙ্গুল মর্দন করবার চেষ্টা করছে। কাজটা ভালো হচ্ছে না।"

ফিদাই খাঁ উত্তর দিলো, "কয়েদখানায় রদ-অন্দাজ খাঁর মেহমানের সংখ্যা একজন বাড়বে মনে হচ্ছে।"

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বোধ হয় বাদশাহ্‌র ধৈর্য-চ্যুতি ঘটলো। দরবার সমাপ্ত হবার আগে শাহী লস্করের কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করার কথা। কিন্তু এ অনুষ্ঠান বাতিল করে

দিয়ে বাদশাহ তখত্-এ-তাউসের সামনের পর্দা নামিয়ে দিয়ে দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করলো।

দিওয়ান-ই-আম থেকে বাদশাহ চলে গেল দিওয়ান-ই-খাস্এ। সেখানে হাজির হোলো উজীর-উল-মুলক্ জাফর খাঁ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ, দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা আকিল খাঁ, মুন্শী কাবিল খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ, আসাদ খাঁ বকশি, ফুলাদ খাঁ, ফিদাই খাঁ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট মনসবদার, সেদিনকার কর্মসূচীর প্রয়োজনে যাদের যাদের উপস্থিতি সেখানে বাঞ্ছনীয়। অন্য সব মনসবদারেরা দিওয়ান-ই-খাসের বাইরে গুলালবার্এ এসে ভিড় করলো।

দিওয়ান-ই-আমের বাইরে প্রশস্ত আঙিনার নানা জায়গায় শামআনাহ্ খাটানো হয়েছে। প্রধান ওমরাহ ও মনসবদারদের সহচর ও অনুগামীবৃন্দ অপেক্ষা করছে সেখানে। রাঠোর রাজ-পুতদের শাম-আনাহ্র কাছে একজায়গায় দাঁড়িয়েছিলো শক্তিসিংহ রাঠোর ও আবিদ হুসেন। অন্যান্য সবার মতো তাদের মনেও শিবাজীকে দর্শন করবার জন্যে অদম্য কৌতূহল।

আম-দরবার শেষ হয়ে গেল। শিবাজীর তখনো দেখা নেই। একটা গুঞ্জরণ উঠলো চারদিকে। নানারকম কথা বলতে লাগলো সবাই। কেউ বললো, বাদশাহ শেষ মুহূর্তে শিবাজীর দরবারে আসা মানা করে দিয়েছে। একটা ছুতো করে শিবাজীকে আগ্রায় আনা হয়েছে। এবার তাকে কয়েদ করা হবে। হয়তো এতক্ষণে শিবাজীকে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেল্লার কয়েদখানায়। কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল শিবাজী বিশ্রাম করছে খোজা ফিরোজার বাগে। তখন অনেকে বললো, শিবাজীর মনে সন্দেহ হয়েছে। নিরস্ত্র অবস্থায় সে দরবারে আসবে না। সে তার সৈন্যদের সবাইকে নিয়ে কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করবার হুকুম চেয়েছে। বাদশাহ সেই হুকুম দেয় নি। সে জন্যে এই বিলম্ব।

কেল্লার চারদিকে সৈন্যদের পাহারা অন্যান্য দিনের থেকে অনেক বেশী। সিলাহ্‌দারদের হাতে খোলা তলোয়ার, পিয়াদাদের হাতে উদ্যত বর্শা। বাহেলিয়াদের বন্দুকে গুলি ভরে রাখা আছে। কেল্লার ভিতরে গুলালবারেও দেখা যাচ্ছে শাহী লস্করের একদল বাছাই করা যোদ্ধাকে।

ভিতর থেকে খবর এলো যে, বাদশাহ সলামত দিওয়ান-ই-আম থেকে চলে গেছে দিওয়ান-ই-খাস্‌এ। আগ্রার শাহী কেল্লার কিলাদার, আগ্রার ফৌজদার, আগ্রা শহরের কোতোয়াল তিনজন-কেই সেখানে ইত্তলা দিয়েছেন বাদশাহ। উজীর-উল-মুল্‌ক্ জাফর খাঁ তাদের সঙ্গে গোপন পরামর্শে নিমগ্ন। কিছুক্ষণ পরে জানা গেল, এও গুজব। গোপন পরামর্শ কিছুই হচ্ছে না। আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দিওয়ান-ই-খাসে যেই অনুষ্ঠানসূচীর আয়োজন হয়েছে, তাই পালন করা হচ্ছে মাত্র। দরবারের বিশিষ্ট মনসবদারদের পান-বিরা গ্রহণ করবার জন্যে সেখানে ইত্তলা দেওয়া হয়েছে।

"তোমায় একটু চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে," আবিদ হুসেন শক্তি সিংহকে বললো।

"হ্যাঁ, ভাবনা হবার কারণ আছে বইকি," শক্তিসিংহ আনমনে বললো, "আজকের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

শক্তিসিংহ কিসের ইঙ্গিত করছে সেটা আবিদ হুসেনের বুঝবার কথা নয়। কিছু না বুঝেই সে বললো, "ভাবনা কিসের বন্ধু, তুমি আছো, আমি আছি। দুনিয়ার কাকে আর আমাদের পরোয়া।"

এমন সময় একটা শোরগোল শোনা গেল বাইরে। শিবাজী তশরীফ আনছেন, শিবাজী তশরীফ আনছেন, শোনা গেল সবার মুখে। দরবারে আসবার পথ কেল্লার দিল্লী দরওয়াজা দিয়ে। সবার দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হোলো। তটস্থ হয়ে নিশ্চল হয়ে উন্মুক্ত অসি হাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো দরওয়াজার চৌকি। সেদিন

মহল-চৌকির ভার কুমার রামসিংহের। তাই প্রহরীরা সবাই রাজপুত। কিন্তু কেল্লার চারদিকে রদ-অন্দাজ খাঁর মোগল সিলাহ্‌দার, দিওয়ান-ই-খাসের পাশে গুলালবারে বাদশাহ্‌র খাস লস্করের তুর্কী ও মোগল পিয়াদা, কেল্লার বিভিন্ন বুরজে দেওয়ালের উপরে বন্দুক তাক করে বসে আছে বক্সারিয়া বাহেলিয়া। একটা চাপা উত্তেজনা সবারই মনের মধ্যে।

কেল্লার বাইরে প্রশস্ত চওক। চারদিকে বাজার দোকানপাট। নানারঙের কাগজের শৃঙ্খল, নানারঙের পতাকায় সাজানো হয়েছে। দোকানদারেরা আতরের ঝারি থেকে আতর বর্ষণ করছে খরিদ্দারদের উপর। থেকে থেকে বাজি পটকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শাহী সড়কের দুদিকে মোগল সিলাহ্‌দারেরা বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে অশ্বারূঢ় হয়ে আছে সার বেঁধে। তাদের পেছনে পথের দুপাশেই নিদারুণ ভিড়। চারদিকের মঞ্জিল, ইমারত, মহলের ছাতে জানলায় লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বাগী মারাঠা শিবাজী মহারাজা আসছে শাহ-ইন-শাহ্‌র দরবারে। সবার মুখে একই কথা। শিবাজীর সম্বন্ধে সত্যি মিথ্যে যে যা জানে তাই বলছে। সবারই মনে কৌতূহল আর ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা। সেই সঙ্গে একটুখানি গর্ব। এমন লোককেও আমাদের বাদশাহ সলামত বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছে!

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে এরাও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। শিবাজীর এর মধ্যে এসে পড়ার কথা। কেন, এই বিলম্ব? যেমনি কেল্লার ভিতরে, তেমনি কেল্লার বাইরেও নানারকম গুজব শোনা যাচ্ছে। সবারই উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তার আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছে কেল্লার নহবত নাকারার শব্দ। হঠাৎ এক সময় একটা শোরগোল শোনা গেল। সবার মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো,— এসে পড়েছে শিবাজী রাজা। কোথায়, কোথায় শিবাজী রাজা? গ্রীবা উত্থত করে সবাই তাকালো শাহী সড়কের বাঁকের দিকে। ওই তো, ওই

তো। না, না, ও শিবাজী নয়। ঘোড়ায় চেপে চারজন যারা আসছে, ওরা রাজপুত। মারাঠারা কোথায়?

দেখা গেল রাজপুত চারজনের পেছন পেছন আসছে একদল মারাঠা বারগির। তার পেছনে দেখা যাচ্ছে আরও অনেক লোকের মিস্‌ল্‌। জনতার হৈ-চৈ ক্রমশ উচ্চগ্রামে উঠতে লাগলো। আস্তে আস্তে কেল্লার কাছে এগিয়ে এলো সেই শোভাযাত্রা। সবার আগে উদ্যত বর্শা হাতে চারজন কছওয়া রাজপুত অশ্বারোহী। তাদের পেছন পেছন একদল মারাঠা বারগির। তাদের ঠিক পেছনে আরেকদল মারাঠা পিয়াদা। মাথায় তুর্কী টুপি, কোমরে খাটো তলোয়ার ঝুলছে। প্রায় সবাই শ্যামবর্ণ, হ্রস্বকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ-দর্শন। তারপর দেখা গেল একটা হাতি। সে বহন করছে শিবাজীর গৈরিক পতাকা, জায়গায় জায়গায় সিঁদুরে লাল, মাঝখানে সোনালী কাজ করা। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করতে করতে চলেছে শিবাজীর ফৌজ। হাতির পেছনে একটি "সুখপাল"। তার চালের আকার গম্বুজের মতো।' ডাণ্ডিগুলো রূপোয় মোড়া, তার থেকে রেশম ও রূপালী জরির গুচ্ছ ঝুলছে। তারপর শিবাজীর নিজস্ব পাল্কি। পাল্কির সমস্তটাই রূপোর তৈরী এবং নানা রকম কারুকার্য করা। ডাণ্ডিগুলো সোনার।

শিবাজীর পাল্কি, শিবাজীর পাল্কি,—বলে উঠলো সবাই। কিন্তু পাল্কির দিকে কারো চোখ গেল না। চোখ পড়লো পাল্কির পেছনে। দৃপ্তভঙ্গিতে অশ্বারোহণে আসছে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। একজনকে সবাই চেনে। বাদামী ঘোড়ার উপরে মির্জা রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র, আমেরের মহারাজকুমার রামসিংহ। তার পাশে শাদা ঘোড়ার উপর ও কে? ঈষৎ রক্তিম-শুভ্র তার সুগঠিত দেহের বর্ণ, মাথায় রেশম ও জরীর উষ্ণীষ। সুন্দর মুখমণ্ডলে সযত্নবিন্যস্ত কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফ শ্মশ্রু, স্নিগ্ধ আয়ত দুটি চোখ। সমস্ত ব্যক্তিত্বে একটা অনন্যসাধারণ রাজসিক মহিমা।

ইনি শিবাজী। ইনিই শিবাজী। চাপা গলায় শোনা গেল চারদিকে। এক মুহূর্তে নিশ্চল নিসাড় নিস্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত জনতা। শুধু শোনা গেল দুর্গপ্রাকারের ওদিক থেকে নহবতের মধুর আওয়াজ ভেসে আসছে।

শিবাজী ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে তাকালো না। রামসিংহের পাশে পাশে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে চললো কেল্লার দিকে। শিবাজীর পেছন পেছন এলো তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী ও মুখলিস খাঁ, তারপর তেজসিংহ কছওয়া, রামদাস রাজপুত, হিরাজী ফরজন্দ, ডুঙ্গরমল চৌধুরী, নিরাজী রাওজী, দত্ত ত্রিম্বক, রঘু মিত্র, পরমানন্দ কবিশ্বর, কৃষ্ণাজী আপ্তে এবং অন্যান্য মারাঠা সেনাধ্যক্ষেরা। প্রত্যেকেই অশ্বারূঢ়। তাদের পেছনে শিবাজীর দুটো হাতি। হাওদাগুলো খালি। তারপর এলো আরেকদল মারাঠা সিলাহদার। সবার পেছনে কুমার রামসিংহের কছওয়া রাজপুত দেহরক্ষী দল।

জনতা পেরিয়ে কেল্লার দিল্লী দরওয়াজা দিয়ে ভিতরে এসে শিবাজী, রামসিংহ এবং অন্যান্য সবাই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলো। শাহী মহলের চৌহদ্দির মধ্যে বাদশাহ এবং শাহজাদারা ছাড়া আর কেউ অশ্বারোহণে যেতে পারে না। দিওয়ান-ই-আম ডাইনে রেখে, গুলালবার অতিক্রম করেই সামনে দিওয়ান-ই-খাস। তেজসিংহের নির্দেশে শিবাজীর সহচরেরা গুলালবার অতিক্রম করেই থেমে গেল। কুমার রামসিংহের সঙ্গে শিবাজী আর শম্ভুজী হেঁটে চললো দিওয়ান-ই-খাসের অভিমুখে।

এক পাশে দাঁড়িয়েছিলো আবিদ হুসেন খাঁ ও শক্তিসিংহ। আবিদ হুসেন চক্ষু বিস্ফারিত করে জিজ্ঞেস করলো, "ইনিই শিবাজী রাজা?"

"হ্যাঁ, ইনিই শিবাজী," শ্রদ্ধায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে শক্তিসিংহ উত্তর দিলো।

"আহা, কী খুবসুরত, কী মশহুর চেহারা। আমাদের বাদশাহ্‌র ফৌজের সঙ্গে যারা সমানে লড়তে পারে, এমন রাজা তাদেরই হয়। মোতিজানকে যখন গিয়ে বলবো, সে খুশী হবে।"

শিবাজী পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ লক্ষ্য করলো এক তরুণ রাজপুত যোদ্ধা সসম্ভ্রমে তার দিকে তাকিয়ে আছে। শিবাজীর চোখ পড়তে সে করযুগল সংবদ্ধ করে অভিবাদন করলো। ঈষৎ হাস্য করে শিবাজী একটু মস্তকহেলন করলো। রামসিংহের চোখ পড়লো শক্তিসিংহের দিকে। শক্তিসিংহ তাঁকেও অভিবাদন করলো। রামসিংহ খানিকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গেই মাথা নাড়লো। এগিয়ে যেতে যেতে শিবাজী নিম্নকণ্ঠে রামসিংহকে বললো, "এ মুখ আমার পরিচিত। একে আমি কোথাও যেন দেখেছি।"

রামসিংহ উত্তর দিলো, "ও রাঠোর রাজপুত। মহারাজা জসবন্ত সিংহের ফৌজে আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখে থাকবেন।"

শিবাজী আর রামসিংহ দিওয়ান-ই-খাসের সামনে এসে থামলো। শক্তিসিংহ এদিকে মুখ ফেরালো শিবাজীর সহচরদের দেখবার জন্যে। দেখলো কৃষ্ণাজী আপ্তে দাঁড়িয়ে আছে কাছেই। শক্তিসিংহকে দেখে কৃষ্ণাজী মুখ ফিরিয়ে নিলো। শক্তিসিংহ অন্য দিকে এগিয়ে গেল। আবিদ হুসেনও যাচ্ছিলো সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ কি ভেবে এগিয়ে এলো কৃষ্ণাজীর কাছে। এক গাল হেসে বললো, "আরে ভাইজী, আপনিও এখানে? আমাকে চিনতে পারেন?"

কৃষ্ণাজীর মুখের কঠিন ভাবের কোনো পরিবর্তন হোলো না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো আবিদ হুসেনকে। তারপর একটা সৌজন্যের হাসি হেসে বললো, "আপনাকে চিনতে পারবো না? আপনি কিছুদিন আগে আমার একটা উপকার করেছিলেন। আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।"

"কৃতজ্ঞ! কেন, কী উপকার করেছিলাম আপনার?" বিস্মিত হয়ে আবিদ হুসেন জিজ্ঞেস করলো।

কৃষ্ণাজী একথার উত্তর না দিয়ে বললো, "আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে।"

আবিদ হুসেন চলে গেল শক্তিসিংহের পেছন পেছন।

দিওয়ান-ই-খাসের পেছনদিকে কতোগুলো খুব ছোটো ছোটো জাফরি ঢাকা ঝরোকা আছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মহলের বেগমেরা এখানে এসে দাঁড়ায়। পর্দার আড়াল থেকে অবলোকন করে দরবারের দৃশ্য। সেদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠান দিবস। তাই মহলের সমস্ত বিশিষ্ট বেগমই উপস্থিত ছিলো সেখানে। মনে মনে সবারই কৌতূহল ছিলো শিবাজীর জন্যে। শাহজাহানের দুই বিধবা পত্নী আকবরাবাদী মহল ও ফতেপুরী মহল, বাদশাহে্র তিন পত্নী রহমত-উন-নিসা বেগম, আওরঙ্গাবাদী মহল আর উদিপুরী মহল, বাদশাহ্র ভগ্নী রোশন আরা ও গওহর আরা, বৈমাত্রেয় ভগ্নী পরহুনরবানু, দারার কন্যা পাকনিহাদবানু ও জাহানজেববানু, সুলেমান শিকোর কন্যা সলিমা বানু, আওরংজেবের পাঁচ কন্যা জেব-উন-নিসা, জিনত-উন-নিসা, জুবদত-উন-নিসা, বদর-উন-নিসা, এমন কি পাঁচ বছর বয়স্কা শিশু শাহজাদী মেহের-উন-নিসাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। ছিলো না শুধু আওরংজেবের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জাহান আরা বেগম। সে অনেক বছর ধরেই কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে না।

বাদশাহ্র তখ্ত্এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো উজীর-উল-মুল্ক জাফর খাঁ। জাফর খাঁর পেছনে মুন্শী কাবিল খাঁ। একটু দূরে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলো কাজি-উল-কুজাত, খাঁ-ই-সামান, দিওয়ান-ই-তন, দিওয়ান-ই-খালসা আর দিওয়ান-ই-বুয়ুতাত। তাদেরই কাছাকাছি ছিলো দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস আকিল খাঁ। ঝরোকার জাফরির আড়াল থেকে জেব-উন-নিসার দৃষ্টি বার বার গিয়ে পড়ছিলো তার উপর, সবার অলক্ষ্যে। এক সময় দেখলো

কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ আকিল খাঁর কাছে এসে কানে কানে কি যেন বললো।

জিনত-উন-নিসা হেসে ফেললো। কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদ খাঁ কিছুদিন আগে আবিদ হুসেন খাঁর হাতে যে লাঞ্ছিত হয়েছিলো, সেই রসালো কাহিনী বাদশাহ্‌র হারেমেও পৌঁছেছিলো। জিনত-উন-নিসা খুব নিচু গলায় জেব-উন-নিসাকে বললো, "আবিদ হুসেনের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু সে ঠিকই বলেছিলো। এক জিন আর হুরী তার কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলো। ওই জিন তার হয়ে লড়াই করেছে ফুলাদ খাঁর সঙ্গে। ফুলাদ খাঁ যদি জানতো কে সেই জিন—!"

"শ্‌-শ্‌-শ্‌," চাপা গলায় ধমক দিলো জেব-উন-নিসা, "এখানে দেওয়ালেরও কান আছে।"

জিনত-উন-নিসা হাসতে লাগলো। বললো, "আমার তো একবার ওই আবিদ হুসেন লোকটাকে দেখবার ইচ্ছে আছে।"

জেব-উন-নিসাও হাসলো। চারদিকে তাকিয়ে বললো, "লোকটা ভয়ে সেই হুরীকে চেপে ধরেছিলো। কিন্তু খুব ভালো লোক সে। হুরী বলে টের পেতেই ছেড়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।"

"ওকে ইনাম দেওয়া উচিত।"

"আজকের দরবারে ওকে একটা খিলাত কি সরোপা দেওয়া উচিত ছিলো।"

"কিন্তু ওর তো মনসবদারি নেই। দরবারে আসবে কি করে?"

"ওর জন্যে একটা মনসবদারির ব্যবস্থা করা যায় না?"

"তুমি চেষ্টা করলে কি না হতে পারে," জিনত-উন-নিসা বললো।

"দেখি, কি করা যায়।"

অন্যদিকে একটা ঝরোকার পেছনে শিশু শাহজাদী মেহের-উন-নিসা তার জননী আওরঙ্গাবাদী মহলের কোলে বসে বার বার

বলছিলো, "আমি শিবাজীকে দেখবো। আমি শিবাজীকে দেখবো।" আওরঙ্গাবাদী মহল তাকে সামলে রাখবার চেষ্টা করছিলো বার বার। বিরক্তি বোধ করছিলো সে। শিশুদের লালন পালন করার অভ্যেস মহলের বেগমদের নেই। ওরা বড়ো হয় খাদিমানদের তত্ত্বাবধানে। এখানে কোনো খাদিমানের আসার হুকুম নেই বলে আওরঙ্গাবাদী নিজে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। এখন মনে হোলো, ওকে না নিয়ে এলেই হোতো। এখানে ঝরোকার পেছনে চুপিচুপি কথা বলাই রেওয়াজ যাতে বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ দিওয়ান-ই-খাসের ভিতরে না পৌঁছায়। শিশু-কণ্ঠের আওয়াজ বাদশাহ্‌র কানে গেলে অনেকরকম জবাবদিহি করতে হবে। স্থির করলো, শিবাজী আসার পর তাকে এক নজর দেখিয়েই বদর-উন-নিসা কি জাহানজেব বানু কারো কোলে তুলে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেবে। সেখানে খাদিমান অপেক্ষা করছে। সে মেহের-উন-নিসাকে নিয়ে যাবে মহলের ভিতর।

আকিল খাঁ জানতো, ঝরোকার জাফরির আড়ালে একজোড়া চোখ তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে একবারও সেদিকে দৃষ্টি ফেরালো না। দরবারের রীতিই এই। উপরে চালের কাছে ছোটো ছোটো জাফরি-ঢাকা ঝরোকাগুলোর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকায় না।

"সত্যি বলছি," জিনত-উন-নিসা জেব-উন-নিসাকে বললো, "আবিদ হুসেনের কিছু উপকার করা যাক।"

"তার জন্যে তোমার এত ব্যাকুলতা কেন?" হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো জেব-উন-নিসা।

"বোঝো না, যার এমন খুশ-কিসমতি যে, দুহাত দিয়ে বেহশ্‌ত্‌এর হুরীকে ছুঁয়ে দিয়েছে, সেই দুহাত দিয়ে এর পর সে যে সামান্য কাজ করবে, তাতে যে কোনো গুণগ্রাহী লোকের ইজ্জতে বাধে।"

বড়ো খামখেয়ালি মোগল শাহজাদীরা। ওই যে, কি ঝোঁকের মাথায় জিনত-উন-নিসা এখানে বসে বলে ফেললো, সেখান থেকেই আবিদ হুসেনের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা হোলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে কিছুই জানলো না। বাইরে গুলালবারের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের মনে গল্প করছিলো শক্তিসিংহ রাঠোরের সঙ্গে।

একধারে উদিপুরী মহল বসেছিলো গওহরআরা ও পরহুনর বান্নুর সঙ্গে। উদিপুরী বললো, "মারাঠা শিবাজী আগ্রায় এসে উপস্থিত হয়েও যে দিওয়ান-ই-আমে বাদশাহকে নজর দিতে রাজী হোলো না, এটা বড়ো বে-আদবি হয়েছে। শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র অসম্মান হয়েছে এতে। আমি তো আজ শাহ-ইন-শাহকে একথাই বলবো। এক বাগী মারাঠাকে নিয়ে এত শোরগোল করার কি প্রয়োজন। তাকে সোজাসুজি কয়েদ করলেই হয়। সে পুণাতে কি করেছে, সুরাটে কি করেছে এসব কথা এখন ভুলে গেলে চলবে কেন?"

"মির্জা রাজার পক্ষভুক্ত উমরাহেরা শাহ-ইন-শাহকে ভুল পরামর্শ দিয়ে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে।"

"মির্জা রাজা নিশ্চয়ই এই মারাঠার কাছ থেকে বহু অর্থ উৎকোচ পেয়েছে," বললো উদিপুরী মহল।

গওহরআরা বলে উঠলো, "আমিও সুযোগ পেলে এবিষয় নিয়ে আলোচনা করবো শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে। চাখতাইয়া খানদানের শরম-ইজ্জত সব কিছুরই ওপরে।"

উদিপুরী মহলের সঙ্গে রোশনআরা বেগমের সম্প্রীতি ছিলো না। উদিপুরী মহল যে একদা ছিলো শাহজাদা দারার পরসতার বা রক্ষিতা, একথা রোশনআরা ভুলতে পারতো না কিছুতেই। আওরংজেব যে উদিপুরীকে বিবাহ করে "মহল" অর্থাৎ দ্বিতীয়বর্গের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে, এর সমর্থন সে কোনোদিনই করতে পারেনি। উদিপুরীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে তার আত্মমর্যাদায় বাধতো। এক

সময় রোশনআরা দারার বিপক্ষে আওরংজেবের হয়ে ষড়যন্ত্র করেছে। তার খুব আশা ছিলো আওরংজেব বাদশাহ হওয়ার পর তার প্রভাব অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু উদিপুরী মহল ও জেব-উন-নিসার জন্যে সেটা সম্ভব হয়নি।

রোশনআরা অন্যত্র বসেছিলো আওরংজেবের পত্নী রহমত-উন-নিসার বেগমের সঙ্গে। রহমত-উন-নিসা, যাকে অন্তরঙ্গ মহলে সবাই নবাববাঈ বলে সম্বোধন করতো, ছিলো কাশ্মীরের রজৌরি রাজ্যের রাজপুত রাজা রাজুর কন্যা। সেই ছিলো একমাত্র জীবিতা 'বেগম' অর্থাৎ প্রথম বর্গের স্ত্রী। আওরংজেবের প্রথমা পত্নী দিলরস বানু বেগম বছর নয় আগে আওরঙ্গাবাদে ইহলীলা সংবরণ করেছিলো। আওরংজেব তখনো বাদশাহ হয়নি, তখন সে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। রহমত-উন-নিসা মালিকা-আলম অর্থাৎ প্রধানা মহিষীর সম্মান পেলেও মহলে তার কোনো প্রভাব ছিলো না, এবং আওরংজেবের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিলো না। সুতরাং রোশনআরার সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিলো খুব।

রোশন আরা চারদিকে তাকিয়ে রহমত-উন-নিসা বেগমের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বললো, "শিবাজীকে অপদস্থ করবার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে চারদিকে। মহারাজা জয়সিংহের সাফল্যের জন্য অনেকেই ঈর্ষান্বিত। এখন আওরংজেব ও মির্জা রাজার মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে চায় অনেকে। মহারাজা জয়সিংহ মোগল রিয়াসতের প্রকৃত হিতৈষী। উনি সিংহাসনের যুদ্ধে আওরংজেবকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। এখন উনি শিবাজীকে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন। এর পর শিবাজীর সহায়তায় উনি বিজাপুরও অধিকার করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং এখন কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া কি বাঞ্ছনীয়?"

রহমত-উন-নিসা বেগম বললো, "আমি আর কি বলবো।

আমার কথা তো শাহ-ইন-শাহ শুনবেন না। উদিপুরী যা বলবে তাই হবে।"

"উদিপুরী যা বলবে তা হবে না, হলে চলবে না," সরোষে বলে উঠলো রোশনআরা, "অনেক সংঘাত অনেক রক্তক্ষয়ের পর এই মোগল রাজ্য গড়ে উঠেছে, আমাদের স্বপ্ন হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার, তাও সফল হতে চলেছে। এখন যে কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঈর্ষা বিদ্বেষের জন্যে আমাদের এত বছরের স্বপ্ন মিথ্যে হবে, সে আমি সহ্য করবো না।"

"আপনি কি করতে পারেন?" রহমত-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো।

"আমি?" রোশনআরা হাসলো, "রোশনআরা বেগম সাহিবার আর আগের মতো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। কিন্তু এখনো সে অনেক কিছু করতে পারে। এখনো উমরাহদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা তাদের শ্রদ্ধেয়া ছোটী বেগম সাহিবার এক কথায় নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।"

"মহারাজা জয়সিংহের যাতে মান থাকে, আমাদের তার জন্যে কিছু করা উচিত," বললো রহমত-উন-নিসা বেগম।

"মালিকা আলম," রোশনআরা বললো, "হয়তো আপনার সাহায্যও আমার প্রয়োজন হবে।"

"আমার যথাসাধ্য আমি করবো," আশ্বাস দিলো রহমত-উন-নিসা।

এমন সময় দেখা গেল বাদশাহ্‌র মুশরিফ-ই-খওয়াস এসে দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস আকিল খাঁকে কানে কানে কি যেন বললো। আকিল খাঁ একটু চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলো উজীর জাফর খাঁর কাছে। নিচু গলায় কিছু যেন বললো জাফর খাঁকে। জাফর খাঁ সসম্ভ্রমে বাদশাহ্‌র তখ্‌ত্‌এর কাছে এগিয়ে এসে বোধহয় একই কথা জানালো আওরংজেবকে। আওরংজেব তাকালো আসাদ খাঁ বকশির দিকে। উজীরের ইঙ্গিতে আসাদ খাঁ বকশি

এগিয়ে এলো তখ্‌ত্‌এর কাছে। বাদশাহ তখ্‌ত্‌এ বসে আর কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা বলবে না। আওরংজেব আদেশ জানালো উজীরকে। উজীর সেই আদেশ শোনালো আসাদ খাঁ বকশিকে। আসাদ খাঁ বকশি কুর্ণিশ করে চলে গেল দিওয়ান-ই-খাসের বাইরে।

স্তব্ধ হয়ে রইলো দিওয়ান-ই-খাস। কিন্তু একটা চঞ্চলতা অনুভূত হোলো সবারই চোখে মুখে। সেই চঞ্চলতার ঢেউ পৌঁছালো জাফরি ঢাকা ঝরোকাগুলোর পেছনে বেগমদের মধ্যেও।

রোশনআরা রহমত-উন-নিসা বেগমকে বললো, "মালিকা আলম, নাটকের প্রথম দৃশ্য এবার শুরু হচ্ছে।"

আওরঙ্গাবাদী মহল শিশুকন্যা মেহের-উন-নিসাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বললো, "চুপ, চুপ, ওই বাগী মারাঠা আসবে। আওয়াজ করলে ধরে নিয়ে যাবে।" মেহের-উন-নিসা আওরঙ্গাবাদীর কোল থেকে নেমে জাফরির ছিদ্রতে চক্ষু সন্নিবিষ্ট করলো।

দিওয়ান-ই-খাসের ভিতরে সবারই মুখ পেছন দিকে ফিরলো। আসাদ খাঁ বকশির পেছন পেছন তিনজন প্রবেশ করলো দরবারের

"উনি শিবাজী?" জিনত-উন-নিসা বলে উঠলো।

জেব-উন-নিসার চোখ এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত আকিল খাঁর উপরই নিবদ্ধ ছিলো। এবার সেও চোখ ফিরিয়ে তাকালো।

প্রত্যেক মনসবদারেরই তার নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান নির্দিষ্ট আছে বাদশাহ্‌র দরবারে। মহারাজকুমার রামসিংহ নিজের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পড়লো। আসাদ খাঁ বকশির সঙ্গে শিবাজী আর শম্ভুজী এগিয়ে গেল বাদশাহ্‌র তখ্‌ত্‌এর দিকে। বাদশাহ্‌র মসনদের সামনে এসে শিবাজী তিনবার কুনিস করলো। শিবাজীর পরিচয় দিলো আসাদ খাঁ বকশি।

"শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে নজর ও নিসার এনেছেন শাহ-ইন-শাহ্‌র খাদিম দাক্ষিণাত্যের পুণা মহলের শিবা ভোঁসলে।"

ব্যস, এই পরিচয়। হয়তো,—হয়তো শিবাজীর মনের ভিতর একবার আগুন জ্বলে উঠেছিলো। কিন্তু মুখে কোনোরকম ভাব প্রকাশ পেলো না। সে শান্ত ভাবে আবার কুর্নিস করলো তিনবার। তারপর বাদশাহ্‌কে দিলো এক হাজার মোহর ও দু হাজার টাকা নজর আর পাঁচ হাজার টাকা নিসার। এর পর আবার তিন কুর্নিস।

তারপর শম্ভুজীকে উপস্থাপিত করা হোলো বাদশাহ্‌র সামনে, দেওয়া হোলো তার পরিচয়। সে বাদশাহ্‌কে দিলো পাঁচশো মোহর ও এক হাজার টাকা নজর আর দুহাজার টাকা নিসার।

আওরংজেব চোখ তুলে তাকালো না। একটা কথাও বললো না। উজীরের দিকে ফিরে আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষে বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়াল্‌এ জমা হয়ে যাওয়া যে-সমস্ত হিসাব খালাস করে দেওয়ার কথা ছিলো, তার ফর্দ দিতে বললো।

এটা ছিলো না অনুষ্ঠান সূচীতে। উজীর বুঝলো যে শিবাজীকে অবজ্ঞা করে কোনো প্রসঙ্গ অবতারণা করবার জন্যেই বাদশাহ এই হুকুম দিলো। কিন্তু হাতে কোনো ফর্দ নেই। অথচ খোলা দরবারে বাদশাহ্‌কে একথা বলা চলে না। হাতে অন্য একটি কাগজ ছিলো, আর মনে এলো শুধু একটি নাম। বললো, "ফর্দে আছে শুধু একজনের জন্যে সুপারিশ। পরলোকগত মহম্মদ হুসেন খাঁর যে সম্পত্তি বইত্-উল-মাল-ওয়া-আমুয়ালএ বাজেয়াপ্ত করা আছে, সেটা খালাস করে পরলোকগত মহম্মদ হুসেন খাঁর সুপুত্র আবিদ হুসেনকে প্রত্যর্পণ করার হুকুম দেওয়ার মেহেরবানি করা হোক।"

আওরংজেবও অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। সে বুঝলো জাফর খাঁর অবস্থা। নির্বিকার ভাবে নিমীলিত নেত্রে বললো,

“আবিদ হুসেন খাঁ অতি অল্পবয়স্ক। এত অর্থ তার হাতে প্রত্যর্পণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। সে অর্থ নষ্ট হতে পারে। আগে তাকে কোনো যোগ্য পদে নিযুক্ত করে তার মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান গড়ে তুলতে হবে। তারপর সমস্ত অর্থসম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের করুণা হলে, এর দ্বিগুণ ইনাম দেওয়া হতে পারে তাকে।”

“কেরামত, কেরামত,” শোনা গেল চারদিকে।

আওরংজেব বলে গেল, “উপস্থিত দশ হাজার টাকা বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়াল থেকে খালাস করে আবিদ হুসেনকে দেওয়া হোক। ওকে নিযুক্ত করা হোক দিওয়ান-ই-খাসের দারোগার নাইব। তাহলে সে দরবারের রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবে।”

ফুলাদ খাঁ হতচকিতের মতো তাকালো আকিল খাঁর দিকে। রদ-অন্দাজ খাঁর চোখে মুখেও বিস্ময়। আকিল খাঁ কোনো রকমে হাসি চাপলো।

“বাদশাহ মেহেরবানকে খোদা সলামত রাখুন,” গুঞ্জন উঠলো চারদিকে।

এতক্ষণ শিবাজী আর শম্ভুজী চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো। কোনো কথা বলা হোলো না তাদের। আওরংজেব এবার অন্য কাজে মন দিলো। আসাদ খাঁ বকশি শিবাজীকে এনে দাঁড় করালো পাঁচ হাজারী মনসবদারদের শ্রেণীতে, তাহির খাঁর জায়গায়, ঠিক রাজা রায় সিংহের সামনে। পাশে ছিলো মহারাজকুমার রামসিংহ। শিবাজী তাকে জিজ্ঞেস করলো খুব নিচু গলায়, “এখানে আমাকে দাঁড় করানো হোলো কিসের মর্যাদায়?”

রামসিংহের মুখমণ্ডল তখন ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠেছে। বললো, “এখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন পাঁচ হাজারী মনসবদারদের মধ্যে।”

"পাঁচ হাজারী!" শিবাজী সরোষে বলে উঠলো, "আমার ওই সন্তান বাদশাহ্‌র সামনে হাজির না হয়েও পাঁচ হাজারী হয়েছিলো। আমার খাদিম নেতাজী পালকরও পাঁচ হাজারী। শুধু এরই জন্যে আমাকে আগ্রা আসতে হোলো? বাদশাহ আওরংজেবের জন্যে এত করার পর আমাকে দেওয়া হোলো এই হীন পদমর্যাদা!"

রামসিংহ কোনো উত্তর দিলো না। কথাটা শিবাজী বলেছিলো ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে। কয়েকজন ফিরে তাকালো তার দিকে। কিন্তু অনেকেই কোনো মনোযোগ দিল না যেহেতু শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ ভ্রূক্ষেপও করলো না শিবাজীর প্রতি। স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চললো দরবারের কাজ।

শিবাজী রামসিংহকে জিজ্ঞেস করলো, "সামনে যে রাজপুত দাঁড়িয়ে আছেন, উনি কে?"

"মহারাজা জসবন্ত সিংহ," উত্তর দিলো রামসিংহ।

শিবাজীর কণ্ঠস্বর এবার আরেক পর্দা চড়লো। বললো, "সেই জসবন্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে যার পৃষ্ঠপ্রদর্শন ,আমার সৈন্যেরা বারবার উপভোগ করেছে? তারই পেছনে দাঁড়াতে হবে আমাকে!"

মহারাজা জসবন্ত সিংহের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করলো। কিন্তু ফিরে তাকালো না।

বাদশাহ্‌র জন্মদিবস উপলক্ষে তখন ওমরাহ ও মনসবদারদের মধ্যে পান-বিরা বিতরিত হচ্ছে। শিবাজীকেও একটি দেওয়া হোলো। শিবাজী একবার ভাবলো গ্রহণ করবে না। তারপর মনে হোলো এতটা অসৌজন্য প্রকাশ করা শোভন হবে না। সে চুপচাপ গ্রহণ করলো পান-বিরা, সবার দেখাদেখি কপালে ঠেকালো।

এর পরের অনুষ্ঠান খিলাত বিতরণ। সারা বছরের বিশিষ্ট সেবার জন্যে এই ইনাম। খিলাত প্রথমে দেওয়া হোলো শাহজাদা মহম্মদ আজম ও মহম্মদ আকবরকে। তারপর দেওয়া হোলো

উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁকে। জাফর খাঁর পরে মহারাজা জসবন্ত সিংহকে।

খিলাত বিতরণের পর শিবাজীর মনে হোলো তাকে যেন বিশেষ করে বাদ দেওয়া হচ্ছে এসব সম্মান থেকে। সে খুব বিষণ্ণ আর অস্থির হয়ে পড়লো। ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলো তার মুখ। চোখ দুটো অপমানে অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো।

আওরংজেবের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। নিজের আসন থেকে লক্ষ্য করলো শিবাজীর ক্রোধ ও অস্থিরতা। কুমার রামসিংহকে কাছে ডাকিয়ে এনে উজীর-উল-মুল্‌কের মারফতে বললো, "শিবাজীকে জিজ্ঞেস করো, ওর কি হয়েছে। ওর কি এখানে কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে?"

মহারাজকুমার রামসিংহ ফিরে এলো শিবাজীর কাছে। বললো, "শাহ-ইন-শাহ জানতে চাইছেন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?"

শিবাজীর ফরশা মুখ লাল হয়ে গেল, কিন্তু আত্মসংবরণ করে বললো, "আমি শিবাজী, মারাঠাদের রাজা। আমার মানসম্ভ্রম আমার যোগ্যতা, আমার ক্ষমতা, আমার শক্তি, আমার ব্যক্তিত্ব, সব কিছুর পরিচয় আপনি পেয়েছেন, আপনার পিতা, আপনার বাদশাহ, সবাই পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও, আপনারা আমার যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি। আমি আপনাদের দেওয়া মনসব প্রত্যাখ্যান করছি।"

একথা বলে শিবাজী আর দাঁড়ালো না। দরবারের আদব কায়দা তুচ্ছ করে শাহী তখ্‌ত্‌এর দিকে পেছন ফিরে উদ্ধত পদক্ষেপে বেরিয়ে চলে গেল দিওয়ান-ই-খাস থেকে। রামসিংহ শিবাজীর হাত ধরে তাকে নিবারণ করবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু পারলো না। শিবাজী সবলে হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। দিওয়ান-ই-খাসের এক পাশে বিস্তৃত অলিন্দ। সেখানে মর্মরস্তম্ভের পেছনে বসে পড়লো উত্তেজনার অবসাদে।

কুমার রামসিংহ বাদশাহ্‌র দিকে তাকালো। বাদশাহ নিমীলিত নয়নে ঈষৎ মস্তক হেলন করলো। রামসিংহও বেরিয়ে এলো শিবাজীর পেছন পেছন। বললো, "শিবাজী, এভাবে শাহ-ইন-শাহ্‌র বিনা অনুমতিতে দরবার থেকে বেরিয়ে আসা আদব নয়।"

"দরবারের আদবকায়দার চাইতে আমার ইজ্জৎ বড়ো," উত্তর দিলো শিবাজী।

"শাহ-ইন-শাহ অসন্তুষ্ট হবেন। তাতে আপনার কোনো উপকার হবে না।"

"আওরংজেবের ভয় আমি করি না। একথা যদি আপনাদের বাদশাহ এখনো না বুঝে থাকেন, এবার আমি এমন ভালো করে বুঝিয়ে দেবো যে আপনাদের বাদশাহ্‌কে সারাজীবন অনুতাপ করতে হবে।"

কুমার রামসিংহ শঙ্কিত হোলো শিবাজীর ভাষা শুনে। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালো। ধারে কাছে কেউ নেই। দিওয়ান-ই-খাসের ভিতর থেকে প্রায় সবাই আড় চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সোজাসুজি তাকাচ্ছে না কেউ। কারণ, বাদশাহ কোনো রাজকীয় বিষয় আলোচনা করছে উজীর-উল-মুল্‌কের সঙ্গে। সে দিকে কারো মনোযোগ নেই, এরকম ভাব প্রকাশ পাওয়া বাদশাহ্‌র প্রতি অসম্মানজনক।

রামসিংহ একটু আশ্বস্ত হোলো। শিবাজীর কথা শুনতে পায়নি কেউ।

"আপনি দু-একদিন ধৈর্য ধরে থাকুন," রামসিংহ বললো, "শাহ-ইন-শাহ খুবই মেহেরবান, আপনার আক্ষেপ করার কোনো কারণ থাকবে না। তিনি স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁকে ভুল বুঝবেন না।"

"আপনাদের বাদশাহ্‌র মেহেরবানির নমুনা আমি খুব পেয়েছি," শিবাজী উত্তর দিলো, "যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। আওরংজেবকে

আমার ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই। ওঁকে আমার চাইতে ভালো আর কেউ বোঝে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি আগ্রায় এসে ভুল করেছি। ওঁর আজকের ব্যবহারে আমার চোখ খুলে গেছে। আপনারা বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি আমার সম্বন্ধে ওঁর আসল উদ্দেশ্যটা কি।"

কুমার রামসিংহ আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর নিচু গলায় বললো, "আমিও সবই বুঝি শিবাজী। আপনি প্রকাশ্যে এরকম ব্যবহার করলে আপনার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে না। আমার পরামর্শ শুনুন। আপনি এখন ফিরে চলুন দরবারে। পরে এর একটা বিহিত করার পরিকল্পনা স্থির করা যাবে।"

"আওরংজেবকে আমি ভয় পাই না," উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠে শিবাজী বললো, "হয়তো আমার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্রও ভয় নেই। হয় আপনারা আমায় হত্যা করুন, কিংবা আমি নিজের প্রাণ নিজে নেবো। যদি ইচ্ছা হয়, আপনারা আমায় কোতল করতে পারেন, কিন্তু আমি আর আপনাদের ওই উদ্ধত অকৃতজ্ঞ বাদশাহ্‌র সামনে হাজির হবো না।"

শিবাজী দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝরোকার পেছনে অন্তরালবর্তিনী বেগমদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠে ছিলো। বাদশাহ্‌র নজরের বাইরে বলে এই চাঞ্চল্য গোপন করারও কোনো প্রয়োজন ছিলো না। সবাই মর্মর-জালির উপর ঝুঁকে ঝুঁকে পড়লো।

"শিবাজী অত্যন্ত সুপুরুষ," জেব-উন-নিসা বললো জিনত-উন-নিসাকে, "কি রকম দৃপ্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল। আর কারো সাহস হোতো না।"

"কিন্তু এভাবে চলে গেল কেন?" জিনত-উন-নিসা জিজ্ঞেস

করলো, "শাহ-ইন-শাহ্‌র মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু উনি যেরকম স্থির নিশ্চল হয়ে আছেন, মনে হচ্ছে খুব ক্রুদ্ধ হয়েছেন।"

"ভাবনার কথা," জেব-উন-নিসা উত্তর দিলো, "সত্যিই ভাবনার কথা। কিন্তু জানতে হচ্ছে, ব্যাপারটা কি।"

গওহর-আরা বেগম দরবারের ঘটনাটা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। উদিপুরী মহলের দিকে ফিরে বললো, "কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। শিবাজী অপমানিত বোধ করেছে। বাদশাহও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ভালোই হয়েছে। বাদশাহ এবার বুঝতে পারবেন যে ওই মারাঠাকে এতখানি আস্কারা দেওয়া ঠিক হয়নি।"

উদিপুরীমহল উত্তর দিলো, "আমাদের তকদির আমাদের সহায়। যা বুঝছি আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে বেশী বেগ পেতে হবে না।"

পরহুনর-বানু চাপা গলায় বলে উঠলো, "ওই দেখুন, ছোটী বেগম সাহিবা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।"

গওহর-আরা আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো রোশন-আরার দিকে। কিন্তু উদিপুরীমহল তাকালো না। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে। অস্ফুট হিমশীতল কণ্ঠে বললো, "ছোটী বেগম সাহিবার প্রতিপত্তি শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু একথা সে মেনে নিতে চায়না। ওর কপালে আরো অনেক হতাশা আছে।"

রোশন-আরা রহমত-উন-নিসা বেগমের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, "হঠাৎ কি হোলো বুঝতে পারছি না। শিবাজী ওভাবে বেরিয়ে চলে গেল কেন?"

"দরবারের আদবকায়দা জানে না বোধ হয়," উত্তর দিলো রহমত-উন-নিসা।

"শিবাজীর কোনো রকম অসম্মান হয়েছে নিশ্চয়ই!"

রহমত-উন-নিসা কোনো উত্তর দিলো না। রোশন-আরা নীরবে কিছু একটা চিন্তা করলো, তারপর খুব চাপা গলায় বললো, "খোজা ইয়ার লতিফকে একবার পাঠাতে হবে শিবাজীর কাছে। ওর জানা দরকার যে, আমরা ওর পেছনে আছি। বিজাপুর মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত করার আগে পর্যন্ত শিবাজীকে বিরূপ করা উচিত হবে না।"

"শাহ-ইন-শাহ্‌কে অনেকে ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন," বললো রহমত উন-নিসা।

"ওরা জানে না যে রোশন-আরা বেগম এখনো আওরংজেবকে নিজের ইচ্ছে মতো পরিচালিত করতে পারে।"

"আম্মিজান," শাহজাদী মেহের-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো তার জননী আওরঙ্গাবাদী মহলকে, "শিবাজী চলে গেল?"

"হ্যাঁ, চলে গেল।"

"আর আসবে না?"

"বোধ হয় আর আসবে না।"

পাঁচ বছরের শিশুর কৌতূহল আর রইলো না। সে একটা হাই তুললো।

"তোমার ঘুম পাচ্ছে," বললো তার জননী, "তুমি এখন মহলে ফিরে যাও।"

মেহের-উন-নিসা নেমে পড়লো আওরঙ্গাবাদী মহলের কোল থেকে। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো বাইরে খাদিমানের কাছে।

"ওই দেখ, কুমার রামসিংহ একলা ফিরে আসছে," বলে উঠলো জিনত-উন-নিসা। জেব-উন-নিসা ঝুঁকে পড়লো জাফরির উপর।

মহারাজ কুমার রামসিংহ তখ্‌ত্‌এর সামনে এসে কুর্নিস করলো।

"বলো, শিবার কি ফরিয়াদ," আওরংজেব নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"জাহাঁপনা, হিন্দুস্তানের গ্রীষ্মকালের আবহাওয়া পার্বত্য অঞ্চল নিবাসী মারাঠার সহ্য হচ্ছে না। দরবারে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এই কক্ষের উত্তাপে শিবাজী অসুস্থ বোধ করছেন। তাই, বাইরে চলে গেলেন খোলা হাওয়ায়।"

"সভ্য সমাজের বাদশাহ্‌র দরবারের গরম একজন পাহাড়ী জংলির সহ্য হওয়ার কথা নয়," মৃদু হেসে আওরংজেব বললো, "বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমার অনুমতি নেওয়া যে আদব সেকথা ওকে নিশ্চয়ই কেউ জানায়নি। সে পার্বত্য বর্বর, সভ্য সমাজের আদব কায়দা কি করে জানবে। ওর কোনো অপরাধ হয়নি। অপরাধ তোমার।"

রামসিংহের মুখ লাল হয়ে গেল। মনের রাগ মনে চেপে বিনীত কণ্ঠে রাজপুতবীর বললো তার মোগল প্রভুকে, "অপরাধ স্বীকার করছি আলমপনাহ। আমার কসুর মাফ করা হোক।"

হঠাৎ জ্যা-ছিন্ন ধনুকের মতো সোজা হয়ে বসলো আওরংজেব। কঠিন কণ্ঠে বললো, "এসব অবান্তর কথা। কে অসুস্থ, কে সুস্থ বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। এই সামান্য কারণটা জানবার জন্যে তোমাকে ওর কাছে পাঠাইনি। আসল কথাটা কি?"

"শাহ-ইন-শাহ হয়তো খুশী হবেন না—।"

"সত্যি কথাই আমাকে খুশী করে, অন্য কিছু নয়।"

"আলমপনাহ, শিবাজী মনে করেন তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা উজীর-উল্-মুল্‌ক জাফর খাঁ আর মহারাজ জসবন্ত সিংহের চাইতে কম নয়। তাঁকে অবহেলা করে ওঁদের খিলাত দেওয়া হয়েছে, এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।"

"ও।" আওরংজেব মৃদু হাসলো। "শুধু একটি খিলাতের জন্যে? আমার পাঁচ বছরের শিশু কন্যা মেহের-উন-নিসা খেলনার জন্যে, পুতুলের জন্যে এরকম অভিমান প্রকাশ করে। সরল পাহাড়ী জংলিদের এই শিশুসুলভ মনোভাব কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে।

এই সরলতাই তাদের একমাত্র গুণ। দাও, দাও, ওকে একটা খিলাত দাও।"

জাফরির পেছনে জিনত-উন-নিসা জেব-উন-নিসাকে চুপিচুপি বললো, "ওই দেখ, তোমার পুরোনো দিনের মাশুক এগিয়ে আসছে শাহ-ইন-শাহ্‌র দিকে।"

জেব-উন-নিসা রুষ্ট হোলো। বললো, "চুপ, কেউ শুনলে কি ভাববে?"

জিনত-উন-নিসা হাসলো, মুখ নিয়ে গেল জেব-উন-নিসার কানের কাছে, "বহন্‌জী-সাহিবা, দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা আকিল খাঁ মিঞার খাতির শাহ-ইন-শাহ্‌র দরবারে বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন। খুব গুরুতর কিছু ঘটে গেছে বুঝতে পারছি। এবং শাহ-ইন শাহ কোনো একটা বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করছেন ওঁর উপর। ওই দেখ, আকিল খাঁ একলা নয়, ওঁর পেছন পেছন এগিয়ে আসছে মুলতাফত খাঁ আর মুখলিস খাঁ।"

জাফরির ভেতর দিয়ে দুই শাহজাদী দেখতে পেলো আকিল খাঁ মুখলিস খাঁ আর মুলতাফত খাঁ বাদশাহ্‌র তখ্‌ত্‌এর সামনে এসে কুর্নিস করলো।

শিবাজী মর্মর-স্তম্ভের পাশে বসে মাথায় হাত দিয়ে নানাকথা ভাবছিলো। এমন সময় পায়ের সাড়া শুনে মুখ তুলে তাকালো। দেখলো, তিনজন সম্ভ্রান্ত মোগল এগিয়ে আসছে তার দিকে। শিবাজী উঠে দাঁড়ালো না, তাকালোও না তাদের দিকে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

একজন তার সামনে এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে। সালাম করে বললো, "শিবাজী, আমি আকিল খাঁ, দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস।"

শিবাজী মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, আপনার নাম

আমি শুনেছি। আপনাদের বাদশাহ যখন দাক্ষিণাত্যে সুবাদার ছিলেন তখন আপনি ছিলেন তাঁর জিলওদার।"

"আমার খুবই খুশ কিসমতি যে আপনি আমাকে মনে রেখেছেন। ইনি আমার বন্ধু মুখলিস খাঁ।"

"হ্যাঁ, ওঁকে আমি চিনি। আজ সকালে কুমার-জীর সঙ্গে উনি আমার অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন।"

"আর ইনি হলেন মুলতাফত খাঁ, দরবারের একজন বিশিষ্ট মনসবদার।"

শিবাজী এবার মুখ ফেরালো। তাকিয়ে দেখলো তিনজনকে। বললো, "মুলতাফত খাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার এ পর্যন্ত হয়নি।"

"মেহেরবান শাহ-ইন-শাহ আপনার মনোবেদনার কথা শুনে আমাদের পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। উনি আপনার জন্যে এই খিলাত দিয়েছেন।"

"এতক্ষণে!"

"আপনার প্রতি কোনোরকম অবজ্ঞাপ্রদর্শন করার ইচ্ছে শাহ-ইন-শাহ্‌র ছিলো না। আজ আপনি প্রথম দরবারে এসেছেন। এজন্যে প্রথম দিনেই অন্য সবার সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলে অন্য সবার মতো খিলাত আপনাকে দিতে চাননি। তাঁর ইচ্ছে ছিলো, পরে এক সময় বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত দরবারে আপনাকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করবেন।"

শিবাজী শুকনো হাসি হাসলো। বললো, "দরবারের অনুষ্ঠান আমিও করে থাকি। কোন্‌ উদ্দেশ্যে কার সঙ্গে কখন কোন্‌রকম ব্যবহার করা হয়, সেসব রহস্য আমার একেবারে অজ্ঞাত নয়।"

"শিবাজী, অকারণ অভিমান করবেন না," বললো আকিল খাঁ।

"অভিমান আমি করিনা। তবে আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগলে আমি তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করি।"

মুখলিস খাঁ আর মুলতাফত খাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেল ওরা দুজনে। কিন্তু আকিল খাঁ হাল ছাড়লো না। হাসিমুখে বললো, "শিবাজী, আপনি যদি এই খিলাত পরিধান করে আমাদের অনুগমন করে দরবারে ফিরে আসেন, শাহ-ইন-শাহ সন্তোষ লাভ করবেন।"

"আমার অসম্মানে উনি যতো সন্তোষ লাভ করেছেন, তার বেশী সন্তোষ আমার প্রত্যাবর্তনে পাবেন না।"

আকিল খাঁর অসীম ধৈর্য। সহজ কণ্ঠে বললো, "আজ খুব গরম পড়েছে। হিন্দুস্তানে এসময় আবহাওয়া ভালো থাকে না। আপনি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। সেখানে যে এত গরম পড়ে না তা আমি জানি!"

"আপনারা অনর্থক আবহাওয়ার আলোচনা করে আমার এবং আপনাদের সময় নষ্ট করছেন।"

মুখলিস খাঁ আর মুলতাফত খাঁর মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। কিন্তু আকিল খাঁ কৌতুকবোধ করলো শিবাজীর ক্রোধ দেখে। হেসে বললো, "আপনি এই খিলাত গ্রহণ করবেন না?"

"না।"

"তাতে কিন্তু শাহ-ইন-শাহ্‌র প্রতি অসম্মান দেখানো হবে।"

"আজ আমার যা অসম্মান হয়েছে, তার বেশী অসম্মান কেউ কাউকে করতে পারে না।"

"আপনি এই খিলাত পরিধান করে শাহ-ইন-শাহ্‌কে কুর্নিস করবার জন্যে দরবারে ফিরে আসবেন না?"

"না।"

"শাহ-ইন-শাহ তাহলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।"

"শুধু দুঃখিত নয়," মুখলিস খাঁ বলে উঠলো, "উনি রীতিমতো রুষ্ট হবেন।"

"আমি হলে আগ্রায় বসে শাহ-ইন-শাহ্‌কে রুষ্ট হবার কারণ সৃষ্টি হতে দিতাম না," বললো মুলতাফত খাঁ।

শিবাজী ক্রোধে ফেটে পড়লো। সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আগ্রায় বসে আছি বলে আপনাদের এই উদ্ধত কথাবার্তা আমি নীরবে সহ্য করছি। মহারাষ্ট্র হলে আজ আমি অন্য ভাষায় এর উত্তর দিতাম। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি কার কতো ক্ষমতা। অত্যন্ত কাপুরুষ ছাড়া কেউ প্রতিপক্ষ অতিথির সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে না।"

এবার আকিল খাঁও গম্ভীর হয়ে গেল। শান্ত কণ্ঠে বললো, "শিবাজী, আমরা কাপুরুষ নই। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরাও যথেষ্ট আত্ম-মর্যাদা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছি। আপনি আমাদের মেহমান। আপনার কোনোরকম অমর্যাদা করার ইচ্ছে আমাদের নেই। কিন্তু একটা ভুলবোঝাবুঝির ফলে এই অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শাহ-ইন-শাহ তাঁর সদিচ্ছার পরিচয় দেওয়ার জন্যেই এই খিলাত সহ আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আপনাকে সসম্মানে দরবারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি আপনার শুভার্থী। আমার কথা শুনুন, আপনি এই খিলাত পরিধান করে আসুন আমাদের সঙ্গে—।"

"না, না, না," শিবাজী গর্জে উঠলো, "আমি কারো কোন কথা শুনতে চাইনা। আমি প্রত্যাখ্যান করছি এই খিলাত। আপনাদের বাদশাহ ইচ্ছে করে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে আমাকে স্থান দিয়েছেন জসবন্ত সিংহেরও নিচে। আমার মতো মান সম্ভ্রম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তিনি তুচ্ছ করে অবহেলা করে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।"

"এ কি বলছেন শিবাজী," আকিল খাঁ স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠলো।

"সত্যি কথাই বলছি। শিবাজী কপটতা জানে না। আমি চাই না আওরংজেবের মনসব, আমি তার খাদিম তার বান্দা হতে

এখানে আসিনি। আপনারা যদি চান আমায় কয়েদ করতে পারেন, আমায় কোতল করতে পারেন। কিন্তু ঐ খিলাত আমি স্পর্শ করবো না।”

জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা দেখলো আকিল খাঁ, মুখলিস খাঁ আর মুলতাফত খাঁ ফিরে আসছে।

“বোধ হয় শিবাজীকে ইত্তলা দিয়েছিলেন শাহ-ইন-শাহ,” জিনত-উন-নিসা বললো, “কিন্তু শিবাজী আর দরবারে হাজির হতে রাজী নয়।”

বাইরে থেকে ভেতরে খোজাদের মারফত খবর আদান প্রদান হয় খুব তাড়াতাড়ি। এতক্ষণে বেগমেরা সবাই শুনতে পেয়েছিলো আসল ঘটনার বিবরণ।

জেব-উন-নিসার মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে গেছে। বাদশাহ আওরংজেবের দরবারে এরকম ঔদ্ধত্য, এরকম বে-আদবি অভূতপূর্ব, অভাবনীয়। বললো, “দরবারে সব উমরাহ মনসবদার নিসাড় নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই শাহ-ইন-শাহ্‌র মুখের উপর দেখা যাচ্ছে তীব্র ক্রোধের আভাস।”

“ওই দেখ, কুমার রামসিংহ এগিয়ে আসছেন শাহ-ইন-শাহ্‌র তখ্‌ত্‌এর দিকে।”

বাদশাহর ইশারা পেয়ে রামসিংহ সামনে এসে তিনবার কুর্নিস করলো।

“রামসিংহ,” আওরংজেব বললো, “আমাদের অনুগত খাদিম শিবাজী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দরবারে ফিরে এসে আমাকে কুর্নিস জানানোর মতো অবস্থাও তার নয়। একথা শুনে আমি খুব দুঃখিত ও ব্যথিত হয়েছি। আমার অসীম মেহেরবানির অভিব্যক্তি স্বরূপ দরবার ভঙ্গ হবার আগেই তাকে প্রত্যাগমন করবার হুকুম দিচ্ছি। তুমি তাকে তোমার দৌলতখানায় নিয়ে যাও। তার

যথাবিহিত পরিচর্যা করো। তাকে বুঝিয়ে দিও যে, আমি তার প্রতি অপ্রসন্ন নই। বরং তার জন্যে আমার মনে প্রচুর সহানুভূতি আছে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সে আগ্রায় এসেছে, এখানকার জল হাওয়া তার হঠাৎ সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু আমার প্রতি আনুগত্যে সে যদি অটুট থাকে তাহলে দরবারের পরিবেশ ও আবহাওয়া তার ক্রমে সয়ে যাবে। আশা করি অচিরেই সুস্থ হয়ে সে দরবারে হাজির হয়ে আমাদের আনন্দবর্ধন করবে।"

"কেরামৎ, কেরামৎ," বলে উঠলো দরবারের সমস্ত উমরাহ।

"শাহ-ইন-শাহ মেহেরবান। খোদা বাদশাহ্‌কে সলামত রাখুন," বললো উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁ।

রামসিংহ তিনবার কুর্নিস করলো। তারপর কয়েক পা পিছু হটে কুর্নিস করলো আবার। দিওয়ান-ই-খাসের নিষ্ক্রমণ পথে উপস্থিত হয়ে কুর্নিস করলো তৃতীয়বার। তারপর চলে গেল সবার দৃষ্টির আড়ালে।

এতক্ষণ সবাই চুপ করে ছিলো। এখন শুরু হোলো বিভিন্ন কণ্ঠের গুঞ্জন।

"শাহ-ইন-শাহ বড়ো মেহেরবান," বললো অনেকে। "শিবাজী এতখানি বে-আদবি করেছে, তবু শাহ-ইন-শাহ তাকে মার্জনা করেছেন।"

"শিবাজীর কাছ থেকে এ ছাড়া আর কি ব্যবহার আশা করা যায়," বললো যারা শিবাজীর নামও সহ্য করতে পরতো না।

"মির্জা রাজার উচিত হয়নি মারাঠার সঙ্গে সন্ধি করা। তাদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা উচিত ছিলো," বললো আর হু'তিনজন।

"যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শিবাজীর শিক্ষা হয়নি," শোনা গেল আরেকজনের কণ্ঠে, "কিছুদিন কয়েদখানায় থাকলে তার মস্তিস্ক শীতল হবে।"

সৈয়দ মুরতজা খাঁ আস্তে আস্তে বললো, "শিবাজী একটা জংলী জানোয়ার। ওকে আস্তে আস্তে পোষ মানাতে হবে। আজ সে খিলাত গ্রহণ করেনি, কিন্তু কাল খিলাত পরিধান করতে আপত্তি করবে না।"

এতক্ষণ আওরংজেব বসেছিলো নিমীলিত নেত্রে। সৈয়দ মুরতজা খাঁর কথাটা কানে যেতে চোখ তুলে তাকালো। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চোখ দুটি, কিন্তু মুখে কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পেলো না।

চিক ফেলে দিলো বাদশাহ। দরবার ভঙ্গ হোলো।

দিওয়ান-ই-খাসের পেছনের অলিন্দে বেগমরাও উঠে পড়লো যার যার আসন ছেড়ে।

রহমত-উন-নিসা রোশন-আরাকে বললো, "খোজা ইয়ার লতিফকে এবেলাই পাঠিয়ে দাও ফিরোজাবাগে। খোঁজ খবর নিয়ে আসুক। তারপর আমরা বসে স্থির করবো আমাদের কি করা উচিত।"

গওহর-আরা উদিপুরী মহলকে বললো, "আজ মধ্যাহ্নে শাহ-ইন-শাহ যখন মহলে বিশ্রাম করতে আসবেন তখন শিবাজীর প্রসঙ্গটা উত্থাপন কোরো। যদি দরকার হয় আমাকে ইত্তলা দিয়ো। আমিও হাজির হবো শাহ-ইন-শাহ্‌কে তসলিম জানাতে।"

"আজ?" উদিপুরী একটু ভাবলো, "না, আজ নয়, কয়েকটা দিন যাক। ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে এই পরিস্থিতি। ভাবছি, আজ একবার কোতোয়াল ফুলাদ খাঁকে ইত্তলা দেবো।"

জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা ছিলো সবার থেকে একটু তফাতে। জিনত-উন-নিসা বললো, "খবর চাই। সব খবর চাই। কার উপর ভার দেবো? মহল থেকে কাউকে পাঠালে জানাজানি হয়ে যেতে পারে।"

"আছে একজন।"

"উপযুক্ত ?"

"খুব। তাকে কেউই সন্দেহ করবে না।"

"কে সে ?"

"আমাদের আবিদ হুসেন।"

"আবিদ হুসেন ?" জিনত-উন-নিসা হাসলো, "হ্যাঁ, তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। রাজপুত শক্তিসিংহের সঙ্গে তার খুব সখ্যতা। সেটা মস্ত সুবিধে।"

"কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি করে ?"

জিনত-উন-নিসা জেব-উন-নিসার দিকে তাকালো। বললো, "আকিল খাঁ কি আমাদের হয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে অসম্মত হবে ?"

"আকিল খাঁ !"

"তার কাছে নিশান পাঠাও।"

"তারপর ?"

"সে লুকিয়ে একবার আঙ্গুরীবাগে আসবে।"

"অসম্ভব, সন্ধ্যেবেলা বেগমেরা সবাই সেখানে হাওয়া খেতে যায়।"

"সন্ধেবেলা কেন ? মধ্যাহ্নে, এই ধরো তৃতীয় প্রহরের কিছু আগে। তখন এত গরম, কেউ বাইরে বেরোয় না। দেওড়ি চৌকিও তখন ঘুমে ঢুলতে থাকে। দিওয়ান-ই-আমের ওদিকে গুলালবারের পাশ দিয়ে এসে প্রাচীর পার হয়ে আঙ্গুরীবাগে ঢুকবে।

"দিনের আলোয় ?"

"তখনই নিরাপদ। কেউ থাকবে না আঙ্গুরীবাগে। আর আমি থাকবো তোমার সঙ্গে।"

"কিন্তু প্রাচীর পার হয়ে আসবে দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা সাহাব। ধরা পড়লে খুব বেইজ্জতি হবে।"

"এই ঝুঁকি সে জীবনে বহুবার নিয়েছে," জিনত-উন-নিসা হেসে বললো।

দিল্লী দরওয়াজার কাছে ঘোড়ায় চেপে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল শিবাজী আর রামসিংহ। তাদের পেছন পেছন গেল শিবাজীর সহচরবৃন্দ ও রামসিংহের কছওয়া রক্ষীবাহিনী।

গুলালবারের কাছে দাঁড়িয়ে শক্তিসিংহ আর আবিদ হুসেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। একটু পরে আবিদ হুসেন বললো, "চলো আমরাও যাই।"

বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, ততক্ষণে তাদের কাছেও খবর পৌঁছে গেছে। শিবাজী দরবারে বে-আদবি করেছে। শাহ-ইন-শাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজের শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছে। নানা রকম জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে সবার মধ্যে। কেউ বলছে শিবজীকে বলা হবে আগ্রা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে। কেউ বলছে শাহ-ইন-শাহ কয়েদ করবে শিবাজীকে। অনেকে উড়িয়ে দিচ্ছে এসব গুজব। তাদের অভিমত, মির্জা রাজা নিজের দায়িত্বে শিবাজীকে আগ্রায় পাঠিয়েছে। শাহ-ইন-শাহ মির্জা রাজাকে অসন্তুষ্ট করবেন না।

"চলো আমরাও যাই," বললো আবিদ হুসেন।

"কোথায় ?"

"খোজা ফিরোজার বাগের দিকে।"

"কেন ?"

"খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, এর পর শিবাজী কি করেন।"

শক্তিসিংহ বললো, "তুমি যাও।"

"তুমি যাবে না ?"

"আমার পক্ষে তো এখান থেকে নড়বার উপায় নেই। আমি এসেছি আমাদের মহারাজার সঙ্গে, সুতরাং ফিরতেও হবে ওঁর সঙ্গে।"

আবিদ হুসেন চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কে যেন ডাকলো পেছন থেকে। ফিরে তাকিয়ে দেখলো মুখলিস খাঁ এগিয়ে আসছে তার দিকে। তার বেশ হাসি হাসি মুখ। বললো, "ওহে আবিদ হুসেন, একটা খুশ খবর দিই তোমায়।"

"খুশ খবর? আজকের দিনে আবার খুশ খবর কি? চারদিকে সবার মুখে যা শুনছি, সব তো দুর্ভাবনা হওয়ার মতো খবর।"

"কেন, দুর্ভাবনা কেন?" মুখলিস খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করলো।

"শিবাজী রাগ করে চলে গেল দরবার থেকে। এবার যদি তার মারাঠারা হামলা করে কোনো রকম? আমরা কোতোয়ালির লোক, আমাদের দুর্ভাবনা হবে না?"

এবার মুখলিস খাঁ হাসলো। মনে মনে ভাবলো,—এই বেওকুফের দিকে কেন শাহ-ইন-শাহ্‌র নেকনজর পড়েছে বোঝা মুশকিল। মুখে বললো, "না, দুর্ভাবনা হওয়ার কোনো কারণ নেই। ওরা কোনোরকম হামলা করার আগেই ওদের কয়েদ করা হবে।"

"কে বলেছে?"

চারিদিকে তাকালো মুখলিস খাঁ, তারপর নিচু গলায় বললো, "কাউকে বোলো না। খুদ শাহ-ইন-শাহ্‌র নিজের মুখের কথা। খুব গোপনীয়।"

আবিদ হুসেন গম্ভীর হয়ে বললো, "কোতোয়ালির লোকের কাছে কিছুই গোপন নয়। তাকে জানতে হয় সব কিছু।"

"কিন্তু আসল কথাটা শুনলে না—।"

"কি কথা?"

"ওই যে, খুশখবরের কথা বলছিলাম—।"

"কি খুশখবর? কার সম্বন্ধে?"

"তোমার সম্বন্ধে।"

"আমার সম্বন্ধে? কি খুশখবর শুনি?"

"বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়াল থেকে তোমার নামে দশ হাজার টাকা খালাস করে দেওয়ার হুকুম হয়েছে।"

"সে কি!" বিশ্বাস করতে পারলো না আবিদ হুসেন, সেদিন পাঁচ হাজার, আজ আবার দশ! "কে হুকুম দিয়েছেন? বাদশাহ সলামত?" হঠাৎ যেন তার কপাল খুলে যাচ্ছে। "কখন হুকুম হোলো?"

"আজই। খাস দরবারে। খুশখবর আরো আছে, শোনো।"

আবিদ হুসেন ভাবলো, এবার যদি শোনে, তাকে আগ্রার কোতোয়াল নিযুক্ত করা হয়েছে, সে আশ্চর্যান্বিত হবে না বিন্দুমাত্র। মনে মনে স্থির করে নিলো মোতিজানের মাইফিলখানায় ফুলাদ খাঁকে দেখলে কিভাবে তার পশ্চাদ্ধাবন করবে।

সে মুখলিস খাঁর দিকে তাকালো। মুখলিস খাঁ তার দিকে তাকিয়ে একটু একটু হাসছে। বললো, "তোমায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়েছে শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুমে।"

নিশ্চয়ই কোতোয়ালের পদ পেয়েছে সে। তার বুক টিপটিপ করতে লাগলো, কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ। জিজ্ঞেস করলো, "তা হলে ফুলাদ খাঁর কি হবে?"

"ফুলাদ খাঁ!" মুখলিস খাঁ বিস্মিত হোলো।

"হ্যাঁ, তাকে কি অন্য কোনো পদে নিযুক্ত করা হয়েছে?"

"না তো! তেমন কোনো কথা তো জানিনা। তবে তোমার কথা জানি। শাহ-ইন-শাহ নিজের মুখে বললেন উজীর-উল-মুল্‌ককে। তোমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে দিওয়ান-ই-খাসের দারোগার নাইব। কালই দিওয়ানির দফতর থেকে কাজে হাসিল হওয়ার পরওয়ানা পেয়ে যাবে।"

"নাইব! দিওয়ান-ই-খাসের?" আবিদ হুসেনের চক্ষু বর্তুলাকৃতি ধারণ করলো। "আমাদের আকিল খাঁর নাইব!"

মুখলিস খাঁ তার পিঠ চাপড়িয়ে চলে গেল।

খোজা ফিরোজার বাগে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হোলো। সে ছুটে গেল শক্তিসিংহের সন্ধানে। কিন্তু তাকে খুঁজে পেলো না। দরবার ভঙ্গ হয়েছে। উমরাহেরা বেরিয়ে আসছে দুজন তিনজন করে, তাদের ঘিরে ধরছে তাদের অনুরাগী বন্ধু ও সহচরবৃন্দ। চারদিকে সবার মুখে ওই একই আলোচনা,—শিবাজী দরবারের আদব ভঙ্গ করেছে। শাহ-ইন-শাহ অসীম ধৈর্যভরে তাকে মার্জনা করেছেন। কিন্তু এর পর কি হয় বলা যায় না। নানা রকম গুজব শোনা যাচ্ছে। মহলের অনেক বেগম শিবাজীকে কয়েদ করবার সুপারিশ করছে। কিন্তু কোনো কোনো বেগম নাকি শিবাজীর রূপবর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা শিবাজীর কোনো রকম বিরুদ্ধাচরণ করার পক্ষপাতী নন। বেগমদের নিয়ে নানা রকম রসালো আলোচনা হতে লাগলো উমরাহ ও মনসবদারদের মধ্যে। আবিদ হুসেন এক সময় দেখতে পেলো মহারাজা জসবন্ত সিংহকে। তার পেছন পেছন অন্য অনুচরদের মধ্যে আছে শক্তি সিংহও। আবিদ হুসেন আর ডাকলো না তাকে। অন্য দিকে সরে গেল।

সবারই মধ্যে উত্তেজনা, ব্যতিব্যস্ততা। কাকে নিজের খুশখবর শোনাবে আবিদ হুসেন! একবার ভাবলো মোতিজানের কাছে চলে যাই। তারপর মনে হোলো আগে একবার আকিল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। সে এগিয়ে গেল আকিল খাঁর সন্ধান করতে। দিওয়ান-ই-খাস থেকে উমরাহেরা সবাই বেরিয়ে পড়েছে। ওদিকেই খোঁজ করলে পাওয়া যাবে আকিল খাঁকে। সে আকিল খাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। উমরাহদের মধ্যে সে দেখতে পেলো চেনাজানা অনেককেই, কিন্তু আকিল খাঁকে দেখা গেল না কোথাও। হতাশ হয়ে সে ফিরে চললো। স্থির করলো একবার খোজা ফিরোজার বাগের ওদিকে ঘুরে যদি সম্ভব হয় শিবাজীর খোঁজ খবর নিয়ে চলে যাবে মোতিজানের কাছে। তারপর অপরাহ্ণে আকিল

খাঁর হাবেলিতে গিয়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। শাহ-ইন-শাহ সন্ধ্যার কিছু আগে আবার দিওয়ান-ই-খাসএ আসে দেওরি চৌকির ভারপ্রাপ্ত মনসবদারের তসলিম গ্রহণ করতে। সে সময় দিওয়ান-ই-খাসের দারোগাকেও উপস্থিত থাকতে হয়। কে জানে, হয়তো আকিল খাঁ সেদিনই সঙ্গে করে দিওয়ান-ই-খাসে হাজির করবে নব নিযুক্ত নাইব দারোগাকে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে গুলালবারের পাশ কাটিয়ে সে চলে এলো দিওয়ান-ই-আমের কাছে। সেদিক দিয়ে দিল্লী দরওয়াজার অভিমুখে যাওয়ার পথ। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হয়েছে। অসহ্য প্রখর হয়ে উঠেছে নিদাঘ সূর্যের তাপ। চারদিক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বিভিন্ন উমরাহের শাম-আনাহ্‌তে নাচ গানের মাইফিল স্থগিত করা হয়েছে অপরাহ্ণ পর্যন্ত। সন্ধ্যার পর শাহ-ইন-শাহ বেছে বেছে কয়েকটি শাম-আনাহ্‌য় তশরীফ আনবেন। অপরাহ্ণ হতে না হতে আবার জনসমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে চারদিক। কিন্তু সারা দুপুর আর কাউকে দেখা যাবে না। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই লু চলতে শুরু করবে। তার আগেই সবাই ফিরে যাচ্ছে যে যার আশ্রয়ে।

দিওয়ান-ই-আমের চারদিকে কানাত ফেলে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়লো। আকিল খাঁ! হ্যাঁ, তাইতো। কিন্তু ওখানে কেন?

একটি স্তম্ভের পাশে কানাতের আড়ালে দাঁড়িয়ে আকিল খাঁ মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলো একটি রঙীন কাগজ। সামনে দাঁড়িয়ে মহলের একজন খোজা। পত্র পাঠ সমাপ্ত করে আকিল খাঁ কি যেন বললো খোজাকে। খোজা চকিত নেত্রে চারদিকে তাকিয়ে ত্রস্তপদে চলে গেল খাসমহলের দেওরির দিকে। আবিদ হুসেনকে দেখতে পেলো না। সে দাঁড়িয়ে ছিলো আরেকটি স্তম্ভের আড়ালে। লোকটি চলে যাওয়ার পর আবিদ হুসেন হাসি মুখে এগিয়ে গেল

আকিল খাঁর দিকে। কিন্তু আকিল খাঁ তাকে দেখতে পায়নি। সে পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো দিওয়ান-ই-আমের পেছন দিকে।

আবিদ হুসেন একবার ভাবলো, দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা সাহাব নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, ওর পেছন পেছন ছুটে কোনো লাভ নেই, পরে এক সময় দেখা করলেই চলবে। এখন ফিরেই যাই। চোখের উপর হাত রেখে আকাশের দিকে তাকালো। প্রখর মধ্যাহ্ন-সূর্য মধ্যগগন অতিক্রম করে কিছুটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। দূরে শোনা গেল ঘড়িয়ালির আওয়াজ। দ্বিপ্রহরের পর আরো দু-ঘড়ি সময় পার হয়ে গেছে। চারদিক প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। এদিকে তো একেবারে নির্জন। দিওয়ান-ই-আমের মর্মর স্তম্ভগুলো থেকে যেন গ্রীষ্মের উত্তাপ ঠিকরে পড়ছে চারদিকে।

আবিদ হুসেন চলেই যেতো। হঠাৎ চোখে পড়লো,—ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে একজন পাহারাদার, আর তাকে দেখে আকিল খাঁ চট করে সরে গেল একটি থামের আড়ালে। পাহারা-দার তাকে দেখতে পায়নি। সে টহল দিতে দিতে অন্যদিকে চলে গেল।

এবার আবিদ হুসেনের খুব কৌতূহল হোলো। দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা, শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র অন্তরঙ্গ এবং প্রিয়তম সহচর আকিল খাঁ একজন সাধারণ পাহারাদারকে দেখে আত্মগোপন করলো! নিশ্চয়ই ব্যাপারটা রহস্যময়, আবিদ হুসেন স্থির করলো। হয়তো কোনো গুরুতর কাজে লিপ্ত হয়েছে আকিল খাঁ, নিশ্চয়ই খুদ বাদশাহ্‌র হুকুমে। হয়তো একাজে তার সহায়তা করবার কেউ নেই, হয়তো একাজ লোকচক্ষুর আড়ালেই করতে হবে। দরবারের দৈনন্দিন জীবনে বহু রহস্যজনক ঘটনা ঘটে যায়, বহু কাজ নিষ্পন্ন করা হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে, যা আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হতে পারে। সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করা অবান্তর। আবিদ হুসেন

এক মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করে নিলো। যদি এমনই ব্যাপার যে আকিল খাঁকে একা সম্পন্ন করতে হচ্ছে কোনো গুরুতর কাজ, তাহলে দিওয়ান-ই-খাসের দারোগার নব নিযুক্ত নাইব হিসেবে তার কর্তব্য আকিল খাঁকে সাহায্য করা। তাতে নিশ্চয়ই খুশী হবে আকিল খাঁ। বাদশাহ্ সলামত গুণগ্রাহী, তার কানে উঠলে তিনিও নিশ্চয়ই প্রীতিলাভ করবেন, হয়তো বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়াল থেকে তার পিতা মহম্মদ হুসেন খাঁর সমস্ত সম্পত্তিই খালাস করে দেওয়ার ফরমান জারি হতে পারে। আবিদ হুসেন চারদিকে তাকিয়ে দেখলো,—না কোথাও কেউ নেই। সে বুক ফুলিয়ে টেনে টেনে দু'টো নিশ্বাস নিলো। হাওয়ার গরমে স্ফীত হোলো তার নাসারন্ধ্র। তারপর সে অতি সন্তর্পণে আকিল খাঁর অনুসরণ করলো সতর্ক দূরত্ব থেকে।

দিওয়ান-ই-আমের পাশ দিয়ে প্রশস্ত উদ্যান। তারপরই দু-তিন সারি বড়ো বড়ো ফলের গাছ। সেখানে বেশ ছায়াঘন। আকিল খাঁ সন্তর্পণে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত উদ্যান অতিক্রম করে ঢুকে পড়লো সেই ছায়াঘন ফলের বাগানে। আবিদ হুসেনও এলো পেছন পেছন। আকিল খাঁ দুতিনবার পেছন ফিরে তাকালো। প্রত্যেকবারেই কোনো না কোনো গাছের আড়ালে সরে গেল আবিদ হুসেন। তার মনে হোলো, হয়তো তার এই অনাহূত সহায়তা আকিল খাঁর অনুমোদন নাও পেতে পারে। ফলের বাগান পার হয়ে আবার একটি প্রশস্ত বাঁধানো পথ, পাঁচ ছয় হাত চওড়া। সেখানে অনবরত টহল দেয় দেওড়ি চৌকির পিয়াদা। তার পরই উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের ওধারে কি আছে আবিদ হুসেনের জানা নেই। শুধু এইটুকু জানে যে ওদিকটা নিষিদ্ধ অঞ্চল, বাদশাহ্‌র খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত।

বর্শা হাতে এগিয়ে আসছে একজন পিয়াদা। বাঁধানো পথের উপর তার পদধ্বনি খুব স্পষ্ট। আকিল খাঁ আত্মগোপন করে

রইলো একটি গাছের ছায়ায়, আবিদ হুসেন আরেকটি গাছের পেছনে। লোকটি চলে গেল তাদের পেরিয়ে। কিছুক্ষণ পর অন্তর্হিত হোলো প্রাচীরের একটি বাঁকে। আকিল খাঁ একটু অপেক্ষা করে ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। দ্রুত পথ অতিক্রম করে এগিয়ে গেল প্রাচীরের দিকে। আবিদ হুসেন বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো। কি করছে আকিল খাঁ! ওই প্রাচীর পার হওয়ার চেষ্টা করবে নাকি? ভাব-ভঙ্গি দেখে তাই মনে হোলো। কিন্তু কি করে সম্ভব? অন্তত পনেরো হাত উঁচু প্রাচীর। অতি মসৃণ তার গা। বেয়ে ওঠা যাবে না। সিঁড়ি ছাড়া অসম্ভব।

আবিদ হুসেন চুপচাপ লক্ষ্য করতে লাগলো। দেখলো আকিল খাঁ একজায়গায় এসে দাঁড়ালো। দেওয়ালের নিম্নভাগে পথ বরাবর নিচু ঝোপের একটা সারি চলে গেছে দুদিকে। সেখানে এক-জায়গায় ঝোপের ডাল পালা সরিয়ে একটি প্রশস্ত আয়ত প্রস্তর-ফলক অক্লেশে তুলে ফেললো আকিল খাঁ। তারপর নিচে নেমে পড়ে আস্তে আস্তে নামিয়ে নিলো সেই প্রস্তরফলক। এক নিমেষে ঘটে গেল এই ব্যাপার। পর মুহূর্তে কোথাও তার চিহ্নমাত্রও রইলো না।

আবিদ হুসেন তাকিয়ে রইলো বিপুল বিস্ময়ে। আকিল খাঁ এভাবে লুকিয়ে খাস মহলের এলাকার ভিতরে ঢুকছে কেন? ওখানে শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আর শাহজাদাদের ছাড়া আর কারো তো যাওয়ার অধিকার নেই। আবিদ হুসেনকে যা সবচেয়ে বেশী বিস্মিত করলো, সেটা হোলো এই যে, এত সুরক্ষিত আগ্রার শাহী মহল, প্রকাশ্য দিনের আলোয় এত সহজে ওখানে যাওয়া সম্ভব? একথা সবাই জানে, এবং আবিদ হুসেনও শুনেছিলো যে মহল থেকে বাইরে যাওয়া-আসার কয়েকটি গুপ্তপথ আছে যার সন্ধান খুব কম লোকেই জানে। কিন্তু সেগুলো তো অত্যন্ত সুরক্ষিত বলেই তার ধারণা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো আবিদ হুসেন। মনে মনে তর্কবিতর্ক করলো আকিল খাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ বাঞ্ছনীয় কি না। স্থির করলো যেহেতু সে আকিল খাঁর নাইব নিযুক্ত হয়েছে, আকিল খাঁর অনুসরণ করা তার কর্তব্য। সে সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। কেউ কোথাও নেই। ছায়ার আড়াল পেরিয়ে সেও পথ অতিক্রম করে প্রাচীরের তলায় এসে দাঁড়ালো। ঝোপের ডালপালা সরানোর উপক্রম করছে, এমন সময় শুনতে পেলো জুতোর আওয়াজ। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। দেখতে পেলো একজন পিয়াদা টহল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। সে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো একটি হাঁক শুনে। পিয়াদা তাকে দেখতে পেয়েছে।

খুব দ্রুতপদে বর্শা উঁচিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো সেই পিয়াদা। আবিদ হুসেন মধুর হাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তুমি এখানে কি করছো?" পিয়াদা জিজ্ঞেস করলো কাছে এসে।

"আমার রুমালি পড়ে গেছে, তাই তুলে নিচ্ছিলাম।"

পিয়াদা তাকালো ঝোপের দিকে। ফিকে সবুজ রেশমী রুমালি পড়ে আছে সেখানে। আবিদ হুসেন আস্তে আস্তে তুলে নিলো সেই রুমালি। পিয়াদার নাকের নিচে নাড়লো একটুখানি।

"চমৎকার খুশবু,—না?"

পিয়াদা গম্ভীর ভাবে মস্তক হেলন করে স্বীকার করলো যে, হ্যাঁ, রুমালের সুগন্ধ প্রশংসনীয়।

"খুব দামী আতর। আমার নানী দিয়েছে," বলে আবিদ হুসেন জেবএর ভিতর থেকে আতরের শিশি বার করে, কাচের ছিপি তুলে পিয়াদার জামায় লাগিয়ে দিলো।

অন্য কোনো দিন হলে পিয়াদা খুব কড়া ব্যবহার করতো তার

সঙ্গে। কিন্তু আজ এক বিশেষ উৎসবের দিন। নানারকম লোক কেল্লার ভিতরে আসে। ভুল করে খাসমহলের কাছাকাছিও চলে আসে। তাদের নিবৃত্ত করতে হয়। এরকম দিনে এধরনের অভিজ্ঞতা নতুন নয়। ভাবলো, তেমনই একজন হবে এই লোকটি। পোশাক পরিচ্ছদ ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সম্ভ্রান্ত মোগল। সুতরাং কোনোরকম সন্দেহ হওয়ারও কারণ ছিলো না। নিশ্চয়ই কোনো প্রান্তীয় সুবার হোমরাচোমরা কেউ হবে। আগ্রায় এসেছে আজকের উৎসব উপলক্ষে। কে জানে হয়তো খিলাত বা সর-ও-পা পেয়েছে বাদশাহ সলামতের কাছ থেকে। তার প্রতি কোনো রুক্ষ ভাব প্রদর্শন করা উচিত হবে না।

জিজ্ঞেস করলো, "এদিকে কেন এসেছেন?"

"ঘুরে ঘুরে দেখছি। আগে তো দেখিনি।"

"এদিকে খাসমহল। বাইরে যাওয়ার রাস্তা ওদিকে।"

"তাই নাকি? ও। আমি তাহলে ভুল করে এদিকে এসেছি।"

"এদিকে কারো বিনা কাজে ঘোরাফেরা করার হুকুম নেই।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি।"

পিয়াদার নাকে আসছে আতরের মিষ্টি গন্ধ। সে মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে জামার গন্ধ শুকলো, যেখানে আতর মাখিয়ে দিয়েছিলো আবিদ হুসেন।

"খুশবুটা ভালো লাগছে?"

পিয়াদা মাথা নাড়লো।

"আতরটা পছন্দ?"

"খুব।"

"তোমার চাই?"

পিয়াদার গোঁফ দাঁড়ির আড়ালে শুভ্র দন্তপংক্তি দেখা গেল। আতরের শিশি হস্তান্তরিত করলো আবিদ হুসেন।

"খাঁ-সাহাব," আবিদ হুসেন বললো, "আমি নতুন লোক। ঘুরে ফিরে দেখে খুব ভালো লাগছে। যদি এদিকে একটু ঘুরে বেড়াই তোমার আপত্তি আছে? অবশ্যি তোমার হুকুম হলেই যাবো, তা নইলে চলে যাচ্ছি।"

পিয়াদা অল্পক্ষণ ভাবলো। কেউ কোথাও নেই। যাক, আজকের দিনে এদিকে কেউ যদি একটু বেড়ায়, ক্ষতি কি? এদিকটা তো আর নিষিদ্ধ অঞ্চল নয়।

"কিন্তু এই গরমে তোমার খুব তকলিফ হবে।"

"না। আমি ওই গাছগুলোর ছায়ায় ছায়ায় বেড়াবো। তারপর ফিরে যাবো আমাদের শাম-আনায়। বুঝলে খাঁ সাহাব, মন ভালো নেই। আমার মাশুকের সঙ্গে মুলাকাত হয়নি কয়েকদিন, এই বলে আবিদ হুসেন একটি শের শোনালো: আকাশের চাঁদ যখন পূবে উদিত হয়ে আবার পশ্চিমে অস্ত যায়, মনে হয় শুধু দুবার নিশ্বাস নিয়েছি। আকাশের সূর্য যখন পূব থেকে পশ্চিমে চলে আসে মনে হয়, শৈশব যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে এসে পড়ছি।

ভালো শের শুনিয়ে কিনে নেওয়া যায় দিল্লী আগ্রার যে কোনো লোককে। পিয়াদা উল্লাসে আহা-হা, আহা-হা, কেয়াবাত, কেয়াবাত বলে উঠলো। মাশুকের কথা মনে পড়েছে তারও। বললো, "বেশীক্ষণ থাকবেন না। কিলাদার সাহেবের চোখে পড়লে আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন।"

"কে? রদ-অন্দাজ? জিজ্ঞেস করলে বোলো, আবিদ হুসেন খাঁ এদিকে তফরি করছিলো। রদ-অন্দাজ আমার রিশতাদার। আমার ওয়ালিদ মহম্মদ হুসেন খাঁ হোলো রদ-অন্দাজ খাঁর চাচেরা ভায়ের শালা। মহম্মদ হুসেন খাঁ ছিলেন দরবারের উমরাহ। নিশ্চয়ই নাম শুনেছো।"

ঠিক স্মরণ করতে পারলো না ওই পিয়াদা, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলো না যে শোনেনি কোনোদিনই। সবিনয়ে বললো, "আলবৎ

শুনেছি। নিশ্চয় শুনেছি। কে না শুনেছে মহম্মদ হুসেন খাঁর নাম। বড় শরীফ লোক ছিলেন। তিনি আপনার ওয়ালিদ? বড় খুশী হলাম। আপনার ইস্‌ম শরীফ?"

"আমার নাম আবিদ হুসেন খাঁ। আমি দিওয়ান-ই-খাসের নাইব-দারোগা। আজ থেকে এই পদে বহাল হয়েছি।"

সবিনয়ে অভিবাদন করলো চৌকির পিয়াদা।

"তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু ফুলাদ খাঁ, রদ্‌-অন্দাজ খাঁ, আকিল খাঁ, এদের জিজ্ঞেস কোরো, ওরা বলতে পারবে আমি কে।"

পিয়াদা আবার অভিবাদন করলো। কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ, কিলাদার রদ্‌-অন্দাজ খাঁ, দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা আকিল খাঁ এরা অতি উচ্চ পর্যায়ের রাজপুরুষ। পিয়াদার কাছে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো। সে ভাবলো, এর মতো লোক আমার সঙ্গে এত সৌজন্য সহকারে কথা বলছে? ইনিও বড়ো শরীফ লোক। বড়ো মেহেরবান। এর নেকনজরে থাকা উচিত। কে জানে পিয়াদা থেকে মির্‌দহএর পদে পদোন্নতির ব্যবস্থা, করতে হলে হয়তো এর সঙ্গে পরিচয় কাজে লাগনো যাবে। এর ওয়ালিদ খুদ কিলাদারের চাচেরা ভায়ের শালা! ইনি খুদ আকিল খাঁর নাইব! পিয়াদা বিনীত ভঙ্গিতে শোকরিয়া জানালো আতরের শিশির জন্যে, তারপর এগিয়ে গেল টহলদারি করতে করতে। আবিদ হুসেন এগিয়ে চললো অন্যদিকে। পিয়াদা চোখের আড়াল হতেই চট করে ফিরে এলো আগের জায়গায়। নিমেষের মধ্যে ঝোপের আড়ালে ভূমির উপর সেই প্রস্তরফলক তুলে নিচে নেমে গেল, ভেতর থেকে নামিয়ে নিলো প্রস্তরফলক। সেটা তেমন ভারী নয়, তাই বিশেষ অসুবিধে হোলো না।

নিচে নেমে আবিদ হুসেন বুঝলো ব্যাপারটা কি। প্রাচীরের ওদিকে নিশ্চয়ই একটি বাগিচা আছে। ওদিক থেকে কয়েকটি নালা প্রাচীরের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে কেল্লার বাইরে

চলে গেছে। বেশ প্রশস্ত নালা, একজন লোক গুড়ি মেরে চলতে পারে আনায়াসে। এখন গ্রীষ্মকাল, তাই জল নেই। কিন্তু এপথে খাসমহলের ভিতরে যাওয়াও সম্ভব নয়। প্রস্তরফলক সাধারণত চুনসুরকি দিয়ে এঁটে দেওয়া থাকে, এভাবে তোলা যায় না। তা ছাড়া, ঠিক প্রাচীরের নিচে নালা জুড়ে থাকে পুরু লোহার পাতে তৈরি জালি-দরজা। ওদিক থেকে কুলুপবন্ধ থাকে। তার ভিতর দিয়ে জল আসতে পারে, কিন্তু সেটি ভেঙে ভিতরে যাওয়া যায় না। আবিদ হুসেন ভাবলো, আকিল খাঁ গেল কি করে?

সামনেই লোহার পাতের জালি-দরজা, একটু একটু আলো আসছে সেদিক দিয়ে। আবিদ হুসেন গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল। একটু ঠেলতেই দরজাটা সরে গেল। সে বুঝতে পারলো যে ওদিক থেকে কুলুপ কেউ খুলে রেখেছে আগের ব্যবস্থা মতো। দরজা ঠেলে সে আরো এগিয়ে এলো। তারপর ভেজিয়ে দিলো লোহার দরজা। ওদিক থেকে যেমন নামা গেছে এই নালায়, এদিক থেকেও নিশ্চয়ই উঠবার পথ আছে, অনুমান করলো আবিদ হুসেন। অতি সন্তর্পনে মাথার উপরের প্রস্তরফলকটি একটু ঠেলে ধরলো নিচের থেকে। যা ভেবেছিলো তাই। প্রস্তরফলক একটু উঁচু হোলো। মাথা তুলে উঁকি মেরে দেখলো। চারদিকে অতি মনোরম ছায়াস্নিগ্ধ একটি বাগ। অনেক দূরে শুভ্র মহল।

কোথায় এলাম!— আবিদ হুসেন ভাবলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো নিসাড় হয়ে গেল তার সমস্ত শরীর। এ যে আঙ্গুরীবাগ! এখানকার কতো কাহিনী সে শুনেছে। দূরে বাঁয়ে শিসমহল, ওধারে খাসমহল। এক মুহূর্তের জন্য হৃদপিণ্ড ভয়ে ধুকধুক করে উঠলো। তারপর ভাবলো, আকিল খাঁ যদি এখানে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে পারে তো আমার ভয় কিসের। আমি তো আকিল খাঁর নাইব, খুদ বাদশাহ সলামতের নাইব দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস। আমার কাকে ভয়!

আকিল খাঁকে এবার খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু এটা হারেমের বাগিচা। এখানে একজন পুরুষ মানুষের আত্মপ্রকাশ করা কি বাঞ্ছনীয়? সেটা গুরুতর অপরাধ। গুরুতর সাজা হতে পারে, এমন কি গর্দন পর্যন্ত যেতে পারে। আবিদ হুসেন অল্প একটু ইতস্তত করলো। তারপর ভাবলো, মহলের কানুন দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাসের চাইতে বেশীতো কেউ জানে না। সে যখন এখানে এসেছে, তখন নিশ্চয়ই কানুন ভাঙে নি, কিংবা খুদ বাদশাহ্‌র হুকুমে কানুনের ব্যতিক্রম করতে সাহস পেয়েছে। আবিদ হুসেন নাইব দারোগা, সুতরাং তার পক্ষেও কোনো অপরাধ হবে না।

সে পাথর ঠেলে উপরে উঠে এলো। সামনে একটা ঝাউ গাছ। তার আড়ালে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো চারদিক। এবার দেখতে পেলো আকিল খাঁকে।

একটু দূরে একটি উঁচু ফুলের ঝাড়। তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আকিল খাঁ।

চারদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে দু-চারটি পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় উড়ছে একটি-দুটি প্রজাপতি। এত গরমের মধ্যে ছায়ার বাইরে প্রখর রোদে বেরিয়ে আসতে পারছে না। গরম হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে, ঝিরঝির করছে ঝাউগাছগুলোর সরু সরু পাতা। মহলের ওদিকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। সবাই এখন নিশ্চয়ই বিশ্রাম করছে মহলের নিচে ঠাণ্ডা তহ্‌খানায়।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আবিদ হুসেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো আকিল খাঁর মতলবটা কি? এই গরমের ভিতর ওখানে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কেন? সে নিজেকে বোঝালো যে আকিল খাঁ যখন নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে, তখন তারও তেমনি অপেক্ষা করা কর্তব্য।

কতক্ষণ কেটে গেল খেয়াল নেই। বোধ হয় প্রায় প্রহরের কাছাকাছি হয়ে এলো। এমন সময় আবিদ হুসেন শুনতে পেলো ঘাসের উপর মৃদু পদধ্বনি। সে ঝাউগাছের আড়াল থেকে সন্তর্পনে মুখ বার করে তাকালো। বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেলো দুজন সুন্দরী তরুণী দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে। খাস মহলের অভ্যন্তর, সুতরাং কারো মুখের উপর নকাব নেই। আব্রু-বিহীন দুজন মহিলাকে দেখে আবিদ হুসেন নিজেই কুণ্ঠিত বোধ করলো। শরমে নিজের মুখ ঢাকলো দুহাতে, তারপর আবার দেখতে লাগলো আঙুল ফাঁক করে।

দুজনেই সুন্দর দেখতে। যে বয়ঃকনিষ্ঠা তাকে দেখতে আরো বেশী সুন্দর। বয়ঃজ্যেষ্ঠার মুখে কোনো প্রসাধন নেই, অধরে নেই তাম্বুলরাগ। কিন্তু আয়ত দুটি চোখে একটা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। পরনে চুরিদার সরু পায়জামা। রেশমের বন্ধনী হাঁটু অবধি ঝুলছে। পায়ে নানারঙের নকশা করা পয়জার। গায়ে মখমলের জামা, রেশমের নুরমহলী। মাথায় নারঙ্গী রঙের রেশমী লচক বাঁধা। গায়ে অলঙ্কারপত্র বেশী নেই। শুধু গলায় মোতির গলবন্দ ও হার, হাতে মোতির বাজুবন্দ, আঙ্গুলে হীরার অঙ্গুশতরি। মহলের অভিজাত নারীর তুলনায় পোশাক পরিচ্ছদ অনেক শালীন, অনেক সাদাসিধে। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠার মুখে কড়া চন্দনচূর্ণের প্রসাধন, অধর গাঢ় লাল। তারও মাথায় লচক, গায়ে নাদিরী ও জামা, পরনে চুড়িদার পায়জামা। কিন্তু তার বসন আরো বর্ণাঢ্য। জরির কাজ প্রখর রৌদ্রে ঝকঝক করছে। পায়ে জরির পয়জার, তাতে নানারঙের পাথর বসানো। সারা গায়ে গহনার প্রাচুর্য খুব। কানে মোর-ভঁওঅর, নাকে লং, হাতে কঙ্গন, জওএ, কোমরে কটি-মেখলা, পায়ে জেহর, বিছ্ওয়া, কপালে লাল চুনীর কোত্‌বিলদার। ছায়াঘন আঙ্গুরীবাগের নানারকমের ফুলের ঝোপঝাড় গুলজারের পাশ দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পড়লো এদিকের একটি ঘন

লতাকুঞ্জে, চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো সেই লতাকুঞ্জের ভিতর।

আকিল খাঁও পর্যবেক্ষণ করছিলো এদের আগমন। এবার সেও সরে এলো ঝাড়ের আড়াল থেকে। সন্তর্পণে এগিয়ে গেল লতাকুঞ্জের দিকে। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালো চারদিকে। তার পর চট করে সেও লতাকুঞ্জের ভিতর অন্তর্হিত হোলো।

ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর, আবিদ হুসেনের মনে হোলো। এবার আমারও ওখানে যাওয়া প্রয়োজন। ঝাউ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সেও এগিয়ে গেল লতাকুঞ্জের দিকে। কাছে এসে দাঁড়াতেই তার কানে গেল অন্তরালনিঃসৃত কথাবার্তা। আবিদ হুসেন ভাবলো, আমার ভিতরে যাওয়া কি ঠিক হবে? এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অনুমান করা যাক পরিস্থিতিটা কিরকম, তারপর বিবেচনা করে দেখা যাবে আমার কি করা উচিত। সে কান পাতলো, আর সঙ্গে চমকে উঠলো।

"মক্‌ফি! আমি তোমার খাদিম। যা হুকুম করবে, তাই তামিল করবো।"

মক্‌ফি! মকফি তো শাহজাদী জেব-উন-নিসার ছদ্মনাম। এ নামে সে কাব্যরচনা করে। আবিদ হুসেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে চাইলো না। বয়োজ্যেষ্ঠা তা হলে জেব-উন-নিসা! এভাবে গোপনে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আকিল খাঁ!

"রাজি! তোমাকে এভাবে ডাকিয়ে এনেছি জিন্নত-উন-নিসার পরামর্শে।"

"পরামর্শটা আমার, কিন্তু প্রয়োজন আমাদের দু বোনেরই।"

অন্যজন হোলো শাহাজাদী জিন্নত-উন-নিসা! আবিদ হুসেন এবার ঘামতে শুরু করলো। স্থির করলো তার এখানে উপস্থিত না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আকিল খাঁ নিশ্চয়ই এসেছে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। আবিদ হুসেনকে এখানে এভাবে দেখতে পেলে কেউ

খুশী হবে না। ভাবলো, যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরে যাই। কিন্তু যাওয়া হোলো না। এর পর যা কানে এলো তা শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়লো আড়ষ্ট হয়ে।

"আবিদ হুসেনকে আমাদের দরকার।"

আবিদ হুসেনকে? কে আবিদ হুসেন! খুব চেনা লোকের নাম মনে হচ্ছে!—একটু চিন্তা করলো আবিদ হুসেন। মনে পড়লো,—আরে! এতো আমারই নাম। আমার নাম! আমাকে ইয়াদ করছে চাখতাইয়া খানদানের একজন শাহাজাদী!

"আবিদ হুসেনকে!" মনে হোলো যেন আকিল খাঁও বিস্মিত হয়েছে, "আমাদের আবিদ হুসেন, যাকে শাহ-ইন-শাহ আমার নাইব নিযুক্ত করেছেন? কেন?"

"একজন বিশ্বাসী নিজের লোক দরকার শিবাজী সংক্রান্ত সমস্ত খবর জানবার জন্যে। এমন একজন, যাকে কেউ কোনোরকম সন্দেহ করবে না আমাদের লোক বলে। মহলের কোনো খোজাকে এ কাজে নিয়োগ করা যাবে না। তাহলে দুদিনেই জানাজানি হয়ে যাবে যে, আমরা শিবাজীর সম্বন্ধে খুব উৎসুক।"

"কিন্তু শিবাজীর সম্বন্ধে এই বিশেষ ঔৎসুক্য কেন?" আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো, "খবর তো এমনিই জানা যাবে, কোনো লোক নিয়োগ না করেই। দরবারে তো তার খবর সব সময় পাওয়া যাবে।"

"দরবারে খবর পৌছানোর আগে আমাদের কাছে খবর পৌছানো প্রয়োজন।"

"কিন্তু কেন?"

"কারণ আছে। এখন সব বলা যাবে না। তোমার পক্ষে এখানে এরকম সময়ে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদও নয়। খবরটা খুব গোপন রাখতে চাই বলে তোমায় অন্য লোকের মারফত জানাইনি, এখানে ডাকিয়ে এনে বললাম। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে যে আবিদ হুসেন আমাদের লোক।"

"আমায় কি করতে হবে, মক্‌ফি!"

"আবিদ হুসেন খাঁর সঙ্গে কথা বলে ওকে বুঝিয়ে দাও কি করতে হবে।"

"কি করতে হবে আমি তো নিজেই বুঝতে পারছি না।"

"শিবাজীর সম্বন্ধে সমস্ত খবর আমাদের জানাতে হবে। রাঠোর-দের উর্দুর খবর, কছওয়াদের উর্দুর খবর, মারাঠাদের উর্দুর খবর, কোতোয়ালির খবর, সব আমাদের জানা দরকার অন্য সবার আগে। আবিদ হুসেন খাঁর অনেক সুবিধে। রাঠোর শক্তিসিংহ ওর বন্ধু। নিজে কোতোয়ালিতে আছে। ফুলাদ খাঁ রদ-অন্দাজ খাঁ যে তওআয়ফের মাইফিলখানায় যায়, সে ওর মাশুক—।"

"ওর সম্বন্ধে এত খবর তোমরা জানো?"

"হ্যাঁ, ওর সম্বন্ধে খবর নিয়েছে জিনত-উন-নিসা। খোজা মহম্মদ উসমান কিছুদিন ওর সম্বন্ধে খোঁজ খবর করেছে। আবিদ হুসেনের উপর শাহ-ইন-শাহ্‌র খুব নেকনজর। সবাই এখন থেকে তাকে নানা রকম ভাবে তোয়াজ করবার চেষ্টা করবে। সুতরাং আবিদ হুসেন সবার সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পাবে। সবাই ওকে নিরীহ ভালোমানুষ বলে জানে। তাই তার সম্বন্ধে কেউ সতর্কতাও অবলম্বন করবে না। সে এসে সব খবর জানাবে তোমাকে। খোজা মির হাসান সব জেনে আসবে তোমার কাছ থেকে। মির হাসানও যেন জানতে না পারে আবিদ হুসেন আমাদের লোক।"

"তারপর?"

এর উত্তর দেওয়ার আগেই লতাকুঞ্জের অন্যদিক থেকে শোনা গেল আরেকটি কণ্ঠস্বর।

"ওখানে কে?"

লতাকুঞ্জের অভ্যন্তর স্তব্ধ হয়ে গেল। পদশব্দ ঘুরে আসছে এদিকে। ভিতরে যাওয়ার পথটাও এদিকেই। হয়তো এবার ধরা পড়ে যাবে আকিল খাঁ। এক মুহূর্তের জন্যে আবিদ হুসেনের মুখ

শুকিয়ে গেল। তারপর অতি সহজ মুখভাব করে এগিয়ে গেল। লতাকুঞ্জের প্রবেশপথে উপস্থিত হওয়ার আগেই লোকটাকে নিবৃত্ত করা দরকার।

কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই তাকে দেখতে পেলো। সে মহলের একজন খোজা পাহারাদার। মহলের চারদিকে ঘোরাফেরা করবার জন্যে যাদের নিযুক্ত করা হয় তাদেরই একজন।

"কে ওখানে ?"

"আমি," আবিদ হুসেন এক গাল হেসে বললো।

"কে তুমি ?"

"আমার নাম হুসেন।"

সেদিন বিশেষ উৎসবের দিন। তাই আবিদ হুসেন বেঁচে গেল। অন্যান্য দিন মহলের খোজাদের পরিধানে থাকে একটা নির্দিষ্ট পোষাক। দেখেই চেনা যায় ওরা খাস মহলের খোজা খাদিম। কিন্তু উৎসবের দিনে সবাই পরিধান করে যে যার নিজের পছন্দমতো পোষাক।

আবিদ হুসেনের সহজ ভাবভঙ্গি দেখে পাহারাদারের মনে কোনো সন্দেহ হোলো না। সবাইকে সে চেনেও না। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কার খাদিম ?"

"বেগম সাহিবার।"

"কোন বেগম সাহিবার ?"

"বড়ী বেগম সাহিবার।"

এক সময় বড়ী বেগম সাহিবা বলতে জাহানআরা বেগমকেই বোঝাতো। জাহানআরা খাসমহল ছেড়ে আলিমর্দন খাঁর মঞ্জিলে উঠে যাওয়ার পর এখানে বড়ী বেগম সাহিবা বলে অভিহিত করা হোতো জেব-উন-নিসাকেই। নাম ধরে উল্লেখ করার উপায় নেই, সেটা চরম বে-আদবি।

"এই রোদে তুমি এখানে কি করছো ?"

"বড়ী বেগম সাহিবা সন্ধ্যেবেলা এখানে আসবেন। উনি এবং ওঁর সহেলী কোথায় বসবেন, কিভাবে এখানে তাঁদের শরবত দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, তাই একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি।"

পাহারাদারের কঠিন মুখে একটা সখ্যতার ভাব দেখা গেল। বললো, "আজ বড্ড গরম পড়েছে। ছুটি পেলে হোতো। নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোতেম। বেলা তিন প্রহরে সব চাইতে বেশী গরম। এই গরমে কেউ বেরোয়? কিন্তু এমন নসীব, আমার চৌকির পালা পড়েছে এই বেলা।"

"বিকেলে ছুটি আছে?"

"সূর্যাস্তের পর ছুটি।"

"মুখলিস খাঁর শাম-আনাহ্‌তে যেয়ো। সেখানে নাকি একজন তওআয়ফ আনা হয়েছে দিল্লী থেকে। খুব মশহুর গায়িকা"

"তাই নাকি! নিশ্চয়ই যাবো। তোমাকেও একটা খবর দিই। কাউকে বোলো না। বাহাদুর খাঁর শাম-আনাহ্‌তে শরবত বলে যেটা বিতরণ করা হবে সেটা আসলে শিরাজী শরাব। মুহতাসিবদের ঘুস দেওয়া হয়েছে। ওরা ওদিকে যাবে না। আর যারা সেই শরাব পান করবে, কেউ কাউকে কিছু বলবে না। আলমগীর বাদশাহ্‌র আমলে শাহী কেল্লার ভিতরেও শরাবের ব্যবস্থা। হাঃ হা।"

"হাঃ হাঃ হা," আবিদ হুসেনও হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এদিকে কেন এসেছো?"

"দূর থেকে মনে হোলো কেউ যেন ওই ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এদিকে এলো। তারপর মনে হোলো আরেকজন কে যেন এই ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদিকে গেল। তারপর দেখলাম, দুজন স্ত্রীলোক বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এলো। দিন দুপুরে আঙ্গুরী-বাগে আবার কি ইশক্‌বাজি চলছে তাই তদারক করতে এলাম। আর কে এসেছে এদিকে?"

"কেউ না। আমাকেই দেখেছো। আমিই এই ঝাড়ের পাশ থেকে ওদিকে গেলাম, ওই ঝাড়ের পাশ থেকে আবার এদিকে এলাম। আর তো কেউ এদিকে আসেনি।"

"দুজন স্ত্রীলোককে যে দেখলাম!"

"আমি তো দেখিনি।"

"নিশ্চয়ই মহলের দুজন খাদিমান। দূর থেকে তাই মনে হোলো।"

"না ভাই-জী। আর কেউ এদিকে আসেনি। তুমি নিশ্চয়ই খোয়াব দেখছিলে!"

"ভাই-জী, খোজারা খোয়াব দেখে না। হাঃ হা।"

"তাহলে মরীচিকা দেখছিলে। হাঃ হাঃ হা।"

"হোঃ হোঃ হো।"

"হিঃ হি।"

খোজাদের চটুল রসিকতা, কিছু হাসিতে, কিছু ইঙ্গিতে। পাহারাদার চলে গেল সেখান থেকে। আবিদ হুসেন দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। পাহারাদার দূরে চোখের আড়াল হওয়ায় পর আবিদ হুসেন স্থির করলো এখান থেকে এবার সরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। এবারে তার হৃদকম্প শুরু হোলো। ঝোঁকের মাথায় সে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে, আর নয়। আকিল খাঁ যদি আবার বিপদে পড়ে, নিজেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আকিল খাঁর নিজের। তার জন্যে দ্বিতীয় বার নিজের গর্দনের ঝুঁকি নিতে রাজী নয় আবিদ হুসেন। মোতিজান শুনলে রাগ করবে।

লতাকুঞ্জের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়েছিলো আকিল খাঁ, জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা। পাহারাদারের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে আকিল খাঁ অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো, "এ আবার এখানে কি করে এলো?" তার চোখে মুখে বিপুল বিস্ময়।

"কে ও?" জিজ্ঞেস করলো জেব-উন-নিসা।

"আবিদ হুসেন।"

"আবিদ হুসেন!" জেব-উন-নিসা বিস্ময়ে বলে উঠলো।

"আমাদের আবিদ হুসেন?" জিজ্ঞেস করলো জিনত-উন-নিসা, "এখানে!"

"যাই হোক, আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে," বললো জেব-উন-নিসা।

জিনত-উন-নিসা লতার ঘন আবরণ সরিয়ে দেখলো। "আরে, ও চলে যাচ্ছে। ওকে ডাকুন আকিল খাঁ।"

"ডাকবো এখানে?"

"হ্যাঁ ডাকুন।"

"এখানে, এই বে-আব্রু অবস্থায়?"

"ডাকুন ওকে," বলে জিনত-উন-নিসা মুখের উপর নকাব তুলে দিলো।

তার দেখাদেখি নকাব তুলে দিলো জেব-উন-নিসাও।

চাপা গলায় আকিল খাঁ ডাকলো আবিদ হুসেনকে। সে ফিরে এলো, দাঁড়িয়ে পড়লো লতাকুঞ্জের বাইরে।

"ওকে ভেতরে আসতে বলুন," বললো জিনত-উন-নিসা।

"ভেতরে এসো আবিদ হুসেন।"

"ভেতরে!" আবিদ হুসেনের পা দুটো কাঁপতে শুরু করলো, "আমি এখান থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি।"

"ভেতরে আসুন, আবিদ হুসেন—," বলে উঠলো জিনত-উন-নিসা।

মুখ রাঙা করে চক্ষু অবনত করে মাথা নিচু করে আবিদ হুসেন ভিতরে এলো। এখানে পর্দা নেই। সে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। প্রায় চক্ষু মুদিত করেই সে তসলিম জানালো দুই শাহজাদীকে।

"আবিদ হুসেন, আপনি আমাদের শরম ইজ্জত রক্ষা করেছেন,"

বললো জিনত-উন-নিসা "সে জন্যে আমরা আপনার প্রতি অত্যন্ত

কথাটা আবিদ হুসেনের কানে যায়নি। তার নাকে আসছিলো একটা আতরের গন্ধ। অতি পরিচিত সেই সৌরভ। এর আগে কোথায় পেয়েছে এই খুশবু? জোরে জোরে দুটো নিশ্বাস নিলো সে, আর মনে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, সেদিন রাত্রিতে জোধা বাঈয়ের আরামগাহ্‌র কাছে অন্ধকার গাছ তলায়—

সেই হুরী! প্রচণ্ড কৌতূহলে সব আদব ভুলে সে চোখ তুলে জেব-উন-নিসার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথা নিচু করে বললো, "খাদিমের অপরাধ মার্জনা করবেন বেগম সাহিবা—।"

তিনজনেই বুঝলো। হাসি দেখা দিলো সবারই মুখে। জিনত-উন-নিসা হেসে বললো, "আপনার সেই হুরীর পরিচয় জানতে পারলেন, আবিদ হুসেন?"

আবিদ হুসেন শিউরে উঠলো। বললো, "না, না, আমি কিছু জানি না, কিছু জানতে চাইনা।"

"তুমি বুদ্ধিমান লোক আবিদ হুসেন," বললো আকিল খাঁ।

"আমি বেগম সাহিবার খাদিম।"

"আমার কিন্তু একটা কথা জানবার অধিকার আছে," আস্তে আস্তে বললো জেব-উন-নিসা, "আপনি এখানে এলেন কি করে, কেনই বা এলেন?"

আবিদ হুসেন অকপটে খুলে বললো সব কথা। জিনত-উন নিসা হেসে ফেললো ওর কথা শুনে। আকিল খাঁও না হেসে পারলো না। জেব-উন-নিসা স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির। তার অধরপ্রান্তেও ফুটে উঠলো কৌতুকের হাসি।

"আবিদ হুসেন," জেব-উন নিসা বললো, "আপনি বাহাদুর লোক, আপনি জীবনে উন্নতি করবেন।"

"আমার খুবই খুশ কিসমতি," আবিদ হুসেন উত্তর দিলো, "আপনারা এই খাদিমের প্রতি মেহেরবানি দেখিয়েছেন।"

"আবিদ হুসেন, আপনার উপর আমরা একটা গুরুতর কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই।"

"হুকুম করুন, বেগম সাহিবা।"

সারাদিন মে মাসের অসহ্য গরমে আগ্রার অধিবাসীরা যখন রুদ্ধদ্বার গৃহের শীতল স্নিগ্ধ আধো অন্ধকারে দিবানিদ্রায় নিশ্চিন্ত আরামে অপরাহ্ণ অতিবাহিত করছিলো, খোজা ফিরোজার বাগে কুমার রামসিংহের মঞ্জিলে আর শিবাজীর ছাউনিতে তখন কারোই অবসর ছিলো না একটুও। উত্তেজনায়, কর্মব্যস্ততায়, অবিরাম আলাপ আলোচনায় কছওয়া রাজপুত আর মারাঠারা সবাই চঞ্চল হয়ে রইলো সারাদিন।

কুমার রামসিংহ দিওয়ান-ই-খাস থেকে বেরিয়ে শিবাজীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো নিজের মঞ্জিলে। সেখানে নিজের দিওয়ান-খানায় শিবাজীকে বসিয়ে সার্ধদ্বিদণ্ডকাল ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলো। অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে বললো, "এখানে বাদশাহ্‌র কাছে যদি এরকম অনমনীয় ভাব দেখান, তাহলে আপনার নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে। অনেক উমরাহ্‌ আপনার প্রতি বিরূপ। মহারাজা জসবন্ত সিংহ, ফুলাদ খাঁ, রদ-আন্দাজ খাঁ, মুখলিস খাঁ সবাই বাদশাহকে পরামর্শ দিচ্ছেন আপনাকে কয়েদ করবার জন্যে। শায়েস্তা খাঁর পত্নী এবং জাহানআরা বেগম সাহিবা নিজে মহলের অন্যান্য বেগমদের মারফত বাদশাহকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছেন। এবং যদি বাদশাহ কোনো ছুতো পেয়ে আপনাকে কয়েদ করেন, তাহলে সুদূরপরাহত হবে আপনার দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করার আশা।"

"আপনি এ অবস্থায় কি করতেন?" শিবাজী শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি নিজেকে মানিয়ে নিতাম এই পরিস্থিতির সঙ্গে। তারপর দাক্ষিণাত্যে ফিরে সন্ধির সমস্ত শর্ত পুনর্বিবেচনা করতাম।"

শিবাজী হেসে উঠলো। বললো, "আপনি কি মনে করেন আওরংজেবকে এভাবে প্রতারিত করা সম্ভব? আওরংজেবের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।"

"আপনি কি বলতে চান?" রামসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"আমি শুধু একথাই বলতে চাই যে, আওরংজেব স্বেচ্ছায় আমাকে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেবে না। আমি ইচ্ছে করেই একবার ভুল করেছি, দ্বিতীয়বার ভুল করতে রাজী নই। আওরংজেবকে একবার সুযোগ দিয়েছি তার সদিচ্ছা প্রমাণ করবার। ওকে আর সুযোগ দেবো না।"

"শিবাজী, আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, এখানে আমার সামনে শাহ-ইন-শাহ বাদশাহকে তাঁর নাম ধরে আপনি উল্লেখ করলেও, বাইরে সবার সমক্ষে সেটা করবেন না। বাদশাহকে নাম ধরে অভিহিত করা হিন্দুস্তানে বেআদব বলে গণ্য করা হয়।"

"আওরংজেব আমাকে শিবা বলে অভিহিত করে, শিবাজী বলে না। সুতরাং আমিও তাকে আওরংজেব ছাড়া অন্য কোনো নামে অভিহিত করতে প্রস্তুত নই। আমার নিজের জন্যে আমি যা স্থির করি তাই আদব। আওরংজেবের খাদিম ও বান্দাদের জন্যে নির্দিষ্ট আদব মানতে আমি বাধ্য নই।"

রামসিংহ বিমর্ষ মুখে বললো, "আমার অবস্থা আপনি দুঃসহ করে তুলছেন। আপনি আমার অতিথি, আমি প্রাণ দিয়ে হলেও আপনার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে বাধ্য। কিন্তু আপনার ব্যবহারে আওরংজেব শীঘ্রই অসন্তুষ্ট হবেন, এবং অতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।"

"মহারাজকুমার, আমার নিরাপত্তার একমাত্র উপায় হোলো আমার এখনকার মনোভাব। দুর্বিনীত শক্তিমান লোকের কাছে

শক্তিই একমাত্র যুক্তি। তার দম্ভের একমাত্র উত্তর হোলো দম্ভ, তার ঔদ্ধত্যের একমাত্র প্রতিবাদ হোলো আরো বেশী ঔদ্ধত্য। আমি দেখতে চাই আওরংজেব আমার কি করতে পারে।"

"আপনি আর দরবারে যাবেন না?" জিজ্ঞেস করলো কুমার রামসিংহ।

"যদি আওরংজেব আমার যোগ্য সম্মান দেখাতে পারে, আমার যোগ্য মর্যাদা দিতে পারে, তাহলেই যাবো, তা নইলে নয়।"

রামসিংহ চিন্তাকুল মুখে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, "আপনার মধ্যাহ্নভোজনের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আমি আর আপনাকে এখানে বেশীক্ষণ আটকে রাখতে চাই না।"

শিবাজী উঠে পড়লো। রামসিংহ তাকে এগিয়ে দিলো মঞ্জিলের প্রধান প্রবেশপথ পর্যন্ত। শিবাজী ফিরে এলো নিজের ছাউনিতে।

খোজা ফিরোজার বাগে কছওয়া রাজপুত শিবিরের অনতিদূরে আরেকটি মঞ্জিল নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো শিবাজীর জন্যে। তার চারদিকে খাটানো হয়েছিলো কয়েকটি শিবির। সেখানে শিবাজীর সহচর ও অনুগামীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

নিজের মঞ্জিলে ফিরে শিবাজী স্নান করে পূজায় বসলো অনেকক্ষণ। তারপর চলে এলো নিজের বিশ্রামকক্ষে। শম্ভুজী, নিরাজী রাওজী, দত্তত্রিম্বক, রঘুমিত্র, হিরাজী ফরজন্দ, কবীন্দ্র কবীশ্বর পরমানন্দ এবং আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছিলো শিবাজীর সঙ্গে একত্র ভোজন করবে বলে। শিবাজী তাদের কাছে খবর পাঠালো, তার জন্যে অপেক্ষা না করে সবাই যেন আহার করে নেয়, শিবাজীর ভোজন করার স্পৃহা নেই, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবারও ইচ্ছে নেই। শিবাজীর আদেশ অমান্য করবার সাহস নেই কারোই, কেউ এসে আর বিরক্ত করলো না।

তাকিয়ায় গা এলিয়ে শিবাজী একমনে চিন্তা করছিলো। এমন

সময় দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার শব্দ শুনে চোখ তুলে দেখলো একহাতে একটি থালা ও অন্য হাতে পানপাত্র নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করছে এক সুন্দরী রাজপুতকন্যা। সে ভিতরে এসে শিবাজীর সামনে থালা ও পানপাত্র রাখলো। তারপর দুহাত জুড়ে প্রণাম করলো।

তাকে দেখে শিবাজীর চিন্তাকুল চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে মা?"

"আমার নাম পান্না," রাজপুতকন্যা উত্তর দিলো, "আমি মুনশী গিরধরলালজীর কন্যা। আপনার আহারাদির ব্যবস্থা করার ও পরিচর্যার ভার আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে।"

শিবাজী সামনে থালার দিকে তাকালো। থালায় নানাবিধ ফল ও মেওয়া সাজানো। পানপাত্রে সুবাসিত ঠাণ্ডাই। হাসিমুখে বললো, "আমি তো খবর পাঠিয়েছিলাম যে আজ আমার ভোজনে স্পৃহা নেই।"

"সেজন্যেই তো ফল ও শরবতের ব্যবস্থা করেছি।"

"কিন্তু আমি তো খাবো না, মা।"

"আমি তা শুনবো না। আজ সারাদিন উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়েছেন, একেবারে অভুক্ত থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বেন। এদেশে এত গরম এসময়। শরীরের যত্ন না নিলে তো চলবে না।"

শিবাজী হেসে ফেললো। বললো, "মা, এই একটি জায়গায় আমি বড়ো দুর্বল।"

আস্তে আস্তে খেতে শুরু করলো শিবাজী। দেখতে দেখতে থালার সমস্ত ফল ও মেওয়া শেষ হয়ে গেল। এক চুমুকে নিঃশেষিত হোলো পানপাত্রের পানীয়। তারপর চোখ তুলে দেখলো পান্না হাসিমুখে পর্যবেক্ষণ করছে তাকে। শিবাজীর ফরশা মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে উঠলো। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বোধ করে বললো, "খিদে ছিলো। তবে রুচি ছিলো না।"

পান্না একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো শিবাজীর দিকে। হঠাৎ বললো,

"আপনার কাহিনী শুনে আমরা প্রেরণা পাই। আপনি এত অসহায় বোধ করেছেন কেন?"

"তুমি জানো না মা, আমার উপর কিরকম বিপদ ঘনিয়ে আসছে।"

"আপনার কোনো বিপদ হবে না।"

শিবাজী হাসলো। "আমায় প্রবোধ দিচ্ছো?"

"না," মাথা নাড়লো পান্না, "প্রবোধ দিচ্ছি না। আগ্রা শহরে আপনার কতো মিত্র ও শুভাধ্যায়ী আছে আপনি জানেন না। আমি জানি। আমি তাদেরই একজন। আমি এখানে সব সময় আপনার কাছে কাছে থাকবার নির্দেশ পেয়েছি। তাদের সঙ্গে আপনার যোগসূত্র কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। তাদেরই হয়ে আপনাকে একথা জানাচ্ছি, আপনার কোনো বিপদ আমরা হতে দেবো না।"

শিবাজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। আস্তে আস্তে নিমীলিত হোলো তার ভাবগভীর চোখ দুটি। মুখ থেকে অস্ফুট নির্গত হোলো,—মা! মা গো!—তারপর চোখ খুলে সতেজ কণ্ঠে বললো, "তুমি ঠিক বলেছো। আমার কোনো বিপদ হতে পারে না। দেশের সাধারণ মানুষ আমার সহায়, আমার ভাবনা কিসের!"

পান্না বললো, "যখন শুনলাম আপনি আহার করবেন না, আজ আর কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না, আমার কিন্তু দুর্ভাবনা হয়েছিলো। মনে হোলো, আপনি বুঝি ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছেন।"

"ভেঙে পড়বার মতো অবস্থাই হয়েছিলো! আমার সঙ্গে মাত্র অল্প কয়েকজন লোক। দেশ থেকে এত দূরে মোগল রাজধানীতে আমরা একেবারে একা। কিন্তু না, এখন আর ভয় নেই। এক একটা দুর্বল মুহূর্ত আসে। কেটেও যায়। এটাও কেটে গেছে।"

"আমি সংবাদ পেয়েছি," পান্না বললো, "আমাদের কুঁবর-সা বেলা তিন প্রহরের পর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠাচ্ছেন

গোপীরাম মোহতাকে। তাঁকে কি একথাই জানানো হবে যে, আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না ?"

"না, আমি আর বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত নই," উত্তর দিলো শিবাজী, "আমি সাগ্রহে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।"

পান্না চলে যাচ্ছিলো।

"আবার কখন আসবে ?" জিজ্ঞেস করলো শিবাজী।

"রাত্রে, ভোজনের সময়," পান্না বললো।

"দত্ত ত্রিম্বককে বলে যেও যে সে যেন একবার এখানে আসে।"

পান্না দ্বার রুদ্ধ করে চলে গেল।

মির্জা রাজা জয়সিংহের নির্দেশ ছিলো কুমার রামসিংহের প্রতি,—শিবাজীর প্রতি আনুষ্ঠানিক ভাবে আতিথেয়তা দেখাতে যেন কোনো রকম গাফিলতি না হয়। সেদিনই বিবরণ পাঠাতে হবে মির্জা রাজার কাছে। তাই তৃতীয় প্রহরের পর কুমার রামসিংহ নানারকম মেওয়ার ভেট পাঠালো গোপীরাম মোহতার হাতে।

গোপীরাম মোহতা শিবাজীকে নজরানা দিলো নয় টাকা। শিবাজী তাকে দিলো একটি সর-ও-পা। গোপীরাম অভিবাদন করে বললো, "কুঁবর-সা জানতে চেয়েছেন সেবা ও আতিথেয়তায় কোনো রকম ত্রুটি হয়েছে কিনা।"

শিবাজী কছওয়া রাজপুতদের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করলো।

গোপীরাম বললো, "আজ কুঁবর-সার পত্র যাবে মহারাজার কাছে। ওঁর কাছে আপনার যদি কিছু জানানোর থাকে তো কুঁবর-সা সানন্দে সে বিষয় উল্লেখ করবেন তাঁর পত্রে।"

"না, মহারাজাকে আমার নতুন কিছু জানাবার নেই। যা কিছু খবর, কুমার রামসিংহ তো লিখবেনই।—হ্যাঁ। দাঁড়াও। শোনো,"

শিবাজী বললো একটু ভেবে, "কুমার বাহাদুরকে বোলো, শুধু একথা যেন লিখে দেওয়া হয় যে, আগ্রার আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। অসহ্য গরম, শিবাজীর সহ্য হচ্ছে না এই আবহাওয়া। তবে গ্রীষ্মের পর যে বর্ষা আসে, এ কথা শিবাজীর অজ্ঞাত নয়। শিবাজী সেই আশায় বসে আছে।"

গোপীরাম সরল লোক। এই কথাগুলো নিলো খুব সহজ ভাবে। প্রণাম করে সে বিদায় গ্রহণ করলো।

গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে আগ্রা শহর আবার উৎসবমুখর হয়ে উঠলো। নানা রঙের সাজ-পোশাক করে লোকজন পথে বেরিয়ে পড়লো। অনেকে গিয়ে ভিড় করলো কেল্লার সামনের চওকে। সন্ধ্যার পর আতশবাজি শুরু হবে। সেখান থেকে দেখতে পাওয়া যাবে ভালো করে। তা-ছাড়া লোকের মুখে মুখে শোনা যাবে সারাদিনের খবর। হয়তো দিওয়ান-ই-খাসে সন্ধ্যার দরবারে শিবাজী স্বয়ং উপস্থিত হবে। দরবারের পর বাদশাহ্‌র সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হবে দিওয়ান-ই-আমের প্রাঙ্গনে আর গুলালবারের আশপাশে আজকের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন উমরাহ্‌দের শাম-আনাহ্‌র নাচ গান শায়রির মাইফিলে। ঘোড়ায় চেপে, পাল্কি চড়ে, ছোটো বড়ো আমীর, উমরাহ ও বিভিন্ন বর্গের মনসবদারেরা গিয়ে ভিড় করলো কেল্লার ভিতরে। পর্দা ঢাকা পাল্কিতে চেপে অভিজাত পরিবারের মহিলারা খাসমহলে গেল বেগম সাহিবাদের তসলিম জানাতে। সেখানে অনুষ্ঠিত হবে মালিকা-আলম রহমত-উন-নিসা বেগমের জেনানা-দরবার।

সন্ধ্যে হতে না হতে নানা রকম খবর ছড়িয়ে পড়লো কেল্লার বাইরে। এবার উৎসবসূচীর ব্যতিক্রম হচ্ছে। শাহ-ইন-শাহ এবার আর দিওয়ান-ই-খাসের দরবারের পর উমরাহ্‌দের শাম-আনাহ্‌গুলো পরিদর্শন করতে আসবেন না। সোজা চলে যাবেন

খিলওয়াতগাহ্‌তে। সেখানে জরুরী পরামর্শসভা বসবে। শিবাজী শাহী দরবারের সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছেন।

মহলের ভিতরের খবরও চাপা থাকে না। উদিপুরী মহল বাদশাহ্‌র প্রিয়তমা পত্নী, কিন্তু প্রধানা পত্নী নন, বেগম নন, এখনো মহল, দ্বিতীয় বর্গের পত্নী। নিজের দিওয়ানখানায় জেনানা-দরবার অনুষ্ঠিত করার অধিকার তাঁর নেই। শাহ্‌-ইন-শাহ্‌র কাছে আরজ জানিয়েছিলেন, ফরমান জারি করে তাঁকে যেন এই অধিকার দেওয়া হয়। শাহ-ইন-শাহ অভিমত চেয়েছিলেন জাহান-আরা বেগম সাহিবা, রোশন-আরা বেগম সাহিবা আর জেব-উন-নিসা বেগম সাহিবার কাছে। রোশন-আরা বেগম সাহিবা আর জেব-উন-নিসা বেগম সাহিবা একবাক্যে আপত্তি জানিয়েছিলেন। জাহান-আরা বেগম সাহিবা বলে পাঠিয়েছিলেন, যদি অন্যতমা পত্নী আকবরা-বাদী মহলকেও এই অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। শুধু গওহর-আরা বেগম সাহিবা বলেছিলেন, কে মালিকা আলম হবে, কে জেনানা-দরবার অনুষ্ঠিত করবার অধিকার পাবে, সেটা স্থির করতে পারেন একমাত্র বাদশাহ। বাদশাহ্‌র জ্যেষ্ঠতমা পত্নীই যে মালিকা আলম হবে এই রেওয়াজ বাতিল হওয়া উচিত। বাদশাহ্‌র প্রিয়তমা পত্নী হওয়ার ফলে খাসমহলে যাঁর প্রভাব ও মর্যাদা সব চেয়ে বেশী, তাঁকেই মালিকা আলম বলে ঘোষণা করা উচিত। পরলোকগত বাদশাহ আলা হজরত ফিরদৌস আশয়ানি শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ শাহজাহানের দুই বিধবা বেগম আকবরাবাদী মহল আর ফতেপুরী মহল সমস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, এ রেওয়াজ চালু হলে ভবিষ্যতে কোনো বাদশাহ যদি তার পরসতারকে মালিকা আলম বলে ঘোষণা করে তাহলে কারো কিছু বলার থাকবে না। আওরংজেবের বৈমাত্রেয় ভগ্নী পরহুনর-বানু বেগমের অভিমত, প্রশ্নটা কোনো পরসতারকে নিয়ে নয়, বেগম আর মহলকে নিয়ে। এর সহজতম সমাধান হোলো উদিপুরী

মহলকে বেগমের পদমর্যাদায় উন্নীত করা। জেব-উন-নিসা বেগম জানালো যে বেগমের পদমর্যাদা দেওয়া যায় শুধু মুসলমান শাহী খানদান বা হিন্দু রাজবংশের মেয়েকে। অন্য কাউকে বেগম বলে অভিহিত করা যায় না, তাদের দেওয়া যায় মহলের মর্যাদা। পরহুনর বানু তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে তার পিতামহী মমতাজ বেগম শাহী খানদানের কন্যা নয়, তবু তাকে বেগমের পদে উন্নীত করা হয়েছিলো। নুরজাহান বেগমও শাহী খানদানের মেয়ে ছিলেন না। খাসমহলে বেগমদের মধ্যে যখন এ বিষয় নিয়ে তুমুল কলহ শুরু হোলো বাদশাহ পরামর্শ চাইলেন উজীর-উল-মুল্‌ক্ জাফর খাঁর কাছে। উজীর মহলের গৃহবিবাদের মধ্যে থাকতে চান না। তিনি পরামর্শ দিলেন কাজি-উল-কুজাত, অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান বিচারপতির অভিমত গ্রহণ করবার জন্যে। কাজি-উল-কুজাত জানালেন যে, প্রভাব প্রণয় ও ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের উপর পদমর্যাদা নির্ভর করে না। যদিও, যে কোনো মহলকে বেগমের মর্যাদা দেওয়ার অধিকার বাদশাহ্‌র আছে, কোনো মহলকে বা জ্যেষ্ঠতমা বেগম বিনা, অন্য কোনো বেগমকে মালিকা-আলম বলে ঘোষণা করবার অধিকার বাদশাহ্‌র নেই। শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ মুখে আর কিছু বললেন না। কাজি-উল-কুজাতের সিদ্ধান্তের অনুলিপি পাঠিয়ে দিলেন খাস মহলের প্রত্যেকের কাছে।

এই আলোচনা চাপা পড়ে গেল। চওকে সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে, উদিপুরী মহল মালিকা আলম রহমত-উন-নিসা বেগমের জেনানা-দরবারে হাজির হচ্ছেন না। তাঁর শিরঃপীড়া হয়েছে। তিনি নিজের মহলে শুয়ে আছেন।

খাসমহলের গুজব শুরু হলে অন্যান্য খবর চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরেকটি গুজব খাসমহলের গুজবের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াতে লাগলো সবার মুখে মুখে। শিবাজী বাদশাহ সলামতের দরবারে বে-আদবি করেছে। জানিয়েছে, আর সে হাজির

হবে না শাহ-ইন-শাহ্‌র দরবারে। কোনো রকমেই শিবাজীকে রাজী করানো যাচ্ছে না। দু-এক দিনের মধ্যে শিবাজী আগ্রা থেকে রওনা হবে দাক্ষিণাত্যে। মারাঠারা নাকি বলছে, বাদশাহ শিবাজীকে আগ্রা ত্যাগ করবার অনুমতি দেয় তো ভালো, যদি না দেয়, অনুমতির তোয়াক্কা না করেই চলে যাবে। যদি শাহী লশ্‌কর বাধা দেয় তো রীতিমতো একটা যুদ্ধই হবে আগ্রা শহরে। কছওয়া রাজপুতদের ভাবগতিক বোঝা যাচ্ছে না। যদি রাঠোর রাজপুতেরা শাহী লশ্‌করের সহায়তা করে, কছওয়া রাজপুতেরাও হয়তো সাহায্য করবে মারাঠাদের।

খবরটা ছড়াতে লাগলো লোকের মুখে মুখে। আরো একটা কথা চাপা গলায় সবাই সবাইকে বললো,—কী সাংঘাতিক বে-আদবি, শিবাজী নাকি শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র উল্লেখ করে তাঁর নাম ধরে। মারাঠারা বলছে শিবাজী যদি দরবারে হাজির হয়ওবা, বাদশাহ্‌কে দরবারেই নাম ধরে সম্বোধন করবে। এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যেই নাকি মেহেরবান বাদশাহ সলামত শিবাজীকে সন্ধ্যার দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে জোর করছেন না।

অন্য কেউ হলে, তাকে কোতল করা হোতো এই অচিন্তনীয় বে-আদবির জন্যে, বলাবলি করতে লাগলো সবাই। শিবাজী বিশিষ্ট মেহমান, সেজন্যে পরম ধৈর্যশীল বাদশাহ ক্রোধ সংবরণ করে আছেন। কিন্তু কী সাহস এই বাগী মারাঠার। আগ্রা শহরের বুকের উপর বসে এরকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে খুদ বাদশাহ সলামতের সামনে? যে সে বাদশাহ নয়, খুদ শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আলমগীর, যার নামে সারা হিন্দুস্তান থর থর করে কাঁপে!

এ সমস্ত গুজবের ঢেউ গিয়ে পৌঁছালো কেল্লার ভিতরে সর্বত্র, এমন কি খাসমহলেও। আওরংজেব শুনে গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, "এখনই ইত্তলা দাও কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ ও পর্‌তিত রায় হরকরাকে।"

গুসলখানায় বাদশাহ্‌র কাছে এসে তসলিম জানালো কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদ আর আওরংজেবের ব্যক্তিগত হরকরা বা গুপ্তচর পর্‌তিত রায় হরকরা।

এসমস্ত গুজবের সম্পূর্ণ বিবরণ এসে গেল খোজা ফিরোজার বাগে, কুমার রামসিংহের উর্দুতে। তখন সবে সূর্যাস্ত হয়েছে, কিন্তু গোধূলির স্নিগ্ধ আলোয় মনোরম হয়ে আছে আগ্রার শহরতলি। কুমার রামসিংহ কেল্লায় দিওয়ান-ই-আমে সন্ধ্যার দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। শিবাজী সম্পর্কিত নানারকম গুজবের বিবরণ শুনে কুমার রামসিংহ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো খানিকক্ষণ। এরকম গুজব চালু হলে ভাবনার কথা। মান সম্ভ্রম ইজ্জত নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বাদশাহ্‌র মনোভাব অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে। দরবারের ক্ষমতা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে হয়তো কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন আওরংজেব। তাঁকে উস্কে দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই। শিবাজীকে কয়েদ করে মির্জা রাজা জয়সিংহকে অপদস্থ করায় এবং তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করে দেওয়ায় দরবারের অনেকের নানারকম স্বার্থ আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর কুমার রামসিংহ ডেকে পাঠালো মুনশী গিরধরলাল ও বল্লু শাহকে। সমস্ত পরিস্থিতি তাদের বুঝিয়ে বললো, "আপনারা শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, তাঁকে জানান এসমস্ত ব্যাপার, বলুন যে, মির্জা রাজা এবং আমার সম্মান বজায় রাখবার জন্যে, এবং তাঁর নিজের নিরাপত্তার জন্যে, তাঁর কিছুদিন আমাদের পরামর্শ মতো চলা বাঞ্ছনীয়। ওঁকে জানাবেন যে, আমিও দরবারে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করছি। আপনারা বিলম্ব করবেন না। তাড়াতাড়ি এসে আমাকে জানিয়ে যাবেন শিবাজীর প্রতিক্রিয়া।"

বল্লু শাহ আর গিরধরলাল মুনশী তৎক্ষণাৎ মারাঠাদের শিবিরে

এসে সাক্ষাৎ করলো শিবাজীর সঙ্গে। কুমার রামসিংহ তাদের যা যা বলেছিলো, সব কথা জানালো। শিবাজী মনোযোগ দিয়ে শুনলো তাদের বক্তব্য। তারপর বললো, "বেশ, ভাইজী রামসিংহের কথা আমি মেনে নিচ্ছি।"

"তাহলে আপনি আসছেন দরবারে?" গিরধরলাল মুনশী উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমি এখন যাবো না। আমার পুত্র শম্ভুকে পাঠিয়ে দেবো ভাইজীর সঙ্গে। সে দরবারের মনসবদারিতে হাসিল হবে।"

"আপনি নিজে যাবেন না?"

শিবাজী হেসে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, যাবো। তবে এখন নয়। সবাই জানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। দু-তিন দিন যাক। তারপর দেখা যাবে। হ্যাঁ, যাবো নিশ্চয়ই। শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌কে আমার আনুগত্য জানিয়েছি, দরবারে যাবো না?"

বল্লু শাহ আর গিরিধরলাল সন্তুষ্ট হয়ে কুমার রামসিংহকে গিয়ে জানালো, শিবাজী বাদশাহ্‌র দিওয়ানে হাজির হতে স্বীকৃত হয়েছেন। রামসিংহ তখন প্রস্তুত হোলো সান্ধ্য-দরবারে যাওয়ার জন্যে। এমন সময় রামসিংহের দিওয়ানখানায় উপস্থিত হোলো কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ আর পর্‌তিত রায় হরকরা।

রামসিংহ তাদের খুব খাতির করে বসালো। জানতে চাইলো তাদের এই শুভাগমনের কারণ। ফুলাদ খাঁ তাকালো পর্‌তিত রায়ের দিকে। ফুলাদ খাঁর পদমর্যাদা পর্‌তিত রায়ের উপরে হলেও পর্‌তিত রায় বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত দূত। বাদশাহ্‌র বাণী অবগত করানোর দায়িত্ব তার।

পর্‌তিত রায় বললো, "কুমার জী, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে শিবাজীকে উপলক্ষ করে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।"

“হ্যাঁ, সে কথা আমি অবগত আছি,” কুমার রামসিংহ উত্তর দিলো, “আমি খুবই দুঃখিত, কারণ শিবাজী আমার অতিথি।”

“শাহ-ইন-শাহ্‌র অভিমত এই যে, যতো শীঘ্র সম্ভব এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়।”

“এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত,” বললো রামসিংহ।

“শাহ-ইন-শাহ মনে করেন যে, এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানো শুধু একটি মাত্র উপায়ে সম্ভব,—যদি শিবাজী শাহ-ইন-শাহ্‌র দিওয়ানে হাজির হন। তা নইলে—”

রামসিংহের মুখে জাগলো দুর্ভাবনার ছায়া। জিজ্ঞেস করলো, “তা নইলে ?”

উত্তর দিলো সিদ্দি ফুলাদ খাঁ। বললো, “তা নইলে শাহ-ইন-শাহ্‌কে কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা ভাবতে হবে—।”

“এবং মেহমানের প্রতি এরকম কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবার কারণ সৃষ্টি না হলেই তিনি খুশী হবেন,” বললো পর্‌তিত রায়।

“শাহ-ইন-শাহ্‌র খাদিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য,” ফুলাদ খাঁ বললো, “শাহ-ইন-শাহ্‌র পক্ষে অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে না দেওয়া।”

ফুলাদ খাঁর সঙ্গে একমত হোলো রামসিংহ।

“শাহ-ইন-শাহ এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন,” পর্‌তিত রায় বললো, “আপনি যেন শিবাজীকে বুঝিয়ে শান্ত করে দরবারে ফিরিয়ে আনেন। উনি দরবারে এলে শাহ-ইন-শাহ ওঁর প্রতি বিশেষ মেহেরবানি করতে প্রস্তুত আছেন।”

রামসিংহ চুপচাপ ভাবতে লাগলো।

ফুলাদ খাঁ বললো, “যদি আপনার পক্ষে এ কাজে সফল হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে হয়তো এমন অবস্থার উদ্ভব হবে যে, আপনার আমার মতো শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিরা খুব মনঃকষ্ট পাবো।”

“সেকথা বেশ বুঝতে পারছি,” আস্তে আস্তে উত্তর দিলো রাম সিংহ, “তবে কাজটা সহজ নয়। দেখি, আমি কি করতে পারি।”

সিদ্দি ফুলাদ খাঁ আর পর্‌তিত রায় হরকরা চলে যাওয়ার পর কুমার রামসিংহ কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে চিন্তা করলো নিজের মনে, তারপর কোনো অনুচর সঙ্গে না নিয়েই একা বেরিয়ে এলো দিওয়ানখানা থেকে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল শিবাজীর কাছে। অকস্মাৎ বিনা ঘোষণায় কুমার রামসিংহকে একা নিজের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে শিবাজী বিস্মিত হোলো, তাকে স্বাগত জানালো সৌজন্যের সঙ্গে। কিন্তু রামসিংহ আসন গ্রহণ করলো না। বললো, "আপনার সঙ্গে কিছু জরুরী আলোচনা আছে। আপনি কি আমার সঙ্গে আমাদের দিওয়ানখানায় আসবেন?"

এটা ঠিক কায়দা নয়, সুতরাং শিবাজী একটু ইতস্তত করলো। তারপর হেসে বললো, "আপনি আমার ভাই। সুতরাং আপনার সঙ্গে কোনো আদবকায়দার কড়াকড়ি নেই, আপনি নিজে এসে যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই যাবো।"

শিবাজীও কোনো অনুচর সঙ্গে নিলো না। রামসিংহের হাত ধরে বেরিয়ে এলো, কিন্তু কিছুটা দূর থেকে তাদের অনুসরণ করলো কৃষ্ণাজী আপ্পে আর দত্ত ত্রিম্বক। হাতিয়ার ছিলো দুজনের সঙ্গেই। মারাঠা শিবিরের কেউই কোনো সময় নিরস্ত্র থাকতো না। কড়া নির্দেশ ছিলো শিবাজীর।

শিবাজী আর রামসিংহ প্রাঙ্গন অতিক্রম করে হাঁটতে হাঁটতে রামসিংহের মঞ্জিলে প্রবেশ করলো। দত্ত ত্রিম্বক আর কৃষ্ণাজী আপ্পে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দিওয়ানখানায় এসে দুজনে মুখোমুখি বসলো।

"এবার বলুন," শিবাজী সহজ কণ্ঠে বললো রামসিংহকে।

রামসিংহ একটু যেন ভাবলো কি ভাবে কথা আরম্ভ করবে। তারপর বললো, "শিবাজী, আপনাকে ভায়ের মতো একটা পরামর্শ দিচ্ছি।"

শিবাজী আয়ত দৃষ্টি মেলে তাকালো রামসিংহের দিকে।

"আপনি যতো শীঘ্র সম্ভব আগ্রা থেকে পালিয়ে যান।"

"পালিয়ে যাবো?" মৃদু কণ্ঠে শিবাজী জিজ্ঞেস করলো।

"আগ্রায় আপনি নিরাপদ নন্। কিন্তু এমনি চলে যাওয়ার অনুমতি পাবেন না। সুতরাং পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

শিবাজী স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সহজভাবেই বললো, "বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন পালিয়েই যাবো।"

"আমি গোপনে সাহায্য করার চেষ্টা করবো, আমার দ্বারা যতোটা হয়। তবে কেউ যেন একথা জানতে না পারে।"

"কোনো মারাঠার কাছ থেকে কেউ কোনোদিন জানবে না।"

"মোগলদের যেন কোনোরকম সন্দেহ না হয় যে, আপনি পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন।"

"হ্যাঁ, তাদের সেরকম কোনো সন্দেহ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়," শিবাজী একমত হোলো রামসিংহের সঙ্গে।

"সুতরাং তাদের এই ধারণা হওয়া উচিত যে আপনি আপনার আজকের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়েছেন। শাহ-ইন-শাহ্‌র প্রতি আপনার আনুগত্য একতিলও কমে নি।"

রামসিংহ দেখতে পেলো না যে শিবাজীর চোখ দুটো এক নিমিষের জন্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হোলো। চোখ বুঁজলো শিবাজী। হাসি মুখে বললো, "বেশ, মোগলদের মনে এরকম ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবো।"

"সুতরাং অবিলম্বে বাদশাহ্‌র দরবারে আপনার হাজির হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

"বেশ, হাজির হবো," মেনে নিলো শিবাজী।

রামসিংহ ভাবতে পারেনি, এত সহজে রাজী করা যাবে এই

উদ্ধত মারাঠাকে। মনের উল্লাস চেপে বললো, "তাহলে একথা আমি শাহ-ইন-শাহকে জানাতে পারি?"

"হ্যাঁ জানাবেন।"

"কবে আপনি আমার সঙ্গে দরবারে হাজির হবেন বলে আশা করতে পারি?"

"সেকথা আপনাকে আমি যথাসময়ে জানাবো। আমার শরীর সত্যিই সুস্থ নেই। দীর্ঘ পথ-পর্যটন আমাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে ফেলেছে। একটু একটু জ্বর হচ্ছে আজকাল। তবে একথা আমি কাউকে বুঝতে দিতে চাই না।"

রামসিংহ আর বেশী চাপ দিলো না। শিবাজী উঠে পড়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

নিজের কক্ষে ফিরে এসে শিবাজী ডেকে পাঠালো নিরাজী রাওজী, হিরাজী ফরজন্দ, পরমানন্দ ও রঘুমিত্রকে। দত্ত ত্রিম্বক আর কৃষ্ণাজী আপ্তে শিবাজীর সঙ্গেই ছিলো। সবাই সম্মিলিত হতে শিবাজী রামসিংহের সঙ্গে তার এই আলোচনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করলো। তারপর বললো, "কৃষ্ণাজী, তোমাকে একটা কাজের ভার নিতে হবে। কথাটা তুলে দিতে হবে আওরংজেবের কানে। একথা যেন সে জানাতে পারে যে আমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, এবং আমার পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নির্ধারিত করছে কুমার রামসিংহ। সে খুব চালাক। ভেবেছে, আমাকে একটা লোভ দেখিয়ে নিজের মুখ রাখবার জন্যে বাদশাহ্‌র সামনে নিয়ে হাজির করতে পারবে। কি লোভ দেখাবে শিবাজীকে? অর্থ নয়, মনসব নয়, স্ত্রীলোক নয়। সে জানে এসব দুর্বলতা শিবাজীর নেই। অতএব তাকে লোভ দেখাও মুক্তির, যেই মুক্তি ও স্বাধীনতা শিবাজীর একমাত্র দুর্বলতা।"

সবাই হাসলো শিবাজীর কথা শুনে। শিবাজী বলে গেল,

"আমাকে রামসিংহ চেনে না। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে কি করে নিজের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করা যায়, সে উপায় এই বর্বর মারাঠা খুব ভালো করেই জানে।"

"কুমারজী কি আপনার সঙ্গে ছলনা করছেন?" নিরাজী রাওজী জিজ্ঞেস করলো।

"না, না, একেবারেই না," বললো শিবাজী, "কোনো একটা উপায় করবার চেষ্টা সে করবে। তার কি ক্ষতি? আমি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে সে বেঁচে যায়, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে কয়েদ হলেও তার আর কোনো ঝামেলা নেই। তবে এর প্রতিদান স্বরূপ সে যে আমাকে ভুলিয়ে আওরংজেবের সামনে হাজির করার চেষ্টা করছে, তাতেই আমার আপত্তি।"

রঘুমিত্র জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি দরবারে আর যাবেন না?"

"না, ওই যে একদিন গেছি, ব্যস, ওই শেষ। আওরংজেবের সঙ্গে আর দেখা হবে না। যদি হয় তো যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে, অন্য কোথাও নয়।"

হিরাজী ফরজন্দ বললো, "আপনি এবার বিশ্রাম করুন। আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি অসুস্থ বোধ করছেন না তো?"

বৈমাত্রেয় ভ্রাতাটির দিকে ফিরে তাকালো শিবাজী। হেসে বললো, "কেন, আমাকে কি অসুস্থ দেখাচ্ছে?"

"আপনার চেহারা বেশ ফ্যাকাশে হয়ে আছে।"

"এখন আমার এরকম চেহারা হওয়া দরকার। কিছুদিন শুধু ফলাহার করবো ভাবছি, যাতে আমাকে দুর্বল দেখায়। তবে একটা কথা বিশ্বাস করো, জীবনে কোনোদিন আমি এত সুস্থ বোধ করিনি। আমার এলাকা যদি আগ্রা থেকে শুধু একবেলার পথ হোতো, তাহলে তোমাদের কয়েকজনকে নিয়েই আমি আগ্রার শাহী কিলা দখল করতে পারতাম কয়েকদিনের জন্যে।"

"আমরা এখনই পারি," বললো হিরাজী, "আপনি শুধু আদেশ দিন।"

"দখল করা খুবই সোজা হিরাজী," গম্ভীর কণ্ঠে শিবাজী উত্তর দিলো, "কিন্তু অধিকার দীর্ঘ দিন ধরে বজায় রাখা সহজ কাজ নয়। শোনো, কাল থেকে একজন বৈদ্য আসুক নিয়মিত। প্রত্যেকদিন আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে।"

হিরাজী হাসলো।

শিবাজী দত্ত ত্রিম্বকের দিকে ফিরে বললো, "তুমি একবার গোপনে সাক্ষাৎ করো মহারাজা জসবন্ত সিংহের সঙ্গে। বিশেষ কিছুই বলতে হবে না, শুধু জানাবে ওঁর প্রতি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।"

খোজা ফিরোজার বাগে মারাঠা শিবিরে যখন এসব আলোচনা চলছিলো, আগ্রার শহরকেন্দ্রে তখন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। আতশবাজি আরম্ভ হয়ে গেছে, নানা রঙের ফুলঝুরির বাহার দেখা যাচ্ছে আকাশের নানা জায়গায়। কেল্লার সামনের বাজার লোকে লোকারণ্য, আমির উমরাহদের মিছিল যাচ্ছে কেল্লার ভিতরে। গুলালবারের ওধারে বিভিন্ন উমরাহদের শাম্‌আনায় শুরু হয়েছে মাইফিল মুশায়েরা, পান শরবত বিতরণ করা হচ্ছে অভ্যাগতদের মধ্যে। এক একটা শাম্‌আনায় শরবত পিয়াসীদের ভিড় বেশী। দেখা যাচ্ছে যে এক একজন পান করছে দুগ্লাস তিনগ্লাস, তারপর মাতাল হয়ে যাচ্ছে। মুহতাসিবেরা চলে যাচ্ছে মুখ ফিরিয়ে। আহা, খাসা শরবত,—বলছে এক একজন—কোথাকার শরবত? কোন দেশী মশলা দিয়ে তৈরী? কেউ বলছে শিরাজী, কেউ বলছে ইরাণী, কেউ বলছে বিলায়তী। হিন্দুস্তানী শরবত নয়। হিন্দুস্তানী শরবত খেয়ে কেউ মাতাল হয় না। ভ্রমরের নাকে মধুর খবর এসে যাবেই। আবিদ হুসেনও এলো। তিন চার গ্লাস পান করলো।

গরম হয়ে উঠলো সমস্ত শরীর। নিজেকে মনে হোলো ছুনিয়ার বাদশাহ। ভাবলো, চিরকাল বজায় থাকুক শরাব সম্বন্ধে আলমগীর বাদশাহ্‌র কড়া মনোভাব। শাহজাহান বাদশাহ্‌র আমলে কেল্লার ভিতরে উৎসবে অনুষ্ঠানে এরকম ব্যাপক ভাবে শরাব পান চলবে, কে ভাবতে পারতো!

দিওয়ান-ই-খাস্‌এ বাদশাহ্‌র দরবার শুরু হওয়ার সময় হয়ে এলো। আবিদ হুসেন রাশভারী মেজাজে হেলতে ছুলতে চললো সেদিকে। আকিল খাঁ বলেছে, তার নিয়োগের পরোয়ানা না এলেও তাকে আজকেই হাজির হতে দেওয়া হবে বাদশাহ্‌র দরবারে।

হঠাৎ দেখলো নিজের মিস্‌ল নিয়ে তাতাতাড়ি আসছে মহারাজ-কুমার রামসিংহ। অনেকেরই চোখ পড়লো তার ওপর। সবাই লক্ষ্য করলো যে, শিবাজী আসেনি, একাই এসেছে মহারাজকুমার। চাপা গুঞ্জন শুরু হোলো সবার মধ্যে। শিবাজী আসেনি,—শিবাজী আসবে না,—শিবাজীকে কয়েদ করা হবে। হয়তো এসম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্যে শাহ-ইন-শাহ দিওয়ান-ই-খাসের দরবার অনুষ্ঠানের পর গুলালবারে আসবেন না উমরাহদের শাম-আনাহ্‌ পরিদর্শন করতে, সোজা চলে যাবেন খিলওয়াতগাহ্‌র গোপন মন্ত্রণা সভায়।

আবিদ হুসেনের কানে এলো সমস্ত রকম আলোচনা। ভাবলো, শিবাজী লোকটা বোকা। সবাই যখন জানে তাকে কয়েদ করা হবে, সেও নিশ্চয়ই শুনেছে। সে লোকটা আগ্রায় বসে আছে কেন? আমি হলে কি করতাম? আবিদ হুসেন অনুরূপ পরিস্থিতিতে কল্পনা করবার চেষ্টা করলো নিজেকে। আমি হলে,—ভাবলো সে, —বাদশাহ্‌কে গিয়ে বলতাম, ভাই বাদশাহ, আমি বিদায় নিলাম। একটা ঘোড়ায় চাপতাম। ছুটো চাপাটি আর একটু গোস্ত্‌ বেঁধে নিতাম এক টুকরো কাপড়ে। তারপর সোজা চলে যেতাম আমার

ওয়াতনে। হ্যাঁ, মোতিবিবিকেও নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে। না, বাদশাহ্‌কে বলতাম না। তাহলে ফুলাদ মিঞা জানতে পারতো। সে কিছুতেই মোতিজানকে সঙ্গে নিতে দিতো না। কাউকে না বলে চলে যেতাম মোতিবিবির সঙ্গে। যেতাম অন্ধকার রাত্রিতে, আকাশে শুধু এক ফালি চাঁদ, আর কিছু নয়। মোতিবিবিকে শের শোনাতে শোনাতে যেতাম। সকাল হলে আগ্রায় হৈ-চৈ পড়ে যেতো। সবাই বলতো শিবাজী মোতিবিবির হাত ধরে পালিয়েছে। শাহ-ইন-শাহ ফুলাদ খাঁকে ধরে আনবার হুকুম দিতো। বলতো, পঁচিশ কোরা লাগাও ফুলাদকে।—ফুলাদের কশাঘাতজনিত যন্ত্রনাবিকৃত মুখ কল্পনা করে আবিদ হুসেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

চারদিকে ইমারতগুলো একটু একটু দুলছে। ওরা কি শরাব পান করে মাতাল হোলো নাকি, আবিদ হুসেন ভাবলো। খেয়াল হোলো— আরে, আমি করেছি কি? শরাব পান করেছি? আমাকে না দরবারে হাজির হতে হবে? তাড়াতাড়ি জেবএর ভিতর থেকে আতরের ছোটো শিশি বার করে কানের নিচে, কানের দুপাশে আতর লাগিয়ে নিলো। রুমালিতে আতর মেখে নাড়তে লাগলো মুখের সামনে। তারপর অতি সন্তর্পনে সচেষ্ট প্রকৃতিস্থতার সঙ্গে এগিয়ে এলো দিওয়ান-ই-খাসের দিকে। এখানে সবার প্রবেশ করার অধিকার নেই। মাঝারি ও ছোটোরা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। বড়োরা অভিজাত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে প্রবেশ করছে। চারদিকে আতর ও ফুলের খুশবু। ঝাড়-ফানুস, কর্পূর মেশানো শামা আর রঙীন আলোর মশাল জ্বলছে চারদিকে। বাদশাহ্‌র খওয়াসেরা আর আহাদিরা আছে সশস্ত্র পাহারায়।

প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ছিলো দুজন তুরাণী। হাতে দীর্ঘ বর্শা। সব উমরাহদেরই মুখ চেনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে প্রত্যেক আগন্তুককে। ওরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো আবিদ হুসেনের দিকে। তারপর হঠাৎ বর্শা দিয়ে আটকালো তার পথ।

আবিদ হুসেন উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকালো তাদের দিকে। তারপর অভিজাত ভঙ্গিতে বললো, "আমি আবিদ হুসেন খাঁ।"

ব্যস, এটুকুই বললো। তুরাণীরা কোনোদিন হয়তো ওর নামও শোনেনি। কিন্তু সে যেভাবে বললো, তাতে ওরা কি ভাবলো কে জানে, পথ ছেড়ে দিলো সসম্ভ্রমে। আবিদ হুসেন ভিতরে ঢুকলো। নতুন মুখ দেখে অনেকেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। আবিদ হুসেন গম্ভীর ভাবে এগিয়ে চললো। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো?—সে ভাবলো। প্রত্যেকের স্থান তো নির্দিষ্ট থাকে। হঠাৎ খেয়াল হোলো, আরে,—সে করেছে কি? কথা ছিলো ইনায়ত খাঁর শাম্ আনাহ্‌তে সে অপেক্ষা করবে, তাকে সেখান থেকে ডেকে নেবে আকিল খাঁ। ভুলেই গেছে একেবারে। সর্বনাশ! কিন্তু এখন তো আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা এসে দাঁড়িয়েছে তখ্‌ত্‌এর ছুদিকে দেওয়াল ঘেঁষে। চঞ্চল নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। বাদশাহ্‌র উপস্থিত হওয়ার সময় হয়েছে। এই নকীব এসে ঘোষণা করলো বলে—।

আবিদ হুসেন নিশ্চিন্ত মনে হেলতে ছুলতে এগিয়ে গেল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ফুলাদ খাঁ। তাকে দেখে আবিদ হুসেন বাঁকা হাসি হেসে একটু মাথা নাড়লো। আবিদ হুসেনকে দেখে ফুলাদের চোখ ছুটি ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম। নকীবকে দেখা গেল তার নির্দিষ্ট জায়গায়। আবিদ হুসেনকে কিছু বলার উপায় নেই এখন। একটা গোলযোগ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় ঠিক এসময়।

আবিদ হুসেন বেপরোয়াভাবে আরো এগিয়ে গেল নাকের নিচে রুমালি নেড়ে চারদিকে আতরের খুশবু ছড়াতে ছড়াতে। হঠাৎ অনুভব করলো কে যেন এসে তার কনুইয়ের কাছটা চেপে ধরেছে। কে এই বেতমিজ! উদ্ধত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, আকিল খাঁ।

"করেছো কি?" আকিল খাঁ ফিসফিস করে বললো, "তোমাকে কে আসতে বলেছে এখানে?"

বলে কি লোকটা! আবিদ হুসেন বিস্মিত হোলো।

আকিল খাঁ বলে গেল, "নিয়োগের পরোয়ানা পাওয়ার আগে দরবারে হাজির হওয়া আদব নয়। দিওয়ান-ই-তন সে কথাই বললো আমায়। তাই তোমায় বলতে গিয়েছিলাম ইনায়ত খাঁর শাম-আনাহ্‌তে। তুমি তো সেখানে ছিলে না।"

"তাহলে ফিরে যাই?" বললো আবিদ হুসেন।

আকিল খাঁ প্রমাদ গুনলো। বাদশাহ্‌ যখন দরবারে হাজির হওয়ার মুখে, ঠিক সে সময় দরবার থেকে কারো বহির্গমন অত্যন্ত বেআদবি। হয়তো বাদশাহ্‌র চোখে পড়বে যে, তাঁর দিকে পেছন ফিরে একজন বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন কৈফিয়ত দিতে হবে দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস আকিল খাঁকে। বললো, "এসো আমার সঙ্গে।"

সামনে এগিয়ে গিয়ে ঠিক নিজের পেছনে আবিদ হুসেনকে দাঁড় করিয়ে দিলো। সামলে নেবো কোনোরকমে,—ভাবলো আকিল খাঁ,—এত বছর ধরে বাদশাহ আওরংজেবের সঙ্গে আছি, দাক্ষিণাত্যে, দিল্লীতে, এখানে, এটুকু যদি সামলাতে না পারলাম তো বৃথাই ওয়াকিবহাল হয়েছি দরবারের আদবকায়দায়।

উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁ, দিওয়ান-ই-তন, দিওয়ান-ই-বুয়ুতাত দিওয়ান-ই-খালসা, কাজি-উল-কুজাত সবারই চোখে পড়লো আবিদ হুসেন। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার অবসর তখন নেই। নকীবের উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা শোনা যাচ্ছে,—বা আদব বা মুলায়জা হোশিয়ার, খলিফত-উজ-জমানি জিল-ই-সুভানি আমির-উল-মুমিনিন শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ মহিউদ্দিন মহম্মদ আওরংজেব আলমগীর গাজি তশরিফ নিয়ে আসছেন

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই। পেছন দিকের দরজা খুলে

গেল। ঈষৎ কুব্জ ভঙ্গিতে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে এলো বাদশাহ আওরংজেব। তখ্‌ত্‌এর সামনের চিক সরে গেল। বাদশাহ সমাসীন হোলো তখ্‌ত্‌এর উপর।

উমরাহেরা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে তখ্‌তএ হাসিল হওয়ার সালতামামির মুবারকবাদ জানালো বাদশাহ্‌কে। তারপর শুরু হোলো সান্ধ্য দরবারের অনুষ্ঠান। সেদিন মহল চৌকির পালা মহারাজকুমার রামসিংহের। মিরতুজুক মহারাজকুমার ও তার অধীনস্থ মনসবদার-দের বাদশাহ্‌র সামনে দাঁড় করিয়ে নাম ঘোষণা করলো। কুর্নিস করলো রামসিংহ ও রাজপুত মনসবদারেরা।

রামসিংহ বললো, "শিবাজীকে রাজী করিয়ে ফিরে এলাম আলমপনাহ্‌।"

আওরংজেব কোনো উত্তর দিলো না, মুখ তুলে তাকালোও না। শুধু হাতের ইশারায় সরে যেতে বললো।

"কি আর রাজী করাবে," আবিদ হুসেন সামনে আকিল খাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, "শিবাজী পালিয়ে যাবে," বলতে বলতে আবিদ হুসেন কোনো রকমে একটা ঢেকুর চাপলো।

"চুপ," বললো আকিল খাঁ, ফিসফিস করে।

আবিদ হুসেনের ইচ্ছে ছিলো খুব নিচু গলায় কথা বলার, কিন্তু সে যেটা ভেবেছিলো খুব নিচু গলা, সেই স্তব্ধতায় সেটা পরিষ্কার শুনতে পেলো আশপাশের লোকেরা। রামসিংহ পিছু হটে যাচ্ছিলো তাদের পাশ দিয়ে। কথাটা কানে যেতে একটু চমকে আবিদ হুসেনের দিকে ফিরে তাকালো। আবিদ হুসেনের চাপা গলা বোধ হয় বাদশাহ্‌র কানেও গিয়েছিলো। রামসিংহের মুখের ভাবও চোখে পড়েছে। আওরংজেব ফিরে তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে। চোখে চোখ পড়তেই আবিদ হুসেন খুব কেতাদুরস্তের মতো অবনত হয়ে কুর্নিস করলো।

আকিল খাঁ তখন মনে মনে গজরাচ্ছে, ভাবছে এই বেওকুফটাকে

তখন ঘাড় ধরে বার করে দিলেই হোতো। কেলেঙ্কারি করবে এবার। কিন্তু বাদশাহ্ ফিরে তাকিয়েছে, আবিদ হুসেনকে এখন বাদশাহ্র সামনে হাজির না করে উপায় নেই। সে যে ভেবেছিলো গান বাজনার শেষে সময় বুঝে হাজির করবে, সে উপায় রাখলো না আবিদ হুসেন। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললো, "এগিয়ে যাও।"

আবিদ হুসেন তখনই মনে মনে নিজেকে একজন বিশিষ্ট মনসবদার গণ্য করতে শুরু করেছে। খুব সংযত ভঙ্গিতে প্রচুর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে এগিয়ে গেল বাদশাহ্র তখ্তএর সামনে। কুর্নিস করলো তিনবার।

"মির আবিদ হুসেন," পরিচয় দিলো আকিল খাঁ, "শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্র দরবারের উমরাহ স্বর্গগত মহম্মদ হুঁসেন খাঁর পুত্র।"

আবিদ হুসেন আবার কুর্নিস করলো।

উজীর জাফর খাঁর চোখ মুখ তখন লাল হয়ে গেছে। আবিদ হুসেন এখনো তার নিয়োগের পরোয়ানা পায়নি, এখানে হাজির হোলো কি করে! রোষকশায়িত লোচনে আকিল খাঁর দিকে তাকালো।

বাদশাহ আওরংজেব চোখ তুলে তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে। তার খুব ভালো লাগলো আবিদ হুসেনের সহজ সরল ভঙ্গি। বেশির ভাগ উমরাহ্ই বাদশার সামনে এসে দাঁড়ালে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, নিজের হাত দুটোকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না, হাঁটু দুটো ঈষৎ কাঁপতে থাকে। বাদশাহ মনে মনে অপছন্দ করে এই দুর্বল মনোভাব, এদের দিয়ে সংসারের কোনো বড়ো কাজই হয়না বলে মনে করে বাদশাহ। আবিদ হুসেনকে দেখে মনে হোলো, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি, অথচ চমৎকার কেতাদুরস্ত, এরাই দরবারে খিদমতে হাসিল হওয়ায় যোগ্য।

নিয়োগের পরোয়ানা পাওয়ার আগেই দরবারে হাজির হয়েছে,

সুতরাং কারণ একটা দেখাতে হবে। আকিল খাঁ বললো, "আলমপনাহ, আপনার কাছে আবিদ হুসেন একটা আরজ পেশ করবার জন্য হাজির হয়েছে।" মনে মনে ভাবলো,—আমার কাজ তো আমি করলাম, এখন আবিদ হুসেন সামলাক। বড়ো বেশী চালাক মনে করে নিজেকে।

"পেশ করা হোক আবিদ হুসেনের আরজ," বললো বাদশাহ।

যমুনার ওদিক থেকে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঝিরঝির করে। সেই হাওয়ায় ভেসে এলো মহলের বাগিচার চামেলির খুশবু। আবিদ হুসেনের মাথাটা যেন অল্প অল্প ঘুরছে। কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছেনা। তবু চট করে ভেবে কিছু একটা বলতে হবে।—আবিদ হুসেন ভাবলো, মিছে কথা বলতে যাই কেন? বানিয়ে বলবো বলে মিছে কথা বানিয়ে বলবো?—যুক্তি দাখিল করলো তার মন। না, আমি আবিদ হুসেন খাঁ সত্যি কথা বানিয়ে বলবো।

"আলমপনাহ," আবিদ হুসেন সহজ কণ্ঠে বললো, "খাদিমের গুস্তাকি মাফ করবেন। আমার বয়েস খুব কম। এই বয়েসে হৃদয়ের সমস্ত আরজ অল্প কথায় শুধু প্রকাশ করা যায় শের্‌এর মাধ্যমে। আমাকে এক শের আবৃত্তি করবার হুকুম দেওয়া হোক।"

আকিল খাঁ প্রমাদ গুনলো। এই বেআদব লোকটা বলে কি? এটা শের শোনাবার জায়গা? কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। যা বলবার বলতে পারে শুধু বাদশাহ।

ওদিকে ফুলাদ খাঁ তখন রাগে জ্বলছে। আবিদ হুসেনকে দেখলেই তার সারা শরীর জ্বলে ওঠে। এ লোকটা এখানে এলো কি করে! ভালোই হয়েছে, সে প্রবোধ দিলো নিজেকে, শাহ-ইন-শাহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি, এখনই ধরে ফেলবে আবিদ হুসেনের আসল রূপ। তারপরই কঠোর সাজা দেওয়ার হুকুম হবে।

রদ-অন্দাজ খাঁ অতোটা অপছন্দ করতো না আবিদ হুসেনকে। এতদিন ধরে দেখে আসছে তাকে, বেশ ভালো করেই চেনে। একমাত্র

সেই বুঝতে পেরেছিলো যে বাইরে বাহাদুর খাঁর শামআনাহ্‌তে নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা শরাব পান করেছে আবিদ হুসেন। তার একটু ভাবনাই হোলো ছেলেটির জন্যে।

আওরংজেব শুধু একটু হেসে মাথা নাড়লো। ভাবলো, বাঃ, বেশ ছেলেতো। নিশ্চয়ই খুব ইলম্‌ আছে ছেলেটির, তা নইলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে শের্‌ শোনাতে চায়। আওরংজেব নিজেও কথাবার্তার অবকাশে দু-চার পংক্তি কবিতা রচনা করতো বক্তব্য বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট করবার জন্যে। সুতরাং আবিদ হুসেনের বাচনভঙ্গি তার খুব ভালো লাগলো।

"আলমপনাহ," বললো আবিদ হুসেন শের তৈরী করে, "যে পাখি পিঞ্জরে ধরা দেয়, সেই পোষ মানে। বুলবুলি একবার এসেই পালিয়ে যায় আকাশে। যে আশিক সারাজীবনের, সে আসে মাশুকের দিওয়ানে। গুলবাগিচার যে আশিক একবারের বেশী আসেনা, সে নিশ্চয়ই পালানোর ভাবনায় মশগুল।"

বেতমিজ!—ভাবলো দরবারের সমস্ত উমরাহ। সবাই স্তব্ধ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো বাদশাহ এই বেওকুফকে কি সাজা দেয়। আদি রসাত্মক শের বাদশাহ যে পছন্দ করে না একথা কারো অজানা নয়।

আওরংজেব চোখ তুলে কুমার রামসিংহের দিকে তাকালো। দেখলো কুমারের মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে। আবিদ হুসেনের দিকে হাসিমুখে তাকালো আওরংজেব। বললো,—ওয়াহ্‌!

আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আমির উমরাহেরা বলে উঠলো,—আ হা হা,—আহা—আহা—কী চমৎকার শের। ওয়াহ্‌ ওয়াহ্‌ ওয়াহ্‌।

কিন্তু মনে মনে কেউই ভেবে পেলো না দরবারে নবাগত এই অর্বাচীন তরুণ এমন কি কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছে যে, স্বয়ং বাদশাহ তার প্রশংসা করছেন।

শুধু আকিল খাঁ অনুমান করতে পারলো। ভাবলো,—না, লোকটার সত্যিই ইলম্ আছে।

ফুলাদ খাঁ আর রদ্-অন্দাজ খাঁ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো। কুমার রামসিংহের মনে জাগলো দুর্ভাবনা। নাঃ, সাবধান হয়ে যেতে হবে, রামসিংহ ভাবলো।

"আজ থেকে মির আবিদ হুসেনের নামের সঙ্গে খাঁ উপাধি যোগ করা হোক," বললো আওরংজেব।

আবিদ হুসেন খুব উল্লসিত হোলো। সে নিজেকে মাঝে মাঝে খাঁ বলতো বটে, কিন্তু এই উপাধি ব্যবহার করার অধিকার ছিলো না। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে চেনাজানা সবাইকে বলা যাবে, তার নাম মির আবিদ হুসেন খাঁ।

উজীরের দিকে ফিরে বাদশাহ বললো, "মির আবিদ হুসেন খাঁর আরজ আমি বুঝে নিয়েছি। ওর আরজ মঞ্জুর করা হবে। আকিল খাঁকে জানানো হোক, দরবারের পরে আবিদ হুসেন খাঁকে খিলওয়াত-গাহ্‌তে আমার কাছে হাজির করার হুকুম হোলো।"

উজীর জাফর খাঁ আকিল খাঁর দিকে ফিরে আনুষ্ঠানিক ভাষায় বাদশাহ্‌র হুকুম জানালো। আকিল খাঁ আর আবিদ হুসেন কুর্নিস করলো বাদশাহকে।

দিওয়ান-ই-খাসের সান্ধ্য দরবারে এসময় উজীর বিভিন্ন রাজস্ব বিভাগের কার্যবিবরণী পেশ করে। কিন্তু সেদিনকার বিশেষ দরবারে এই নিত্যনৈমিত্তিক সূচী ছিলো না। সারাদিন শহরে কিভাবে উৎসব প্রতিপালিত হয়েছে, খাস মহলে মালিকা-আলমের দরবারে কোন কোন উমরাহ্‌র বেগম উপস্থিত হয়ে কি কি নজরানা দিয়েছে সেসবের বিবরণ শোনানোর পর শুরু হোলো নাচ গানের মাইফিল। এই রেওয়াজ দরবার থেকে বাতিল হতে তখনো দুবছর দেরি, ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলো বাদশাহ আলমগীর। তারপর দরবার ভঙ্গ করে চলে গেল।

উমরাহেরা দিওয়ান-ই-খাস থেকে বেরিয়ে এলো গুলালবারে। সেখানে বিভিন্ন শামআনাহ্‌তে নৈশভোজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সবার জন্যে। বাদশাহ্‌র বাবর্চিখানা থেকে নানাবিধ আহার্য প্রেরণ করা হবে প্রত্যেক শামআনাহ্‌তে। অল্প যে কয়জন খিলওয়াত-গাহ্‌তে যাবে তারাই দাঁড়িয়ে রইলো দিওয়ান-ই-খাসের সামনে।

আকিল খাঁ আবিদ হুসেনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে জাফর খাঁ, জসবন্ত সিংহ, ফুলাদ খাঁ আর রদ্‌-অন্দাজ খাঁ তাদের ঘিরে ধরলো। কুমার রামসিংহ পাশ দিয়ে চলে গেল, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো সবার দিকে, কিন্তু দাঁড়ালো না।

জাফর খাঁ আবিদ হুসেনকে বললো, "ব্যাপার কি বলো তো? তোমার মতলব তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আবিদ হুসেনের সুরাপ্রসূত আত্মপ্রত্যয়ের ঘোর তখনো কাটে নি। দরবারে খাতির পেয়ে নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা স্ফীত ধারণা হতে শুরু করেছে। গম্ভীর চালে বললো, "শাহ-ইন-শাহ ঠিক বুঝে নিয়েছেন।"

"তুমি কি শিবাজী সম্বন্ধে কোনো খবর জানতে পেরেছো?" জাফর খাঁ গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আবিদ হুসেন উদ্ধত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "শিবাজী আমার বিবির বেরাদরজান নয় যে আমার গলা জড়িয়ে কানে কানে মনের গোপন কথা জানাবে।"

জাফর খাঁ চটে গেল ওর কথা বলার ধরন দেখে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো, "তুমি তো বড্ড বেতমিজ! হিন্দুস্তানের উজীর-উল-মুলকের সঙ্গে এভাবে কথা বলছো?"

"আমায় বেতমিজ বলছেন? বেশ, একটু পরে খিলওয়াতগাহ্‌তে আমি ফরিয়াদ পেশ করবো শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে।"

"আরে না, না—," ব্যস্ত হয়ে উঠলো জাফর খাঁ, "রাগ করছো

কেন? তোমার স্বর্গনিবাসী ওয়ালিদ মহম্মদ হুসেন খাঁ আমার বড় পেয়ারের দোস্ত ছিলেন। আমি—"

"বেশ তো, ও বলুক না," ফুলাদ খাঁ বললো, "আমিও শাহ-ইন-শাহকে জানিয়ে দেবো আবিদ হুসেন শরাব পান করে দরবারে এসেছিলো বিনা ইত্তলায়।"

"বেশ, আমিও জানাবো আমি শরাব পান করেছিলাম বাহাদুর খাঁর শামআনাহ্‌তে। ওরা শরবত বলেছিলো, তাই ভুল করে খেয়েছিলাম। সেখানে মুহতাসিবেরা ঘুরছিলো, খুদ ফুলাদ খাঁ গল্প করছিলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমি কি করে বুঝবো?"

"আরে না না," এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো ফুলাদ খাঁ, "আমি কি সত্যি সত্যিই বলতে যাচ্ছি নাকি? তুমিও যেমন।"

রদ্‌ অন্দাজ খাঁ মুখ টিপে টিপে হাসছিলো। ফুলাদের হাত ধরে বললো, "চলো, চলো এখান থেকে। খিলওয়াতগাহ্‌তে যাওয়ার আগে বাহাদুর খাঁর শামআনাহ্‌তে গিয়ে আর একবার বিলায়তী শরবত পান করা যাক। আমার গলা শুকিয়ে আসছে।"

রদ্‌ অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ চলে গেল। উজীর জাফর খাঁ আবিদ হুসেনের কাঁধে হাত রেখে বললো, "বাবাজান, তুমি আমার ছেলের মতো। একটা কথা তোমায় বলে রাখি, কথাটা সব সময় মনে রেখো। শাহ-ইন-শাহ্‌র নেকনজর যার উপর পড়ে, তার উচিত শাহ-ইন-শাহ্‌র অন্যান্য প্রিয়জনের সঙ্গেও সদ্ভাব বজায় রাখা। তা নইলে এ খেলা বেশীদিন চলে না। সব কথা শাহ-ইন-শাহ্‌কে সব সময় বলতে নেই। মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে সলাহ্‌ নিয়ে নিলে তোমার উপকারই হবে।" জসবন্ত সিংহের দিকে ফিরে বললো, "চলুন, খিলওয়াতগাহ্‌র দিকে যাওয়া যাক। শাহ-ইন-শাহ নিশ্চয়ই এতক্ষণে এসে পড়েছেন।"

মহারাজা জসবন্ত সিংহ আবিদ হুসেনকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, একটা কথা। তুমিই শক্তিসিংহ রাঠোরের সেই বন্ধু,—না?"

"আমি শক্তিসিংহ রাঠোরের খাদিম," আবিদ হুসেন উত্তর দিলো। "উনি খুব শরীফ লোক।"

মহারাজা জসবন্ত সিংহ আর জাফর খাঁ চলে যাওয়ার পর আকিল খাঁ বললো, "আবিদ হুসেন, তোমাকে খিলওয়াতগাহ্‌তে নিয়ে যেতে না হলে আমি খুশী হতাম।"

"কেন?"

"তুমি বড়ো বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছো। এটা ভালো নয়।"

আকিল খাঁ আর আবিদ হুসেন যখন খিলওয়াতগাহ্‌তে এলো তখন জাফর খাঁ, জসবন্ত সিংহ, ফুলাদ খাঁ, রদ অন্দাজ খাঁ আর আগ্রার ফৌজদার ফিদাই খাঁ সবাই বাদশাহ্‌র অপেক্ষা করছে। একটু পরে নমাজ সেরে খুদ বাদশাহও উপস্থিত হোলো। এখানে রেওয়াজের কড়াকড়ি নেই। বাদশাহ নিজে সোজাসুজি কথা বলে সবার সঙ্গে। আবিদ হুসেনকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলো। বললো, "আবিদ হুসেন খাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমায় কি বলতে চেয়েছো। প্রকাশ্য দরবারে যে ভাবে তুমি সংবাদটি জানিয়েছো, তাতে তোমার তীক্ষ্নবুদ্ধি ও সতর্কতা প্রকাশ পেয়েছে। আমি যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।"

মনে হোলো যেন একটা বিস্ময় ফুটে উঠলো আবিদ হুসেনের মুখের উপর।

আওরংজেব বলে গেল, "কাল থেকে তুমি দরবারে নিয়মিত হাজির থাকবে। অন্য সময় শহরে তফরী করবে। চোখ কান খোলা রাখবে। প্রত্যেকদিন একবার করে খিলওয়াতগাহ্‌তে এসে আমাকে তসলিম জানিয়ে যাবে। তুমি বুদ্ধিমান লোক। তোমাকে এর বেশী কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিনা।"

"শাহ-ইন-শাহ বড়ো মেহেরবান," আবিদ হুসেন তসলিম করে বললো।

আবিদ হুসেনের উত্তর শুনে আকিল খাঁর খুব হাসি পেলো। এমন উত্তর বাদশাহ্‌কে শুধু ওর মত সরল লোকই দিতে পারে।

"তুমি এবার বিদায় নিতে পারো।"

তসলিম করে আবিদ হুসেন বেরিয়ে এলো খিলওয়াতগাহ্‌ থেকে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে দিওয়ান-ই-আমের পাশে গুলালবারের এক প্রান্তে একটি শামআনাহ্‌র কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। চারদিকে বিভিন্ন শামআনাহ্‌তে উৎসবের সমারোহ পুরোমাত্রায় চলছে। অসংখ্য রঙিন কাচের ফানুস ঝুলছে চারদিকের গাছে গাছে। ছোটো ছোটো শামা জ্বলছে প্রত্যেকটি ফানুসে। শামআনাহ্‌র ভিতরে উজ্জ্বল ঝাড়ফানুসের আলোয় জমে উঠেছে নাচগানের মাইফিল। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেদিকে দু-চারবার তাকালো আবিদ হুসেন। তারপর আবার তাকিয়ে রইলো পথের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলো উজীর জাফর খাঁ আর জসবন্ত সিংহ হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে। কেল্লার ভিতরে বাদশাহ আর শাহজাদারা ছাড়া যানবাহন্ ব্যবহার করতে পারে না অন্য কোনো পুরুষ। ওরা কেল্লার দরওয়াজার কাছে গিয়ে উঠে পড়বে যে যার পাল্কিতে আর ঘোড়ায়। দুজনে ইফতিকার খাঁর শামআনাহ্‌র কাছে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে অল্পক্ষণ আলোচনা করলো নিজেদের মধ্যে। তারপর জসবন্ত সিংহ চলে গেল দরওয়াজার দিকে, জাফর খাঁ প্রবেশ করলো ইফতিকার খাঁর শামআনাহ্‌তে। একটু পরে এলো রদ অন্দাজ খাঁ, ফুলাদ খাঁ, ফিদাই খাঁ আর আকিল খাঁ। ওরাও একপাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলো নিম্নকণ্ঠে। চারপাশ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো অন্য সবাই, কিন্তু কাছে গিয়ে কেউ বিরক্ত করলো না। চারজনেই অতি উচ্চ-পদস্থ মনসবদার,—শাহী কেল্লার কিলাদার, আগ্রার কোতোয়াল, আগ্রার ফৌজদার, দিওয়ান-ই-খাসের দারোগা,—প্রত্যেকেই বাদশাহ্‌র অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। তাদের দেখে সবাই দরবারের

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুমান করবার চেষ্টা করে। একটু একটু করে কানাঘুসো শুরু হোলো সবার মধ্যে। ফিদাই খাঁ, রদ্ অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ চলে গেল বাহাদুর খাঁর শাম-আনাহ্‌তে। আকিল খাঁ এগিয়ে চললো দিল্লী দরওয়াজার দিকে। আবিদ হুসেন তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে ধরে ফেললো আকিল খাঁকে।

আবিদ হুসেনের নেশা এতক্ষণে কেটে গেছে অনেকটা। আকিল খাঁকে বললো "খাঁ সাহাব, কি হোলো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আকিল খাঁ বিস্মিত হয়ে আবিদ হুসেনের দিকে তাকালো। তারপর বললো, "শাহ-ইন-শাহ্‌র ধারণা হয়েছে তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। মানুষ চিনতে তাঁর ভুল হয়, এই প্রথম দেখলাম। কিংবা হয়তো তিনি ঠিকই চিনেছেন, তবে তাঁর মনে হয়েছে তোমাকে তাঁর নিজস্ব কোনে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

"কেন? কি ভাবে?" জিজ্ঞেস করলো আবিদ হুসেন।

"তাঁর মনে হয়েছে তুমি অনেক খবর রাখো।"

"আমি খবর রাখি? অনেক? সে কি! আমি তো তাঁর এরকম কোনো ধারণা হওয়ার কারণ দিইনি।"

"দাওনি?" আকিল খাঁ তারদিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "শিবাজী পালিয়ে যাবে, একথা হঠাৎ বলে ফেলনি রামসিংহকে দেখে?"

"আমি খুব নিচু গলায় বলেছি। উনি শুনে ফেলেছেন?"

"ওঁর শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ।"

আবিদ হুসেনের ঠোঁট দুটো ফাঁক হোলো ভয়ে আর বিস্ময়ে। "সে কি! আমার কথা উনি বিশ্বাস করেছেন? ওকথা আমার মুখ ফশকে অমনি বেরিয়ে গেছে।"

"কিন্তু খবরটা তুমি জানলে কি করে?"

"আমি তো কোনো খবর জানি না!"

"ওই যে শের বানিয়ে বললে ?"

"শের ? মাশুক আর আশিকদের সম্পর্কের একটা চিরন্তন ধারা সম্বন্ধে আমার মনে যে ব্যথা আছে সেটাই ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি কি করবো ? আপনি যে বলে বসলেন আমার একটা আরজ আছে। আমি বানিয়ে বানিয়ে কি বলবো, ভেবেই পেলাম না ?"

আকিল খাঁ হেসে ফেললো।

"আবিদ হুসেন, তোমার তো ক্যাল থেকে প্রত্যেক দিন সকালে একবার করে শাহ-ইন-শাহ্‌কে তসলিম করতে যেতে হবে খিলওয়াতগাহ্‌তে। এর অর্থ কি জানো ? তুমি যা যা খবর সংগ্রহ করছো বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে, সব তাঁকে প্রত্যেকদিন গিয়ে জানাতে হবে।"

"সর্বনাশ !" আবিদ হুসেনের মুখ সাদা হয়ে গেল, "কি বলবো তাঁকে ? একদিন দুদিন বানিয়ে বলতে পারি। তারপর ?"

"তারপর আর কি। একদিন দেখবো মির আবিদ হুসেন খাঁর ছিন্নমুণ্ড কিলার প্রাচীরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

আবিদ হুসেন ভয় পেয়ে গেল। আকিল খাঁর হাত ধরে বললো, "খাঁ সাহাব, আপনি আমার বড়ো ভায়ের মতো, আপনি আমায় বাঁচান। আমায় সলাহ্ দিন, কি করা যায়।"

আকিল খাঁ হাসলো আবার। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "যাক, তুমি আর দুর্ভাবনা কোরো না। আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করবো। তুমি খিলওয়াতগাহ্‌তে আসবে প্রত্যেকদিন। আমি যা যা বলে দেবো তোমায়, শাহ-ইন-শাহ্‌কে সেসব কথা জানিয়ে দেবে। রাজী ?"

"নিশ্চয়ই রাজী, আকিল খাঁ, নিশ্চয়ই রাজী। আমি আপনার খাদিম। আপনি যা বলবেন, তাতেই রাজী," আবিদ হুসেন বললো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

মাইফিল হচ্ছিলো মোতিজানের মাইফিলখানাতেও। সম্ভ্রান্ত রইস লোকেরা আসছিলো, রুমালিতে বেঁধে আশরফি ছুড়ে দিচ্ছিলো সামনের থালায়, তারপর আবার চলে যাচ্ছিলো নতুন অভ্যাগতদের ঠাঁই করে দিয়ে। একসময় আবিদ হুসেনও এসে বসলো।

মাইফিল যখন শেষ হোলো, তখন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত। শেষ অভ্যাগত চলে যাওয়ার পর মোতিজান আবিদ হুসেনের কাছে এসে বসলো। রুপোর তশতরি থেকে সোনার তবক মোড়া একটি গিলৌরী তুলে দিলো আবিদ হুসেনের মুখে। তারপর বললো, "আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমার ইনতেজার করে আছি। আমি জানতাম তুমি আসবে।"

আবিদ হুসেনের মুখ নিষ্প্রভ। বললো, "মোতিজান, আজকের এই ইতওয়ারের দিন আমার কি ভাবে কেটেছে তুমি জানো না। আমার এখনো বুকে ধুকধুক করছে। মনে হচ্ছে যেন একটা খোয়াব দেখেছি।"

মোতিজান হাসিমুখে বললো, "তোমার খুশখবর আমিও পেয়েছি। কার মুখ দেখে উঠেছিলে আজ সকালে? একদিনে এত! শুনে খুশিতে আমার চোখে জল এলো। ফুলাদ খাঁ আর তোমার উপর দাপট চালাতে পারবে না। আমরা সবাই ঠাট্টা করে তোমায় উমরাহ বলতাম। তুমি তাই হতে চলেছো সত্যি সত্যি?"

"এদ্দিন শান্তিতে ছিলাম। আজ থেকে আমার মনে আর শান্তি নেই," বললো আবিদ হুসেন, "প্রত্যেকদিন খিলওয়াতগাহ্‌তে গিয়ে শাহ-ইন-শাহ্‌কে তসলিম করে আসতে হবে, নিজের যোগ্যতার একটা না একটা প্রমাণ দিতে হবে, সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক। দরবারের লোক হওয়া যে এত দুর্ভাবনার ব্যাপার কে জানতো। আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।"

"পালিয়ে যাবে? আমাদের ছেড়ে?" মোতিজান হাসলো, "যেতে দিচ্ছে কে?"

"ধরে রাখছে কে?" মোতিজানের হাসি দেখে আবিদ হুসেনের মন একটু হাল্কা হোলো।

"আমি।"

"তুমি আমায় ধরে রাখবার কে?"

"মির আবিদ হুসেন খাঁ, তুমি খাঁ-ই হও আর যাই হও, তুমি আমার চিরদিনের সেই বেওকুফ আবিদ মিঞা।"

ফরাশ এসে জানালো, "রদ্ অন্দাজ খাঁ সাহাব আর ফুলাদ খাঁ সাহাব তশরিফ আনছেন।"

"ওরে বাবা," বলে উঠলো আবিদ হুসেন, "আমি ওদিকের দরজা দিয়ে সরে পড়ি।"

"কেন? ভয়টা কিসের?"

"না বাবা, ফুলাদ খাঁ আবার তর্জন গর্জন শুরু করবে।"

"কিছু করবে না। তুমি বোসো।"

রদ্ অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ ঘরে ঢুকলো। আবিদ হুসেনকে দেখে ফুলাদ খাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছু একটা বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কি ভেবে সামলে নিলো নিজেকে। রদ্ অন্দাজের দিকে ফিরে বললো, "চলো, আমরা চলে যাই।"

রদ্ আন্দাজ খাঁ হাসিমুখে তার হাত ধরে ঘরের ভিতর এনে বসালো। বললো, "কেন ভাই, চলে যাবে কেন? মির আবিদ হুসেন খাঁ তো এখন আমাদের লোক। আমাদের খুবই খুশকিসমতি যে আমাদেরই এক বন্ধু শাহ-ইন-শাহ্‌র মেহেরবানি লাভ করে ধন্য হয়েছে। ভাই আবিদ হুসেন খাঁ, আমরা বেশীক্ষণ বসবো না। শুধু একসঙ্গে বসে তোমার সম্প্রতিক মর্যাদা লাভের উপলক্ষে একটু পান করবো, অবশ্যি যদি তোমার অনুমতি হয়।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," বললো আবিদ হুসেন খাঁ, "আপনাদের খুবই মেহেরবানি।"

"ভাই সাকী," মোতিজানের দিকে ফিরে বললো রদ্ অন্দাজ খাঁ, "নিয়ে এসো তোমার সোনার ঝারি, আর রঙীন কাচের পিয়ালা।"

শরাবের হুল্লোর জমে উঠলো। পায়ের ঘুঙুর ঝমঝমিয়ে নাচ শুরু করলো মোতিজান। তার গানের সঙ্গে গলা মেলালো তার সুন্দরী দোহার। দ্রুত তান গুমরে উঠলো সারেঙ্গিতে।

কিলাদার রদ-অন্দাজ আর কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ গুলালবারে বাহাদুর খাঁর শামআনাহ্‌তেই প্রচুর শরাব পান করেছে, এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে মাতাল হয়ে উঠলো। ফুলাদ খাঁ তাল দিতে লাগলো তাকিয়ায়। রদ-অন্দাজ আর আবিদ হুসেন দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে অন্য হাতে পিয়ালা দুলিয়ে গলা মেলাবার চেষ্টা করলো মোতিজানের গানের সঙ্গে।

রদ-অন্দাজ খাঁ আড় চোখে তাকালো ফুলাদ খাঁর দিকে। ফুলাদ খাঁ বার বার সামনে ঢলে পড়ছে। রদ-অন্দাজ খাঁ আবিদ হুসেনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনলো। সত্যিই কি এত মাতাল হয়ে উঠেছিলো সে?

ফিসফিস করে বললো, "আবিদ হুসেন, আমি তোমাকে দু-চারটা কথা যা জানাবো, ওসব তুলে দেবে শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে?"

"নিশ্চয় দেবো। আমি আপনার খাদিম," বললো আবিদ হুসেন। এক দিনেই সে দরবারের রীতিনীতি আয়ত্ব করেছে বেশ।

লক্ষ্য করলো মোতিজান। খুব খুশী হোলো। সত্যি, এত বিশিষ্ট লোক হয়ে উঠেছে তার আবিদ মিঞা। দ্রুত বোলের সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরপাক খেতে লাগলো, প্রত্যেক ষোলো মাত্রার মধ্যে আটবার, ষোলো বার, বত্রিশ বার—। এত হাল্কা মন নিয়ে সে নাচেনি এর আগে কোনোদিন। শুধু তার শরীর নয়, তার সমস্ত মনই নাচছে।

আর ঠিক সেই সময় খোজা ফিরোজার বাগে রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতর নিরাজী, দত্ত ত্রিম্বক আর হীরাজী ফরজন্দের সঙ্গে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলো শিবাজী ভোঁসলে।

"সময় লাগবে," ন্যায়াধীশ নিরাজী রাওজী বললো।

"লাগুক সময়। এক মাস, দেড় মাস, ছুমাস," শিবাজী উত্তর দিলো, "আমাদের ভবিষ্যৎ মহারাষ্ট্রে, এখানে নয়। হিন্দুপাদ বাদশাহী, এ ছাড়া আমাদের পরিত্রাণের অন্য উপায় নেই। আগ্রায় এসেছি পুরো একদিনও হয়নি। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি।"

"পরিকল্পনা একটা তৈরী করতে হয়," বললো সর-নায়ক দত্ত ত্রিম্বক।

"পরিকল্পনা পরে," শিবাজী বললো শান্ত কণ্ঠে, "প্রস্তুতি শুরু কারো এখন থেকেই। পাথেয় অর্থ লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করো। বোঝা হাল্কা করতে শুরু করো। তিনটি ফাঁপা লাঠি চাই। আশরফি ভরে নাও তার মধ্যে। আওরংজেবের মতলব বোঝা ভার। হঠাৎ আমাদের সব টাকা আশরফি সোনা হীরা জহরৎ বাজেয়াপ্ত করতে পারে। প্রয়োজনীয় অর্থ এখন থেকেই লুকিয়ে ফেল। বাদবাকী টাকা খরচা করতে শুরু করো। ঋণ করো চারিদিকে। আওরংজেবের ধারণা হোক আমরা আগ্রার জৌলুস দেখে দিশাহারা হয়ে গেছি।"

পরদিন তেরোই মে, সোমবার। আগের দিন শাহী কেল্লার চৌকির পালা ছিলো কুমার রামসিংহের। সারারাত তাকে কাটাতে হয়েছে কেল্লার বাইরে এক তাঁবুতে। রাত কেটেছে নানা দুর্ভাবনার মধ্যে। সকালবেলা খোজা ফিরোজার বাগে ফিরে এসেই তেজ সিংহ, ডুঙ্গরমল চৌধুরী, রামদাস রাজপুত আর গিরধরলাল মুনশীকে ডেকে পাঠালো নিজের দিওয়ানখানায়। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা দিওয়ান-ই-খাসের ঘটনা বর্ণনা করে বললো, "শাহ-ইন-শাহ্‌র সন্দেহ হয়েছে।

শুনতে পেলাম, খিলওয়াতগাহ্‌তে মহারাজা জসবন্ত সিংহ আমার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন শাহ-ইন-শাহ্‌কে। এখন কি করা যায়?"

"কে এই আবিদ হুসেন খাঁ?" জিজ্ঞেস করলো তেজ সিংহ, "দুদিন আগেও এর নাম শুনিনি।"

"জানতেই বা পারলো কি করে?" বললো রামদাস রাজপুত, "আপনি শিবাজীকে মতলবটা দিলেন সন্ধ্যেবেলা। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যে দিওয়ান-ই-খাসে শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে খবরটা পৌঁছে গেল? মারাঠাদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই খবরটা বেরোয় নি।"

"হয়তো—," মন্তব্য করলো ডুঙ্গরমল চৌধুরী, "হয়তো, মারাঠারা মতলব করছে আগের থেকেই। আবিদ হুসেন খাঁ জানতে পেরেছে কোনো রকমে।"

"কিংবা হয়তো," রামদাস রাজপুত বললো, "মহারাজা জসবন্ত সিংহই এরকম একটা সম্ভাবনা অনুমান করে নিয়ে উস্কে দিয়েছে আবিদ হুসেনকে। একথা ভুলে যাবেন না যে, মহারাজা জসবন্ত সিংহের অনুচর শক্তিসিংহ রাঠোর আবিদ হুসেনের বন্ধু।"

"সমস্ত ব্যাপারটা বড্ড জটিল মনে হচ্ছে," বললো মুনশী গিরধরলাল।

"এখন আমাদের কি কর্তব্য, সেকথাই আপনাদের কাছে জানতে চাইছি," কুমার রামসিংহ বলে উঠলো, "আমাদের মহারাজার কাছে পত্র লিখে পরামর্শ নেওয়ার সময় নেই। আপনারাই বলে দিন আমি কি করবো?"

"মহারাজার কাছ থেকে উত্তর আসার সময় থাক বা না থাক ওঁকে সব কথা জানানো আমাদের কর্তব্য," ডুঙ্গরমল বললো, "প্রত্যেকদিনকার বিবরণী পাঠানো হোক তাঁর কাছে।"

"মহারাজার একটি নির্দেশ খুব পরিষ্কার," মুনশী গিরধরলাল

অভিমত দিলো, "শিবাজী রাজা আমাদের অতিথি। রাজপুতের অতিথির যেন কোনোরকম অসম্মান বা বিপদ না হয়।"

"অতিথি যদি আমার কথা না শোনে, আমি কি করতে পারি?" বিরক্তি দেখা দিলো রামসিংহের মুখের উপর। "এত করে বলছি, অন্তত একবার হাজির হতে। তাহলেই সব গোলমাল মিটে যায়।"

"ব্যাপারটা অতো সহজ নয়," বললো রামদাস রাজপুত, "শাহ-ইন-শাহ শিবাজীকে নিজের করায়ত্ত করতে কৃতসংকল্প। উনি যদি শিবাজীকে কয়েদ করেন, আমি আশ্চর্য হবো না।"

"আমি প্রাণ থাকতে সেটা হতে দেবো না," বলে উঠলো রাম সিংহ, "শিবাজী কছওয়া দরবারের অতিথি। আমার হিফাজত থেকে যদি কেউ তাঁকে গিরফতার করে, তাতে কছওয়া দরবারের বেইজ্জতি হয়।"

"ওঁকে পালিয়ে যেতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে," বললো তেজ সিংহ, "শিবাজী পালিয়ে গেলে আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই।"

"কিন্তু শাহ-ইন-শাহ্‌র মনে যখন সন্দেহ 'হয়েছে, উনি নিশ্চয়ই আমাদের দায়ী করবেন।"

"আমাদের প্রতি দরবারের কি এমন কোনো নির্দেশ আছে শিবাজীকে পাহারা দেওয়ায়?" তেজ সিংহ জিজ্ঞেস করলো। "আমরা ভার নিয়েছি অতিথিসৎকারের। সেটুকুই আমাদের দায়িত্ব। দরবারের অনুমতি ছাড়া শিবাজী আগ্রা ত্যাগ করতে পারেন না। সুতরাং তিনি যদি পালিয়ে যান অপরাধ তাঁর। শাহ-ইন-শাহ শিবাজীর সঙ্গে সেটা বোঝাপড়া করবেন। আমরা কি করতে পারি।"

"তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগই যদি করে দিতে হয়," বললো ডুঙ্গরমল চৌধুরী, "তাহলে বিলম্ব করা উচিত নয়। যে কোনো দিন শাহ-ইন-শাহ শিবাজীকে কয়েদ করতে পারেন।"

"আগ্রা থেকে পালিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়," মন্তব্য করলো রামদাস রাজপুত।

মুনশী গিরধরলাল গভীর ভাবে চিন্তা করছিলো। বললো, "পালানো সহজ আগ্রার বাইরে কোনো জায়গা থেকে। বাদশাহ্‌র অনুমতি নিয়ে আগ্রার বাইরে যাওয়ার একটা উপায় আছে। কথাটা বোধ হয় আগে একবার উঠেছিলো। যদি শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুমে শিবাজীকে কোনো কাজের ভার দিয়ে কাবুলে কি কান্দাহারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়—"

কুমার রামসিংহও কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, "দুটো চেষ্টাই করতে হবে। একটা না হলে আরেকটা। শিবাজী আমার সঙ্গে দরবারে আসুক আজ কাল আর পরশু। আমাদের হরকরা তো প্রত্যেকদিন দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছে। এর মধ্যে একদিন সুযোগ বুঝে শিবাজীকে আমাদের হরকরা সাজিয়ে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেবো।"

বেলা বেড়ে উঠলো। বাদশাহ্‌র আম দরবারে যেতে হবে। যাওয়ার পথে শিবাজীর মঞ্জিলের সামনে থামলো রামসিংহ। কিন্তু শিবাজী দেখা করলো না। জানালো যে তার শরীর অসুস্থ।

রামসিংহ কি বুঝলো কে জানে। ভেতরে গিয়ে আর খোঁজ করার চেষ্টা করলো না। সোজা চলে গেল দিওয়ান-ই-আমে। আওরংজেব উজীরের মারফত জিজ্ঞেস করলো,—শিবাজী কি আসছে? রামসিংহ জানালো,—শিবাজীর জ্বর হয়েছে, তাই আজ আর আসবেন না।

বাদশাহ্‌র দরবার থেকে ফিরে এসেই মহারাজা জসবন্ত সিংহ ডেকে পাঠালো দুর্গাদাস রাঠোর আর শক্তিসিংহকে। ওরা এসে দেখলো মহারাজার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

"আমি যা চেয়েছিলাম," জসবন্ত সিংহ বললো, "ঠিক তাই

হয়েছে। রামসিংহ সম্বন্ধে অবিশ্বাস এসে গেছে বাদশাহ্‌র মনে শিবাজীর এখন যা মনোবৃত্তি তাতে রামসিংহের রীতিমতো অসুবিধে হবে। যা বুঝছি মহারাজা জয়সিংহের ইজ্জৎ থাকবে না শেষ পর্যন্ত।”

“কিন্তু একথা কি সত্যি,” দুর্গাদাস জিজ্ঞেস করলো, “যে, কুমার রামসিংহ শিবাজীকে পলায়ন করতে সহায়তা করবেন?”

“আমার মনে হয় না। তার এত সাহস নেই। তবে এরকম কানাঘুসো যে উঠেছে, তাতে আমাদেরই সুবিধে। শিবাজী যদি আগ্রা ত্যাগ করতে পারে, তাহলে আমাদের সহায়তা নিয়েই পারবে।”

“মহারাজ,” শক্তিসিংহ বললো, “সেদিন শিবাজী প্রকাশ্য দরবারে আপনার সম্বন্ধে খুব অপমানজনক উক্তি করেছিলেন।”

জসবন্ত সিংহ হাসলো। “হ্যাঁ, সেরকমই একটা বোঝাপড়া আছে আমাদের মধ্যে। সেদিনই সন্ধ্যায় দত্ত ত্রিম্বক শিবাজীর শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে এসেছিলো আমার কাছে। শিবাজীর সম্বন্ধেও আমি প্রকাশ্যে খুব সম্মানজনক উক্তি করছি না। আমি তো শাহ-ইন-শাহ্‌কে সব সময় বলছি শিবাজীর সম্বন্ধে খুব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। উজীর-উল-মুল্‌কের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে এখন আমাদের জানা দরকার, শিবাজীর সম্বন্ধে রামসিংহের পরিকল্পনাটা কি। কোনো মারাঠার সঙ্গে কোনো রাঠোরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। কছওয়াদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতার প্রশ্ন ওঠেই না। খোজা ফিরোজার বাগে যাওয়ার একমাত্র উপলক্ষ আছে,” শক্তিসিংহের দিকে ফিরলো জসবন্ত সিংহ “তোমার। তুমি গোপনে যাবে। সেটা যে বাদশাহ্‌র খুফিয়ানবিসের চোখে পড়বে না তা নয়। তবে তোমাকে কোনোরকম সন্দেহ করার কারণ থাকবে না,” বলে জসবন্ত সিংহ একটু হাসলো।

শক্তিসিংহের চোখ মুখ ঈষৎ রক্তিম হোলো।

"এখন থেকে শিবাজীর সঙ্গে আমার একমাত্র যোগসূত্র হবে তুমি। তার ব্যবস্থা তুমিই করবে। শিবাজী জানেন, তিনি রাম সিংহের উপর ভরসা করে কোনো বিশেষ উপকার পাবেন না। তাঁকে নির্ভর করতে হবে আমার সহায়তার উপর। আজ তাঁকে কতকগুলো কথা জানিয়ে আসতে হবে তোমায়।"

"বলুন মহারাজ," শক্তিসিংহ বললো।

"কাল খিলওয়াতগাহ্‌তে আমি, জাফর খাঁ, ফুলাদ খাঁ আর রদ্‌ অন্দাজ খাঁ সাক্ষাৎ করেছি শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে। এবং—ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নাও,—খুদ জাহানআরা বেগম সাহিবাও আসছেন খিলওয়াতগাহ্‌তে। সেখানে আমরা শাহ-ইন-শাহ্‌কে একটা পরিকল্পনা পেশ করবো। শোনো মন দিয়ে—।"

মহারাজা জসবন্ত সিংহ বলতে শুরু করলো।

শক্তিসিংহের সঙ্গে পান্নার দেখা হোতো নিয়মিত। দু'একদিন পরপর সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে খোজা ফিরোজার বাগে মুনশী গিরধরলালের গৃহের পেছনদিকে সেই কুয়োর কাছে আসতো। কিছুক্ষণ গাছতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গল্প করতো পান্নার সঙ্গে, তারপর বিদায় নিতো দু-তিনদিন পরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

সেদিনও সন্ধ্যের পর যখন অন্ধকার নামলো আগ্রার শহরতলিতে, শক্তিসিংহ রাঠোর চারদিকে তাকাতে তাকাতে এলো খোজা ফিরোজার বাগের কাছে। যেখানে এসে সে ঘোড়া বাঁধতো, সেখানে এসে ঘোড়ার গতি থামাতেই দেখলো অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসছে একদল লশ্‌কর। শক্তিসিংহ আবার চলতে শুরু করলো। কাছে এসে দেখলো ওরা কছওয়া অশ্বারোহী সেনা, টহল দিচ্ছে খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে। শিবাজী আসবার পর পাহারার কড়াকড়ি করেছে কুমার রামসিংহ। সে খানিকটা এগিয়ে গেল। কছওয়া রাজপুতেরা দৃষ্টির আড়াল হতে আবার ফিরে

এলো। ঘোড়ার রাশ টেনে থামাতে যাবে, এমন সময় মনে হোলো যেন পথের ওধারে ঘন গাছপালার ছায়ায় কেউ সরে গেল এক পাশে। শক্তিসিংহ মনে মনে হাসলো। ফুলাদ খাঁর হরকরা নজর রেখেছে খোজা ফিরোজার বাগের উপর। খানিকটা এগিয়ে গেল সে। এদিকটা একেবারে নিরিবিলি। একটি গাছের ছায়ার অন্ধকারে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে একটু ঘুরপথে ফিরে এলো ঠিক সেই জায়গায় যেখানে ফুলাদ খাঁর হরকরা আত্মগোপন করে আছে বলে তার সন্দেহ হয়েছিলো। খুব সন্তর্পনে নিঃশব্দে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে কাছে এসে দেখলো, সে যা ভেবেছিলো তাই। একজন মোগল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খোজা ফিরোজার বাগের উপর চোখ রেখে। কাছে আরেকটি গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে রেখেছে নিজের ঘোড়াটি। সে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাস খাচ্ছিলো। মোগল টের না পেলেও সে বোধ হয় টের পেলো। মুখ ফিরিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো। মোগল চমকে ফিরে তাকাতেই শক্তিসিংহ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে শক্তিমান পুরুষ, তাকে কাবু করতে বেশীক্ষণ লাগলো না। তারই পাগ দিয়ে বেঁধে ফেললো তার হাত দুটো, তারই আতরের গন্ধ মাখা রুমাল পুরে দিলো মুখের মধ্যে। তারপর তাকে চাপালো তার ঘোড়ার উপর। একটি সরু গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে প্রবল জোরে আঘাত করলো ঘোড়ার পশ্চাদভাগে। মোগলকে নিয়ে তার ঘোড়া তীব্রবেগে ছুট দিলো সামনের পথ ধরে।

শক্তিসিংহ হাসলো। এখন কিছুক্ষণের মতো নিশ্চিন্ত। আর কারো নজরে পড়বার সম্ভাবনা নেই।

সে দেওয়াল অতিক্রম করে চলে এলো নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায়। পান্না অপেক্ষা করছিলো সেখানে।

পান্না বললো, "তোমার জন্যে ভাবনা হচ্ছিলো। আজ থেকে চৌকির টহলদারি লশ্‌কর দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে।"

শক্তিসিংহ তার কিছুক্ষণ আগেকার অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলো।

"এতো ঝুঁকি নিয়ো না," পান্না বললো, "কবে একদিন বিপদে পড়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ নিজস্ব কথাবার্তা হোলো তাদের মধ্যে। তারপর শক্তি-সিংহ হঠাৎ বললো, "পান্না, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কি?"

"শিবাজীর কাছে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু খুব গোপনে। ওঁর নিজের লোকেরাও যেন টের না পায়।"

পান্না আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। ভাবলো একটুখানি। তারপর বললো, "আচ্ছা এখানে অপেক্ষা করো। আমি আসছি। কিন্তু একটু দেরি হতে পারে।"

"তা হোক। আমি অপেক্ষা করছি এখানে।"

"সাবধান থেকো। কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। বিপদে পড়বে তাহলে।"

শক্তিসিংহ হেসে উত্তর দিলো, "আমাকে বিপদে ফেলা খুব সহজ নয়।"

পান্না চলে গেল। শক্তিসিংহ একটি গাছের নিচের অন্ধকারে শুয়ে পড়লো ঘাসের উপর।

সে জানতো না, কিছু দূরে একটি ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে চুপচাপ লক্ষ্য করছে একজন। সে একটু দূরে ঘোরাফেরা করছিলো। শক্তিসিংহকে দেওয়াল অতিক্রম করে আসতে দেখে এগিয়ে এসে আত্মগোপন করেছে একটি ঝাড়ের আড়ালে।

পান্না চলে যাওয়ার পর সে দাঁতে দাঁত ঘষলো নিজের মনে। তার ডান হাত উঠে এলো তলোয়ারের হাতলে। কিন্তু আবার সে হাত নেমে গেল যথাস্থানে। সেও অপেক্ষা করতে লাগলো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

শিবাজী নৈশভোজন সমাধা করতো একটু সকাল করেই, শুধু ফল আর দুধ, আর কিছু নয়। ফলের থালা নিয়ে পান্না উপস্থিত হোলো শিবাজীর কাছে। বাইরে পাহারা দিচ্ছিলো দুজন সশস্ত্র মারাঠা। তারা পথ ছেড়ে দিলো সসম্ভ্রমে। এখানে পান্নার অবাধ যাওয়া আসা।

দুধে শেষ চুমুক দিয়ে শিবাজী জিজ্ঞেস করলো, "কে সে?"

"শক্তিসিংহ রাঠোর।"

"শক্তিসিংহ? শ—ক্তি সি—ং—হ রাঠোর! নামটা শোনা মনে হচ্ছে," শিবাজী চোখ তুলে পান্নার দিকে তাকালো। "তোমার পরিচিত?"

"অত্যন্ত পরিচিত।"

"কি রকম পরিচয় তোমাদের?" খুব নিচু গলায় শিবাজী জিজ্ঞেস করলো।

পান্না একটু ব্রীড়াবনতা হোলো। তারপর মুখ তুলে সহজ কণ্ঠে বললো, "আমাদের প্রায়ই দেখা হয় সন্ধ্যার পর।"

"কজন জানে?"

"কেউ জানে না।"

শিবাজী একটা স্নিগ্ধ হাসি হাসলো। তারপর বললো, "আচ্ছা, তুমি যে পথে এসেছো সেপথে চলে যাও। আমি একটু পরে আসছি।"

"আপনি আসছেন?" পান্না বিস্মিত হোলো।

"সবার অগোচরে ওকে এখানে আনবার তো উপায় নেই। আমি ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছি, এরা জানবে আমি বাগানে একটু টহল দিচ্ছি। আমার অভ্যেস প্রত্যেকদিনকার। সঙ্গে কেউ আসবে না।"

"কিন্তু আপনি আসবেন ওর কাছে, সে কি করে হয়?"

"কেন হয় না ?"

"আপনি যে রাজা।"

শিবাজী হেসে উঠলো, "আমি রাজা আওরংজেবের কাছে, তাই ওর দরবারে আমি যাই না। কিন্তু এখানে আমি যাচ্ছি তোমার পরিচয়ে। আমি তোমার ছেলে। ও তোমার প্রিয়জন। আমার যেতে বাধা কি ? যাও, দেরি কোরো না। শোনো, আমি কোন-দিক দিয়ে গেলে তোমার কাছে পৌছাবো সেকথা বলে যাও।"

"কিন্তু আপনি একা যাবেন ওখানে ?"

"তুমি তো আছো, মা সঙ্গে থাকলে আমি দুনিয়ার কাউকে ভয় করি না," বলতে বলতে শিবাজী ঈষৎ ভাবাবিষ্ট হয়ে চক্ষু মুদিত করলো।

শক্তিসিংহ আর পান্না অপেক্ষা করছিলো গাছতলার অন্ধকারে। একটু পরে দেখতে পেলো সহজ পদক্ষেপে শিবাজী এগিয়ে আসছে। পান্না এগিয়ে এলো, শিবাজী তার কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে এলো শক্তিসিংহের কাছে। শক্তিসিংহ সসম্ভ্রমে আনত হয়ে অভিবাদন করলো।

"তুমি শক্তিসিংহ রাঠোর ?" শিবাজী সহজ অমায়িক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। "আমি ভাবছিলাম—এ নাম কোথায় শুনেছি। হেঁটে আসতে আসতে মনে পড়লো। পুণায় যেদিন রাত্রে আমি শায়েস্তা খাঁর লালমহল আক্রমণ করলাম সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে তুমি গোপনে সাক্ষাৎ করেছিলে আমার সহচর ও বন্ধু চিম্‌নাজী বাপুজীর সঙ্গে।"

"আমি সামান্য লোক। একটি সামান্য কাজের জন্যে আপনি আমার নাম মনে রেখেছেন, আমি তার জন্যে আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।"

শিবাজী হাসলো। "এসব সৌজন্যের কথা এখন থাক। বলো

কি জন্যে তুমি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছো। নিশ্চয়ই মহারাজ জসবন্ত সিংহ তোমায় পাঠিয়েছেন।"

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।"

"মহারাজা জসবন্ত সিংহ আমার শুভাধ্যায়ী বন্ধু। সংসারে এমন দুচারজন বন্ধু থাকতে হয় যাদের সঙ্গে প্রকাশ্য সম্পর্ক থাকবে শত্রুতার। তাহলে আসল শত্রুরা গিয়ে মিত্রতা করবে তাদের সঙ্গে। রাজধানীতে এর অনেক সুবিধে।"

"মহারাজা মনে মনে আপনার খুব অনুরাগী।"

"মহারাজা জয়সিংহের জায়গায় মহারাজা জসবন্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে গেলে আমাকে আজ এ অবস্থায় আগ্রায় আসতে হোতো না। আশা করি অদূরভবিষ্যতে মহারাজা জসবন্ত সিংহই দাক্ষিণাত্যে যাবেন।"

"উনি চেষ্টা করছেন।"

"মহারাজা জয়সিংহ ফিরে না এলে সেটা সম্ভবপর হবে না।"

"আপনি যদি দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে পারেন, তাহলে মহারাজা জয়সিংহ সেখানে বেশীদিন থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না," বললো শক্তিসিংহ।

শিবাজী হেসে উঠলো, বুঝতে পারলো শক্তিসিংহের কথার ইঙ্গিত। বললো, "হ্যাঁ, আমার নিজের স্বার্থেই মহারাজা জসবন্ত সিংহের সহায়তা করা আমার কর্তব্য। এবং কুমার রামসিংহের সঙ্গে সহযোগিতা না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে কুমার রামসিংহ লোক ভালো। আতিথ্যধর্মে তার অটল নিষ্ঠা।"

"মহারাজ, আমরা সবাই রাজপুত।"

শিবাজী হেসে বললো, "আমরা সবাই ক্ষত্রিয়। ওটা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, শুধু রাজপুতের একলার নয়।"

"অবান্তর আলোচনায় আপনারা সময় নষ্ট করছেন," বলে উঠলো পান্না।

শিবাজী হাসিমুখে তাকালো তার দিকে। তারপর শক্তিসিংহের দিকে ফিরে বললো, "শোনো, আমার মা আমায় তাড়া দিচ্ছে। বলো, তোমার কি প্রয়োজন আমার সঙ্গে?"

"কাল মহারাজ জসবন্ত সিংহ, উজীর জাফর খাঁ, এবং জাহানআরা বেগমসাহিবা বাদশাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন খিলওয়াতগাহ্‌তে।"

"হ্যাঁ, সবাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমাকে নিয়ে।"

"মহারাজা শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন আপনাকে কয়েদ করার জন্যে। উনি আশা করছেন যে জাহানআরা বেগমসাহিবা তাঁর প্রস্তাব খুব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করবেন। উজীর-উল-মুল্‌ক, ফুলাদ খাঁ, বদ-অন্দাজ খাঁ, এরাও তাঁর সঙ্গে একমত হবেন।"

"খুবই স্বাভাবিক।" শিবাজী হাসলো।

"আপনাকে শেষ পর্যন্ত কয়েদ করা যাতে না হয়, তার জন্যে হস্তক্ষেপ করতে পারেন জাফর খাঁ এবং স্বর্গীয় উজীর মির জুমলার পুত্র মহম্মদ আমিন খাঁ। আপনি তাঁদের জন্যে কিছু উপহার পাঠাবেন আগে থাকতেই।"

"হ্যাঁ, এরা উপহার পেতে খুব ভালবাসে।"

"আরেকটা কথা জানাবার আছে।"

"বলো।"

"মহারাজার ধারণা, কুমার রামসিংহ আপনার সম্পর্কে কোনো একটা পরিকল্পনা করছে, এবং সেটা বাদশাহ আওরংজেবের কর্ণগোচর হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

শিবাজী হাসতে লাগলো। "হ্যাঁ, যেহেতু আমি এই পরিকল্পনার সুযোগ নিতে ইচ্ছুক নই, আমি তোমাদের মহারাজার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আওরংজেবের নজর খুব তীক্ষ্ণ। ওর চোখে ধুলি নিক্ষেপ না করলে, কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াবে না।"

"এতে অবশ্যি অনেক ঝুঁকি।"

"শক্তিসিংহ, জীবনে বড়ো কাজ করতে হলে বড়ো ঝুঁকি নিতে হয়। আমি যে প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় আগ্রায় এসেছি, এর চেয়ে বড়ো ঝুঁকি আর কি হতে পারে। আমি সব রকমের সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।"

"কুমার রামসিংহের সঙ্গে আপনার কি আজ সাক্ষাৎ হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে এসেছিলো। আজ সন্ধ্যায় দিওয়ান-ই-খাসে নিয়ে গিয়েছিলো আমার পুত্র শম্ভুকে। সর্বক্ষণ তাকে রেখেছিলো নিজের পাশে। আওরংজেব শম্ভুকে একটি সর-ও-পা, রত্নখচিত ছোরা আর মুক্তাহার ইনাম দিয়েছে। শুধু এই করুণাতেই বিগলিত হয়ে গেছে আমাদের মহারাজকুমার রামসিংহ।"

"উনি কি আপনাকে কিছু বলেছেন?"

"হ্যাঁ, দুটো পরিকল্পনার কথা আমায় জানিয়েছেন। প্রথমটা হোলো, দুতিন দিনের মধ্যেই আমাকে কান্দাহার দরবারের হরকরা সাজিয়ে আগ্রা থেকে পালানোর সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।"

"আপনি কি এই সুযোগ গ্রহণ করবেন।"

"না। যদি করতাম, তোমাকে জানাতাম না।"

"কিন্তু এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা কি অসম্ভব?"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যে সব লোকজন আছে, তাদের সবাইকে তো হরকরা সাজিয়ে আগ্রা থেকে বার করে নেওয়া যাবে না। ওদের এখানে ফেলে আমি পালিয়ে যেতে রাজী নই।"

"কুমার রামসিংহ কি একথা জানেন?"

"না, ওকে জানাইনি। আমি ওর পরিকল্পনায় উৎসাহ জানিয়েছি।"

"আর অন্য পরিকল্পনা?"

"কুমার সাহাব আওরংজেবকে বলবে আমাকে কাবুলে পাঠানোর

জন্যে। আমাকে যেতে বলা হবে আমের হয়ে। আমেরের ওখান থেকে আমি যাতে পালিয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করা হবে। রাজওয়াড়ার ভিতর দিয়ে পালালে, মোগল ফৌজ আমাকে খুঁজে পাবে না।"

"এও তো উত্তম প্রস্তাব।"

"পালানোর জন্যে উত্তম, মারাঠাদের এলাকায় পৌঁছানোর জন্যে নয়।"

"কেন মহারাজ?"

"নর্মদা পার হতে পারবো না। মোগলেরা আমাকে গুজরাটে আটকে ফেলবে।"

"কুমার রামসিংহকে জানিয়েছেন এই ক্রটির কথা?"

"না। এই পরিকল্পনাতেও উৎসাহ দেখিয়েছি। আমি চাই যে আওরংজেবের ধারণা হোক, আমি পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি এভাবেই।"

"আপনার কি নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা আছে?"

"সেকথা তোমার জানার তো দরকার নেই," পান্না বলে উঠলো।

"ওর সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে, মা," শিবাজী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো।

পান্না উত্তর দিলো, "সহায়তা যখন দরকার হবে, তখন নিশ্চয়ই শক্তিসিংহ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। দরকার হয় প্রাণ দেবে আপনার জন্যে। কিন্তু আপনার পরিকল্পনা আপনার নিজস্ব। কাউকে জানাবেন না।"

"বেশ মা, মেনে নিলাম তোমার কথা। কাউকে জানাবো না।"

"এসব কথা আমাদের মহারাজাকে জানাবো?" শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, অবিলম্বে জানাবে, যাতে কালই আওরংজেবের কর্ণগোচর হয়।"

শক্তিসিংহ তখন শিবাজীকে অভিবাদন করে বিদায় প্রার্থনা করলো।

পান্না একবার শিবাজীর দিকে তাকালো। তারপর মনের কুণ্ঠা কাটিয়ে শক্তিসিংহকে জিজ্ঞেস করলো, "আবার কবে আসবে?"

শক্তিসিংহ সঙ্কুচিত বোধ করলো শিবাজীর উপস্থিতিতে। কোনো উত্তর দিতে পারলো না। সে ইতস্তত করছে দেখে শিবাজীই হেসে বললো "কালই এসো। আজতো সময় কেটে গেল আমার সঙ্গেই। আর—যদি তোমাকে আমার প্রয়োজন হয়, আমি জানবো তোমাকে এখানেই পাওয়া যাবে।" একটু থেমে বললো, "শুধু কাল নয় শক্তিসিংহ, প্রত্যেকদিনই এসো।"

শক্তিসিংহ বিদায় নিয়ে চলে গেল। সে দেওয়াল অতিক্রম করে গেল দেখে শিবাজী একটু হাসলো। পান্নাকে বললো, "সব নায়কেরই ওই একটি আসা যাওয়ার পথ। আমাদের দেশে এমন দিন কবে আসবে যে, নায়ক বাড়ির সম্মুখদ্বার দিয়ে সহজ ভাবে এলে নায়িকার অসুবিধে হবে না?"

"যেদিন পৃথিবীর আকাশে আর চাঁদ থাকবে না,—সেদিন," পান্না মুখে চুণরি চাপা দিয়ে বললো।

হাসতে হাসতে দুজনে চলে গেল মারাঠা-শিবিরের দিকে।

এতক্ষণ ঝাড়ের আড়ালে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কৃষ্ণাজী। এবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। একবার তাকালো দেওয়ালের দিকে, যেদিক দিয়ে চলে গেছে শক্তিসিংহ রাঠোর। দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। শক্তিসিংহ চলে যাচ্ছে। তারপর ফিরে তাকালো অন্যদিকে, যেদিক দিয়ে চলে গেছে শিবাজী আর পান্না। তাদের হাসির অস্ফুট আওয়াজ ভেসে এলো পূবের হাওয়ায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কৃষ্ণাজী আপ্তে তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল সেখান থেকে।

মহারাজা জসবন্তসিংহ সব কথা শুনলো শক্তিসিংহের কাছে। তারপর বললো, "তোমার সেই বন্ধু, আবিদ হুসেন খাঁ, ওকে খুঁজে বার করো। ওকে জানাও এসব কথা। ওকে বলে দাও, কাল সকালে যখন খিলওয়াতগাহ্‌তে যাবে শাহ-ইন-শাহ্‌কে তসলিম করতে, তখন যেন এসব কথা জানিয়ে দেয়।"

শক্তিসিংহ চললো আবিদ হুসেনের সন্ধানে। বাজারের দু-তিনটে কাফিখানায় ওকে খুঁজলো, যেখানে ও কাফি খেতে বসতো অবসর সময়। কোথাও না পেয়ে চললো মোতিজানের মাইফিলখানায়। সেখানেই পেয়ে গেল।

আবিদ হুসেন তখন পরমানন্দে শরাবের পিয়ালায় একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে মোতিজানের গান শুনছে। মোতিজান শক্তিসিংহকে দেখে অভিবাদন করলো। মুখ ফিরিয়ে দেখে আবিদ হুসেনও খুব খুশী।

"আরে এসো এসো। আমার খুব খুশকিসমতি যে তুমি নিজের থেকেই এখানে এসেছো।"

আবিদ হুসেনের খুব সহজ ভাব। আজকাল আর ফুলাদ খাঁ বদ-অন্দাজ খাঁর ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় না। ফরাশ আরেকটি পিয়ালা নিয়ে এলো। নিজের হাতে শরাব ঢেলে দিলো আবিদ হুসেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাইফিলখানা নিরিবিলি হয়ে এলো। শক্তি-সিংহ আবিদ হুসেনের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

"আবিদ হুসেন," গলা খাটো করে বললো সে, "জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে।"

"বলো দোস্ত্‌।"

"কাল কি তুমি খিলওয়াতগাহ্‌তে শাহ-ইন-শাহ্‌কে তসলিম জানাতে যাবে?"

"আমার উপর হুকুম তো তাই।"

"একটি খবর দিচ্ছি তোমায়। খুব গোপন খবর। শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে তুলে দিতে হবে।"

আবিদ হুসেনের মুখের শরাব খাদ্যনালীতে প্রবেশ না করে শ্বাস-নালীতে প্রবাহিত হোলো। বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করলো সে। চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হোলো। মোতিজান নাচ থামিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আবিদ হুসেনের মাথার উপর হাত দিয়ে অনবরত আঘাত করতে শুরু করলো।

"কি হোলো আবিদ হুসেন," জিজ্ঞেস করলো শক্তিসিংহ।

"কিছুই না," কোনোরকমে সামলে নিয়ে আবিদ হুসেন উত্তর দিলো, "কাল থেকে সারা আগ্রা শহরের লোক এসে আমার কানে কানে কথা বলছে।"

দিওয়ান-ই-আমের আম-দরবার, দিওয়ান-ই-খাসের খাস-দরবার, কোথাও আবিদ-হুসেনের কিছু করবার ছিলো না। শুধু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আকিল খাঁর পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা। দরবারের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানসূচী প্রায় একই রকম। আবিদ হুসেনের বড্ড একঘেয়ে লাগছিলো। পায়ের নিচের দিকে চুলকুনি পাচ্ছিলো খুব। কিন্তু আনত হয়ে একটু চুলকিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। প্রকাশ্য দরবারে সেটা ঘোর বেআদবি। আবিদ হুসেন অন্যান্য উমরাহ মনসবদারদের দিকে তাকালো। এখানে কি কারো গা হাত পা চুলকোয় না মাঝে মাঝে?—আবিদ হুসেন ভাবলো—তখন ওরা করে কি?

বাদশাহ খিলওয়াতগাহ্‌তে আসে সকালের নাশতার পর, সেখানে জরুরী মামলা মোকর্দমার বিচার করে নিজে। সেখান থেকে ঝরোকাই—দর্শনে চলে যায়, তারপর ফিরে আসে দিওয়ান-ই-আমএ, তারপর দিওয়ান-ই-খাস্‌এ, সেখান থেকে রংমহলের হারেমে। খিলওয়াতগাহ্‌তে আবার একবার আসে অপরাহ্ণে। কখনো কখনো

খুব জরুরী প্রয়োজন হলে মধ্যাহ্নে কিংবা সন্ধ্যার পর দিওয়ান-ই-খাস থেকে আবার ফিরে যায় খিলওয়াতগাহ্‌তে। সকাল বেলায় খিলওয়াতগাহ্‌তে যাওয়ার নির্দেশ আবিদ হুসেনের উপর নেই। তাকে যেতে বলা হয়েছে শুধু অপরাহ্নে। তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ যখনই খিলওয়াগাহ্‌তে উপস্থিত থাকবে তখন হাজির হওয়ার অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে।

সেদিন জাহানআরা বেগম সাহিবা শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবে বলে খবর এসেছে। সুতরাং দিওয়ান-ই-খাস থেকে একটু সকাল করেই উঠে পড়লো বাদশাহ আওরংজেব। সোজা চলে গেল খিলওয়াতগাহ্‌তে। আবিদ হুসেন স্থির করলো,—আমার কাজ জরুরী, সুতরাং এবেলাই হাজির হবো সেখানে। খিলওয়াত-গাহ্‌তে এসে দেখলো উজীর জাফর খাঁ, জসবন্ত সিংহ, আকিল খাঁ, ফুলাদ খাঁ, ফিদাই খাঁ আর রদ-অন্দাজ খাঁ বাইরে অপেক্ষা করছে, জাহানআরা বেগম সাহিবা এলে পরে সবাইকে ইত্তলা দেওয়া হবে। আকিল খাঁর কাছে শুনতে পেলো ভিতরে শাহ-ইন-শাহ মির মুনশী কাবিল খাঁকে কতকগুলো গোপনীয় পত্র সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছে।

আবিদ হুসেন মুশরিফ-ই-খওয়াসকে ধরে জানালো, সে এসময় একলা শাহ-ইন-শাহ্‌র দর্শন পেতে চায়।

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো মুশরিফ-ই-খওয়াস।

"তসলিম জানাতে এসেছি," আবিদ হুসেন ভারিক্কা চালে বললো, "শাহ-ইন-শাহ্‌কে একথা বললেই হবে। উনি ঠিক বুঝবেন।"

আবিদ হুসেনের কথার ধরন শুনে মুশরিফ-ই-খওয়াস আর বেশী ঘাঁটালো না। চুপচাপ ভিতরে চলে গেল। ইত্তলা এলো একটু পরে। জাফর খাঁ, ফুলাদ খাঁ আর ফিদাই খাঁ ঈর্ষার অগ্নিদৃষ্টি হানলো তার দিকে। আবিদ হুসেন ভ্রূক্ষেপও করলো না। শুধু আকিল

খাঁ, রদ অন্দাজ খাঁ, আর মহারাজা জসবন্ত সিংহ জানতো, আবিদ হুসেন কেন এসেছে। নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এরা তিনজন।

"কি খবর আবিদ হুসেন খাঁ," জিজ্ঞেস করলো আওরংজেব।

"আজ অনেক খবর আছে, জাহাঁপনাহ্।"

"বলো শুনি, কি তোমার খবর!"

"প্রথম খবর শিবাজীর সম্বন্ধে। দুচার দিনের মধ্যেই কছওয়া দরবারের হরকরার ছদ্মবেশে হঠাৎ চলে যাবে আগ্রা থেকে, ফিরে যাবে মারাঠা এলাকায়।"

"পারবে না," বললো আওরংজেব।

"দ্বিতীয় খবর,—কুমার রামসিংহ শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র কাছে হুকুম চাইবে কাবুল যাত্রা করার। শিবাজীকেও নিতে চাইবে সঙ্গে। পথে আমের শহরের কাছে সবার অলক্ষ্যে সরে পড়বে শিবাজী। রাজওয়াড়ার ভিতর দিয়ে গেলে মোগল ফৌজ আর খুঁজে পাবে না তাকে।"

"তাকে আমি হয়তো কাবুল পাঠাবো না," স্থির কণ্ঠে বললো আওরংজেব, "যদি পাঠাই তার খবরদারি করার যথোচিত ব্যবস্থা করবো। তারপর?"

আকিল খাঁ কার কথা যেন জানিয়েছিলো? মনে করবার চেষ্টা করলো আবিদ হুসেন। হ্যাঁ, খোজা ইয়ার লতিফ।

"খোজা ইয়ার লতিফ কাল গোপনে শিবাজীর সর-নায়ক দত্ত ত্রিম্বকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।"

খোজা ইয়ার লতিফ! আওরংজেবের ভুরু দুটি সঙ্কুচিত হোলো। সে যে রোশনআরা বেগম আর রহমত-উন-নিসা বেগমের প্রিয়পাত্র একথা আওরংজেব জানতো।

"কেন?" আওরজেব জিজ্ঞেস করলো।

"সে খবর আমি জানতে পারিনি।"

"হুঁম্", আওরংজেব গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর আবিদ হুসেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আর কিছু জানানোর আছে?"

রদ-অন্দাজ খাঁর কাছে শোনা একটি খবর বলা হয়নি এখনো। আবিদ হুসেন বললো, "সাত আট দিন আগে আওরঙ্গাবাদ থেকে দিলির খাঁ রুহেলা একটা গোপন পত্র প্রেরণ করেছেন।"

"কার কাছে?"

একটু ইতস্তত করলো আবিদ হুসেন। রাজ্যের প্রধান উমরাহদের নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা নিরাপদ কিনা, তাই ভাবছিলো।

আওরংজেব বুঝতে পারলো। আশ্বাসের সুরে বললো, "তুমি নির্ভয়ে বলো। তোমাকে আমিই দরবারে নিযুক্ত করেছি, তোমার কোনোরকম দুর্ভাবনার কারণ নেই। বলো দিলির খাঁ গোপনে পত্র লিখেছে কার কাছে।"

"উজীর-উল-মুল্ক জাফর খাঁর কাছে।"

"জাফর খাঁর কাছে!" আওরংজেব আরো গম্ভীর হয়ে গেল। "আমাকে তো কিছু জানায় নি!" কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রইলো আওরংজেব। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ব্যস, এই?"

"আজ আর কোনো সংবাদ নেই, জাহাঁপনাহ্।"

বাদশাহ্র অনুমতি পেয়ে আবিদ হুসেন বেরিয়ে এলো খিলওয়াতগাহ থেকে। অন্য সবাই তখনো বাইরে অপেক্ষা করছে। জাফর খাঁ, ফুলাদ খাঁ আর ফিদাই খাঁ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো জসবন্ত সিংহ আর রদ-অন্দাজ খাঁ। সবার অলক্ষ্যে শুধু আকিল খাঁ আবিদ হুসেনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

খবর এলো, জাহানআরা বেগম সাহিবা এসে গেছে খিলওয়াতগাহ্তে। একটু পরে সবাইকে ইত্তলা দেওয়া হোলো। সারিবদ্ধ

হয়ে সবাই ভিতরে গিয়ে দণ্ডায়মান হোলো বাদশাহ্‌র তখ্‌ত্‌এর সামনে। খিলওয়াতগাহ্‌র একপাশে সংমর্মরের জালির সামনে দাঁড়িয়ে আছে জাহানআরা বেগমের খোজা মুনশী আবদুল হামিদ জালির পেছনে জাহানআরা বেগমের উপস্থিতি সবাই অনুভব করলো। বাদশাহ্‌কে কুনিস করার পর সবাই চোখের দৃষ্টি নত করে জালির দিকে ফিরে সসম্ভ্রমে তসলিম করলো, তারপর চোখ ফিরিয়ে বাদশাহ্‌র দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

আওরংজেব বললো, "আমাদের সম্মানিত জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হজরৎ বড়ী বেগম সাহিবা এখানে তশরিফ এনেছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে। তিনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর পরামর্শ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করবার জন্যে এবং বিবেচনা করবার জন্যে সবদাই প্রস্তুত। আমরা সাগ্রহে তাঁর বক্তব্য শোনবার প্রতীক্ষায় আছি।"

খোজা আবদুল হামিদের মারফতে সবাইকে সম্বোধন করলেন জাহানআরা বেগম।

"উজীর-উল-মুলক জাফর খাঁ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ, এবং সমাগত অন্যান্য উমরাহ্‌বৃন্দ! আপনারা সবাই দরবারের বিশ্বস্ত খিদমদগার। দীর্ঘকাল ধরে আপনারা আমার প্রিয় ভ্রাতা শাহ্‌-ইন-শাহ্‌ বাদশাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছেন। দরবারের শরম, চাখতাইয়া খানদানের শরম ও আপনাদের শরম এক। আজ এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে এই শরম রক্ষা করবার জন্যে আমাদের একমত হয়ে শাহ্‌-ইন-শাহ্‌ বাদশাহ্‌কে আমাদের মনোভাব জানাতে হবে।"

"শিবাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া কি উচিত?" আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো।

"গুরুত্ব আমরা দিই নি। গুরুত্ব দিয়েছেন আমাদের বাদশাহ্‌ শিবাকে আগ্রায় আসবার জন্যে আওরঙ্গাবাদের খাজিনাহ্‌-ই-আমার

থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কি কোনো প্রয়োজন ছিলো?"

"শিবাকে আগ্রায় আনার প্রয়োজন ছিলো।"

"প্রয়োজন কি সিদ্ধ হয়েছে?" আবদুল হামিদের মারফতে জিজ্ঞেস করলো জাহানআরা বেগম, "সে কি বশ্যতা স্বীকার করেছে? সে কি আমাদের শাহ্-ইন-শাহ্ বাদশাহ্কে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছে?"

জাফর খাঁ বললো, "দরবারে সে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছে, অমার্জনীয় বেত্তমিজি করেছে।"

"শাহ্-ইন-শাহ্র প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছে," বললো জসবন্ত সিংহ।

রদ-অন্দাজ খাঁ বলে উঠলো, "কিন্তু আমাদের মেহেরবান শাহ্-ইন-শাহ্ অত্যন্ত সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন শিবাজীর প্রতি।"

"সেকথা কেউ জানবে না," উত্তর দিলো জাহানআরা, "দেশে দেশে একথাই রটনা হবে যে, বাগী মারাঠা শিবা ভোঁসলে প্রকাশ্য দরবারে শাহ্-ইন-শাহ্ বাদশাহ আলমগীরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছে। আর হিন্দুস্তানের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ নীরবে সহ্য করেছেন এই অপমান। মারাঠাদের তার এত ভয় যে, নিজের রাজধানীতেও তাকে কিছু বলতে সাহস করেন নি।"

আওরংজেব খানিকটা অসোয়াস্তির সঙ্গে নড়ে চড়ে বসলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "হজরত বড়ী বেগম সাহিবা ঠিকই বলেছেন। শিবাজীর দুর্ব্যবহারের ফলে এমন একটা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, অবিলম্বে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।"

"শিবার প্রতি কঠোর হলে মির্জা রাজা ক্ষুব্ধ হবে," বললো আওরংজেব।

"মহারাজা জয়সিংহের মন রাখবার জন্যে সামান্য লোকের অসম্মান সহ্য করতে হবে?" জসবন্ত সিংহ একটু উত্তেজিত হয়ে বললো।

"কুমার রামসিংহ আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, শিবাকে সে দরবারে নিয়ে আসবে।"

"প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তিন তিন বার আম দরবার খাস-দরবার হয়ে গেল। শিবাজী আসেনি," বললো ফুলাদ খাঁ।

"এভাবে সাধাসাধি করে তাকে দরবারে আনা যাবে না," বললো আকিল খাঁ।

"এভাবে আনবার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে সম্মানজনকও নয়," মন্তব্য করলো ফিদাই খাঁ।

"কে এই শিবা যে, শাহ্-ইন-শাহ্র সামনে এরকম উদ্ধত রুক্ষ ব্যবহার করতে সাহস করে," বলে উঠলো জাহানআরা বেগম।

"অন্য কেউ হলে, তার ছিন্নশির এতক্ষণে কিলার বাইরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হোতো," রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "শিবাজীর ক্ষেত্রে কেন শাহ্-ইন-শাহ্র এই সহিষ্ণুতা, আমিও তো বুঝতে পারছি না।"

আওরংজেব চুপচাপ শুনতে লাগলো সবার কথাবার্তা।

"যদি এভাবে চলতে থাকে," জানালো জাহানআরা বেগম, "তাহলে অন্যান্য ভূমিয়ারাও দরবারে এসে অনুরূপ ব্যবহার করতে ভয় পাবে না।"

"তাই যদি হয় তো হুকুমত চলবে কি ভাবে?" জিজ্ঞেস করলো ফুলাদ খাঁ।

আওরংজেবের চোখ দুটি আস্তে আস্তে মুদিত হোলো।

রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "দেশে দেশে একথা রটে যাবে যে এক সামান্য হিন্দু বাদশাহ আলগীরের দরবারে হাজির হয়ে নির্ভয়ে

ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, অশালীন ভাষায় কথা বলেছে। এর পর অন্য সবাইও নিশ্চিন্ত মনে রুক্ষ ব্যবহার করবে আমাদের সঙ্গে; সাজা পাওয়ার কোনো ভয় কারো মনে থাকবে না।"

"শিবা একজন সামান্য ভূমিয়া," বলে উঠলো জসবন্ত সিংহ, "সে দরবারে এলো শির উঁচু করে, বেতমিজের মতো ব্যবহার করলো, শাহ্-ইন-শাহ্‌কে অবজ্ঞা করলো জবরদস্ত লোকের মতো। শাহ্-ইন-শাহ যদি এই বেতমিজি অবহেলা করতে চান, অগ্রাহ্য করতে চান, সেটা ওঁর মর্জি। কিন্তু আমার অভিমত এই যে, শিবার সাজা হওয়া উচিত।"

জাহানআরা বেগম বললো, "শাহ্-ইন-শাহ্‌র একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে শিবা সুরাট লুঠ করেছে, পুণা থেকে শায়েস্তা খাঁর কন্যাকে অপহরণ করেছে—।"

আওরংজেব চোখ তুললো না। একটু হাসি দেখা দিলো ঠোঁটের কোণে। আস্তে আস্তে বললো, "শিবাকে এই অপবাদ দেওয়া উচিত নয়। ও কোনোদিন কোনো নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেনি, কি হিন্দু কি মুসলমান। শিবাকে আমি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করি, কিন্তু কারো নামে মিথ্যা অপবাদ আমি শুনতে রাজী নই। শায়েস্তা খাঁর কোনো কন্যাকে সে অপহরণ করেনি।"

"আমি যা শুনেছি, তাই বলছি," বললো জাহানআরা।

"সুরাট লুঠ হওয়ার ফলে আমদানী শুল্ক বাবদ বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে, যে অর্থ হজরত বড়ী বেগম সাহিবার ব্যক্তিগত আয়। সুতরাং শিবার প্রতি তাঁর প্রসন্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই একথা আমি জানি।"

আওরংজেবের কথা শুনে আকিল খাঁ হাসি চাপলো। রাজনীতি-ক্ষেত্রে যাই হোক, ব্যক্তিগত জীবনে বাদশাহ্‌র এই সত্যনিষ্ঠা আকিল খাঁকে চিরকালই মুগ্ধ করতো।

"যাই হোক," জাহানআরা বেগম বলে গেল, "শিবা ভোঁসলে

দরবারের প্রতি অসম্মান দেখিয়েছে। শাহ্-ইন-শাহ্ গায়ে মাখেন নি। এই নীতি আমি সমর্থন করি না।"

"এই নীতি আমার কাছেও দুর্বোধ্য," বললো জাফর খাঁ।

"এই নীতি ক্ষতিকর বলেই আমার ধারণা," বলে উঠলো জসবন্ত সিংহ।

"শাহ্-ইন-শাহ্ শিবাজীর প্রতি আরেকটু কঠোর হলে আমি খুশী হতাম," বললো ফুলাদ খাঁ।

ফিদাই খাঁ জানালো যে ফুলাদ খাঁর সঙ্গে সে একমত।

আওরংজেব চোখ খুলে তাকালো আকিল খাঁর দিকে। আকিল খাঁ আস্তে আস্তে বললো, "আমার অভিমত এই যে, কাউকে বে-মিজি করার সুযোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।"

আওরংজেব আবার চোখ বুঁজলো, শান্ত মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "এখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনাদের ধারণা?"

একটা স্তব্ধতা নামলো কক্ষের ভিতর। কারো মুখে কোন কথা নেই। গম্ভীর হয়ে রইলো সবাই।

কিছুক্ষণ পরে জাহানআরা খোজা আব্দুল হামিদের মারফৎ বললো, "এই কাঁটা চিরকালের জন্যে একেবারে উপড়ে ফেলা বাঞ্ছনীয়।"

"কি ভাবে?"

"শিবাকে কোতল করার হুকুম দেওয়া হোক।"

"ওকে এখনই কোতল করা ঠিক হবে না," বলে উঠলো জাফর খাঁ।

আওরংজেব চোখ খুলে জাফর খাঁর দিকে একটু তাকালো।

"দক্ষিণে হঠাৎ গোলযোগ শুরু হয়ে যেতে পারে। মারাঠারা যোগ দিতে পারে বিজাপুরের সঙ্গে," বলে গেল জাফর খাঁ।

"তাহলে আপনার কি পরামর্শ, উজীর-উল-মুলক্?" জিজ্ঞেস করলো আওরংজেব।

"শিবাকে কোনো কিলায় অবরুদ্ধ করে রাখা হোক," জাফর খাঁ উত্তর দিলো। "তাহলে মারাঠারা গোলমাল করবে না। হয়তো শিবাকে একদিন মুক্তি দেওয়া হতে পারে এ আশায় চুপ করে থাকবে।"

"জসবন্ত সিংহের কি অভিমত," আওরংজেব জানতে চাইলো।

"হিন্দুস্তানের অনেক হিন্দু শিবার অনুরাগী," জসবন্ত সিংহ বললো, "তাকে কোতল করলে হিন্দুরা শাহ্-ইন-শাহ্র প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। রাজওয়াড়াতেও গোলযোগ শুরু হতে পারে, বিশেষ করে শিবা যখন এখানে কছওয়া দরবারের অতিথি। সুতরাং শিবাকে আপাতত কয়েদখানায় রাখাই বাঞ্ছনীয়।"

ফিদাই খাঁ আর রদ-অন্দাজ খাঁ মত দিলো জাহানআরার পক্ষে। আকিল খাঁ সমর্থন করলো জাফর খাঁ ও জসবন্ত সিংহকে। তর্কবিতর্ক শুরু হোলো। আওরংজেব চক্ষু মুদিত করে শুনলো কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। শাহ্-ইন-শাহ্ বাদশাহ আলমগীরের এই ভঙ্গির কথা সবারই জানা। বাদশাহ্ কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এখনই কিছু বলবে। সবাই সাগ্রহে তাকিয়ে রইলো আওরংজেবের মুখের দিকে।

আওরংজেব গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "শিবা হিন্দু। এই ব্যাপারে হিন্দুর অভিমতই বিবেচ্য। আমি মহারাজা জসবন্ত সিংহের অভিমতই গ্রহণ করলাম। শিবাকে কোতল করা হবে না।"

আকিল খাঁর মনে একটা দুর্ভাবনা শুরু হয়েছিলো। এবার কেটে গেল সেই ভাব। সে সবার অজ্ঞাতে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললো। সে জানতো না যে মহারাজা জসবন্ত সিংহ আর উজীর জাফর খাঁর মনও একটু হাল্কা হয়েছে। ওদের মুখের ভাবে কিছুই বোঝা গেল না। অন্য সবাইকে দেখে মনে হোলো, ওরা যেন একটু হতাশ হয়েছে।

"শিবাকে আপাতত কয়েদ করে রাখা হোক," বলে গেল আওরংজেব, "ফুলাদ খাঁ!"

সিদ্দি ফুলাদ দু পা সামনে এগিয়ে গেল।

"আগ্রা শহরের কোতোয়াল হিসেবে তোমার উপর আমি এই দায়িত্ব দিচ্ছি যে তুমি অবিলম্বে শিবা ভোঁসলেকে খোজা ফিরোজার বাগ থেকে কিলার ভিতর রদ-অন্দাজ খাঁর মহলে স্থানান্তরিত করবে।"

"আপনার যা হুকুম জাহাঁপনাহ্," সিদ্দি ফুলাদ তসলিম করে বললো।

কুমার রামসিংহ খিলওয়াত্‌গাহ্‌তে যায় নি। ইদানীং তাকে আর ডাকা হোতো না সেখানে। আম-দরবার থেকে সে সোজা ফিরে এসেছিলো খোজা ফিরোজার বাগে। দিওয়ানখানায় বসে মুন্‌শী গিরধরলালকে দিয়ে কতকগুলো পত্র রচনা করাচ্ছিলো। এমন সময় তেজসিংহ এসে জানালো খোজা ইয়ার লতিফ এসেছে। সাক্ষাৎ করতে চায় মহারাজকুমারের সঙ্গে। খোজা ইয়ার লতিফ মালিকা-আলম রহমত-উন-নিসা বেগম আর রোশনআরা বেগম সাহিবার নিজস্ব লোক। রামসিংহ বুঝলো নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর খবর আছে। তার নির্দেশে তেজসিংহ খোজা ইয়ার লতিফকে ভেতরে নিয়ে এলো। খোজা ইয়ার লতিফ অভিবাদন করে জানালো যে ছোটী বেগম সাহিবা মহলে গুজব শুনতে পেয়েছেন যে শাহ্-ইন-শাহ্ শিবাজীকে কয়েদ করবার হুকুম দিয়েছেন। ফুলাদ খাঁর উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আজকের দিনের মধ্যেই যেন শিবাজীকে কেল্লার ভিতর রদ-অন্দাজ খাঁর মহলে স্থানান্তরিত করা হয়। এ খবর পেয়ে মালিকা-আলম আর ছোটী বেগম সাহিবা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। রামসিংহ যেন অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা করেন।

খবর দিয়ে চলে গেল খোজা ইয়ার লতিফ। রামসিংহ চঞ্চল হয়ে পায়চারি করতে লাগলো ঘরের ভিতর।

আকিল খাঁ খোজা মহম্মদ উসমানের মারফত খবর পাঠালো জেব-উন-নিসা আর জুবদত-উন-নিসার কাছে,—শাহ্-ইন-শাহ্ শিবাজীকে অবিলম্বে কয়েদ করার হুকুম দিয়েছেন।

"না, না, এ অন্যায়," বলে উঠলো জুবদত-উন-নিসা, "উনি আমাদের সম্মানিত মেহমান। বড়ী বেগম সাহিবা আর কয়েকজন স্বার্থপর উমরাহ যে ষড়যন্ত্র করে শাহ্-ইন-শাহ্‌কে প্ররোচিত করবেন তাঁকে অসম্মান করার জন্যে, এ আমরা হতে দিতে পারি না। শাহ্-ইন- শাহ্‌র সহিষ্ণুতার নীতিই ছিলো ঠিক। কেন ওদের কথা শুনতে গেলেন তিনি?"

দিওয়ান-ই-খাসে শিবাজীকে দেখবার পর থেকে জুবদত-উন-নিসার মনে একটা শ্রদ্ধার উদয় হয়েছিলো শিবাজীর জন্যে, একথা জেব-উন-নিসা জানতো। জিজ্ঞেস করলো, "এখন আমরা কি করতে পারি?"

"আমি নিজে শাহ্-ইন-শাহ্‌কে বলবো," বললো জুবদত-উন-নিশা।

"কিন্তু এবেলা তো ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। খবর পেয়েছি যে উনি উদিপুরীজীর মহলে গেছেন খিলওয়াতগাহ থেকে বেরিয়ে।"

"তাহলে তো রাত্রির আগে আর সাক্ষাৎ হবে না," উত্তর দিলো জুবদত-উন-নিসা। "এখন কি করা যায় তাহলে।"

"যদি অন্তত একদিনের জন্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় ফুলাদ খাঁকে, তাহলে রাত্রিতে শাহ্-ইন-শাহ্‌কে আমরা বলে দেখতে পারি।"

"ফুলাদ খাঁর কাছে লোক পাঠানো আমাদের উচিত হবে না, শাহ্-ইন-শাহ্ জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবেন।"

দুজনে মিলে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করলো। তারপর স্থির

করলো খবর দেওয়া যাক কুমার রামসিংহকে। উনি যদি নিজে ফুলাদ খাঁকে অনুরোধ করেন, তাহলে সেটা অস্বাভাবিক ঠেকবে না।

"খবর পাঠানো যাক শিবাজীর কাছেও," জুবদত-উন-নিসা বললো, "উনি খুব চতুর লোক। নিজেকে রক্ষা করবার উপায় হয়তো তিনি নিজেও করতে পারেন।"

কুমার রামসিংহ পায়চারি করছিলো অস্থির চিত্তে, কিছু স্থির করতে পারছিলো না, এমন সময় তেজসিংহ নিয়ে এলো খোজা মহম্মদ উসমানকে। একই খবর তার কাছেও শুনলো রামসিংহ। খোজা মহম্মদ উসমান দুই শাহজাদীর বিশ্বস্ত খাদিম। এবার রামসিংহের সন্দেহ অনেকটা ঘুচলো। নিশ্চয় গুজব নয়। খোজা মহম্মদ উসমান বললো, কুমার সাহাব যেন সিদ্দি ফুলাদ খাঁকে ধরে পড়ে তাঁকে একদিনের জন্যে ঠেকিয়ে রাখেন। রাত্রিতে শাহজাদীরা এ বিষয়ে কথা বলবেন শাহ্-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে। মির্জা রাজা জয়সিংহ শাহজাদীদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর কোনো অসম্মান হয় তাঁরা চান না।

খোজা মহম্মদ উসমান চলে যাওয়ার পর এসে উপস্থিত হোলো কৃষ্ণাজী আপ্তে। তাকে পাঠিয়েছে শিবাজী। হাতে আশরফি ভর্তি দুটো তোড়া।

তাকে দেখে বিস্মিত হোলো রামসিংহ।

কৃষ্ণাজী আপ্তে রামসিংহের হাতে দিলো আশরফির তোড়া দুটো।

"আশরফি কেন?" জিজ্ঞেস করলো রামসিংহ।

"শিবাজী পাঠিয়েছেন।"

"কেন?"

"ফুলাদ খাঁকে দেওয়া হবে একটা। অন্যটা মহম্মদ আমিন খাঁকে। শিবাজীর পরামর্শ, এই যে মহম্মদ আমিন খাঁর মারফতে বাদশাহ্‌কে

অনুরোধ করা যেতে পারে এই হুকুম রদ করার জন্যে। মহম্মদ আমিন খাঁ মিরজুমলার পুত্র। তাঁকে খুব খাতির করেন বাদশাহ। আপনার সঙ্গেও তাঁর খুব অন্তরঙ্গতা। আপনি স্বচ্ছন্দে তাঁর কাছে মন খুলে কথা বলতে পারেন।"

"কিন্তু শিবাজী কি করে জানলেন?"

"শাহজাদী জুবদত-উন-নিসা খোজা মির হাসানকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে।"

"শাহজাদী জুবদত-উন-নিসা!" রামসিংহের মুখ ব্যাদিত হোলো বিপুল বিস্ময়ে।

কৃষ্ণাজী আপ্তে আশরফির তোড়া রেখে চলে গেল।

কুমার রামসিংহ তেজসিংহের দিকে ফিরে বললো, "কি ব্যাপার তেজসিংহ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মালিকা আলম রহমত-উন-নিসা বেগম, ছোটী বেগম সাহিবা, জেব-উন-নিসা বেগম, জুবদত-উন-নিসা বেগম, এঁরা হঠাৎ এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করছেন কেন? খোজা ইয়ার লতিফের মুখে শুনলাম, খুদ জাহানআরা বেগম নিজে আজ শাহ্-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে খিলওয়াত গাহ্‌তে সাক্ষাৎ করে শিবাজীকে কোতল করার সুপারিস করেছিলেন। বেগমদের কী স্বার্থ?'

"কুঁবর-সা," তেজসিংহ বললো, "রং-মহলের কূটনীতি বুঝবার চেষ্টা করে লাভ নেই। উপস্থিত শিবাজীর পরামর্শ মতোই কাজ করুন। উনি ভালো বুদ্ধিই দিয়েছেন। এই আশরফিতে এখন অনেক কাজ হবে। এক তোড়া আশরফি নিয়ে আপনি সাক্ষাৎ করুন মহম্মদ আমিন খাঁর সঙ্গে।"

"ফুলাদ খাঁর কাছেও তো যেতে হবে?"

"সেখানে আমি যাচ্ছি। আমার মনে হয় তোড়া ভর্তি আশরফি পেলে ফুলাদ খাঁ গররাজি হবেন না। কালকের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হতে পারেন।"

আকিল খাঁ আবিদ হুসেনকে ডাকিয়ে এনে বললো, "রদ-অন্দাজ খাঁকে খবর দাও, কুমার রামসিংহের লোক এসে এক তোড়া মোহর দিয়ে গেছে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁকে।"

আবিদ হুসেন কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁর কাছে গেল খবর দিতে। রদ-অন্দাজ খাঁ শুনে লাফিয়ে উঠে বললো, "তাই নাকি!" চোখে ফুটে উঠলো একটা লুব্ধ দৃষ্টি। তাড়াতাড়ি মাথায় পাগ চাপিয়ে ছুটলো কোতোয়ালির দিকে।

আবিদ হুসেন অপেক্ষা করে বসে রইলো। রদ-অন্দাজ খাঁ ফিরে এলো এক ঘড়ি পরে। আবিদ হুসেনকে দেখে বললো, "তুমি এখনো বসে আছো?"

আবিদ হুসেন বললো, "মিঞা, আমার বখরা?"

তার সম্বোধনের ভাষা শুনে রদ-অন্দাজ স্তম্ভিত হোলো। তারপর হাল্কা সুরে বললো, "বখরা? কিসের বখরা? কে তোমায় আজকাল এসব মতলব দিচ্ছে? তুমি কি মনে কর্রো আমাকে?"

"আমি অপরাহ্ণে খিলওয়াতগাহ্‌তে গিয়ে বাদশাহ্‌কে তসলিম জানাবো ভাবছি," শান্ত কণ্ঠে আবিদ হুসেন বললো।

এক মুহূর্তে বদলে গেল রদ-অন্দাজ খাঁর মুখের ভাব। "আরে ইয়ার," বললো সে, "তুমি ঠাট্টা বোঝো না। আমরা কতো দিনের চেনা জানা, পুরোনো দোস্ত। তোমার ওয়ালিদ মহম্মদ হুসেন খাঁ আমার চাচেরা ভায়ের শালা। তুমি আমার কতো নিকট রিশতাদার। এই নাও।"

রদ-অন্দাজ খাঁ জেবের ভিতর হাত দিয়ে বার করলো একটি মখমলের বটুয়া। গুনে গুনে দশটা আশরফি বার করে দিলো।

"আরে মিঞা, এতো কম তো নেবো না।"

"আর কতো চাই?"

"যা পেয়েছো, তার অর্ধেক তো দাও।"

"ভাই আবিদ হুসেন, তুমি বড়ো সেয়ানা হয়ে গেছ," আস্তে আস্তে বললো রদ-অন্দাজ খাঁ।

আশরফির আরেকটি তোড়া নিয়ে কুমার রামসিংহ নিজে গেল মহম্মদ আমিন খাঁর মঞ্জিলে। সে প্রসন্ন চিত্তে নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করলো এই ভেট, কিন্তু নিরাসক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "এই আশরফি কেন ?"

"আপনার কিছু খরচপত্র হতে পারে। আপনাকে কিছু সময়ও দিতে হবে, শাহ্-ইন-শাহ্ বাদশাহ্‌র অপ্রিয়ভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বেশী কি আর বলবো।"

কুমার রামসিংহের কথা শুনে মহম্মদ আমিন খাঁ খুব প্রীত হোলো। খাতির করলো খুব। পান শরবত খাওয়ালো। তারপর বললো, "ব্যাপার কি বলুন। কি করতে হবে আমাকে।"

"শিবাজীর ব্যাপারটা শুনেছেন ?"

"হ্যাঁ, কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে।"

"কয়েকজন খলচরিত্র ব্যক্তির পরামর্শে শাহ্-ইন-শাহ্ শিবাজীকে কয়েদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কোতোয়াল ফুলাদ খাঁকে হুকুম দিয়েছেন শিবাজীকে সোজা ফিরোজার বাগ থেকে কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁর মহলে স্থানান্তরিত করবার জন্যে।"

"তাতে এতো ভাবনা হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ?"

কুমার রামসিংহ উত্তর দিলো, "আমি খবর পেয়েছি, শাহ্-ইন-শাহ্‌র আসল উদ্দেশ্য শিবাজীকে হত্যা করা। শিবাজী যদ্দিন আমার মেহমান হয়ে আছেন তদ্দিন এই মতলব কাজে পরিণত করা যাবে না। সেজন্যেই তাঁকে কিলার ভিতরে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

"আপনি নিজে শাহ্-ইন-শাহ্‌কে বলছেন না কেন ?

"আমার কথা উনি কানে তুলবেন না। মহারাজ জসবন্ত সিংহ ওঁকে কিছুতেই আমার কোনো আরজ মঞ্জুর করতে দেবেন না। উনি আমাকে ও আমার পিতা মহারাজা জয়সিংহকে সবার চোখে হেয় করতে চান।"

"শিবাজীর জন্যে আপনার এত চিন্তান্বিত হওয়ার কারণই বা কি? আপনার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। শিবাজী একজন বিদ্রোহী, শাহ্-ইন-শাহ্‌র শত্রু। আপনি দরবারের একজন বিশিষ্ট মনসবদার। এ ব্যাপারে আপনার নিরাসক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

কুমার রামসিংহ এবার ক্রুদ্ধ হোলো। বলে উঠলো, "এই উপদেশ শুনবার জন্যে আপনার কাছে আশরফি নিয়ে আসিনি।"

মহম্মদ আমিন খাঁ হেসে বললো, "আপনি রাগ করছেন কেন? আপনি মানী লোক, আমার গরীব খানায় তশরিফ এনেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি শুধু জানতে চাইছি, এ ব্যাপারে আপনার স্বার্থটা কি।

"আমার কোনো স্বার্থ এতে নেই," রামসিংহ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "অনর্থক আমার পিতার অবিবেচনার জন্যে আমাকে এত ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। তাঁর উচিত ছিলো শিবাজীকে আগ্রায় না পাঠানো। কিংবা, তাঁকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে আসা। সব জেনেশুনে কেন তিনি একাজ করলেন ভেবে পাচ্ছি না। আমি শুধু আমার ইজ্জত বজায় রাখতে পারলেই খুশী হবো।"

"এ ব্যাপারে আপনার ইজ্জতের সওয়াল আসছে কোথায়?"

"আসছে না? শিবাজী আমার মেহমান। আমার পিতা তাঁকে কথা দিয়েছেন যে আগ্রায় তাঁর কোনো বিপদ হবে না, আমার মেহমান হয়ে তিনি নিরাপদেই থাকবেন। আমি রাজপুত, আমি এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতে বাধ্য। আমার প্রাণ থাকতে আমি কাউকে আমার শিবির থেকে নিয়ে যেতে দেবো না শিবাজীকে।"

"আপনি কি সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা ভাবছেন?"

"সেখানেই তো সমস্যা। খুদ বাদশাহ্‌র হুকুম, আমি বাধাই বা দিই কি করে?"

"আমি কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"আপনি শাহ্‌-ইন-শাহ্‌র কাছে হাজির হয়ে তাঁকে বোঝান। আপনার পিতা মির জুমলাকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন, এজন্যে আপনার অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।"

"আমি কি বলবো শাহ্‌-ইন-শাহ্‌কে?"

রাগে কুমার রামসিংহের চোখমুখ লাল হয়ে গেল। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো, "আর কিছু যদি বলতে না পারেন, তাহলে অন্তত একথাই বলুন, শাহ্‌-ইন-শাহ্‌ বাদশাহ যেন আগে আমায় বধ করেন। আমার মৃত্যুর পর তিনি শিবাজীকে কোতল করুন কয়েদ করুন যা খুশী করুন কেউ কিছু বলতে আসবে না।"

মহম্মদ আমিন খাঁ হাসিমুখে কুমার রামসিংহের কাঁধে হাত রেখে বললো, "কুমার-জী, আপনি বিচলিত হবেন না, আপনি আমার পুরোনো বন্ধু। আমার স্বর্গীয় পিতা আপনার পিতার বন্ধু ছিলেন। আমি আমার যথাসাধ্য করবো। আপনি আমার উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন," এই বলে আশরফির তোড়াটি তুলে নিলো।

অপরাহ্নে আওরংজেব যখন দৈনন্দিন রেওয়াজ অনুযায়ী খিলওয়াতগাহ্‌তে এলো, আবিদ হুসেন তসলিম করে জানালো, আমের দরবারের সর্দার তেজসিংহ মধ্যাহ্নে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রায় একই সময় কুমার রামসিংহ গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন মহম্মদ আমিন খাঁর সঙ্গে। আবিদ হুসেন চলে যাওয়ার পর আওরংজেব ইত্তলা দিলো ফুলাদ খাঁকে। জিজ্ঞেস করলো নিস্পৃহ কণ্ঠে, "শিবাজীকে কিলার ভিতর স্থানান্তরিত করার কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

এরকম প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলো সিদ্দি ফুলাদ খাঁ। বিনীত কণ্ঠে

জানালো, "রদ-অন্দাজ খাঁর বিশেষ অনুরোধে এ ব্যবস্থা একদিনের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে, কারণ রদ-অন্দাজ খাঁর মহলে বড্ড স্থানাভাব, মহলের একাংশ খালি করে শিবাজীর মতো মেহমানের আরামস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে একটু সময় লাগবে।"

"তুমি এরকম বেওকুফ আমার ধারণা ছিলো না," কঠিন কণ্ঠে বললো আওরংজেব, "শিবাজীকে রদ-অন্দাজ খাঁর মহলে স্থানান্তরিত করার হুকুমের এ অর্থ নয় যে তাকে খাতির করে মুখের উপর নকাব পরিয়ে মাথার উপর বোরখা চাপিয়ে রাখা হবে রদ-অন্দাজ খাঁর হারেমে। আমি সোজাসুজি বোঝাতে চেয়েছি কিলার কয়েদখানা।"

ফুলাদ খাঁ শঙ্কিতচিত্তে বললো, "ভুল হয়ে গেছে জাহাঁপনাহ্, আমাদের মাফ করবেন।"

"তোমার জরিমানা হোলো পঁচাত্তর আশরফি। এই অর্থ বইত-উল-মালএ জমা হবে। পরে বিতরণ করে দেওয়া হবে ফকিরদের মধ্যে।" আবিদ হুসেন কিছু না বললেও, আওরংজেব ঠিকই অনুমান করেছিলো কেন তেজসিংহ সাক্ষাৎ করেছিলো ফুলাদ খাঁর সঙ্গে।

ফুলাদ খাঁ মনে মনে কপাল চাপড়ালো। তেজসিংহের দেওয়া তোড়ার মধ্যে ছিলো একশো আশরফি। তার মধ্যে পঞ্চাশ নিয়ে গেছে রদ-অন্দাজ খাঁ। করুন কণ্ঠে বললো, "জাহাঁপনাহ্ মেহেরবান, জরিমানা হ্রাস করার হুকুম হোক, তা নইলে সামনের মাসের তন্‌খা পাওয়া অবধি অর্থাভাবে কষ্ট পেতে হবে।"

"কতো দিতে চাও?"

মনে মনে হিসেব করলো ফুলাদ খাঁ, তারপর বললো, "চল্লিশ আশরফি।"

একটু হাসি দেখা দিলো আওরংজেবের মুখে।

"বেশ, তাই হুকুম হোলো।"

দশ আশরফি মুনাফা। ফুলাদ খাঁ সন্তুষ্ট হয়ে তসলিম করে চলে গেল।

বাদশাহ ইত্তলা দিলো রদ-অন্দাজ খাঁকে।

রদ-অন্দাজ খাঁ এসে তসলিম করে দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করলো, "যাদের কয়েদ করার হুকুম হয় তাদের তুমি হারেমে রাখবার নীতি গ্রহণ করেছো কবে থেকে?"

মুখ লাল করে রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "আমার বুঝবার ভুল হয়ে গেছে জাহাঁপনাহ্। আমায় মার্জনা করা হোক।"

আওরংজেব উত্তর দিলো, "এতদিন তুমি আমার সঙ্গে আছো, এখনো কথা বলার কৌশল আয়ত্ত করতে পারো নি। আমি হলে বলতাম, জাহাঁপনাহ, কয়েদখানায় কুঠরি খালি আছে, কিন্তু শাহ্-ইন-শাহ্র মুখ থেকে রদ-অন্দাজ খাঁর মহলের কথা বেরিয়েছে বলে, তাঁর জবানের মান রাখতে দু-একদিন আমার মহলে রাখবার ব্যবস্থা করছিলাম, যাতে নিন্দুকেরা কোনো কথা বলতে না পারে। যাই হোক,—তুমি আমার হুকুম তামিল করতে গাফিলতি করেছো। তোমার জরিমানা হোলো পঞ্চাশ আশরফি।"

পঞ্চাশ আশরফি! পঁচিশ আশরফি যে নিয়ে গেছে আবিদ হুসেন! আর্তকণ্ঠে রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "জাহাঁপনাহ! আমার জায়গীরের আয় অতি সামান্য। আমার তনখায় মহলের খরচ কুলোয় না। আমার জরিমানা মাফ করার হুকুম হোক।"

"একেবারে মাফ তো হবে না। ওই অর্থ বইত-উল-মালএ যাবে, তারপর দান করা হবে গরীব দুঃখীদের। কতো দিতে পারবে বলো।"

রদ অন্দাজ খাঁও মনে মনে হিসেব করলো। তারপর বললো, "কুড়ি আশরফি।" পাঁচ আশরফি মুনাফা তো রাখতে হবে।

তাই হুকুম হোলো। তসলিম করে চলে গেল রদ-অন্দাজ খাঁ। আওরংজেবও মনে মনে একটা হিসেব করলো। তারপর হুকুম দিলো আবিদ হুসেনকে ইত্তলা দেওয়ার। আবিদ হুসেন হাজির হোলো অবিলম্বে।

"মির আবিদ হুসেন খাঁ," বললো আওরংজেব, "তুমি চতুর লোক। কিলাদার কোতোয়ালের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের তুমি যেরকম বেকায়দায় ফেলছো, তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বেশী চাতুরি ভালো নয়। অন্তত আমার সঙ্গে কোরো না।"

"আমার কি কসুর হয়েছে জাহাঁপনাহ্?"

"তুমি আজ হয়তো আমার কাছে কোনো খবর গোপন করেছো।"

আবিদ হুসেন চুপ করে রইলো।

"তুমি খামোশ কেন?"

"জাহাঁপনাহ্, আমি ঠিক ধরতে পারিনি আপনি কি বলতে চাইছেন। এজন্যে আপনাকে সত্যিও বলতে চাই না, মিথ্যেও বলতে চাইনা।"

"শাবাশ, আবিদ হুসেন খাঁ, শাবাশ। বাদশাহ আলমগীরের মুখের উপর এমন কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। তুমি সাচ্চা সরল লোক, তাই নির্ভয়ে বলতে পারলে।" আওরংজেবের মুখে হাসি দেখা যায় না সচরাচর, আবিদ হুসেনের কথা শুনে দেখা গেল সেই দুর্লভ হাসি। "শোনো। আমি ফুলাদ খাঁকে জরিমানা করেছি চল্লিশ আশরফি, রদ-অন্দাজ খাঁকে কুড়ি আশরফি। তুমি কতো দিতে পারবে বলো।"

আবিদ হুসেন খাঁ ভাবলো না। সরল ভাবে বলে ফেললো, "আমি পঁচিশ আশরফি পেয়েছি। না, পাইনি, আদায় করে নিয়েছি। কার কাছ থেকে, এবং কিভাবে, সেকথা বলতে পারবো না। আমি বেইমানি করতে পারি না। ওই পঁচিশ আশরফি আমার সম্বল।"

"তোমার ওয়ালিদের যে অর্থ আমি বইত-উল-মাল থেকে খালাস করে দেওয়ার হুকুম দিয়েছি, সেটা পাওনি?"

"না, জাহাঁপনাহ্, কোনো ব্যক্তি বিশেষকে পঞ্চাশ আশরফি না

দিলে সে অর্থ সহজে খালাস হবে না। পঞ্চাশ আশরফি তো আমাকে যোগাড় করতে হবে। পাবো কোথায়? তাই স্থির করেছি, যারা অন্যের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে অন্যায় ভাবে, তাদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে অর্থ আদায় করবো আমি। তাতে প্রথম অন্যায়েরও প্রতিকার হবে, আমারও কাজ হবে।”

আওরংজেব হেসে উঠলো। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, “বাবাজান, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। হারামের অর্থ কোনোদিন নিজে ভোগ কোরো না। অন্যের উপকারে লাগিয়ো, দান করে দিয়ো। থাক, আমি তোমাকে জরিমানা করবো না। ফুলাদ খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ, ওদের ধারণা হোক যে তুমি ওদের থেকেও বেশী বুদ্ধিমান। আমি ওদের ধরে ফেলেছি, কিন্তু তোমাকে ধরতে পারিনি। তবে আমাকে কথা দাও, এই পঁচিশ আশরফি তুমি গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে।”

“আপনার যা হুকুম জাহাঁপনাহ্।”

“এই নাও আশরফির তোড়া। এর মধ্যে পঞ্চাশ আশরফি আছে। এটা তুমি নিজে খরচা করো। আর, তোমার ওয়ালিদের বাজেয়াপ্ত অর্থ সম্পত্তির জন্যে ভাবনা কোরো না। আমি আজই হুকুম দিচ্ছি উজীর-উল-মুল্ককে। সমস্তটাই খালাস হয়ে যাবে। কালই তোমার হাতে দেওয়া হবে সেই অর্থ।”

“জাহাঁপনাহ্ মেহেরবান,” তসলিম করে বলে উঠলো আবিদ হুসেন খাঁ, “মেহেবানের চাইতেও মেহেরবান।”

আবিদ হুসেন চলে যাওয়ার পর রেশমী রুমালি ঢাকা রুপোর তশতরী হাতে এলো মহম্মদ আমিন খাঁ। বাদশাহ্‌কে তসলিম করে নজর দিলো সেই তশতরী। বাদশাহ্‌র ইঙ্গিতে খওয়াস এসে রেশমী রুমালি তুলে নিলো। ঝিকমিক করে উঠলো একরাশ সোনার আশরফি।

"বইত-উল-মালএ জমা হবে এই আশরফি।"

মহম্মদ আমিন খাঁ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখলো বাদশাহ্‌র দিকে। অস্বাভাবিক রকম ভারী বাদশাহ্‌র কণ্ঠস্বর।

"জাহাপনাহ্‌র কাছে একটা আরজ নিয়ে এলাম," বললো মহম্মদ আমিন খাঁ।

"আরজ-এর বিষয়টা কি?"

"শিবা ভোঁসলের সম্পর্কে আপনার হুকুম।"

"এতে তোমার আগ্রহের কারণ?"

মহম্মদ আমিন খাঁ বাদশাহ্‌র মনোবৃত্তি খুব ভালো করেই জানতো। তাই সে সোজাসুজিই বললো।

"আজ কুমার রামসিংহ আমার গরীবখানায় তশরিফ এনেছিলেন।"

"সে কি বলছে?"

"জাহাপনাহ্‌। শিবা ভোঁসলে কুমার রামসিংহের মেহমান। মির্জা রাজা শিবা ভোঁসলেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুমার রামসিংহ সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্য। কিন্তু শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুমও সে অমান্য করতে পারে না।"

"সে কি চায়?"

"সে চায়, শিবার জান নেওয়ার আগে যেন তার জান নেওয়া হয়। তাহলে তার আর কোনো আক্ষেপ থাকবে না।"

"কুমার রামসিংহ দরবারের একজন বিশিষ্ট মনসবদার," বললো আওরংজেব, "তার জানের কীমত অনেক। শিবার জন্যে আমি তাকে হারাতে পারি না। ওর কাছে গিয়ে জেনে এসো, সে শিবার জন্যে জামিন হতে রাজী আছে কিনা। শিবা যদি পালিয়ে যায়, কিংবা যদি কোনো অসৎকার্য করে, তাহলে সমস্ত ক্ষতির জন্যে দায়ী হতে হবে রামসিংহকে। এবং এই মর্মে তাকে একটি জমানৎ-নামা দস্তখত করতে হবে। ব্যস, এই আমার হুকুম।"

মহম্মদ আমিন খাঁ কালবিলম্ব না করে শাহী কেল্লা থেকে সোজা ফিরে এলো নিজের মঞ্জিলে। তারপর লোক পাঠিয়ে খোজা ফিরোজার বাগ থেকে ডাকিয়ে আনলো কুমার রামসিংহকে। বাদশাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে খুলে বললো সমস্ত কথা।

রামসিংহ চুপ করে শুনলো মন দিয়ে। তার মনের উপর থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। আশ্বস্ত হয়ে বললো, "বেশ ভালো কথা। জমানৎনামায় দস্তখত করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। খোজা ফিরোজার বাগে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে এলো। নিজের মঞ্জিলে ফেরার আগে শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে গেল কুমার রামসিংহ।

শিবাজীর শিবিরে সারাদিন ধরে একটা চাপা উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে সবাই। আড়াইশো মারাঠা সৈন্য মধ্যাহ্ন-কাল থেকে সশস্ত্র হয়ে তৈরী হয়ে আছে, আড়াইশো ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামানো হয়নি। নিরাজী রাওজী, দত্ত ত্রিম্বক, হিরাজী ফরজন্দ, কৃষ্ণাজী আপ্তে সবাই কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে ঘিরে বসে আছে শিবাজীকে। শিবাজী নিজেও তলোয়ার চোখের আড়াল করেনি এক মুহূর্তের জন্যেও।

কুমার রামসিংহ চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

শিবাজী হেসে বললো, "ফুলাদ খাঁ পিয়াদা নিয়ে এলে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হোতো। আগ্রার মোগলেরা শিবাজীর সম্বন্ধে নানারকম কিংবদন্তী শুনেছে। এবার চোখে দেখতো মারাঠার তলোয়ার কী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে।"

"আপনি বিনা যুদ্ধে যে আত্মসমর্পণ করবেন না, তা আমি জানি।"

"আত্মসমর্পণ!" শিবাজীর চোখ দুটো ঝলসে উঠলো মধ্যাহ্ন-

রৌদ্র উদ্ভাসিত কোষমুক্ত তরবারির মতো। "আত্মসমর্পণ আমি করি না। ফুলাদ খাঁর সৈন্যদের রক্তে লাল হয়ে যেতো খোজা ফিরোজার বাগ।"

"কিন্তু আগ্রা ছেড়ে বেশীদূর যেতে পারতেন না।"

"আগ্রা ছেড়ে যেতাম না। সমস্ত মারাঠাদের নিয়ে চড়াও হতাম শাহী কিলায়। মারাঠাদের রক্তের দাগ চিরকালের জন্যে এঁকে দিতাম দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাসের মেঝের সংমর্মরে। একটি দিনের জন্যে কাঁপিয়ে দিতাম আগ্রা শহর। চিরকালের জন্যে সবার মনে থাকতো এদিনের কথা। লোকে জানতো একদিন অন্তত আওরংজেব আশ্রয় নিয়েছিলো রুদ্ধদ্বার রংমহলে। যদি সে বেরিয়ে আসতো সাহস করে, শিবাজী আর আওরংজেবের প্রাণহীন দেহদুটো সবাই একসঙ্গে দেখতে পেতো গুলালবারের সামনে।"

কুমার রামসিংহ একটু হাসলো, মৃদুকণ্ঠে বললো, "দুটি নয়, তিনটি। সেখানে থাকতো, কুমার রামসিংহের মৃতদেহও। মহম্মদ আমিন খাঁকে দিয়ে শাহ-ইন-শাহ্‌কে বলে পাঠিয়েছিলাম যে, কুমার রামসিংহ জীবিত থাকতে কেউ শিবাজী রাজার গাত্রস্পর্শ করতে পারবে না। জানিয়ে দিলাম খুব বিনীত ভাষায়, তবে শাহ-ইন-শাহ ঠিক বুঝে নিয়েছেন। আপনি জানেন না, আজ সারাদিন প্রস্তুত ছিলো কছওয়া শিবিরের প্রত্যেকটি রাজপুত। তবে আগের থেকে বাইরের কাউকে জানতে দিতে চাইনি। তাহলে একটা হট্টগোল শুরু হোতো। আমি চেয়েছিলাম, যতোক্ষণ বিনা সংঘর্ষে শান্তভাবে একটা মিটমাট করার চেষ্টা করা যায়, ততোক্ষণ কেউ যেন জানতে না পারে, কছওয়া রাজপুতেরা প্রয়োজন হলে তলোয়ার নিয়ে এ ব্যাপারের ফয়সলাহ্‌ করতে প্রস্তুত।"

শিবাজী শান্তভাবে শুনলো রামসিংহের কথাগুলো, একটু হাসলো, তারপর স্বাভাবিক কথোপকথনের সুরে জিজ্ঞেস করলো, "দরবারে যাচ্ছেন?"

"না। আসছি মহম্মদ আমিন খাঁর মঞ্জিল থেকে। আজ আর দরবারে যাবো না। আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এসেছি।"

"বলুন।"

"মহম্মদ আমিন খাঁ খিলওয়াতগাহ্‌তে শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।"

"তারপর?"

"শাহ-ইন-শাহ আপনাকে কিলায় স্থানান্তরিত করার হুকুম বাতিল করে আপনাকে এখানেই থাকতে দিতে রাজী হয়েছেন। তবে একটি শর্তে।"

"কি শর্ত?"

"আমি আপনার জন্যে জামিন থাকবো। আপনি পালিয়ে গেলে কিংবা কোনো অপ্রীতিকর কার্য করলে দায়ী হবো আমি। তার জন্যে আমি সমস্ত ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য হবো। এবং এই মর্মে একটি জমানৎনামায় দস্তখত করতে হবে আমাকে।"

"তারপর?"

"আমি রাজী হবো কিনা, এ-কথাই আপনার কাছে জানতে এসেছি।"

"কুমারজী", শিবাজী বললো, "আপনি আমার ভায়ের মতো। আপনি আমার যা মেহমানদারি করেছেন, তা আমি জীবনে ভুলবো না। আমার জন্যে আপনি অনেক জড়িয়ে পড়েছেন। সুতরাং এ-ব্যাপারে আমি কোনো পরামর্শ দেবো না। আপনি যা উচিত মনে করেন, তাই করবেন।"

"আমি জমানৎনামায় দস্তখত করতে রাজী হয়েছি, তবে তার আগে আপনার কাছ থেকে আমি কয়েকটা প্রতিশ্রুতি চাই।"

"কি প্রতিশ্রুতি?"

"আপনি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

"আমি কি কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও এ আভাস দিয়েছি যে আমি পালিয়ে যাবো?"

"এরকম একটা পরিকল্পনা যে সম্প্রতি আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়নি তা নয়।"

শিবাজী যেন একটু বিরক্ত হোলো। বলে উঠলো, "শুনুন কুমার রামসিংহ, আগ্রার দরবারের কায়দামাফিক কূটনৈতিক ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আমি পাহাড়ী লোক, সভ্য সমাজের রীতিনীতি জানিনা। আমার সঙ্গে সোজা কথা বলুন, সোজা উত্তর পাবেন।"

"পালিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা যে ছিলো না, তা তো নয়।"

"পরিকল্পনা আপনার।"

"কিন্তু পালিয়ে যেতে স্বীকৃত হয়েছিলেন আপনি।"

"আপনি বলেছিলেন। আমি স্বীকৃত হয়েছিলাম। আপনি না বললে, আমি এ বিষয় নিয়ে কোনো চিন্তাই করতাম না।"

"আগে কি করা হোতো না-হোতো তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না," বলে উঠলো কুমার রামসিংহ। এবার সেও একটু চটে উঠেছে। ভাবলো, এই মারাঠার কাছ থেকে যদি একটু সহযোগিতাও পাওয়া যেতো, তাহলে এরকম জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হোতো না।

"আমি তো কোনো আলোচনাই করছিনা," উত্তর দিলো শিবাজী, "আমি শুধু আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি।"

"আমি শুধু জানতে চাই দুটি কথা।"

"বেশ, বলুন কি কথা।"

"আপনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

"কুমার-জী, পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আপনার। আপনি সেটি বাতিল করে দিন।"

"আমি জানতে চাই যে, আপনি নিজে কোনো চেষ্টা করবেন না।"

"এ ব্যাপারে আমার হ্যাঁ-না কিছুই বলার নেই, কারণ এবিষয়ে আমি কোনো চিন্তা করিনি।"

"আপনি আমাকে এই আশ্বাস দিন যে আপনি নিজে কোনো চেষ্টা করবেন না আগ্রা ত্যাগ করার। অন্তত আমাকে না জানিয়ে নয়।"

"দেখুন কুমারজী, আমরা সবাই ইতিহাসের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। যা করি পরিস্থিতি অনুযায়ী করি। কোন সময়ে কি রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন আমি আত্মরক্ষার জন্যে কোন উপায় অবলম্বন করবো, সেকথা আগের থেকে কি করে বলবো বলুন?"

"শিবাজী, আমি রাজপুত ক্ষত্রিয়। যুদ্ধই আমার বৃত্তি। কুটনীতির ভাষা আমিও জানিনা। আমিও সোজাসুজি বলছি আপনাকে। আমি শাহ-ইন-শাহ্‌কে দুটো প্রতিশ্রুতি দেবো। প্রথমত,—আপনি পালিয়ে যাবেন না। দ্বিতীয়ত,—আপনি কোনো হামলা বা গণ্ডগোল করবেন না। আমার কথা রাখা নির্ভর করে আপনার সহযোগিতার উপর।"

"আমার কাছ থেকে কি সহযোগিতা চান, বলুন!"

"অনুরূপ প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিন।"

শিবাজী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রামসিংহের দিকে। তারপর উত্তর দিলো, "আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, পরিস্থিতির যদি কোনো পরিবর্তন না হয়, যদি আমি সম্মান বজায় রেখে এখানে থাকতে পারি, তাহলে আমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো না, কোনোরকম হামলা বা গণ্ডগোলও করবো না।"

"শর্তাধীন প্রতিশ্রুতি আমি চাই না," রামসিংহ নীরস কণ্ঠে বললো, "আমি আপনার প্রতিশ্রুতি চাই বিনা শর্তে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আপনি যদ্দিন আমার অতিথি হয়ে আছেন, তদ্দিন আপনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, তদ্দিন আপনি এখানে কোনো গণ্ডগোল বাধাবেন না।"

শিবাজী স্তব্ধ হয়ে রইলো অল্পক্ষণ। তারপর সহজকণ্ঠে উত্তর দিলো, "এরকম কোনো প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না।"

"তাহলে আমিও কোনো জমানৎনামায় দস্তখত করতে পারবো না।"

"ওরা আসবে আমাকে কিলায় স্থানান্তরিত করবার জন্যে।"

"হ্যাঁ, তা আসবে," বললো রামসিংহ।

"তখন যা হবে, তার জন্যে আমাকে আর দায়ী করবেন না।"

অন্যান্য সবাই চুপচাপ শুনছিলো দুজনের কথাবার্তা। হঠাৎ এই মুহূর্তে ন্যায়াধীশ নিরাজী রাওজী তাদের কথোপকথনে বাধা দিয়ে বললো, "এ বিষয়ে আজ রাত্রিতেই কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। আজ রাত্রিতে আপনিও ভাবুন, আমরাও ভাবি। কাল সকালে যা হোক একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।"

কুমার রামসিংহ বললো, "আমার কোনো আপত্তি নেই।"

শিবাজী চোখ বুজে বসেছিলো। সুতরাং নিরাজী রাওজী প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তার দিকে কোনোরকম ইশারা করতে পারলো না। সবাই তাকিয়ে রইলো শিবাজীর মুখের দিকে। শিবাজী আস্তে আস্তে চক্ষু উন্মীলিত করলো, তারপর বললো, "বেশ, আমারও কোনো আপত্তি নেই।"

ঠিক সেই সময় পান্না আর শক্তিসিংহ রাঠোর মুনশী গিরধরলালের গৃহের পেছন দিকের সেই পূর্ববর্ণিত স্থানে গাছের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো।

"আজ সারাদিন খুব ভাবনার মধ্যে কেটেছে," বলছিলো পান্না, "শিবাজীকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ফৌজ এলে খুব গণ্ডগোল হোতো। কুঁবর-সা খুব চেষ্টা করছেন যাতে ওঁকে কয়েদ

করার হুকুম রদ করানো যায়। সফল হয়েছেন কিনা জানি না। শুনতে পেলাম, উনি কিছুক্ষণ আগে মহম্মদ আমিন খাঁর মঞ্জিল থেকে ফিরে এসেছেন, ফিরে এসে সাক্ষাৎ করতে গেছেন শিবাজীর সঙ্গে। তুমি কিছু জানতে পেরেছো ?”

“না,” উত্তর দিলো শক্তিসিংহ, “আমি যখন আমাদের শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমাদের মহারাজা তখনো দিওয়ান-ই-আম থেকে ফেরেন নি।”

“তোমার জন্যেও ভাবনা ছিলো। বাদশাহ্‌র ফৌজ আসেনি বটে, কিন্তু খুফিয়ানবিসেরা নিশ্চয়ই চারদিকে ঘুরে ঘুরে নজর রেখেছে। তোমাকে দেখতে পেলে ঠিক খবর চলে যাবে বাদশাহ্‌র কাছে।”

“একথা আমারও খেয়াল ছিলো। আমি এসেছি আবিদ হুসেনের সঙ্গে। ও এখন শাহ-ইন-শাহ্‌র নিজের লোক। কোনো খুফিয়ানবিস আমাকে এখানে ঢুকতে দেখলেও কোনোরকম সন্দেহ করবে না। আবিদ হুসেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে। কোনো কথা উঠলে নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞেস করবেন শাহ-ইন-শাহ। সে জানাবে যে, আমি সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে।”

পান্না একটু চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, “এবার কিন্তু আমাকে নিয়ে কোনো কথা ওঠা ঠিক হবে না।”

“কেন ?”

“সেবার যখন কৃষ্ণাজীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হয়েছিলে বলে তোমাকে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে যাওয়ার দরুণ নানারকম আলোচনা শুরু হয়েছিলো, আমাকে প্রচুর ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিলো।”

“কে ভর্ৎসনা করেছিলো ? মুনশী গিরধরলাল ?”

“হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে এভাবে গোপনে সাক্ষাৎ হওয়া তিনি অনুমোদন করেন না।”

শক্তিসিংহ গম্ভীর হয়ে কিছু একটা চিন্তা করছিলো।

"কি ভাবছো ?" পান্না জিজ্ঞেস করলো।

শক্তিসিংহ ফিরে তাকালো। উত্তর দিলো, "ভাবছি, একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।"

"কেন ?"

"আমায় জানতে হবে, তিনি আমাকে তোমার যোগ্য মনে করেন কিনা।"

"না, না, এখন নয়।"

"বেশী দেরী করা ঠিক হবে না পান্না।"

"এখনকার এসব গোলমাল মিটে যাক, তারপর দেখা কোরো।"

"কিন্তু সত্যি, তোমাকে নিয়ে যদি আবার কোনো কথা ওঠে ?"

"আমি সয়ে নেবো।"

"পান্না,—।"

শক্তিসিংহ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় তীব্রকণ্ঠে কে যেন ডাকলো, "পান্না !"

তুজনে চমকে ফিরে তাকালো। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মুনশী গিরধরলাল আর কৃষ্ণাজী আপ্তে।

"পান্না, তুমি যাও এখান থেকে," বললো মুনশী গিরধরলাল।

পান্না তাকালো কৃষ্ণাজীর দিকে। দেখলো সে নিস্পৃহ মুখ করে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। পান্নার চোখে একটা তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠলো।

"পান্না, আমি তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলেছি," বলে উঠলো মুনশী গিরধরলাল।

"না," পান্না উত্তর দিলো ফিরে তাকিয়ে।

"তুমি আমার কথার অবাধ্য হবে, এটা আমি আশা করিনা পান্না।"

"অবাধ্য আমি নই। কিন্তু আমার একটা কথা বলার আছে। সেকথা আপনাকে শুনতে হবে। তার আগে আমি যাবো না।"

"আমি এখন কোনো কথা শুনতে চাইনা।"

"তুমি যাও পান্না," শক্তিসিংহ বললো, "যা বলার আমিই বলবো।"

পান্না চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো দুতিন মুহূর্ত, তারপর মন্থর পদক্ষেপে চলে গেল সেখান থেকে।

"মুনশীজী—," শুরু করলো শক্তিসিংহ।

"আপনার সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা আমি করতে চাই না," বলে উঠলো মুনশী গিরধরলাল, "আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি এই মুহূর্তে ফিরোজাবাগ থেকে বেরিয়ে যান।"

"আমি এখানে কেন এসেছি, সেকথা না শুনে—"

"আমি শুনতে চাই না। আমি শুধু একথা বলতে চাই যে, কছওয়া শিবিরে কোনো রাঠোরের প্রবেশ নিষেধ। আপনি আমার কথা না শুনলে আমি সৈন্যদের ডাকতে বাধ্য হবো।"

"মুনশীজী," শক্তিসিংহ ধীরকণ্ঠে বললো, "একদিন আপনি আমার সহায়তা চেয়েছিলেন কোনো একটা কাজে।"

"এখন চাইনা। আপনাদের মহারাজা আমাদের মহারাজকুমারকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছেন। আপনাদের মহারাজা শাহ-ইন শাহ্‌কে প্ররোচিত করেছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি শিবাজী রাজাকে অপমান করবার জন্যে। তাঁকে কয়েদ করবার জন্যেও পরামর্শ দিয়েছেন। এখন আর কোনো রাঠোরের সঙ্গে কোনো কছওয়ার কোনোরকম সহযোগিতা সম্ভব নয়। আপনাদের আমরা বিশ্বাস করিনা।"

"আমার সম্বন্ধে আপনার কোনোরকম ভুল ধারণা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় মুনশীজী।"

"আমার ধারণায় কোনো ভুল নেই। আপনি এখানে আসেন অন্যায় উদ্দেশ্য নিয়ে। এখন অন্য অবান্তর প্রসঙ্গ তুলে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে চাইছেন।"

একথা শুনে শক্তিসিংহের মনে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হোলো। কিন্তু কোনোরকমে আত্মসংবরণ করে সে চুপ করে রইলো। চোখ পড়লো কৃষ্ণাজীর উপর। আবছা অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পেলো না তার মুখ, কিন্তু মনে হোলো যেন একটুখানি হাল্কা হাসি শুনতে পেয়েছে।

প্রবল ঘৃণার সঙ্গে শক্তিসিংহ কৃষ্ণাজীর দিকে ফিরে বললো, "আজকের এই অপ্রীতিকর ঘটনায় আপনার কি ভূমিকা জানিনা। তবে আমি হলে কখনো মুনশীজীকে এখানে আসবার জন্যে প্ররোচিত করতাম না। রাজপুত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, হীন ব্যক্তির মতো ঈর্ষা করে না।"

"শক্তিসিংহ," ক্রুদ্ধকণ্ঠে কৃষ্ণাজী আপ্তে বললো, "কোনো মারাঠার সম্বন্ধে অপমানকর উক্তি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

"বিপদের ভয় রাজপুত জানেনা, কৃষ্ণাজী।"

কৃষ্ণাজী আপ্তের তলোয়ার ঝলমল করে উঠলো। শক্তিসিংহও হাত রাখলো নিজের তলোয়ারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ঝাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে এলো নিরাজী রাওজী। মুনশী গিরধরলালকে দেখে বললো, "আপনি এখানে? শিবাজী আপনার খোঁজ করছেন। আমাকে পাঠালেন আপনাকে বলতে, আপনি যেন এখন একবার মহারাজকুমারের কাছ থেকে জমানৎনামার মুসাবিদাটা নিয়ে এসে তাঁকে দেখান। খুব জরুরী। দেরি করবেন না।"

মুনশী গিরধরলাল দ্রুতপদে চলে গেল রামসিংহের মঞ্জিলের দিকে।

"তুমি এখানে কি করছো?" নিরাজী রাওজী জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু না। বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে পড়লাম," কৃষ্ণাজী একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

"ইনি কে ?" শক্তিসিংহকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো নিরাজী রাওজী।

"ইনি আমাদের একজন অতি পরিচিত বন্ধু," কৃষ্ণাজী উত্তর দিলো। আসল কথাটা জানাজানি হয়, এটা সে চাইলো না।

নিরাজী রাওজী কৃষ্ণাজীকে বললো, "আজকের দিনে শিবির থেকে বেরিয়ে আসা উচিত হয়নি। শিবাজী শুনলে রাগ করবেন। আজ সবারই সশস্ত্র হয়ে তাঁর মঞ্জিলে সর্বসময় উপস্থিত থাকার কথা।"

কৃষ্ণাজী চুপ করে রইলো।

"এসো আমার সঙ্গে," বললো নিরাজী রাওজী।

ন্যায়াধীশের আদেশ কোনো মারাঠা অমান্য করতে পারে না। কৃষ্ণাজী চুপচাপ চললো নিরাজীর পেছন পেছন। নিরাজী শক্তি-সিংহের দিকে দৃকপাতও করলো না। মারাঠা শিবিরের দিকে চলে গেল কৃষ্ণাজীকে সঙ্গে নিয়ে।

ওরা দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে যাওয়ার পর শক্তিসিংহও চলে যাওয়ার উপক্রম করছিলো, এমন সময় হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে হাত রাখলো তার কাঁধের উপর। শক্তিসিংহ চমকে ফিরে তাকালো। তারপর সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন করলো সসম্ভ্রমে।

শিবাজী হেসে বললো, "আমি আসছিলাম তোমার কাছে, এমন সময় এদের দুজনকে দেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নিরাজীকে আমিই পাঠিয়েছিলাম মুনশীজী আর কৃষ্ণাজীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তোমার সঙ্গে আমার একলা দেখা করার জরুরী প্রয়োজন ছিলো।"

"আদেশ করুন মহারাজ।"

"কিন্তু তার আগে আমায় বলো, তুমি এরপর এখানে আসবে কি করে ? আমি মুনশীজীর সব কথা শুনতে পেয়েছি।"

"আপনার আদেশ হলে আমি যে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

"ঝুঁকি নেবে শুধু আমার জন্যে? আমার মায়ের জন্যে নয়?"

"আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না," বিষণ্ণ কণ্ঠে শক্তিসিংহ বললো।

"এ তো খুব সামান্য ব্যাপার। এর জন্যে এত দুর্ভাবনা করার কি আছে? তুমি এসো প্রত্যেকদিনকার মতো। কৃষ্ণাজীকে আমি সন্ধ্যের পর আমার মঞ্জিলে হাজির থাকবার হুকুম দেবো। মুনশীজীর পেছনে আমার খুফিয়ানবিস থাকবে। ও এ সময় মহারাজকুমারের কাছে কি অন্য কোথাও কাজে ব্যস্ত থাকে তো ভালোই, আর যদি এদিকে আসার উপক্রম করে, খুফিয়ানবিস নিরাজী রাওজীকে খবর দেবে, সে মুনশী গিরধরলালকে আটকে রাখবে কোনো না কোনো ছুতো করে।"

নিরাজী রাওজী! মারাঠা রাজ্যের ন্যায়াধীশ! এক অখ্যাত নায়ক এক সাধারণ নায়িকার সঙ্গে গোপনে মিলিত হবে বলে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রধান বিচারপতি আটকে রাখবে নায়িকার অভিভাবককে? শক্তিসিংহ প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, "আমার জন্যে আপনি এতখানি করবেন, আমি ভাবতে পারি না মহারাজ। আমি সামান্য ব্যক্তি, মহারাজের এতখানি করুণার যোগ্য নই।"

শিবাজী হাসলো। "তোমার জন্যে তো করছি না," উত্তর দিলো শিবাজী, "আমার নিজের স্বার্থে করছি। আমার প্রয়োজনে প্রত্যেকদিন এখানে এসময় কিছুক্ষণ তোমার হাজির থাকা দরকার, সেকথা ভুলে যাচ্ছো কেন?" একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, "তবে নিজের স্বার্থ না থাকলেও করতাম। আমার মায়ের জন্যে করতাম।"

"কিন্তু পান্না তো জানবে না। ও ভাববে আমি আর আসবো না," ঈষৎ ব্যাকুল হয়ে শক্তিসিংহ বললো।

"এই সামান্য খবরটুকুও কি আমি আমার মাকে জানাতে পারবো না?" শিবাজী হেসে বললো।

"মহারাজ," শক্তিসিংহ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "আমার মতো সামান্য লোকের সামান্য সুখের জন্যে আপনার মতো একজন সুমহান রাজা—"

তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে শিবাজী উত্তর দিলো, "আমি কাউকেই সামান্য মনে করি না শক্তিসিংহ। আমি রাজা বলেই আমাকে যে কোনো লোকের সামান্য ছোটো খাটো ব্যক্তিগত সুখকেও অসামান্য মূল্য দিতে হয়।"

শক্তিসিংহ চুপ করে রইলো দু এক মুহূর্ত। তারপর বললো, "মহারাজ, আপনি বলছিলেন আমার সঙ্গে আপনার জরুরী প্রয়োজন। আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় আছি।"

শিবাজী আনমনে উত্তর দিলো, "কিন্তু মুনশী গিরধরলালের কাছে তোমায় অপদস্থ করায় কৃষ্ণাজীর কি স্বার্থ আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

শক্তিসিংহ ব্যস্ত হয়ে বললো, "মহারাজ, আমার একটা অনুরোধ, আপনি ওকে কিছু বলবেন না।"

"আমি বলবো!" হঠাৎ গর্বোদ্ধত হয়ে উঠলো শিবাজীর কণ্ঠস্বর, "আমি রাজা, সে আমার ফৌজের একজন সৈনিক। ওসব তোমাদের সমস্যা, তোমরাই তার ফয়সলাহ্ করবে।—হ্যাঁ শোনো, জসবন্ত সিংহকে জানাবে, আওরংজেবের নির্দেশ মতো জমানৎনামায় দস্তখত্ করার আগে কুমার রামসিংহ আমার কাছে দুটো প্রতিশ্রুতি চেয়েছে। প্রথমত,—আমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো না, দ্বিতীয়ত—আমি কোনোরকম গণ্ডগোল করবো না। আমি এখনো কোনো কথা দিই নি। মহারাজা জসবন্ত সিংহ আমাকে যা পরামর্শ দেবেন, তাই করা হবে। তুমি আমাকে তাঁর নির্দেশ জানিয়ে যাও।"

"আমি এখনই যাচ্ছি," বললো শক্তিসিংহ।

"এখানেই ফিরে আসবে," শিবাজী বলে উঠলো, "ঠিক এক ঘড়ি পরে আমি এখানে তোমার অপেক্ষা করবো।"

শক্তিসিংহ চলে যাওয়ার পর নিরাজী রাওজী ফিরে এলো। বললো, "মহারাজ, শক্তিসিংহ ফিরে আসা পর্যন্ত কি এখানে অপেক্ষা করবেন?"

"না। এখন চলো এখান থেকে। এক ঘড়ি পরে আবার ফিরে আসবো।"

দুজনে মিশে গেল বাগিচার অন্ধকারে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ ততক্ষণে অস্তমিত হয়েছে।

শিবাজী হাঁটতে হাঁটতে বললো, "মহারাজা জসবন্ত সিংহ খুশী হবে পরামর্শ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে। লোকটা পরামর্শ দিতে খুব ভালোবাসে। আর কিছুই করতে পারে না। ওই বেওকুফ জানেনা যে, মহারাজকুমারকে সমস্ত রকম প্রতিশ্রুতি দেব বলে আমি মনস্থির করে ফেলেছি অনেক আগেই, কিন্তু আমি চাই যে জসবন্ত সিংহ মনে করুক, আমি ওর পরামর্শ মতোই কাজ করছি।"

দিওয়ান-ই-খাসের সন্ধ্যাবেলার দরবারের পর বাদশাহ ফিরে এলো নিজের খোয়াবগাহ্‌তে। কনিষ্ঠা পত্নী উদিপুরী মহল প্রতীক্ষা করছিলো সেখানে। ইদানীং উদিপুরীমহলের সঙ্গেই কাটে বাদশাহ্‌র অবসর সময়। অন্য দুজন পত্নী রহমত-উন-নিসা বেগম আর আওরঙ্গা-বাদী মহলের সঙ্গে বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই।

খোয়াবগাহ্‌তে প্রবেশ করেই আওরংজেব নাকের নিচে আতর মাখানো রুমালি নাড়তে লাগলো আস্তে আস্তে। আওরংজেব কোনো প্রসাধনদ্রব্য বড়ো একটা ব্যবহার করতো না, কিন্তু খোয়াবগাহ্‌তে আসার আগে খুশবুখানার দারোগা বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে আসতো কড়া আতর মাখানো রেশমী রুমালি। উদিপুরী অত্যন্ত সুরাসক্তা, বাদশাহ প্রায় সময় শরাবের মৃদু গন্ধ পেতো তার মুখ থেকে। কিন্তু কিছু বলতে পারতো না। উদিপুরীর স্বভাব অত্যন্ত উগ্র, নিজের যা খুশী তাই করবে, কারো কথা শুনবে

না। বাদশাহ্‌র মনেও একটা অসংযত দুর্বলতা ছিলো এই রূপসী যুবতীর জন্যে। জোর গলায় কিছু বলার সাহসও ছিলো না।

উদিপুরী বাদশাহ্‌র আগমন ঘোষণা শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। বাদশাহ ভিতরে প্রবেশ করতেই এগিয়ে এসে কুর্নিস করলো। আওরংজেবের মনে যতোই দুর্বলতা থাক, বাইরের গাম্ভীর্য বজায় রাখতো সব সময়। চোখে একটা কোমলতা ফুটে উঠলো, ভাবার্দ্র হয়ে উঠলো চোখের দৃষ্টি, কিন্তু গম্ভীর হাস্যবিহীন মুখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটি চারপাইর উপর বসলো। একজন খাদিমান পিঠের কাছে রাখলো নরম তাকিয়া। তারপর একপাশে সরে দাঁড়ালো আদেশের অপেক্ষায়।

"শাহ্-ইন-শাহ্‌র জন্যে দস্তরখান কি এখনই পাতবার হুকুম হবে?" উদিপুরী জিজ্ঞেস করলো।

"তোমার যেমন মর্জি," বললো আওরংজেব।

"এখানে এসে আপনাকে তসলিম করার হুকুম চেয়েছে গওহরআরা।"

আওরংজেব চোখ তুলে উদিপুরীর দিকে তাকালো। উদিপুরী তো মহল মাত্র, খুদ বেগমেরও বাদশাহ্‌র ভগ্নীদের নাম ধরে উল্লেখ করার অধিকার নেই। সেটা চরম বেআদবি। কিন্তু উদিপুরী গওহরআরাকে নাম ধরেই ডাকতো, নাম ধরেই উল্লেখ করতো। আওরংজেব একদিন মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলো, কিন্তু উদিপুরী হেসেই অস্থির। বলেছিলো—গওহরআরা আমার কতো বছরের পুরোনো বন্ধু, আজ ওকে বেগমসাহিবা বলে সম্বোধন করতে হবে? আওরংজেব কোনো উত্তর দেয়নি। পুরোনো দিনের বিস্তারিত বিবরণ উদিপুরী পছন্দ করে না, আওরংজেবের পক্ষেও সম্মানজনক নয়। সে সময় উদিপুরী ছিলো দারার হারেমের একজন পরসতার মাত্র। গওহরআরা তাকে স্নেহ করতো, তার প্রতি সদয় ব্যবহার করতো, তাকে মাঝে মাঝে নিজের মহলে এসে সাক্ষাৎ করবার

অনুমতি দিতো। তখন মহলের আদব অনুযায়ী বেগমসাহিবা বলেই সম্বোধন করতে হোতো উদিপুরীকে। নাম ধরে ডাকার সম্পর্ক অচিন্তনীয়। একথা মনে করিয়ে দিলে উদিপুরীকে তার আগের পরিস্থিতি মনে করিয়ে দিতে হয়। তাই বাদশাহ আর কিছু বললো না।

গওহরআরা ভালো মানুষ। প্রথম দিকে ক্ষুণ্ণ হলেও তারপর সয়ে নিয়েছিলো। উদিপুরী আগে যাই থাকুক, এখন বাদশাহ্‌র পত্নী। তার সঙ্গে মনোমালিন্য করে লাভ নেই। বরং সখ্যতা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

গওহরআরার অবস্থা খানিকটা বুঝতো আওরংজেব। বাদশাহ শাহজাহান জাহানআরা ও রোশনআরার ভরণপোষণের সুব্যবস্থা করে গিয়েছিলো। তাদের নিজস্ব বিস্তীর্ণ সম্পত্তি আছে, স্থায়ী বাৎসরিক আয় আছে, কিন্তু গওহরআরার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু করে যায় নি। সুতরাং তাকে নির্ভর করতে হোতো আওরংজেবের উপর, এবং স্বাভাবিকভাবেই তোয়াজ করতে হোতো বাদশাহ্‌র প্রিয়তমা পত্নীকে।

"গওহরআরা আসতে চায় এখানে।" বললো আওরংজেব, "বেশ তো, তাকে ইত্তলা দাও।" ইশারা পেয়ে খাদিমান চলে গেল।

গওহরআরা এলো, তসলিম করলো আওরংজেবকে। তারপর অনুমতি পেয়ে নিচে গালিচার উপর বসলো উদিপুরীর একপাশে। প্রারম্ভিক সৌজন্যালাপের পর গওহরআরা বললো, "আজ বিশেষ প্রয়োজনে আমরা দুজন আপনার সঙ্গে এই নিভৃত আলাপের সুযোগ কামনা করছিলাম।"

"বিশেষ প্রয়োজন!" আওরংজেব আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করলো। বেগমদের সামান্য খুঁটিনাটি প্রয়োজনও বিশেষ প্রয়োজন।

"শিবা মারাঠার প্রসঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই আপনাকে।"

নিশ্চয়ই উদিপুরীর শেখানো ভাষা। আওরংজেব চোখ তুলে উদিপুরীর দিকে তাকালো একবার। সে-ই শিবাজীকে শিবা মারাঠা বলে উল্লেখ করে। তারপর আবার চক্ষু মুদিত করে ক্লান্ত কণ্ঠে বললো, "এখানেও তার কথা? আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। সকাল থেকে সারাদিন দরবারে খিলওয়াতগাহ্‌তে তারই বিষয় আলোচনা হয়েছে।"

গওহরআরা উদিপুরীর দিকে তাকালো। উদিপুরী শুষ্ক কণ্ঠে বললো, "বেশ, তাহলে এ প্রসঙ্গ থাক। দরবারের মহামান্য উমরাহ মনসবদারেরা আজ সারাদিন এবিষয়ে আলোচনা করেছে, কালও করবে, পরশুও করবে। আমরা সামান্য বেগম। আমাদের কী অধিকার আছে হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌কে বিরক্ত করার। আমারও মাথা ধরেছে। শাহ্‌-ইন-শাহ্‌র অনুমতি পেলে আমি আমার মহলে ফিরে যেতে পারি।" সে উঠে পড়বার উপক্রম করলো।

এতক্ষণে আওরংজেবের গাম্ভীর্যের মুখোস খুলে পড়বার উপক্রম হোলো। ব্যস্ত হয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে বললো, "না, না, আমি তো তোমাদের কথা শুনবো না বলিনি। বলো কি বলছিলে?"

উদিপুরী বললো, "শিবাজীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে আপনি ভুল করেছেন।"

আওরংজেবের মুখ লাল হোলো। বাদশাহ্‌ করেছেন ভুল! তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে উদিপুরীর এরকম ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু এই একটি নারীর কাছে আওরংজেব বড়ো দুর্বল। মৃদুকণ্ঠে বললো, "আমি যা করি অনেক বিবেচনা করেই করি।"

"মহলে জোর গুজব," গওহরআরা বললো, "রামসিংহ নাকি শিবাজীকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে।"

"মহলে এরকম গুজব রটে যাওয়ার কারণ?" আওরংজেব বিরক্তি ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"খোজারা শুনেছে রাঠোরদের কাছে," গওহরআরা উত্তর দিলো।

উদিপুরী বললো, "এজন্যে আজ মধ্যাহ্নে যখন শুনলাম, আপনি শিবা মারাঠাকে কিলার ভিতর নিয়ে আসবার হুকুম দিয়েছেন, তখন খুশী হয়েছিলাম।"

"শিবাজী প্রকাশ্য দরবারে আপনার অসম্মান করেছিলো। তার এরকম শাস্তি হওয়া উচিত", বলে উঠলো গওহরআরা।

"আমি এটাকে আমার ব্যক্তিগত অপমান মনে করেছি," বললো উদিপুরী, "শাহ-ইন-শাহ্‌র অপমান আমারই অপমান,—আমাদের খানদানের প্রত্যেক বেগমেরই অপমান, যদিও অবশ্যি সব বেগম এভাবে ব্যাপারটাকে দেখেন না।"

"তাই নাকি?" আওরংজেব নিস্পৃহকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি জানেন না," বললো গওহরআরা, "তাই ব্যাপারটাকে অতো গুরুত্ব দিচ্ছেন না।"

"আমি জানি না এমন কোনো খবর আছে নাকি?" বলে আওরংজেব তাকালো উদিপুরীর দিকে।

উদিপুরী উত্তর দিলো, "শুনতে পেলাম কুমার রামসিংহ মহম্মদ আমিন খাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছে, তেজসিংহ গিয়েছিলো ফুলাদ খাঁর কাছে। মহম্মদ আমিন খাঁ তারপরে হাজির হয়েছিলো খিলওয়াতগাহ্‌তে। এখন শুনছি আপনি নাকি আপনার হুকুম পুনর্বিবেচনা করতে রাজী হয়েছেন।"

"আপনার হুকুম ছিলো ফুলাদ খাঁর জন্যে," গওহরআরা বললো, "খুব গোপনীয় হুকুম। কিন্তু তারপরেই কছওয়ারা এত তৎপর হয়ে উঠেছিলো কেন? খবরটা নিশ্চয়ই পৌঁছে গিয়েছিলো তাদের কাছে।"

"এখন আমার প্রশ্ন এই,—ওরা আপনার গোপনীয় হুকুমের খবর পেলো কি করে," বলে উদিপুরী ঝুঁকে পড়লো আওরংজেবের দিকে।

আওরংজেব নাকের নিচে নাড়তে শুরু করলো আতর মাখানো রুমালি।

"বলুন, ওরা খবর পেলো কি করে?" উদিপুরী আবার জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছে," আওরংজেব বললো, "কাল দুতিনজন খুফিয়ানবিসকে এর অনুসন্ধান করার জন্যে নিয়োজিত করবো স্থির করেছি।"

"ওরা জানতে পারবে না," বললো গওহরআরা, "জানলেও আপনাকে বলতে সাহস করবে না।"

"কেন?"

"ওরা যখন জানতে পারবে যে কছওয়া শিবিরে খবর নিয়ে গেছে খোজা ইয়ার লতিফ, তখন আপনাকে কোন সাহসে জানাবে বলুন?"

"খোজা ইয়ার লতিফ?"

"হ্যাঁ, রোশনআরা বেগম সাহিবা আর রহমত-উন-নিসা বেগম সাহিবার অতি বিশ্বস্ত অনুচর, খোজা ইয়ার লতিফ।"

"সে গিয়েছিলো খোজা ফিরোজার বাগে?"

"হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে দেখা করেছিলো খুদ কুমার রামসিংহের সঙ্গে।"

"তোমরা কি করে জানলে?"

"আমার দুতিনজন খোজা সব সময় নজর রাখে বেগম সাহিবাদের অনুচরদের উপর," উদিপুরী উত্তর দিলো।

আওরংজেব আবার বিরক্ত হোলো। বলে উঠলো, "মহলের ভিতর এসব কেন? আমি পছন্দ করিনা। একি কথা? এক বেগমের খোজা নজর রাখবে আরেক বেগমের খোজার উপর? তার মানে এই যে, বেগমেরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। এতো ঠিক নয়। আমি বাদশাহ, আমার খাসমহলে এরকম আবহাওয়া গড়ে উঠবে কেন?"

“যাক, আজ আপনি আমাকে বেগম বলে সম্মান করলেন,” উত্তর দিলো উদিপুরী, “হয়তো আপনি ভুলে গেছেন আমি বেগমের মর্যাদা এখনো পাইনি। এখনো আমি এক সাধারণ ‘মহল’ মাত্র।”

“তুমি যাই হও, তুমি আমার পত্নী। আমার আরেক পত্নীর উপর এরকম খুফিয়ানবিসী চলবে, এটা আমি পছন্দ করি না।”

“আপনার আরেক পত্নী, আর কেউ নয়, খুদ মালিকা আলম রহমত-উন-নিসা বেগম, আপনার শত্রুকে আপনার বিরুদ্ধে সহায়তা করবে, এটা আপনি পছন্দ করেন?”

আওরংজেব কোনো উত্তর দিলো না। তার মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে গেল।

“আমার গুস্তাকী মাফ করবেন”, বললো উদিপুরী, “খুদ মালিকা আলমের নামে অভিযোগ করা আমার উচিত হয়নি।”

“শুধু নবাববাঈকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না,” গওহরআরা বলে উঠলো, “রোশনআরা বেগম সাহিবাও তাঁর সঙ্গে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমার ধারণা সব তাঁর পরামর্শেই হয়। কিন্তু রোশনআরা বেগম সাহিবা আপনার প্রিয়তমা ভগ্নী। তাই আমাদের কিছু বলতে সাহস হয় না।”

আওরংজেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর একজন খোজা খাদিমকে ভিতরে ডেকে বললো, “মহলদারকে গিয়ে জানাও, রহমত-উন-নিসা বেগম সাহিবা আর রোশনআরা বেগম সাহিবাকে গিয়ে বলবে, ওঁরা যদি অনুগ্রহ করে এখানে তশরিফ নিয়ে আসেন তাহলে আমি খুব খুশী হবো।” খাদিম চলে গেল হুকুম পেয়ে।

গওহরআরা বলে উঠলো, “না, না, আমাদের সামনে নয়।”

“তোমার ভয় কি গওহরআরা,” উদিপুরী বলে উঠলো, “আমরা কার পরোয়া করি? শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে বেইমানি তো আমরা করিনি।”

আওরংজেব মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো। এসব ঝঞ্ঝাট তার ভালো লাগে না। এক পত্নীর বিপক্ষে অন্য পত্নী, এক ভগ্নীর বিপক্ষে অন্য ভগ্নী, রংমহলের এসব জটিলতা কি শেষ হবে না কোনোদিন?

কিছুক্ষণ পরে রহমত-উন-নিসা বেগম আর রোশনআরা বেগমের আগমন ঘোষণা শোনা গেল খোজা নকীবের মুখে। সগর্ব পদক্ষেপে তুজনে খোয়াবগাহতে প্রবেশ করলো। রহমত-উন-নিসা মালিকা আলম, সুতরাং গওহরআরা সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু উদিপুরী দাঁড়ালো না। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো আওরংজেব ও রোশনআরা। তখন আওরংজেব নিজেই উঠে দাঁড়ালো। কারও উপস্থিতিতে বাদশাহ্‌র উঠে দাঁড়ানোর কথা নয়, কিন্তু রোশনআরা আওরংজেবের বয়োজ্যেষ্ঠা, তাকে এ সম্মান দেখানো, তাই উঠে দাঁড়ালো।

উদিপুরী অধর দংশন করলো। বাদশাহ দণ্ডায়মান হলে আর কারো বসে থাকবার উপায় নেই। তাকেও দাঁড়াতে হোলো।

আওরংজেব খুব সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগত করলো বয়োজ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও প্রধানা বেগমকে। সবাই উপবেশন করলো। রোশনআরা উদিপুরী আর গওহরআরার দিকে তাকালো। গওহরআরার মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে। রোশনআরা মনে মনে হাসলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কোন শুভ উপলক্ষে আমরা এখানে আমন্ত্রিত হওয়ার সম্মান পেলাম আওরংজেব?"

আরওংজেব হাসিমুখে উত্তর দিলো, "এখানে আমাদের সবার জন্যে দস্তরখান পাতা হবে।"

"আমাদের অসীম সৌভাগ্য।"

"তার আগে আমি একটা গুরুতর বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ চাই," আওরংজেব বললো।

"তুমি বাদশাহ।" উত্তর দিলো রোশনআরা, "আমরা তোমার খিদমতে সর্বদাই হাজির আছি।"

"বিষয়টা কি, আলমপনাহ," জিজ্ঞেস করলো রহমত-উন-নিসা। সে মনে মনে খুশী হয়েছে। আওরংজেব তার খোঁজ খবর বড় একটা নেয়না আজকাল। আজ হঠাৎ পরামর্শের জন্যে তাকে ইত্তলা দেওয়া হয়েছে বলে সে গর্ব অনুভব করলো। সে হিন্দুস্তানের মালিকা আলম, এ সম্মান তার মাঝে মাঝে পাওয়া উচিত।

"আমার এক বিশ্বস্ত খুফিয়ানবিস আমায় সংবাদ দিয়েছিলো," আওরংজেব নিমীলিত নেত্রে বললো, "শিবা ভোঁসলে কুমার রাম সিংহের সহায়তায় আগ্রা থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।"

রোশনআরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আওরংজেবের দিকে তাকালো।

শিবাজী আগ্রার উত্তেজনাময় প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে বাদশাহ্ তাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন দেখে রহমত-উন-নিসা বেগম খুব উৎফুল্ল হোলো। বললো, "শিবাজী অত্যন্ত চতুর। সে নিশ্চয়ই জানে এরকম পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব। সে এরকম পরিকল্পনা বিবেচনা করেছে নিশ্চয়ই এ মতলবে যে, আপনি হয়তো খবরটা জেনে যাবেন, এবং তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, তাকে অবহেলা করবেন না। একটু বেশী খাতির পাওয়ার জন্যে সে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। হয়তো তারই লোক খবরটা জানিয়েছে আপনার খুফিয়ানবিসকে।"

"নবাববাঈ, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী," আওরংজেব বললো রহমত-উন-নিসা বেগমকে, "ঠিক ধরেছো। আমিও সেই অনুমানই করেছিলাম।"

উদিপুরী মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপলো। রোশনআরার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল।

আওরংজেব বলে গেল, "শিবার মতলব ঠিক হাসিল হয়েছে। সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। তাই তাকে আমি কিলার ভেতরে রদ-অন্দাজ খাঁর মহলে আরো আরামের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম।"

এবার উদিপুরী আর গওহরআরা দুজনেই একটু হাসলো।

"আমি সেই হুকুম দিলাম সিদ্দি ফুলাদ খাঁকে," বললো আওরংজেব, "আমি ঠিক জানতাম শিবা খবর পাবে। আমি চেয়েছিলাম যে, শিবা রামসিংহের মারফত আমার কাছে আরজ পেশ করুক এই হুকুম খারিজ হওয়ার জন্যে। তাহলে আমি ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিতে পারবো যে, শিবাজী বিনা হুকুমে আগ্রা ত্যাগ করবে না। যে উদ্দেশ্য শিবাজীর সত্যি সত্যি নেই সে ব্যাপারে কথা দিতে ওর আপত্তি হবে না। শিবাজীরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আমারও মান বাঁচবে।"

"হ্যাঁ, তাইতো হয়েছে শেষ পর্যন্ত," বলে উঠলো রহমত-উন-নিসা।

রোশনআরা অধর দংশন করলো, ভাবলো,—এই বেওকুফ নবাববাঈয়ের বুদ্ধিসুদ্ধি কি কোনোদিন হবে না?

আওরংজেব হঠাৎ চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলো। শান্ত শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি করে জানো?"

গওহরআরা চমৎকৃত হয়ে তাকালো আওরংজেবের দিকে। উদিপুরীর মন আনন্দে নেচে উঠলো। রহমত-উন-নিসা এতক্ষণে বুঝলো সে কথার জালে জড়িয়ে পড়েছে।

তাকে নীরব দেখে আওরংজেব আবার জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি করে জানো?"

রোশনআরা প্রমাদ গুনলো। কিন্তু সে আওরংজেবেরই সহোদরা, তারই মতো শান্ত শীতল কণ্ঠে উত্তর দিলো, "নবাববাঈ আমার কাছে শুনেছে।"

"তুমিই বা কি করে জানো?" তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো আওরংজেব।

"আমার লোক সারাদিন খবর নিয়েছে।

"কেন?"

"আমিই কুমার রামসিংহের কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং তার ফলাফল জানবার জন্যে আমার খুব আগ্রহ ছিলো।"

"তুমি খবর পাঠিয়েছিলে?" খুব সহজ কণ্ঠে আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু এক নিমেষের জন্যে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

"হ্যাঁ," নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো রোশনআরা।

"কেন?"

"বিশিষ্ট মেহমান সম্বন্ধে ওরকম একটা হুকুম জারি করার পেছনে তোমার কি উদ্দেশ্য ছিলো আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তারপরই একটা খবর আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি পাওনি, অথচ তোমাকে জানানোর ফুরসত হোলো না,—দরবারের কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, তোমার হুকুমের সুযোগ নিয়ে, শিবাজী খবর পাওয়ার আগেই, ফৌজ নিয়ে খোজা ফিরোজার বাগে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা করছিলো। এর ফলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হোতো, কছ্‌ওয়ারা অস্ত্রধারণ করতো, মির্জা রাজা জয়সিংহের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য হোতো, লোকচক্ষে তুমি হেয় হতে, এবং তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোতো। তাই তোমার খুফিয়ানবিস অন্য লোকের মারফত যে খবর কুমার সাহাবকে দেরি করে দিতো, সে খবর আমি আমার লোকের মারফত পাঠিয়ে দিলাম। তোমার মান বাঁচলো।"

আওরংজেব আবার চক্ষু মুদিত করলো। অস্ফুটকণ্ঠে বললো, "হ্যাঁ, ভালোই করেছো, আমার খুবই খুশ কিসমতি যে আমি তোমার সহযোগিতা পেলাম।" নিজের কথার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে, আর কিছু বলা যাবে না রোশনআরাকে।

গওহরআরার মুখ ম্লান হয়ে গেল। উদিপুরী গম্ভীর হয়ে অধর দংশন করলো। রোশনআরা ওদের দিকে তাকিয়ে গর্বোদ্ধত চাপা হাসি হাসলো।

রহমত-উন-নিসা বেগম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলো "কিন্তু আমাদের পরামর্শ আপনি চাইছিলেন কোন ব্যাপারে?"

এবার মনে মনে হাসলো রোশনআরা। দিক আওরংজেব এ প্রশ্নের উত্তর।

আওরংজেব চোখ খুললো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমি যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। রামসিংহ মুকল্‌চাহ্ সই করতে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখন আরেকটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।"

"কি সমস্যা, আলমপনাহ," জিজ্ঞেস করলো রহমত-উন-নিসা।

"আমি শিবাকে আর বেশীদিন আগ্রায় রাখতে চাই না," বললো আওরংজেব, "কিন্তু ওকে যদি এখন ওর এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিই, লোকে বলবে ওর জিদের কাছে আমি নতি স্বীকার করেছি। এখন আমার কি করা উচিত? দরবারের উমরাহদের পরামর্শ নিতে চাই না। তাহলে কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। তোমরা আমার প্রিয়জন। তোমরাই বলো। মালিকা আলম, তোমার মর্যাদা সবার উপরে, আগে তুমি অভিমত দাও।"

রহমত-উন-নিসা খুব খুশী। আড়চোখে তাকালো উদিপুরীর দিকে। তারপর বললো, "শিবাজীকে মনসব ও জায়গীর দিয়ে বিজাপুর অভিযাত্রী ফৌজের মির-বকশি করে দেওয়া হোক। সে আমাদের হয়ে বিজাপুর দখল করবে।"

"ছোটী বেগম সাহিবা?" আওরংজেব তাকালো রোশনআরার দিকে।

"শিবা ভোঁসলেকে কাবুল পাঠিয়ে দেওয়া হোক কুমার রামসিংহের সঙ্গে," রোশনআরা অভিমত দিলো।

"গওহরআরা?"

"কুমার রামসিংহের সঙ্গে আবার কেন?" গওহরআরা বলে উঠলো, "তাকে পাঠানো উচিত কোনো মোগল মনসবদারের সঙ্গে।"

"উদিপুরী মহল?"

উদিপুরী শানিত কণ্ঠে বললো, "এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিমত নেই। তবে আমি একথা জানতে চাই রোশনআরা কুমার রামসিংহের নাম সুপারিশ করলো কেন?"

"রোশনআরা?" গর্জে উঠলো আওরংজেবের ভগ্নী, "হিন্দুস্তানের শাহ্-ইন-শাহ বাদশাহ আমার ছোটো ভাই, সেও আমার নাম ধরে সম্বোধন করতে সাহস করে না। আর তুমি এক সামান্য নারী, তোমার এত স্পর্ধা? বাদশাহ্র সামনে না হলে আজ আমি পাঁচ পয়জার লাগাতাম তোমার মুখে—"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো উদিপুরী, "কী! তোমার এত সাহস? আমি শাহ্-ইন-শাহ বাদশাহ্র পত্নী, আমার সঙ্গে তুমি এভাবে কথা বলতে সাহস করো?"

"হ্যাঁ, সেই হিম্মত আমার আছে। আমি আলা-হজরত ফিরদৌস আশয়ানি শাহ্-ইন-শাহ বাদশাহ্ শাহজাহানের কন্যা। তুমি কার কন্যা, আগে সেই পরিচয় দাও, তারপর আমার নাম ধরে সম্বোধন করতে এসো।"

আওরংজেব চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে বসে রইলো। উদিপুরী মহল মুখে রুমালি চাপা দিয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। স্তব্ধ হয়ে রইলো রহমত-উন-নিসা বেগম আর গওহরআরা।

রোশনআরা বাদশাহ্র অনুমতি নেওয়ার আদব অবহেলা করে উদ্ধত পদক্ষেপে খোয়াবগাহ্ থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

রোশনআরা নিজের মহলে ফিরে গেল না, জাহানআরার মহল দেওয়া হয়েছিলো জেব-উন-নিসাকে, সোজা সেখানে চলে গেল। জেব-উন-নিসা তখন ফতিল-সোজ্-এর সামনে বসে আকিল খাঁ রাজির দিওয়ান পাঠ করছিলো, বিনা সংবাদে বিনা ঘোষণায় হঠাৎ রোশনআরাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত হয়ে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো।

রোশনআরা কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললো, "শাহ্-ইন-শাহ হয়তো শিবাজীকে কাবুলে পাঠাবেন। শিবাজীর একথা জানা দরকার, সে যেন কুমার রামসিংহ ছাড়া আর কারো সঙ্গে কাবুলে যেতে রাজী না হয়।"

একথা বলে কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই রোশনআরা চলে যাচ্ছিলো, কি মনে করে আবার ফিরে দাঁড়ালো। বললো, "কে কাকে কি ভাবে খবর পাঠাচ্ছে একথা কেউ যেন জানতে না পারে, এমন কি আমিও যেন জানতে না পারি। সব কথা শাহ-ইন-শাহ্র কানে যায়। উদিপুরী আর গওহরআরা জানতে পেরেছে যে আজ আমি খোজা ইয়ার লতিফকে পাঠিয়েছিলাম কুমার রামসিংহের শিবিরে। আর——," একটু থামলো রোশনআরা, তারপর চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে খুব নিচু গলায় বললো, "আর মহলের কেউ যে খোজা মহম্মদ উসমান ও খোজা মির হাসানকে পাঠিয়েছিলো খোজা ফিরোজার বাগে, সেকথা আমিও জানতে পেরেছি। এতখানি অসতর্কতার পুনরাবৃত্তি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

রোশনআরা চলে যাচ্ছিলো, জেব-উন-নিসা পেছন থেকে ডাকলো, "ছোটী ফুফীজান——।"

"কি ?"

"একটা বড়ো ভাবনায় পড়েছি।"

"কেন ?"

"জিনত-উন-নিসার জন্যে।"

"ওর আবার কি হোলো ?"

"মধ্যাহ্নকাল থেকেই খুব বিমর্ষ হয়ে আছে।"

"কেন ?"

"শাহ্-ইন-শাহ শিবাজীর সম্বন্ধে খুব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এই আশঙ্কায় ওর মনে খুব ভাবনা ধরে গেছে।"

রোশনআরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো জেব-উন-নিসার দিকে।

তারপর বললো, "শিবাজীর জন্যে ভাবনা হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা আছি। অন্যের পরামর্শ শুনে শাহ্-ইন-শাহ যে কোনো ভুল করবেন, এটা আমরা হতে দেবো না।"

"কিন্তু জিনত-উন-নিসার মনে ভাবনা হবে কেন? সে বিমর্ষ হবে কেন?"

"এ জন্যেই তোমার ভাবনা?" রোশনআরা হাসলো। তার স্বাভাবিক উদ্ধত কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। বললো, "জেব-উন-নিসা, একটা কথা তোমার ছোটো বোনটিকে বুঝিয়ে বোলো। আমরা শাহজাদী হওয়ার দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, সারাজীবন কাটবে খাসমহলের মধ্যে। বাইরের আলো হাওয়া কিলার দেওয়াল পেরিয়ে এসে খাসমহলে ঢুকবে, এ-রকম কোনো সম্ভাবনা নেই। এরই মধ্যে দম আটকে যাবে, তবু বেঁচে থাকতে হবে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, এরকম মাঝে মাঝে হবে। আমাদেরও হোতো, তোমাদেরও না হওয়ায় কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই বিমর্ষতা প্রত্যেকবার কাটিয়ে ওঠার অভ্যেস করতে হবে এখন থেকেই। তা নইলে মিছিমিছি বার বার কষ্ট পাবে সারাজীবন।"

তারপর দিন পনেরোই মে, বুধবার।

প্রত্যুষেই শিবাজী উপস্থিত হোলো কুমার রামসিংহের দিওয়ান-খানায়। ন্যায়াধীশ নিরাজী রাওজী সঙ্গে এলো, তার হাতে একটি সোনার থালা, থালার উপর শিবলিঙ্গ, ফুল আর বেলপাতা। নিরাজীর পেছন পেছন এলো শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী। তার হাতে গঙ্গাজলের পাত্র।

রামসিংহ বুঝতে পারলো শিবাজী কেন এসেছে। তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে সাদর অভ্যর্থনা জানালো শিবাজীকে।

শিবাজী কোনো উত্তর দিলো না, কোনো অভিবাদন জানালো

না। নিরাজী রাওজী বললো, "উনি সকাল থেকে জলস্পর্শ করেন নি, মৌনাবলম্বন করে আছেন। শিবপূজো সমাপ্ত হওয়ার আগে কারো সঙ্গে কথা বলবেন না।"

রামসিংহের সমক্ষে পরম ভক্তিভরে ফুল বেলপাতা দিয়ে শিব-পূজো করলো শিবাজী। সহায়তা করতে লাগলো নিরাজী রাওজী। রামসিংহ, তেজসিংহ, আর শম্ভুজী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে।

শিবপূজো শেষ হোলো। শিবাজী তুলে নিলো গঙ্গাজলের পাত্র। শিবলিঙ্গের মাথায় গঙ্গাজল ঢালতে ঢালতে চোখ না তুলেই কুমার রামসিংহকে সম্বোধন করলো।

"কুমারজী, ভগবানকে সাক্ষী করে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, আমি যতোদিন আপনার অতিথি হয়ে আছি, ততোদিন আগ্রা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করবো না। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমি বা আমার সহচর কোনো মারাঠা কারো সঙ্গে এমন কোনো ব্যবহার করবো না বা এখানে আগ্রা শহরে এমন কোনো কাজ করবো না যাতে আপনাকে অপদস্থ হতে হয় অথবা শহরে কোনো রকম শান্তির বিঘ্ন হয়। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

শিবের মাথায় জল ঢালা শেষ হোলো। শিবাজী উঠে দাঁড়ালো। রামসিংহ এগিয়ে এসে ভাবাবেগে আলিঙ্গন করলো শিবাজীকে। বললো, "আপনার কথায় আমার মনের উপর থেকে মস্তো বড়ো একটা দুর্ভাবনার বোঝা কেটে গেল। কাল সারারাত আমার ভালো ঘুম হয়নি।"

"কুমারজী, দুর্ভাবনা আমারও হয়েছিলো। কিন্তু এখন আর কোনো ভাবনা করি না। আমি আপনার আশ্রিত। আমার জীবনমরণ আপনার হাতে। আপনার যা অভিরুচি তাই হবে

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে রামসিংহ বলে উঠলো, "ভাইজী, আপনি আমার অতিথি। আমার পিতা
আপনার কোনো বিপদ হবে না, আপনার কোনো অসম্মান হবে না। ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমিও আপনাকে কথা দিচ্ছি, যতোক্ষণ আমি কি আমার ফৌজের একজন কছওয়াও বেঁচে আছে, কেউ আপনার অঙ্গস্পর্শ করতে পারবে না। আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আপনাকে রক্ষা করবো।"

"আপনি এবার আওরংজেবের প্রার্থিত মুকল্‌চাহ্‌তে দস্তখত করে দিতে পারেন।"

মুনশী গিরধরলালের ডাক পড়লো। মুনশী গিরধরলাল এসে জামানতনামার মুসাবিদা করে দিলো। শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে কুমার রামসিংহ স্বাক্ষর করলো সেই জামানতনামায়।

"আর বিলম্ব করবেন না," নিরাজী রাওজী বললো, "আপনি এবেলাই দরবারে গিয়ে বাদশাহর কাছে এই মুকল্‌চাহ্‌ পৌঁছে দিন।"

রামসিংহের হয়ে উত্তর দিলো তেজসিংহ। "এবেলা তো দেওয়া যাবে না। আজ বুধবার। আম দরবার আজ হয় না। খাস দরবারেও আজ হয় শুধু বিচার বিভাগের কাজ। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কারো সেখানে হাজির হওয়ার হুকুম নেই। দিওয়ান-ই-খাসএ সন্ধ্যার দরবারেই এই মুকল্‌চাহ্‌ শাহ্‌-ইন-শাহ্‌র কাছে পেশ করা যাবে।"

"কিন্তু ফুলাদ খাঁ অপেক্ষা করতে স্বীকার করেছে শুধু আজ সকাল পর্যন্ত। তারপর যে কোনো মুহূর্তে সে পিয়াদা নিয়ে আসতে পারে।"

"আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন," তেজসিংহ বললো, "সে আর আসবে না মুকল্‌চাহ্‌ দস্তখত করে দেওয়ার হুকুমের বিষয় সে নিশ্চয়ই শুনেছে। যদি আসেওবা, আমরা তাকে দরওয়াজা থেকেই

ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো," বলে তেজসিংহ ডান হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে টাকা বাজানোর ভঙ্গি করলো।

সন্ধ্যাবেলা সোনালী ঝাড়-ফানুস আর কর্পূরনির্যাসযুক্ত শামা ও মশালের আলোয় ঝলমল দিওয়ান-ই-খাসে হাজির হোলো কুমার রামসিংহ। মহম্মদ আমিন খাঁ অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে। মুখে কোনো কথা না বলে চুপচাপ তার হাতে তুলে দিলো সেই জমানৎ নামা। শাহ্-ইন-শাহ হুকুম দিয়েছে মহম্মদ আমিন খাঁকে, রামসিংহকে নয়। সুতরাং এই উপলক্ষ নিয়ে সরাসরি শাহ্-ইন-শাহ্‌র কাছে হাজির হওয়ার অধিকার রামসিংহের নেই, আছে মহম্মদ আমিন খাঁর। কুমার রামসিংহ দাঁড়িয়ে রইলো দরবারে নিজের যথানির্ধারিত স্থানে। মহম্মদ আমিন খাঁ বাদশাহ্‌র সামনে হাজির হয়ে কুর্নিস করলো।

"জাহাঁপনাহ্, কুমার রামসিংহ কছওয়ার দস্তখতকরা মুকল্‌চাহ্ আপনার কাছে পেশ করার হুকুম হোক।"

উজীর জাফর খাঁ হাত বাড়িয়ে জমানৎনামা নিলো মহম্মদ আমিন খাঁর হাত থেকে। তারপর এগিয়ে দিলো আওরংজেবের দিকে। আওরংজেব জমানৎনামা খুলে পড়লো ছ'তিনবার, তারপর বললো, "কুমারকে আমার সামনে হাজির করা হোক।"

রামসিংহ এগিয়ে এসে দাঁড়ালো বাদশাহ্‌র তখ্‌ত্‌এর সামনে, তারপর সসম্ভ্রমে কুর্নিস করলো।

আওরংজেব উজীরের দিকে তাকিয়ে বললো, "কুমারকে এই হুকুম জানানো হোক,—শিবাকে নিয়ে চলে যাও কাবুল। শিবাকে আমি কুমারের অধীনে নিযুক্ত করলাম। রওয়ানা হওয়ার জন্যে একটা শুভদিন নির্ধারিত করা হোক।"

রামসিংহ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি এ হুকুম পাওয়া যাবে। বাদশাহ্‌কে তসলিম করে বলে

উঠলো, "জাহাঁপনাহ্, এই মুহূর্তই সব চেয়ে শুভ মুহূর্ত। আমাকে রুখ্সত্ দেওয়া হোক, আমি এখনই রওনা হচ্ছি।"

আওরংজেব রুখ্সত্, অর্থাৎ বিদায় গ্রহণ করার রেওয়াজ মাফিক হুকুম দিলো রামসিংহকে, কিন্তু বললো, "ছয় সাত দিন পরে একটি শুভ দিনে শুভ লগ্ন নির্ধারিত করে তখন রওনা হলেই হবে। ইতিমধ্যে তোমার সামান, বানজারা সব প্রস্তুত রাখো। পরওয়ানা পাঠিয়ে দাও রসদের জন্যে, ফৌজকে সুসজ্জিত করো, কামান, বন্দুক, গোলা বারুদ ও অন্যান্য হাতিয়ার সংগ্রহ করো। শিবাও কয়েকদিন বিশ্রাম করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক। তুমি তোমার উর্দুতে এখনই ফিরে যাও, শিবাকে জানাও আমার অসীম মেহের-বানির কথা।"

কুমার রামসিংহ বেরিয়ে এলো দরবার থেকে। পদব্রজে দিল্লী-দরওয়াজার কাছে এসে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করলো। কেল্লার বাইরে এসে দেখা হয়ে গেল কিলাদার রদ অন্দাজ খাঁর সঙ্গে। সেও অশ্ব পৃষ্ঠে আসছে উল্টোদিক থেকে। রামসিংহের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে থেমে গেল।

রামসিংহ অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি আজ দরবারে এলেন না।"

"আজ আমাকে দরবারে হাজির হওয়া থেকে মাফ করা হয়েছে। যাত্রার আয়োজন করতে হবে। তাই ছুটি দেওয়া হয়েছে আমাকে।"

"যাত্রার আয়োজন? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"কেন, আপনি জানেন না?" রদ অন্দাজ খাঁ যেন একটু বিস্মিত হোলো, "আপনি নিশ্চয়ই কাবুল যাওয়ার হুকুম পেয়েছেন?"

"হাঁ, কিন্তু আপনি—"

"হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। আপনার ফৌজের সম্মুখ ভাগ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। আজ অপরাহ্ণে খিলওয়াতগাহ্তে দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয়েছে এই ব্যবস্থা।"

রদ অন্দাজ খাঁ কেল্লার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কুমার রামসিংহ অনুচরদের সঙ্গে ফিরে চললো খোজা ফিরোজার বাগে।

ষোলই মে। বৃহস্পতিবার।

রামসিংহ সকাল বেলা দরবারে যাওয়ার আগে শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। শুনলো শিবাজী পূজোয় বসেছেন। উঠতে দেরি হবে। রামসিংহ দেখা না পেয়ে দরবারে চলে গেল।

আম-দরবার, খাস-দরবার অনুষ্ঠিত হোলো নিত্য নৈমিত্তিক একঘেয়ে কর্মসূচি অনুযায়ী। রামসিংহের হাজিরা দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলো না। সুতরাং বাদশাহ্‌র সঙ্গে কোনো কথাও হোলো না। লক্ষ্য করলো যে দরবারের আবহাওয়া একটু অন্যরকম, সবাই বেশী রকম গম্ভীর। মহারাজা জসবন্ত সিংহ, উজীর জাফর খাঁ, দারোগা-ই-দিওয়ান-ই-খাস আকিল খাঁ কেউ লক্ষ্য করলো না কুমার রামসিংহকে। একটু যেন এড়িয়েই চললো তাকে। অন্যান্য যারা সামনাসামনি পড়ে কেতা মাফিক অভিবাদন জানালো, তারাও যেন স্বাভাবিক পরিমার্জিত সৌজন্য ছাড়া কোনো রকম আলাপ আলোচনা করায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলো না। রামসিংহ খুব অসোয়াস্তি বোধ করলো। মনে হোলো কিছু একটা যেন ষড়যন্ত্র হচ্ছে,—কিন্তু আঁচ করতে পারলো না বিন্দুমাত্রও। কাবুল যাওয়ার হুকুম পেয়ে কাল যেরকম হাল্কা বোধ করেছিলো, আজ আর সেরকম মনোভাব রইলো না। একটা অজানা আশঙ্কায় মন ভরে গেল।

নিজের মঞ্জিলে ফেরার পথে আরেকবার শিবাজীর খোঁজ করলো। তখনও দেখা হলো না। শিবাজী গাত্রসংবাহন করাচ্ছে। তৈরী হয়ে বেরোতে অনেক দেরি হবে।

দত্ত ত্রিম্বকের প্রয়োজন ছিলো শিবাজীর সঙ্গে। দরজা ফাঁক

করে একটু দেখলো। সেই মুসলমান দবানেওয়ালা এখনো শিবাজীর গাত্রসংবাহন করছে। সে একটু বিরক্তি বোধ করে দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো, ভাবলো, এতক্ষণ গাত্রসংবাহন চলছে? লোকটাকে দেখে মনে হোলো অত্যন্ত আনাড়ি।

কিছুক্ষণ আগে তাদের শিবিরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলো এই দবানেওয়ালা। দ্বাররক্ষীর কাছে অতি ঝকমকে ভাষায় বিবৃত করলো তার অঙ্গ সংবাহনের কুশলতা ও দক্ষতা, দিল্লী আগ্রার কোন কোন খ্যাতিমান উমরাহ্‌র অঙ্গ সংবাহন করেছে তার ফর্দ দিলো। মহারাজা জয়সিংহ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ, উজীর জাফর খাঁ, মহম্মদ আমিন খাঁ, বাহাদুর খাঁ, আরো কতো কে। কি চায় সে, জিজ্ঞেস করলো দ্বাররক্ষী। সে জানালো, সে শুনেছে শিবাজী মহারাজা অঙ্গ সংবাহন করতে ভালোবাসেন। তাই কিছু অর্থ প্রাপ্তির আশায় এসেছে। আকিল খাঁর পরিচয়পত্র বার করে দেখালো।

দ্বাররক্ষী তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলো, কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। উচ্চকণ্ঠে বচসা করতে লাগলো তার সঙ্গে। গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলো দত্ত ত্রিম্বক। কে তুমি?—হুজুর, আমি আপনার বান্দা গোলাম মিঞা, আগ্রার মশহুর দবানেওয়ালা। হাত তুলে তেলের শিশি দেখালো।—মুসলমান? হিন্দুস্তানী?—না, আমি তুরানী। —দরকার নেই বাবা, দত্ত ত্রিম্বক ভাবলো, শিবাজীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় আজকাল। অচেনা লোকের কাছে শিবাজী উন্মুক্ত দেহে গাত্রসংবাহন করাবে, এটা ঠিক নয়। সেও চলে যেতে বললো তাকে। কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। তুর্কী, ফারসী, হিন্দুস্তানী মিলিয়ে অপূর্ব মিশ্র ভাষায় সে শোরগোল শুরু করে দিলো তার তীক্ষ্ণকণ্ঠ আরো উচ্চ গ্রামে তুলে। শিবাজী এসে দাঁড়ালো নিজের কক্ষের ঝরোকায়। শোর-গোল কানে গেছে। জানতে চাইলো কি ব্যাপার। দত্ত ত্রিম্বক

এসে জানালো, একজন মুসলমান দবানেওয়ালা এসেছে আকিল খাঁর পরিচয়পত্র নিয়ে। বোধ হয় কিছু বখশিশ চায়।

শিবাজী তাকে বখশিশ দিয়ে বিদায় করে দেওয়ার হুকুম দিলো। হঠাৎ কি ভেবে আবার ফিরে এলো ঝরোকার কাছে। দত্ত ত্রিম্বককে ডেকে হুকুম দিলো, দবানেওয়ালাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়ার। দত্ত ত্রিম্বক ইতস্তত করলো। শিবাজী হেসে বললো, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। হিরাজী ফরজন্দও থাকবে কক্ষের ভিতর খোলা তলোয়ার নিয়ে।"

লোকটিকে ভিতরে নিয়ে আসা হোলো। সে অতি বিনয়ের সঙ্গে তসলিম করলো, আবার শুরু করলো আলঙ্কারিক ভাষায় তার নিজের অঙ্গসংবাহনকুশলতার বিবরণ দিতে। দিল্লী আগ্রার বড়ো বড়ো উমরাহ্‌দের নামের তালিকা দিলো।

শিবাজী হেসে গায়ের জামাহ্‌ অপসারিত করলো, নগ্ন গাত্রে শায়িত হোলো চার পাই এর উপর। লোকটি খুব ঘটা করে তেলের শিশি থেকে তেল বার করে দু'হাতে তেল মাখলো, তারপর শুরু করলো দলাই-মলাই করতে।

হঠাৎ হিজারী ফরজন্দ এগিয়ে এসে খোলা তলোয়ার ধরলো তার গলার কাছে। রুক্ষ কণ্ঠে বললো, "তুমি তো দবানেওয়ালা নও। কে তুমি?"

লোকটি যতোই ঘটা করুক, পাঁয়তারা করুক, হিরাজী এক মুহূর্তেই বুঝে নিয়েছিলো যে, এ একেবারে আনাড়ি। ওর পেশা আর যাই হোক, অঙ্গসংবাহন তার বৃত্তি নয়।

শিবাজী হেসে হাতের ইসারা করে সরে যেতে বললো হিরাজীকে।

তারপর চোখ বুঁজে বললো, "না ভাই দবানেওয়ালা, তুমি তোমার কাজ করে যাও। জীবনে আমার অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু গোপন সংবাদদাতা এসে রাজা বাদশাহ্‌র অঙ্গসংবাহন

করে, এ কখনো শুনিনি। হ্যাঁ, এভাবে কথাবার্তা বলতে খুব আরাম লাগে।"

লোকটি খুব সরলভাবে একগাল হাসলো, বললো, "আমি আমার পরিচয় দেওয়ার আগেই চিনে ফেলেছেন আমায়? নিজেই বলতে যাচ্ছিলাম।"

"তোমার নাম কি?" শিবাজী জিজ্ঞেস করলো।

"আমার নাম মির আবিদ হুসেন খাঁ।"

"ও। তুমিই শক্তিসিংহের বন্ধু আবিদ হুসেন?"

"আপনিও আমার নাম শুনেছেন?" আবিদ হুসেন খুব বিস্মিত হোলো।

"পান্না বলছিলো তোমার কথা। কোতোয়াল ফুলাদ খাঁকে তুমি কি ভাবে হাত মুখ বেঁধে কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়েছিলে, তার বিবরণ শুনে আমি খুব উপভোগ করেছি। তুমি জানোনা আমরা তোমার কাছে কতো কৃতজ্ঞ। তোমরা ফুলাদ খাঁর হাত থেকে যে লোকটিকে বাঁচিয়েছিলে, সে আমার খুব প্রিয়জন।"

আবিদ হুসেন বিস্মিত হোলো একথা শুনে। জিজ্ঞেস করলো, "ফুলাদ খাঁ একথা জানে?"

"নিশ্চয়ই জানে। আমার লোক বলেই পিয়াদাদের নিয়ে তার উপর চড়াও হয়েছিলো।"

"সর্বনাশ!" আবিদ হুসেনের মুখ শুকিয়ে গেল, "শাহ্-ইন-শাহ জানলে আমার পৈত্রিক অর্থ সম্পত্তি আবার বইত-উল-মাল-ওয়া-আমুয়াল্‌এ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমি অনেক কষ্ট করে সেসব খালাস করিয়েছি।"

"তোমার কি দোষ। তুমি তো ইচ্ছে করে আমার লোককে বাঁচাও নি, ভুল করে বাঁচিয়েছিলে।"

"না," উত্তর দিলো আবিদ হুসেন, "আমরা ইচ্ছে করেই বাঁচিয়েছিলাম। সে ভুল করে আপনার লোক হয়ে গেছে।"

শিবাজী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো আবিদ হুসেনের কথা শুনে। আবিদ হুসেন ঈষৎ আনমনা হয়ে শিবাজীর নিরাবরণ শুভ্র পৃষ্ঠদেশ সংবাহন করতে লাগলো।

"এখন বলো, তুমি এখানে কেন এসেছো। কে পাঠিয়েছে তোমায়? নিশ্চয়ই আওরংজেব পাঠায় নি।"

"না।"

"তাহলে কে পাঠিয়েছে?"

"জিনত-উন-নিসা বেগম সাহিবা।"

"জিনত-উন-নিসা? আওরংজেবের কন্যা?" শিবাজী বিস্মিত হোলো। "কেন?"

আবিদ হুসেন উত্তর দিতে যাচ্ছিলো। শিবাজী তাকে থামিয়ে বললো "দাঁড়াও, তার আগে একটা কথার জবাব দাও। তুমি তো দরবারের লোক, আওরংজেবের প্রিয়পাত্র বলেই শুনেছি। তোমার তো আওরংজেবের অজ্ঞাতে আমার কাছে আসার কথা নয়।"

আবিদ হুসেন হাত পা গুটিয়ে একটু ভাবলো। তারপর বললো, "মালিক, আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে আপনি সাচ্চা লোক। এজন্যে আপনাকে সাফ সাফ কথাগুলো জানাচ্ছি। আপনার কাছে একটা খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আকিল খাঁর মারফতে আমায় হুকুম দিয়েছেন জেব-উন-নিসা বেগম সাহিবা।"

শিবাজী মুখ ফিরিয়ে ভুরু তুলে তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে।

আবিদ হুসেন বলে গেল, "কিন্তু বার বার একথা বলে দেওয়া হয়েছে, আমি যেন জেব-উন-নিসা বেগমের নাম উল্লেখ না করি। আমি যেন আপনাকে জানাই যে, খবর পাঠিয়েছেন জিনত-উন-নিসা বেগম সাহিবা। আকিল খাঁ বললেন, জিনত-উন-নিসা বেগম সাহিবা নাকি আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। দরবারে আপনার তেজস্বিতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। আপনাকে কয়েদ করার ফন্দি আঁটা হচ্ছে শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।"

শিবাজী আর হিরাজী ফরজন্দ নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করলো।

"বেগম সাহিবার হুকুম শোনবার পর আমার মনে সংশয় জেগেছিলো," বলতে লাগলো আবিদ হুসেন, "শাহ্-ইন-শাহ আমায় এত মেহেরবানি করেন। তাঁকে না জানিয়ে কি আমার আসা উচিত আপনার কাছে? অথচ, বেগম সাহিবার হুকুম। আমি কি করি, অনেক ভেবে মোতিজানকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।"

"মোতিজান! সে কে?"

"আমার মাশুকা।" ঈষৎ আরক্ত হোলো আবিদ হুসেনের মুখ।

"ও। আচ্ছা, তারপর?"

"মোতিজান শুনে হাসলো। কেন হাসলো জানিনা, কিন্তু হেসে বললো,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কেন? মোতিজান বললো,—শিবাজীর মতো বাহাদুর লোককে তো কয়েদ করার ভয় দেখিয়ে বশ করা যাবে না, তার জান নিয়েও কোনো মতলব হাসিল হবে না। এ কাজ বাদশাহ্‌র নয়, এ কাজ বাদশাহ্-জাদীর। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কিন্তু শাহ্-ইন-শাহ্‌র কাছে একথা গোপন করা হবে কেন? মোতিজান বললো,—আরে ইয়ার, এই সহজ কথাও বোঝো না। এটা হোলো শাহজাদীর শরম্-এর সওয়াল। সব কথা সবাইকে সব সময় বলা যায়? একথা শুনে আমার মনে আর কোনো সংশয় রইলো না। দবানেওয়ালা সাজবার মতলবও মোতিজানই দিলো। ব্যস চলে এলাম।"

আবিদ হুসেনের কথা শুনে রাগে লাল হয়ে উঠলো হিরাজী ফরজন্দের মুখ। শিবাজীর দিকে ফিরে বললো, "এ লোকটা আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলছে কোন সাহসে? আপনার হুকুম হলে আমি এর গর্দন ধরে বার করে দিই এখান থেকে।"

"না, না, ওকে বলতে দাও," কৌতুকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো শিবাজীর মুখ, "এখানে নানা দুর্ভাবনার মধ্যে একটু হাল্কা কথাবার্তা শুনে হাসবার অবকাশ না পেলে দিন কাটবে কি করে?"

"আমি তো হাল্কা কথা কিছু বলিনি," আবিদ হুসেন গম্ভীর হয়ে বললো।

"ওই যে বললে, আমার জান নিয়েও কোনো মতলব হাসিল হবে না,—আমার জানটা নিচ্ছে কে ? অতো হিম্মত কার ?"

"রদ অন্দাজ খাঁর। তাইতো মতলব করা হচ্ছে।"

"কি ?" শিবাজী চটকরে উঠে বসলো শায়িত অবস্থা থেকে। এক মুহূর্তে বদলে গেল মুখের সহজ ভাব। কপালের দুপাশের শিরাগুলো ফুলে উঠলো।

"সে খবরই তো আপনাকে দিতে এসেছি। শাহ্-ইন-শাহ আপনাকে কাবুলে পাঠাচ্ছেন কুমার রামসিংহের সঙ্গে। আর সঙ্গে যাচ্ছে রদ অন্দাজ খাঁ। আমার ওয়ালিদ তার চাচেরা ভায়ের শালা, আমার খুব নিকট রিশতা, কিন্তু তাকে আমি একটুও পছন্দ করিনা। সে আর ফুলাদ খাঁ বড় বেতমিজ, অসম্ভব শয়তান। মোতিজানকে ফুসলাতে চায়। এই সলাহ্ শাহ্-ইন-শাহ্কে দিয়েছে ওরাই। কাবুল যাওয়ার পথে, কিংবা কাবুলে পৌঁছে যাওয়ার পর রদ অন্দাজ খাঁ আপনাকে হত্যা করবে। বেগম সাহিবা তো একথা জানতে পেরেই আপনাকে খবর দেওয়ার হুকুম দিলেন আমায়। জেব-উন-নিসা বেগম সাহিবার কাছ থেকে আকিল খাঁ জেনেছে যে এ হুকুম যাতে রদ করা হয়, তার জন্যে শাহ্-ইন-শাহ্র কাছে অনুরোধ করবেন জিনত-উন-নিসা বেগম সাহিবা। একথাও আপনাকে জানাতে যেন ভুলে না যাই, আমাকে বিশেষ করে বলে দেওয়া হয়েছে।"

হিরাজী হাসলো, কিন্তু শিবাজী গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইলো আবিদ হুসেনের দিকে। একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি ইনাম চাই বলো।"

"ইনাম ? আমার ইনাম আমি বেগম সাহিবার কাছ থেকে নেবো। আমি এই মুহূর্তে দবানেওয়ালা, আমার পারিশ্রমিক এক সিক্কা তঙ্কা, আমাকে তাই দেওয়ার হুকুম হোক।"

আবিদ হুসেন চলে যাওয়ার পর শিবাজী বললো, "হিরাজী, এই মুহূর্তে দেখা করতে হবে রামসিংহের সঙ্গে। তুমিও চলো।"

বাইরে এসে আবিদ হুসেন দেখলো তলোয়ারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে দত্ত ত্রিম্বক। সে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে। আবিদ হুসেন গ্রাহ্য করলো না। গদাইলস্করী চালে হেলতে দুলতে এগিয়ে চললো। মঞ্জিলের সামনে প্রশস্ত ময়দান। দুপাশে মারাঠা লশকরদের শিবির। তার মাঝখান দিয়ে পথ।

একপাশে দুতিনজন দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। আবিদ হুসেনকে এগিয়ে আসতে দেখে ফিরে তাকালো। একজন এগিয়ে এলো তার দিকে। আবিদ হুসেন চিনতে পারলো তাকে। সে কৃষ্ণাজী আপ্তে। মনে মনে সে প্রমাদ গুনলো। চিনতে পারলে মুশকিল। কৃষ্ণাজীর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু সে তার পথ আটকে দাঁড়ালো।

"খুব চেনা মুখ মনে হচ্ছে," বললো কৃষ্ণাজী, "কোথায় দেখেছি তোমায়?"

"আমি এক গরীব দবানেওয়ালা। এতক্ষণ আপনাদের রাজার খিদমত করছিলাম।"

"দবানেওয়ালা? না, তা তো তুমি নও। আমি কোনো মুখ একবার দেখলে আর ভুলি না। কোথায় দেখেছি তোমায়? তুমি —তুমি—এ্যাঁ, তুমি?"

আবিদ হুসেন চট করে গায়ের কাবা খুলে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো, সোজা দৌড় মারলো দরওয়াজার দিকে। পেছনে একটা হট্টগোল শুনতে পেলো। কৃষ্ণাজী চিৎকার করছে,—ধরো, ওকে ধরো, ও একজন মোগল খুফিয়ানবিস। আরো কয়েকজন বেরিয়ে এলো দুপাশের তাঁবু থেকে। কিন্তু কাছে আসবার আগেই

অতি দ্রুত গতিতে তাদের পেরিয়ে গেল আবিদ হুসেন। দরওয়াজায় দাঁড়িয়েছিলো দুজন পাহারাদার, ওরা ছুটে এলো খোলা তলোয়ার হাতে।

পেছনে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে কয়েকজন মারাঠা। আবিদ হুসেনের বুক টিপ টিপ করতে লাগলো। ভাবলো,—কেন মরতে এসেছিলাম এখানে। এখন উপায় ?

দুজন পাহারাদার এসে গেল খুবই কাছাকাছি। আবিদ হুসেন মরিয়া হয়ে উঠলো। হঠাৎ মনে পড়লো ছেলেবেলাকার খেলার মাঠের গুণ্ডা ছেলেদের হাত থেকে বাঁচবার কৌশল। চট করে নিচু হয়ে দুহাতে মুঠো ভরে ধুলো তুলে নিলো, ছুঁড়ে মারলো পাহারাদার দুজনের দিকে। দুজনে চিৎকার করে হাতিয়ার ফেলে চোখ রগড়াতে শুরু করলো। তাদের পেরিয়ে আবিদ হুসেন ছুটে বেরিয়ে এলো। দরওয়াজা পেছনে ফেলে এগিয়ে এলো খানিকটা। পেছন পেছন ছুটে আসছে মারাঠারা। হাঁফাতে লাগলো আবিদ হুসেন। সে তার ঘোড়াটা রেখে এসেছে বেশ কিছু দূরে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই এরা ধরে ফেলবে মনে হচ্ছে। প্রাণপণে ছুটতে লাগলো আবিদ হুসেন। হঠাৎ দেখতে পেলো পথের পাশের গাছ-পালার আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে কয়েকজন মোগল। প্রত্যেকের হাতে খোলা তলোয়ার। আবিদ হুসেন তাদের চিনতে পারলো। খোজা ফিরোজার বাগের উপর গোপনে নজর রাখবার জন্যে কোতোয়ালি থেকে যেসব পিয়াদা, হরকরা, খুফিয়ানবিস নিযুক্ত করা হয়েছে, এরা তাদেরই কয়েকজন। একজনের নাম জানতো আবিদ হুসেন। চিৎকার করে বললো, "হানিফ বেগ, আমাকে বাঁচাও, মারাঠারা আমাকে মেরে ফেলবে—।

মোগলেরা এসে গেল তার কাছে। মারাঠারা দাঁড়িয়ে পড়লো।

"কে তুমি ?" জিজ্ঞেস করলো হানিফ, "আরে, আবিদ হুসেন খাঁ। আপনি ?" আবিদ হুসেনের তখন খুব খাতির। "কি হয়েছে ?"

"ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চায় ?"

"কি ? মারাঠাদের এত সাহস ?" তলোয়ার উঁচিয়ে হানিফ বেগ বলে উঠলো, "আগ্রা শহরের বুকের উপর বসে দরবারের একজন সম্ভ্রান্ত মোগলের উপর হামলা করে ?"

আবিদ হুসেন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, মারাঠারা তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছে নিজেদের শিবিরের দিকে। তারা অত্যন্ত চতুর, মোগল রাজধানীতে সামান্য কারণে মোগল পিয়াদার মোকাবিলা করবে না।

আবিদ হুসেন এবার বুক ফুলিয়ে হুকুম দিলো, "আমার ঘোড়া।"

একজন পিয়াদা গিয়ে তার ঘোড়া নিয়ে এলো। দুজন তাকে সাহায্য করলো ঘোড়ায় চড়ে বসতে। উদ্ধত মুখভঙ্গি করে আবিদ হুসেন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো শহর কেন্দ্রের দিকে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মোগল পিয়াদারা।

ঠিক সেই সময় খোয়াবগাহ্‌তে বাদশাহ্‌ আওরংজেবের সামনে দাঁড়িয়েছিলো জিনত-উন-নিসা।

"এ খবর তুমি কি করে জানো," গম্ভীরকণ্ঠে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো।

"মহলে সবারই মুখে এই আলোচনা শুনছি, আলমপনাহ্‌।"

"আমি বুঝতে পারি না," বিরক্তিভরা কণ্ঠে আওরংজের বললো, "কেন একটি কথাও গোপন থাকে না। আমি মহলদারকে হুকুম দেবো অনুসন্ধান করার জন্যে। কে এসব কথা প্রকাশ করে দেয় ? তাকে আমি কঠিন সাজা দেবো।"

"আলমপাহ, সাজা আমাকে দিন, কিন্তু যে মেহমান, যে হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌কে বিশ্বাস করে নিজের এলাকা ছেড়ে আমাদের আতিথ্যগ্রহণ করছে, এভাবে হীন ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করলে আপনার অপবাদ হবে।"

"সে আমাদের শত্রু, জিনত-উন-নিসা।"

"তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করুন, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে তার ফৌজকে পরাস্ত করে তাকে ধরে এনে যা খুশী সাজা দিন। আমাদের ফৌজের সেই শক্তি নিশ্চয়ই আছে। তাতেই বাড়বে আপনার গৌরব।"

আওরংজেব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জিনত-উন-নিসার দিকে। সে সহ্য করতে পারলো না এই দৃষ্টি। ঈষৎ আরক্তিম হয়ে অবনত করলো তার চোখ।

আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো, "একজন সামান্য বিদ্রোহীর প্রাণ ভিক্ষা চাইছে চাখতাইয়া খানদানের এক শাহজাদী, আমার জীবনে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা।"

দৃঢ় নম্র কণ্ঠে চোখ না তুলেই জিনত-উন-নিসা বললো, "আলমপনাহ, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।"

"শ্রদ্ধা করো!" বিপুল বিস্ময়ে আওরংজেব উঠে দাঁড়ালো— "এক সামান্য পাহাড়ী অশিক্ষিত বেতমিজ বর্বর, তাকে তুমি শ্রদ্ধা করো। আজ দশ বছরেরও বেশী হয়ে গেল, সে অনবরত মোগল ফৌজকে বিব্রত করছে আমার ফরমান অবহেলা করে, তাকে তুমি শ্রদ্ধা করো? আমার অসীম ধৈর্যের সুযোগ নিয়ে যে এখানে দিওয়ান-ই-খাসে আমার প্রতি বেআদবি প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করলো না, সে তোমার শ্রদ্ধার পাত্র?"

"আপনাকে ভয় পায় না, হিন্দুস্তানে এমন তো আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে না আলমপনাহ্।"

"মুর্খের দুঃসাহসকে তুমি ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ভেবে ভুল করছো জিনত-উন-নিসা।"

"আলমপনাহ, আমি আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে এরকম শ্রদ্ধা করতে পারবো না কোনোদিন," জিনত-উন-নিসা অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলো।

আওরংজেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর শান্ত সংযত

কণ্ঠে বললো, "তাতে কি লাভ? সে তো কোনোদিন জানতে পারবে না তোমার এই শ্রদ্ধার কথা। আমি তা জানতে দেবো না। তোমাকেও আমি কোনোদিন ভুলতে দেবো না যে, তুমি বাদশাহ আলমগীরের কন্যা।"

"আলমপনাহ্, আমি বাদশাহ আলমগীরের কন্যা, সেকথা ভুলতে পারিনা বলেই তাকে আমার শ্রদ্ধার কথা জানাতে দেওয়ার অনুমতি চাইতে আসিনি বাদশাহ আলমগীরের কাছে। আমি শুধু তার প্রাণভিক্ষা চাইছি।"

"কেন?"

"শিবাজীকে মরতেই যদি হয়, তিনি যেন বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে পারেন, তাঁকে শুধু এই সুযোগ দেওয়ার আরজ নিয়েই এসেছি আপনার কাছে।"

আওরংজেব একটু হাসলো, তারপর বললো, "আমার পরিকল্পনার কথা জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়তো নাও হতে পারে।"

"আলমপনাহ্—"

"অকারণ বাক্যব্যয় আমি করিনা জিনত-উন-নিসা। তুমি এবার তোমার মহলে ফিরে যাও।"

জিনত-উন-নিসা বিদায় গ্রহণ করবার পর আওরংজেব খাস খোজা খাদিমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "দেওড়ি চৌকির দারোগার কাছে কোনো খবর পেলে?"

"না, জাহাঁপনাহ্। পাহারা দ্বিগুণ করে দেওয়ার হুকুম মহলের সবাই জেনেছে। বিশেষ কেউ বাইরে যায়নি। মহলদারের দস্তক নিয়ে দু-চার জন যারা গেছে, তাদের অনুসরণ করেছে এক একজন করে হরকরা। সন্দেহজনক কোনো গতিবিধি দেখা যায় নি।"

"মহলদারকে জানিয়ে দেবে, কাউকে যেন আর বাইরে যাওয়ার দস্তক দেওয়া না হয়।"

হিরাজী ফরজন্দকে সঙ্গে নিয়ে শিবাজী যখন কুমার রামসিংহের দিওয়ান খানায় হাজির হোলো তখন কুমার গভীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলো বল্লুশাহ, তেজসিংহ, রণসিংহ আর মহাসিংহ শেখাওয়াতের সঙ্গে। শিবাজীর আগমনঘোষণা শুনে সবাই অলোচনা বন্ধ করে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। শিবাজী প্রবেশদ্বারে উপনীত হতেই রামসিংহ এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে হাত ধরে ভিতরে এনে পাশে বসালো সুকোমল গদির উপর।

"কুমার-জী," শিবাজী বললো, "আপনি দুবার আমার শিবিরে এসেছিলেন। আমি সাক্ষাৎ করতে পারিনি বলে অত্যন্ত লজ্জিত। তাই নিজেই এলাম মার্জনা ভিক্ষা করতে।"

"আমারই মার্জনা চাওয়ার কথা," উত্তর দিলো রামসিংহ, "আমি খবর না পাঠিয়ে অসময়ে উপস্থিত হয়েছিলাম আপনার মঞ্জিলে। হবে সুসংবাদ নিজের মুখে আপনাকে দেবো বলে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম।"

"কি সুসংবাদ কুমার-জী?"

"আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই কাবুল রওনা হচ্ছি। শাহ্-ইন-শাহ অনুমতি দিয়েছেন। এ সুযোগ এত তাড়াতাড়ি হবে আমি ভাবতে পারি নি।

"সুযোগ কেন?"

"তাহলে আপনার দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে, সেটা এখানে আগ্রায় শাহ্-ইন-শাহ্র এত সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে প্রায় অসম্ভব বললেই হয়।"

"ফৌজের সঙ্গে আর কে কে যাচ্ছে?"

"আমরা সবাই যাচ্ছি,—আপনি, আমি, হিরাজী ফরজন্দ, দত্ত ত্রিম্বক, আমাদের তেজ সিংহ, বল্লু শাহ, রণ সিংহ, আর—"

"আর কে?"

"—আর যাচ্ছে রদ-অন্দাজ খাঁ।"

"আমি তাহলে যাচ্ছি না।"

রামসিংহ সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো। "যাচ্ছেন না?"

"না। আগ্রা ছেড়ে আমি এক পাও যাচ্ছি না।"

"কিন্তু, শিবাজী, এরকম সুযোগ দ্বিতীয়বার নাও হতে পারে।"

"না আমি যাচ্ছি না।"

"কেন?"

"ওই রদ-অন্দাজ খাঁকে আমি বিশ্বাস করি না।"

শিবাজীর কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলো সবাই। কিছুক্ষণ পরে রামসিংহ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আগ্রা থেকে পালানোর উপায় করা প্রায় অসম্ভব।"

শিবাজী একথার উত্তর দিলো না। তেজসিংহের দিকে ফিরে বললো, "আমার ভাগ্যদোষে আজ আমি আগ্রায়। আমি না হয় বুঝতে পারিনি, কিন্তু আওরংজেবের মনোবৃত্তি তো আপনাদের অজানা নয়। আপনারা মির্জা রাজাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি? তাঁর উচিত হয় নি আমাকে আশ্বাস দিয়ে আগ্রায় পাঠানো।"

"মহারাজা কারো কথা শোনেন না," উত্তর দিলো তেজসিংহ, "উনি শোনেন শুধু তাঁর মুনশী উদিরাজের কথা। সুর সিংহ আর ভোজরাজ দুজনেই মহারাজাকে বলেছিলেন,—আপনি বিজাপুর আক্রমণের পরিকল্পনা করবেন না। দিলির খাঁ রুহেলাও বলেছিলেন,—আপনি শিবাজীকে আমাদের অনুগত করতে সক্ষম হয়েছেন, বিজাপুর জয় করার ভার দিন তাঁকেই। কিন্তু মহারাজা তাঁদের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের ভর্ৎসনা করেছিলেন।"

কুমার রামসিংহ তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো তেজসিংহের দিকে। শিবাজী হাসলো। বললো, "তাহলে এটাই আসল কথা। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে চক্রান্ত করে?"

কুমার রামসিংহ এক পা এগিয়ে এলো। "শিবাজী, আমার পিতা এবং আমি দুজনেই আপনাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছি। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনাকে রক্ষা করবো।"

শিবাজী হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না।

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না?" জিজ্ঞেস করলো রামসিংহ।

"হ্যাঁ, আপনার সদিচ্ছার উপর আমার আস্থা আছে বৈকি," শিবাজী উত্তর দিলো, "তবে আপনার শেষ রক্তবিন্দু ঝরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নেই।"

অপরাহ্নে খিলওয়াতগাহ্‌তে আবিদ হুসেন এসেছিলো বাদশাহ্‌কে তসলিম জানাতে। ততক্ষণে আবিদ হুসেনের মধ্যাহ্নের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ পৌঁছে গেছে বাদশাহ্‌র কাছে।

"মারাঠারা তোমাকে ধরতে চাইছিলো কেন?" জিজ্ঞেস করলো আওরংজেব।

"জাহাঁপনাহ্‌, আমি দবানেওয়ালার ছদ্মবেশে মারাঠাদের উর্দুতে প্রবেশ করেছিলাম।"

"তোমার সাহস তো কম নয়!" আওরংজেব চমৎকৃত হয়ে বললো, "ওরা সময় মতো টের পেলে তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারতো।"

"জাহাঁপনাহ্‌, আপনার খিদমতে জান কুরবান করতে এই খাদিম সর্বদাই প্রস্তুত।"

আওরংজেবের মুখে একটা প্রসন্নতা ফুটে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, "সেখানে গিয়েছিলে কেন?"

"শিবাজীর কথা অনেক শুনেছি। ওঁকে চাক্ষুষ দর্শন করে ওঁর সঙ্গে আলাপপরিচয় করার ইচ্ছে ছিলো?"

"এ কি অসম্ভব পরিকল্পনা! আমি শুনেছি যে, মারাঠারা শিবাকে দিবারাত্র সতর্ক পাহারার মধ্যে রাখে।"

"অসম্ভব আমি সম্ভব করেছি জাহাঁপনা," আবিদ হুসেন বক্ষস্ফীত করে বললো।

"সে কি! শিবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?"

উজীর জাফর খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ ও ফুলাদ খাঁ সবিস্ময়ে আবিদ হুসেনের দিকে তাকালো।

"জাহাঁপনাহ্, আমি শিবাজীর গাত্রসংবাহন করে এক তঙ্কা পারিশ্রমিক পেয়েছি।"

স্বভাবত গম্ভীর আওরংজেব হেসে উঠলো আবিদ হুসেনের কথা শুনে। সুতরাং অন্য সবাইকেও হাসতে হোলো।

"কোনো খবর আছে?" আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো।

"আছে জাহাঁপনাহ্। শিবাজী কাবুল যাবেন না স্থির করেছেন।"

"সে কি!" বিস্মিত হোলো আওরংজেব।

"রদ-অন্দাজ খাঁর চক্রান্তের সংবাদ তিনি জানেন।"

"জানে!" আওরংজেব স্তম্ভিত হোলো। গর্জে উঠলো, "কি করে জানে?"

"সে খবর আমি জানি না জাহাঁপনাহ্।"

আওরংজেব উত্তেজিত হয়ে তখত থেকে উঠে দাঁড়ালো। বলতে লাগলো, "কি করে জানতে পারে সে? আমার লোক চারদিকে কড়া নজর রেখেছে যাতে মহলের ভিতর থেকে কোনো সংবাদ তার কাছে না যায়। আর কে তাকে জানাতে পারে?"

"আর যারা জানে, হয়তো তারাই জানিয়েছে," বললো আবিদ হুসেন খাঁ। বলতে বলতে সে এমনিই কৌতুহলভরে তাকিয়ে রইলো রদ-অন্দাজ খাঁর দিকে। রদ-অন্দাজ খাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল। এবং আওরংজেবের নজরে পড়লো তার এই ভাবান্তর।

আওরংজেব বলতে লাগলো, "কার কার জানা আছে, এই পরিকল্পনার কথা? উজীর জাফর খাঁ,—তিনি জানাতে পারেন না। ফুলাদ খাঁ,—সেও কাউকে জানাবে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। জসবন্ত সিংহ—তার পক্ষে এ খবর শিবাকে জানানো অসম্ভব। তার মনোভাব শিবার প্রতিকূল। সে চায় যে, শিবাকে এ তুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা হোক। রদ-অন্দাজ খাঁ,—তাকেও আমি বিশ্বাস করি।"

রদ-অন্দাজ খাঁ এক পা এগিয়ে এলো।

"জাহাঁপনাহ্, আমার অপরাধ হয়ে গেছে।"

আওরংজেব বিস্মিত হয়ে বললো, "তুমি জানিয়েছো শিবাকে?"

"না জাহাঁপনাহ্। শিবাজীকে নয়।"

"তা হলে?"

"কাল সন্ধ্যাবেলা যখন কিলায় ফিরছিলাম, দরওয়াজার কাছে কুমার রামসিংহের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তখন হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাকে বলে ফেললাম যে, ফৌজের সঙ্গে আমিও কাবুল যাচ্ছি।"

"বেওকুফ্," দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলো আওরংজেব, "রামসিংহ নিশ্চয়ই শিবাকে গিয়ে বলেছে। শিবা অত্যন্ত চতুর। সে আসল কথাটা অনুমান করে নিয়েছে। অথচ আমি প্রথম থেকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম সবাইকে।"

আওরংজেব চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর জাফর খাঁর দিকে ফিরে বললো, "আবিদ হুসেন খাঁ খুব বাহাতুর। তাকে ইনাম দেওয়া উচিত। তাকে পাঁচশো সওয়ারের মনসব দেওয়া হোলো। কাল আপনি তার মনসবের যথোপযুক্ত জায়গিরের জন্যে দরবারে আমার কাছে সুপারিশ করবেন।"

আবিদ হুসেন তসলিম জানালো বাদশাহকে। ফুলাদ খাঁ রদ-অন্দাজ খাঁর দিকে তাকালো। রদ-অন্দাজ খাঁ আওরংজেবের অলক্ষ্যে একটুখানি কাঁধ ঝাঁকুনি দিলো।

চলে যাওয়ার হুকুম পেয়ে আবিদ হুসেন বিদায় নিলো।

তখন রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "আমার মনে একটা খটকা লাগছে। শিবাজী আর লোক পাননি, অজানা অচেনা এক দবানেওয়ালাকে ধরে বলে ফেললেন মনের কথা যে,—রদ-অন্দাজ খাঁ কাবুল যাচ্ছে আমি জানি, ওর মতলব আমি জানতে পেরেছি, তাই আমি আর কাবুল যাচ্ছি না ?"

"বেওকুফ," বললো আওরংজেব, "একথাও বুঝতে পারো নি যে. শিবা ঠিক বুঝতে পেরেছে আবিদ হুসেন আমার খুফিয়ানবিস ? শিবা চেয়েছে, আমি যেন জানিতে পারি ও ঠিক খবর পেয়েছে।"

"এ ভাবে জানাবে কেন ? আরজ পেশ করে জানাতে পারতো," বললো ফুলাদ খাঁ।

"আরজ পেশ করে জানাবে সে অসুস্থ, তাই কাবুল যাওয়ার হুকুম যেন রদ করা হয়," বললো আওরংজেব, "আরজ দশ্ত্এ একথা লেখা যায় না যে. আসল মতলবটা আমি জানতে পেরেছি. তাই আমি আর কাবুল যাবো না।"

"তাহলে আবিদ হুসেনের বাহাদুরীটা কি ?" ফুলাদ খাঁ বলে উঠলো বিদ্বেষভরা কণ্ঠে, "খবর তো ও বার করতে পারেনি, খবর তাকে গায়ে পড়ে জানানো হয়েছে।"

"ও যে ছদ্মবেশে শিবার সামনে উপস্থিত হতে পেরেছে, সেটাই ওর বাহাদুরী," উত্তর দিলো আওরংজেব।

উজীর জাফর খাঁ এতক্ষণ চুপ করে ছিলো, এবার জিজ্ঞেস করলো, "শিবাজী যদি কাবুল যাওয়ার হুকুম রদ করানোর জন্যে আরজ করেন, তাহলে সেটা মঞ্জুর করা হবে ?"

"হ্যাঁ, আপাতত এই মেহেরবানি না দেখিয়ে আমার উপায় কি," আওরংজেব বললো আস্তে আস্তে, "ব্যর্থ যখন হলামই, তখন ব্যর্থতাকে মহানুভবতার রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে।"

পাঁচ দিন পর, মে মাসের কুড়ি তারিখ, সোমবার, উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁ দিওয়ান-ই-খাসে বাদশাহ আওরংজেবের কাছে পেশ করলো শিবাজীর আরজ্‌-দশত্‌। সেই আবেদন পত্রে শিবাজী জানালো তার শরীর অসুস্থ, তাকে কাবুল পাঠানোর হুকুম মেহেরবানি করে রদ করা হোক। তার ব্যবহারের জন্যে সে অত্যন্ত অনুতপ্ত, তাকে মার্জনা করা হোক। নিজের জীবন বাদশাহ্‌র সেবায় উৎসর্গ করাই তার বাসনা, অতএব তার জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হোক। জাফর খাঁর সুপারিশে আরজ মঞ্জুর হোলো।

আরো নয় দিন পরের কথা। দিওয়ান-ই-খাসের সন্ধ্যেবেলার দরবার সমাপ্ত হওয়ার পর আবিদ হুসেন ক্লান্ত মন নিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে চলে এলো মমতাজআবাদে মোতিজানের মাইফিল খানায়। যতক্ষণ অন্যান্য অভ্যাগতেরা ছিলো, ততক্ষণ আবিদ হুসেন চুপচাপ শরাব পান করতে করতে মোতিজানের গান শুনলো। মাইফিল সমাপ্ত হওয়ার পর মোতিজানের ফরাশ গিয়ে বন্ধ করে দিলো বাইরের দরজা।

নিরালা ঘর ভরে এখন শুধু চামেলির গন্ধ। আবিদ হুসেন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়্‌গড়া টানতে লাগলো। মোতিজান আস্তে আস্তে এসে বসলো আবিদ হুসেনের পাশে। বললো, "কি খবর খাঁ সাহাব, আজ যে বড়ো মুখ ভার?"

"শিবাজী রাজা লোকটা ভালো," আবিদ হুসেন আস্তে আস্তে বললো, "ওরই কথা ভেবে আজ মন খারাপ হয়ে আছে।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"রদ-অন্দাজ খাঁ, ফুলাদ খাঁ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ এদেরই জিত হোলো। তাদেরই সলাহ্‌ মেনে নিয়েছেন শাহ-ইন-শাহ। শিবাজীকে আজ থেকে কয়েদ করা হয়েছে।"

"তাই নাকি?" মোতিজান বলে উঠলো, "ওঁকে কি কিলার ভিতর নিয়ে রাখা হয়েছে?"

"না, এখনো খোজা ফিরোজার বাগেই আছেন। তবে ওঁর বাড়ির চারদিকে পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে। এই মাত্র দরবারে হুকুম জারি করা হোলো।"

মোতিজান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তোমার এত মন খারাপ কেন?"

"শাহ-ইন-শাহ আমার উপর নারাজ হয়েছেন।"

"কেন?" এবার একটু শঙ্কিত হোলো মোতি বিবি।

"উজীর-উল-মুল্‌ক্‌কে শিবাজী যে ঘুস দিয়েছেন, সে খবর আমি জানতে পারিনি বলে! রাজা বাদশাহ্‌দের খাদিম হওয়ার এই বিপদ। যতক্ষণ নেকনজর আছে, আমার সত্যি সত্যি যোগ্যতা থাক বা না থাক আমাকে আশমানে চড়িয়ে দিলো। যেই কুনজরে পড়লাম অমনি আমার গাফিলতি হোক বা না হোক আমার উপর দোষ চাপানো হোলো।"

"জাফর খাঁ ঘুস খেয়েছেন শিবাজীর কাছ থেকে? কে দিলো এই খবর?"

"রদ অন্দাজ খাঁ। উনি নাকি শিবাজীর লোকের কাছ থেকে ঘুস খেয়ে শিবাজীর আরজ মঞ্জুর হওয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। শিবাজীর লোক ওঁকে দিয়েছিলো তিন হাজার আশরফি। উনি বললেন, তিনে হবে না। পাঁচ দিলে নিশ্চয়ই আরজ মঞ্জুর করিয়ে দেবেন। ওরা পাঁচ হাজার আশরফিই দিলো। আসল ব্যাপারটা হোলো এই, শাহ-ইন-শাহ আগেই স্থির করেছিলেন, শিবাজীর কাছ থেকে এরকম আরজ এলে সেটা মঞ্জুর করা হবে। জাফর খাঁ একথা জানতেন। জাফর খাঁকে টাকা দেওয়ার পর রদ-অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ লোক পাঠিয়েছিলো শিবাজীর কাজি-উল-কুজাত নিরাজী রাওজীর কাছে, দু-হাজার আশরফি পেলে ওরা শিবাজীর

আরজ মঞ্জুর করিয়ে দেবে। শিবাজী তাদেরও দিয়েছিলো দু-হাজার আশরফি। পরে ওরা জানতে পারলো জাফর খাঁ পেয়েছে পাঁচ হাজার। তাইতে ওদের রাগ হোলো।”

“আশরফি পেয়েছে ওরা, শাহ-ইন-শাহ্‌র রাগ তোমার উপর হোলো কেন? শিবাজীকেই বা কয়েদ করলেন কেন?”

“শাহ-ইন-শাহ্‌র রাগ হয়েছে এই কারণে যে, আশরফি যেসব দেওয়া হয়েছে ওগুলো শিবাজীর নয়, সব মোগল দরবারের টাকা।”

“মোগল দরবারের টাকা!” মোতিজান বিস্মিত হয়ে বলে উঠল।

“হ্যাঁ, শিবাজী কি কম চালাক! নিজের অর্থ সঙ্গে বেশী আনেন নি। দক্কান থেকে রওনা হওয়ার আগে মির্জা রাজা জয়সিংহকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আওরঙ্গাবাদের খাজনাহ্‌-ই-আমারা থেকে হওয়ালাৎ নিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা। শিবাজী যে চারদিকে ঘুস ছড়াচ্ছেন, সব এই টাকা থেকে। শাহ-ইন-শাহ্‌র রাগ হয়েছে এজন্যে যে তাঁরই টাকা দিয়ে শিবাজী তাঁরই উমরাহদের বশ করবার চেষ্টা করছেন।”

“টাকাটা শিবাজী শাহ-ইন-শাহ্‌কে ফিরিয়ে তো দেবেন।”

“নিজের রাজ্যে ফিরে না গেলে দেবেন কোত্থেকে?”

মোতিজান হঠাৎ হেসে ফেলল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, “এ খবরটা জেনেই শিবাজীকে নজরবন্দী করার হুকুম দিলেন?”

“না। রদ-অন্দাজ খাঁর কাছে খবরটা শুনে তো খুব রেগে গেলেন। রদ-অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁ যে আশরফি পেয়েছেন সে খবর প্রকাশ করে দিলো মহারাজা জসবন্ত সিংহ। খাস দরবারে জাফর খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ, ফুলাদ খাঁ আর জসবন্ত সিংহের সেই ঝগড়া দেখবার মতো, রাস্তার কুত্তার লড়াইকেও হার মানায়। শাহ-ইন-শাহ দরবারের কেতা ভুলে আমাকে কাছে ডেকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, এত খবর তুমি রাখো, এ খবর জানতে পারো নি

কেন ? বোধ হয় আমার পৈত্রিক অর্থ সম্পত্তি বইত-উল-মাল-ওয়া আমুয়ালে বাজেয়াপ্ত করার হুকুমই দিয়ে বসতেন। এমন সময় ভা[illegible] খেলা, তিনি কিছু[illegible] আগেই দরবারে হাজির হোলো মহম্মদ আমিন খাঁ। তার হাতে শিবাজীর একটা আরজ। শিবাজী জানাচ্ছেন—শাহ-ইন-শাহ যদি শিবাজীর কিলাগুলি তাঁকে ফিরিয়ে দেন তাহলে তিনি শাহ-ইন-শাহ্‌কে দু-কোটি টাকা দেবেন। এই কারণে শিবাজী দক্ষিণে ফিরে যাওয়ার হুকুম চাইছেন এবং এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে দক্ষিণে ফিরে গিয়ে তিনি বাদশাহ্‌র হয়ে বিজাপুরের সঙ্গে লড়বেন।"

"দু-কোটি টাকা!" মোতিজান চোখ কপালে তুললো।

"হ্যাঁ। আরজ শুনে তো শাহ-ইন-শাহ আরো ক্ষেপে গেলেন। বললেন, এতদূর স্পর্ধা লোকটার, এখন আমাকেও ঘুস দিতে চাইছে? মহম্মদ আমিন খাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কতো আশরফি দিয়েছে? আচমকা এ প্রশ্নে খাঁ সাহাব থতমত খেয়ে গেল। কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই শাহ-ইন-শাহ বললেন,—আমি এ পর্যন্ত খুব সদয় ব্যবহার করেছি বলে শিবার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। বলে কি লোকটা? ওকে ফিরে যেতে দেবো? দক্কানে? ফুলাদ খাঁকে ডেকে বললেন, ওকে জানিয়ে দাও, সে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না, এমন কি কুমার রামসিংহের মঞ্জিলেও যেতে পারবে না। ওর গৃহের চারদিকে পাহারা বসিয়ে দাও।"

মোতিজান বললো, "এসব রাজা বাদশাহদের ব্যাপার, দু-দিন পরে আবার দেখবে দুজন দুজনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে পরস্পরকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করছে।"

"সে করুক বা না করুক আমার কিছু আসে যায় না। এসব গোলমালের মাঝখানে পড়ে আমিই খতম হলাম।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো মোতিজান।

"শাহ-ইন-শাহ আমায় হুকুম দিয়েছেন, কাল থেকে আর

খিলওয়াতগাহ্‌তে হাজির হওয়ার প্রয়োজন নেই। দিওয়ান-ই-খাসের দারোগার নাইবের কাজ থেকেও আমায় বরখাস্ত্‌ করা হয়েছে।"

"তোমার কসুর?"

"আমার কসুর, আমি এসব ঘুসের লেন-দেনের খবর দিতে পারিনি।"

"তাজ্জব কথা, যারা ঘুস নিলো তাদের টাকা তো বাজেয়াপ্ত করা হোলো না, তাদের তো বরখাস্ত্‌ করা হোলো না।"

"ভাই মোতিজান, তাদের বরখাস্ত্‌ করলে হুকুমত চলবে কাদের নিয়ে?"

দুজনে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আবিদ হুসেন বললো, "বিবি মোতিজান, আমি খুশী হয়েছি। দরবারের আব-হাওয়ায় আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। আমি সামান্য লোক। সামান্য কাজকর্মই আমার জন্যে ভালো।"

মোতিজান বললো, "আমিও খুশী হয়েছি। তুমি এত বাড়তে শুরু করেছিলে যে আমার ভাবনা হয়েছিলো। উমরাহ হলে তো আর আমাকে য়াদ থাকবে না।"

"তোমাকে? য়াদ থাকবে না? আমার?" আবিদ হুসেন লাফিয়ে উঠলো, "আমাকে কেউ যদি বলে তুমি আগ্রার কোতোয়াল হতে চাও, না মোতিজানকে শাদী করতে চাও, আমি বলবো কোতোয়াল হতে চাই না, হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌ও হতে চাইনা, আমি মোতিজানকে শাদী করতে চাই।" উৎসাহের মাথায় বলে ফেললো আবিদ হুসেন। হঠাৎ খেয়াল হোলো যে মোতিজান একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি বললো, "না, মোতিজান, আমার কথায় রাগ কোরো না। আমি এমনি একটা কথার কথা বলেছি। তুমি এক মশহুর তওআয়ফ, আমি এক সামান্য লোক—"

তুমি শাদী করতে চাও আমাকে ? সত্যি বলো।"

"সত্যি বলবো ? হেসো না আমার কথা শুনে। আমি সত্যি খুশী হতাম তোমায় শাদী করতে পারলে। এভাবে প্রত্যেকদিন মাইফিলখানায় আসতে ভালো লাগে না। কেন এখানে ফুলাদ খাঁও আসবে, রদ-অন্দাজ খাঁও আসবে ?"

মোতিজান আস্তে আস্তে বললো, "এ পর্যন্ত অনেকে আমায় প্যার করতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ শাদী করতে চায় নি। আবিদ হুসেন, দিনের পর দিন এই মাইফিল আমারও ভালো লাগে না। ব্যস, আজ থেকে এ জিন্দগী খতম, নতুন জিন্দগী শুরু। ঘরের ওই দরজা তুমি ছাড়া আর কারো জন্যে খুলবে না।"

এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ। উচ্চকণ্ঠের ডাকাডাকি শোনা গেল।

"সর্বনাশ!" ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো আবিদ হুসেন, "ওরা দুজনেই এসেছে।"

"আমি দেখছি," বলে মোতিজান উঠে গিয়ে দরজা খুলে পথ আটকে দাঁড়ালো।

"কি হোলো মোতি বিবি, পথ ছাড়ো," বললো ফুলাদ খাঁর শরাবসিক্ত কণ্ঠস্বর।

"না হয় একটু রাত হয়েছে," শোনা গেল রদ-অন্দাজ খাঁর গলা, "তাই বলে কি আমাদের দুজনকে নিয়ে মাইফিল জমবে না ?"

"এটা মাইফিলখানা নয়," ধীর কণ্ঠে বললো মোতিজান।

ফুলাদ খাঁ মোতিজানের ঘাড়ের উপর দিকে উঁকি মেরে দেখতে পেলো আবিদ হুসেনকে।

"আরে, আবিদ হুসেন মিঞা ওখানে বসে আছে ?" ব্যঙ্গকণ্ঠে ফুলাদ খাঁ বললো, "ও তোমাকে জানায় নি বুঝি ? ওর খেল খতম। ওর ভরসায় মাইফিল খানার দরজা বন্ধ করে রাখলে তোমায় ঠকতে হবে মোতিজান।"

আবিদ হুসেন ঘামতে শুরু করলো। তাকালো এদিক ওদিক, বেরোনোর আর অন্য পথ নেই।

"এদিক দিয়েই বেরিয়ে এসো আবিদ হুসেন," রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "এখানে আর এসো না। তোমার আসবার জায়গা এটা নয়।"

"ধাপ্পাবাজি করে কয়েকদিন বেশ চালিয়েছো," বলে উঠলো ফুলাদ খাঁ, "এখন নিজের ইজ্জত বজায় রেখে এখান থেকে সরে পড়ো দেখি।"

আবিদ হুসেন ভয়ে ভয়ে উঠে এলো। সে এখন সামান্য লোক, বাদশাহ্‌র পেয়ারের লোক আর নয়, আগ্রার কোতোয়াল কিলাদারকে তুচ্ছ করার সাহস তার আর নেই।

মোতিজান চুপচাপ শুনছিলো এতক্ষণ। এবার হিমশীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আপনাদের বক্তব্য শেষ হয়েছে?"

ফুলাদ খাঁ আর রদ-অন্দাজ খাঁ বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো। রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "শেষ হবে কেন সুন্দরী, ওই বেওকুফটা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আমাদের আসল বক্তব্য শুরু হবে।"

"এবার আপনারা চলে যেতে পারেন।"

"চলে যাবো?" বলে উঠলো ফুলাদ খাঁ, "ওই জানোয়ারটার কাছে তোমায় একলা রেখে?"

একটা তীব্র চপেটাঘাতের শব্দ হোলো। নেমে এলো মোতিজানের হাত। ফুলাদ খাঁ গালে হাত বুলালো।

"আমার ইয়ার দোস্তের সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বলবেন," বললো মোতিজান।

অন্ধকার হয়ে উঠলো সিদ্দি ফুলাদ খাঁর মুখমণ্ডল।

এ কি করলো মোতিজান,—ভাবলো আবিদ হুসেন। তার বুক টিপটিপ করতে লাগলো।

ফুলাদ খাঁ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলো, "আমাকে এরকম

অপমান করলে ? তুমি ? তুমি এক সামান্য তওআয়ফ ?" হঠাৎ মোতিং [illegible] ছুটো [illegible] প ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, "তোমাকে আমি—, তোমাকে আমি—," কথা আটকে গেল, রাগে গরগর করতে লাগলো ফুলাদ খাঁ। মোতিজান হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো, পারলো না কিছুতেই।

হঠাৎ একটা পরিবর্তনের ঢেউ খেলে গেল আবিদ হুসেনের সারা শরীরে। তার মোতিজানের বেইজ্জতি করছে ওই ফুলাদ খাঁ! আবিদ হুসেনের বক্ষ স্ফীত হোলো, মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল, আগুন জ্বলে উঠলো দুচোখে।

চোখের পলকে সে ফুলাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। আবার একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাতের শব্দ হোলো। ফুলাদ খাঁ আবার গালে হাত বুলালো।

"এত স্পর্ধা তোমার!" গর্জে উঠলো আবিদ হুসেন, "স্ত্রীলোকের উপর গায়ের জোর দেখাচ্ছো ? আমায় দেখাও তোমার গায়ের জোর। দেখি তোমার কতো হিম্মত।"

ফুলাদ খাঁর মুখ ক্রোধে বীভৎসরূপ ধারণ করলো। ছেড়ে দিলো মোতিজানের হাত। বললো, "তোমায় আমরা অনেক সহ্য করেছি আবিদ হুসেন, আজ তোমায় চরম শিক্ষা দেবো।"

ঝনঝন আওয়াজ হোলো। খাপ থেকে তলোয়ার বার করেছে ফুলাদ খাঁ।

মোতিজান ভয়ে অস্ফুট আওয়াজ করলো। হাত দিয়ে তাকে একপাশে সরিয়ে দিলো আবিদ হুসেন, দু'তিন পা পেছনে সরে গেল, —আর ঠিক সরে যাওয়ার সময় চকিতে তলোয়ার বার করে নিলো রদ-অন্দাজ খাঁর খাপ থেকে। বাঁকা হাসি হেসে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললো, "এসো। সেদিনের কথা ভুলে গেছ। আজ আবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক।"

ফুলাদ খাঁ এক পা এগিয়ে এসেছিলো। একথা শুনে দু-পা

পিছিয়ে গেল। তারও হঠাৎ মনে পড়লো মাসখানেক আগে জোধাবাঈয়ের আরাম গাহ্‌র পাশে সেদিনের সেই সন্ধ্যা। মুখের উপর থেকে মুছে গেল আত্মবিশ্বাসের ঔদ্ধত্য, দেখা দিলো একটা ভয় মেশানো সংশয়।

রদ-অন্দাজ খাঁ বুঝলো তার বন্ধুর মনের অবস্থা। তাড়াতাড়ি হাল্কা কণ্ঠে বললো, "এ কি করছো ফুলাদ খাঁ। তুমি শহরের কোতোয়াল। এখানে এ অবস্থায় আবিদ হুসেনের সঙ্গে লড়েছো শুনলে লোকে কি বলবে? চলো চলো, এখান থেকে চলো।"

ফুলাদ খাঁকে দ্বিতীয়বার বলতে হোলো না। সে তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে নামতে শুরু করলো সিঁড়ি দিয়ে। পেছন পেছন গেল রদ-অন্দাজ খাঁ। ওরা যখন সিঁড়ির নিচে পৌঁছে গেল, আবিদ হুসেন উপর থেকে ছুঁড়ে দিলো রদ-অন্দাজ খাঁর তলোয়ার। রদ অন্দাজ খাঁ সেটি লুফে নিয়ে নিজের খাপে পুরলো।

তারপর বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের অপসৃয়মান শব্দ।

মোতিজান দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর আবিদ হুসেনের দিকে ফিরে ওর কাঁধে হাত রেখে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বললো, "সত্যি, তুমি এতবড়ো বীর, তোমার এস সাহস—!"

ততক্ষণে আবিদ হুসেনের সম্বিৎ ফিরে এসেছে। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে তার হাঁটু দুটো। মোতিজানের হাত দুটো ধরে কম্পিতকণ্ঠে বললো, "সত্যি, আমি কি করতে বসেছিলাম! আমি তলোয়ার ভালো করে ধরতেই জানি না। ফুলাদ খাঁ জানতে পারলে আমায় টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতো।"

"তুমি কি বলছো আবিদ হুসেন," মোতিজান বলে উঠলো।

"ঠিকই বলছি। ওরা এলে আর কোনোদিন দরজা খুলে দিও না।"

॥ তিন ॥

মে শেষ হয়ে জুন মাস শুরু হোলো। বর্ষা নামলো আগ্রায়। সেদিন দোসরা জুন, রবিবার। দরবার থেকে ফেরার পথে কেল্লা থেকে একসঙ্গেই বেরোলো উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁ আর মহারাজা জসবন্ত সিংহ। সড়ক ধরে তুজনের ঘোড়া চললো পাশাপাশি, সামনে উজীরের দেহরক্ষীর মিস্‌ল্‌, পেছনে মহারাজাব। খুব নিচু গলায় কথা বলতে বলতে পাশাপাশি অশ্বচালনা করতে লাগলো মন্থরগতিতে। সকাল থেকেই আকাশ মেঘমেতুর হয়ে আছে। উজীর-উল-মুল্‌ক্‌-এর হাবেলির কাছাকাছি আসতেই বৃষ্টি শুরু হোলো।

"আজই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে ভালো হোতো," নিচু গলায় বললো জসবন্ত সিংহ, "আলোচনা তো সম্পূর্ণ হোলো না। আমাদের আবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। আমি কি অপরাহ্নে কিংবা কাল আপনার হাবেলিতে আসবো? তবে বেশী যাওয়া আসা করলে শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে খবর চলে যাবে।"

"দেরি করা উচিত হবে না," অন্যের শ্রুতিগোচর না হওয়ার মতো কণ্ঠে জাফর খাঁ উত্তর দিলো, "এ আলোচনা এখনই শেষ করতে পারলে ভালো হোতো। দাঁড়ান, আমি উপায় করছি।" চারদিক তাকিয়ে দেখলো জাফর খাঁ। তারপর উচ্চকণ্ঠে বললো "মহারাজা সাহাব, বৃষ্টি আরো জোরে নামবে মনে হচ্ছে। মহলে পৌঁছানোর আগেই ভিজে যাবেন। কিছুক্ষণ আমার গরীবখানায় বিশ্রাম করে যান।"

জসবন্ত সিংহও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো। বৃষ্টি

পড়ছে অল্প অল্প কিন্তু আকাশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে উঠছে। জাফর খাঁর পেছন পেছন হাবেলির দরওয়াজার ভিতর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলো। সুসজ্জিত উদ্যানের মাঝখান দিয়ে কঙ্করময় পথ। মিসল্-এর অন্য সবাই থেমে গেল বাইরে, শুধু দুজন দেহরক্ষী এলো পেছন পেছন। অট্টালিকার সামনে এসে জাফর খাঁ আর জসবন্ত সিংহ দুজনেই নেমে পড়লো ঘোড়ার উপর থেকে। দুজন খাদিম এসে ঘোড়া দুটি নিয়ে গেল। রাজপুত দেহরক্ষী দুজন হাবেলির প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রইলো। অন্যান্য রাজপুতদের মেওয়া বিতরণ করার হুকুম দিয়ে জাফর খাঁ জসবন্ত সিংহের হাত ধরে নিয়ে এলো নিজের মজলিসখানায়। বললো, "আপনি যে ফেরার পথে কিছুক্ষণ আমার এখানে কাটিয়ে গেছেন, এখবর শাহ-ইন-শাহ ঠিকই পাবেন। তবে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় হয়তো আর কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।"

একজন খাদিম এসে সামনে গিলৌরীর তশতরী রেখে চলে গেল। আরেকজন নিয়ে এলো থালা ভর্তি মেওয়া। জসবন্ত সিংহ একটি পান তুলে নিলো।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম," জাফর খাঁ বললো, "আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হোলো।"

"মির্জা রাজা শাহ-ইন-শাহ্‌র উপব আস্থা হারিয়ে ফেলবেন। ওঁর আর উৎসাহ থাকবে না। দিলির খাঁ তো এই অবস্থায় বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে একেবারেই নারাজ। শাহজাদা মুয়াজ্জমও মির্জা রাজার নীতি সমর্থন করেন না। হয়তো মির্জা রাজা দক্কানে আর থাকতে চাইবেন না।"

"ওঁর ফিরে আসার সামান্য আভাসও পেলে আমি শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে আপনার নাম সুপারিশ করবো দক্কানের মোগল ফৌজের মির বকশীর পদের জন্যে।"

"আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোনো বন্ধুকে দিয়ে,—এই ধরুন

খাঁ-ই-সামান ইফতিকার খাঁকে দিয়ে চিঠি লেখাবেন দিলির খাঁর কাছে যে, একটা গুজব শোনা যাচ্ছে মির্জা রাজা জয়সিংহকে সরিয়ে এনে তার জায়গায় মহারাজা জসবন্ত সিংহকে নিযুক্ত করার কথা বিবেচনা করছেন শাহ-ইন-শাহ।"

"হ্যাঁ, সে চিঠির খবর এর কান থেকে ওর কান হয়ে মির্জা রাজার কানে পৌঁছাবে। উনি খুব ক্ষুণ্ণ হবেন।"

"রাজপুতেরা সর্বত্র হাসাহাসি করছে," জসবন্ত সিংহ বললো, "মির্জা রাজা শিবাজীকে আশ্বাস দিয়ে আগ্রায় পাঠিয়েছেন, অথচ রাজপুতের মুখের কথার মান রাখার ক্ষমতা অতদূরে তাঁরও নেই, এখানে রামসিংহেরও নেই। শিবাজীর জন্যে কছওয়া কি রাঠোর কি সিসোদিয়া সব রাজপুতের মনেই একটা সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজপুতের কথার উপর ভরসা করে শিবাজীর মতো একজন বীরপুরুষ আগ্রায় এসে বিপদাপন্ন হলেন, এটা প্রত্যেক রাজপুতের আত্মসম্মানে লেগেছে। আমি যে দরবারে প্রকাশ্যে শিবাজীর বিরুদ্ধাচরণ করছি, এতে আমার অনুগত রাঠোরদের মনেও আমার প্রতি একটা প্রতিকূল মনোভাবের উদ্রেক হয়েছে।"

"খুব স্বাভাবিক," জাফর খাঁ হেসে বললো, "কিন্তু আপনার তো প্রকাশ্যে এরকম একটা নীতি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।"

"আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোলো। মির্জা রাজা শাহ-ইন-শাহ্‌র ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও হতাশ হয়েছেন। এবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল করা দরকার।"

"হ্যাঁ, শাহ-ইন-শাহ যাতে এবার মির্জা রাজার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন তার ব্যবস্থাও করতে হবে।"

"এমনভাবে করতে হবে, যাতে মির্জা রাজা আর কুমার রাম সিংহ দুজনেরই মর্যাদাহানি হয়।"

"সেটা কিভাবে সম্ভব হবে বলে আপনার ধারণা," জিজ্ঞেস করলো জাফর খাঁ।"

"আপনি কি কিছু ভাবছেন?" অতি সাবধানে উত্তর দিলো জসবন্ত সিংহ।

"মনে করুন শিবাজী এই পাহারার মধ্যেও আগ্রা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।"

"তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য খুব সহজেই সিদ্ধ হয়।"

"আমি তো উপস্থিত এর চেয়ে ভালো উপায় দেখতে পাচ্ছি না," বললো জাফর খাঁ।

"আপনি একথা পরিষ্কার করে বললেন বলে আমি খুব খুশী হলাম," জসবন্ত সিংহ বললো, "আমারও একই মত।"

"তাহলে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হলাম যে, শিবাজীর পলায়ন আমাদের স্বার্থে বাঞ্ছনীয়।"

"এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই।"

"জয়সিংহ আপনার আমার শত্রু। শিবাজী জয়সিংহের শত্রু। সুতরাং শত্রুর শত্রুকে সহায়তা করা অন্যায় বলে মনে করা আমাদের উচিত নয়।"

"আমি আপনার সঙ্গে একমত," বললো জসবন্ত সিংহ।

"কিন্তু এই সহায়তা করা হবে অত্যন্ত গোপনে।"

"তা তো বটেই।"

"এখন আপনি বলুন মহারাজ জসবন্ত সিংহ, আমরা কি করে আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারি।"

"আপনি কিছু ভেবেছেন?"

"না। আপনি কি কোনো পরিকল্পনা স্থির করেছেন?"

"না, না, আমি এখনো কিছু ভাবিনি। তবে, আমার মনে হয়, আপনি এ কাজের ভার আমার উপর ছেড়ে দিতে পারেন।"

"তা হলে তো ভালোই হয়," বললো জাফর খাঁ, "তবে আমি জানতে পারলে ভালো হোতো।"

"জাফর খাঁ," জসবন্ত সিংহ বললো, "আপনি না জানাই ভালো।

শাহ-ইন-শাহ পরে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে না।"

জাফর খাঁ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। বললো, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। তাহলে আমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব থাকে না। আর যাই হোক, আমি হুকুমত-এ-হিন্দুস্তানের উজীর-উল-মুল্‌ক। তবে কোনোরকম ভাবে আপনার সহায়তা করতে পারলে খুশী হতাম।"

"আপনি একটা কথা আমায় বলুন। আমার দরবারের একজন তরুণ সর্দার, শক্তিসিংহ রাঠোর, তার নাম আপনি শুনেছেন?"

"হ্যাঁ," হাসলো জাফর খাঁ, "খোজা ফিরোজার বাগে তার ইশ্‌কবাজির খবর আমরা শুনেছি।"

"শাহ-ইন-শাহ্‌র মনে কি এমন কোনো সন্দেহ আছে যে পান্নার মারফতে শিবাজীর সঙ্গে তার যোগাযোগ করা সম্ভব?"

"একেবারেই না," হেসে উত্তর দিলো জাফর খাঁ, "খুফিয়ানবিস আর হরকরাদের উপর শাহ-ইন-শাহ্‌র নির্দেশ আছে তার গোপন অভিসারে কেউ যেন কোনোরকম বাধা না দেয়। তাকে নিয়ে কেউ যেন মাথা না ঘামায়। সেদিকে যেন কোনোরকম নজর না দেয়।"

জসবন্ত সিংহ বললো, "আপনার কাছ থেকে দুটো ব্যাপারে সহায়তা চাই।"

"বলুন।"

"শক্তিসিংহ সম্বন্ধে শাহ-ইন-শাহ্‌র মনে যদি কোনোরকম সন্দেহের সৃষ্টি হয়, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সেই সন্দেহ ঘুচিয়ে দেওয়ার। এবং আমাকেও জানাবেন কোনোরকম বিলম্ব না করে। সম্ভব হলে এ চেষ্টাও করবেন যাতে শক্তিসিংহ সম্বন্ধে কোনোরকম খবর শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে না ওঠে।"

"এ তো অতি সহজ কাজ। অন্যটি কি?"

"ইতিমধ্যে কোনো একদিন আমার ফৌজের কয়েকজন রাঠোর জোধপুরে মহারানীর জন্যে কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে যাবে। তারা রওনা হবে প্রত্যুষে। যাত্রার তারিখ আমি যথাসময়ে জানাবো। আপনি তাদের শহর ত্যাগ করার দস্তকের ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং গোপনে দরওয়াজার চৌকিকে জানাবেন তারা যেন আমার রাঠোরদের বেশীক্ষণ না আটকায় শহরের দরওয়াজায়।"

"ব্যস, শুধু এই?"

"হ্যাঁ, আরো একটা সাহায্য চাই। শিবাজী হয়তো তাঁর অনুচরদের দক্কানে পাঠিয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইবে শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে। আপনি সুপারিশ করবেন যেন অবিলম্বে সে হুকুম পাওয়া যায়।"

"আমি একটু একটু আঁচ করতে পারছি," জাফর খাঁ হেসে বললো।

"সে চেষ্টা করবেন না," জসবন্ত সিংহ বলে উঠলো, "কারণ আমি নিজেই এখনো জানিনা, কি করে খোজা ফিরোজার বাগ থেকে বার করে আনবো শিবাজীকে।"

"বেশ, সে ভার আপনি নিন," উত্তর দিলো জাফর খাঁ, "তারপর শহর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় করে দেওয়ার ভার আমার।"

নিজের মহলে ফিরে এসেই জসবন্ত সিংহ রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করতে বসলো দুর্গাদাস রাঠোর আর শক্তিসিংহের সঙ্গে। জাফর খাঁর সঙ্গে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ শোনবার পর দুর্গাদাস জিজ্ঞেস করলো, "শিবাজীকে খোজা ফিরোজার বাগ থেকে বার করে আনার কি ব্যবস্থা করা যায় সেটা কি আপনি ভেবে রেখেছেন?"

"হ্যাঁ। আমি স্থির করেছি কি করা হবে।"

"একথা জাফর খাঁকে জানান নি।"

"না। সবাইকে অতোখানি বিশ্বাস আমি করি না।"

"অনেক ঝুঁকি আছে কিন্তু।"

"আমি যে পরিকল্পনা ভেবেছি, তাতে বিশেষ ঝুঁকি নেই। সব অসাধারণ পরিকল্পনার মতো, এটাও অতি সহজ।"

জসবন্ত সিংহ সামনে ঝুঁকে বসলো। বললো, "এ-কাজের ভার নিতে হবে শক্তিসিংহকে।"

"আমি প্রস্তুত, মহারাজ," উত্তর দিলো শক্তিসিংহ।

"মন দিয়ে শোনো। দুর্গাদাস রাঠোর অর্থ দিয়ে বশ করবে গিরধরলাল মুনশীর ভৃত্যকে। সে-ই খাদ্যের থালা বয়ে নিয়ে যায় পান্নার সঙ্গে। সে কিছুদিন অসুস্থতার ভান করে ছুটি নেবে। অন্য ভৃত্য নিয়োগ করবে পান্না। দুর্গাদাসের বিশ্বাসী কোনো লোক হবে এই ভৃত্য।"

শক্তিসিংহ আর দুর্গাদাস মন দিয়ে শুনতে লাগলো।

জসবন্ত সিংহ বলে গেল, "ইতিমধ্যে মারাঠারা আগ্রা ত্যাগ করবে শাহ-ইন-শাহ্‌র অনুমতি নিয়ে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শিবাজী শুধু একলা থাকবেন এখানে। দু'তিনজন খুব বিশ্বস্ত অনুচরও সঙ্গে থাকতে পারে। একদিন রাত্রিতে এই ভৃত্য খাবারের থালা নিয়ে শিবাজীর কক্ষে যাবে পান্নার সঙ্গে। তার হাত পা মুখ বন্ধ করে ফেলে রাখা হবে ঘরের এক কোণে। সে আমাদের লোক। সুতরাং চিৎকার শোরগোল করবে না। শিবাজী ভৃত্য সেজে পান্নার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে উচ্ছিষ্টের থালা বহন করে। ইতিমধ্যে শক্তিসিংহ গোপনে খোজা ফিরোজার বাগে প্রবেশ করবে। শাহ-ইন-শাহ্‌র খুফিয়ানবিস যারা বাইরে গোপনে অবস্থান করে, ওরা কেনো সন্দেহ করবে না। তাদের নির্দেশ দেওয়া আছে শক্তি-সিংহকে যেন বিরক্ত না করা হয়। যে জায়গায় শক্তিসিংহ পান্নার সঙ্গে মিলিত হয়, সেটা শিবাজীর মঞ্জিল থেকে বেশ দূরে। সুতরাং

শিবাজীকে যারা পাহারা দেয় ওরাও জানতে পারবে না। শক্তিসিংহ লুকিয়ে থাকবে। একটু পরে সেখানে আসবে পান্না। খুফিয়ানবিসেরা দেখবে অন্ধকারের আড়াল থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে পান্নার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আবছা চাঁদের আলোয় ওর মুখ ওরা পরিষ্কার দেখতে পাবে না, ভাববে সে শক্তিসিংহ।"

"আসলে তিনি শিবাজী ?" জিজ্ঞেস করলো দুর্গাদাস।

"হ্যাঁ। শক্তিসিংহ আত্মগোপন করেই থাকবে," বলে গেল জসবন্ত সিংহ, "কিছুক্ষণ পরে, শিবাজী ফিরোজার বাগ থেকে বেরিয়ে এসে শক্তিসিংহের অশ্বে আরোহণ করে স্বাভাবিক ভাবে চলে আসবেন এখানে, আমাদের মঞ্জিলে। খুফিয়ানবিসেরা ভাববে শক্তিসিংহ চলে আসছে। তাদের মনে কোনোরকম সন্দেহ হবে না। পরে একসময় শক্তিসিংহও চলে আসবে সবার অলক্ষ্যে। প্রত্যুষে একদল রাঠোর আগ্রা ত্যাগ করবে। তাদের জন্যে দস্তকের ব্যবস্থা হয়ে থাকবে ইতিমধ্যে। বেলা হলে জানাজানি হয়ে যাবে শিবাজীর অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ। কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব হোলো কেউ বুঝতে পারবে না। রাঠোরদের কেউ সন্দেহ করবে না। সুতরাং শিবাজী নির্বিঘ্নে অনেক দূরে চলে যেতে সক্ষম হবেন। দুর্গাদাস! শিবাজীকে নিয়ে মারওয়াড়ের পথে রওনা হবে যেই পঞ্চাশজন রাঠোর, তাদের নেতৃত্ব করবে তুমি। শক্তিসিংহও যাবে তোমার সঙ্গে।"

"আমিও!" শক্তিসিংহ যেন ঈষৎ বিচলিত হোলো।

"হ্যাঁ, শক্তিসিংহ," মহারাজা জসবন্ত সিংহ উত্তর দিলো, "শিবাজীর জীবন আর আমার ইজ্জত, দুটোই নির্ভর করছে এই পরিকল্পনার সাফল্যের উপর। সুতরাং অত্যন্ত বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ লোকের উপরই দিতে পারি একাজের ভার। কেন, এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে তুমি কি দ্বিধাবোধ করছো ?"

"না, মহারাজ," শক্তিসিংহ উত্তর দিলো, "প্রয়োজন হলে আমি

নিজের প্রাণ দিয়ে আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে প্রস্তুত আছি।”

দুর্গাদাস বুঝতে পারলো শক্তিসিংহের বিচলিত হওয়ার কারণ। জসবন্ত সিংহের অলক্ষ্যে সে শক্তিসিংহ রাঠোরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

দুদিন পর কুমার রামসিংহ সাক্ষাৎ করতে এলো শিবাজীর সঙ্গে। সেদিন ছয়ই জুন, বৃহস্পতিবার। এইদিনে সরকারী দফতর অর্ধেক দিন বন্ধ, সন্ধ্যার দরবারও হয়না। পরদিন শুক্রবার, সারাদিন ছুটি। সুতরাং খুব নিশ্চিন্ত মনেই এলো রামসিংহ। ভাবলো এই দুদিন শিবাজীকে ভালো করে বুঝিয়ে বাদশাহ্‌র প্রতি শর্তবিহীন আনুগত্য প্রকাশ করতে রাজী করানো যাবে। নিজের অতিথির পাহারাদারির ভার যে নিজেকেই নিতে হয়েছে বাদশাহ্‌র হুকুমে এতে সে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করছিলো।

শিবাজী তখন গম্ভীর মুখে নিরাজী রাওজী ও দত্ত ত্রিম্বকের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলো। রামসিংহের আগমনঘোষণা শুনে দিওয়ানখানার দ্বারপ্রান্তে এসে তার অভ্যর্থনা করে তাকে ভিতরে নিয়ে বসালো। রামসিংহ কিছু বলবার আগেই শিবাজী বলে উঠলো, “আপনার উপর আপনাদের বাদশাহ্‌র অগাধ বিশ্বাস।”

রামসিংহ ভাবলো শিবাজীর পাহারার দায়িত্ব বাদশাহ্‌ আওরংজেব তার উপর অর্পণ করেছে বলে এই ব্যঙ্গোক্তি। তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, “শিবাজী, আপনি একথা নিশ্চয়ই জানেন, খোজা ফিরোজার বাগের বাইরে পাহারায় মোতায়েন করা হয়েছে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর পিয়াদাদের। আসলে আপনাকে পাহারার ভার যেমন দেওয়া হয়েছে আমাকে, তেমনি আমার উপর খবরদারি করার ভার দেওয়া হয়েছে ফুলাদ খাঁকে। তাহলেই বুঝে নিন, শাহ-ইন-শাহ্‌ আমাকে কিরকম বিশ্বাস করেন।”

শিবাজী হাসলো। তারপর বললো, "আপনাদের দরবারের কেতা কায়দার জটিলতা তো আমি বুঝিনা। আওরংজেব আমাকে যেকথা জানিয়েছে, সেকথাই আপনার কাছে উল্লেখ করলাম।"

"শাহ্-ইন-শাহ্ কি জানিয়েছেন আপনাকে," সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো কুমার রামসিংহ।

"আওরংজেবের কাছে আরজ পেশ করেছিলাম আমাকে যেন আর আপনার হিফাজতে রাখা না হয়, আমার জন্যে যেন একটা স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় অন্য জায়গায়। তার উত্তরে আওরংজেব জানিয়েছে যে, কুমার আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বান্দা, এত বিশ্বস্ত যে তার স্থান নিতে পারে এমন আর কাউকে আমি দেখছি না। সুতরাং তোমাকে থাকতে হবে তারই হিফাজতে। বুঝলেন কুমার সাহাব, এজন্যেই বলছিলাম আপনার উপর আওরংজেবের অগাধ বিশ্বাস, তিনি মনে করেন যে আপনি তার অতি বিশ্বস্ত বান্দা, আপনার তুলনা নেই।"

বিশ্বস্ত বান্দা কথা দুটির উপর জোর দিলো শিবাজী। রামসিংহের মুখ আরও লাল হয়ে উঠলো। নীরস কণ্ঠে বললো, "শাহ্-ইন-শাহ্ যখন আমাকে এত বিশ্বাস করেন, আমি নিরুপায়, এই বিশ্বাসের মর্যাদা আমায় রাখতেই হবে। আপনার ভার দেওয়া হয়েছে আমাকেই। সুতরাং আপনি যদি পলায়ন করেন, অথবা নিজের প্রাণ নিজে নেন, শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকেই। এই কারণে আমাদের দরবারের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন সর্দারদের নিযুক্ত করছি আপনার এখানে। কিন্তু আপনি আমার সম্মানিত অতিথি, আপনার কোনোরকম অমর্যাদা করার ইচ্ছে আমার নেই। তাই নিজের মুখেই আপনাকে জানাতে এলাম যে, ওরা শুধু যে আপনাকে পাহারা দেবে তা নয়, ওরা আপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করবে। আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে ওরা কোনো রকম দ্বিধা করবেনা।"

শিবাজী হাসিমুখে বললো, "এটুকুই আমার সান্ত্বনা, পাহারাদারেরা কয়েদীকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাচ্ছে। কয়েদী অতিথির প্রতি এই সম্মানের জন্যে প্রত্যেক মারাঠা চিরকাল বাধিত থাকবে প্রত্যেক কছওয়া রাজপুতের কাছে।"

এই ব্যঙ্গ কছওয়া রাজকুমারকে কাঁটার মতো বিঁধলো। রামসিংহ উঠে দাঁড়ালো কোনো উত্তর না দিয়ে। শিবাজী তাকে বসতে বললো না, নিজেও উঠে দাঁড়ালো না। শুধু উঠে দাঁড়ালো নিরাজী রাওজী আর দত্ত ত্রিম্বক।

"আমাকে এভাবে সম্মান দেখানোর জন্যে যাদের যাদের নিযুক্ত করেছেন," বললো শিবাজী, "আমি কি তাদের নাম জেনে বাধিত হতে পারি?"

"না, নাম জানাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তেজসিংহ, করণ সিংহ আর তাদের অনুচরেরা পাহারায় থাকবে আপনার মঞ্জিলের ভিতর। মঞ্জিলের বাইরে টহলদারিতে নিযুক্ত করা হয়েছে অর্জন সিংহ, সুখ সিংহ নাথাওয়াত, বল্লু শাহ্ প্রভৃতি আর কয়েকজনকে। এদের নাম কেতামাফিক আপনার কাছে পেশ করবার জন্যেই আমি নিজে এসেছিলাম যাতে আপনার মর্যাদাহানি না হয়।"

"শুধু এদের নাম জানানোর জন্যে এসেছিলেন?" গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো শিবাজী, উপবিষ্ট অবস্থাতেই।

রামসিংহ বিস্মিত হয়ে শিবাজীর দিকে তাকালো। শিবাজী তার সঙ্গে কথা বলছে বন্দীর মতো নয়, দরবারে সমাসীন রাজার মতো। রামসিংহই যেন রাজার সামনে সমাগত একজন সামন্ত। ইচ্ছে হোলো, আবার বসে পড়ে, বসে কথার উত্তর দেয়। কিন্তু এমন একটা আশ্চর্য দীপ্তি ছিলো শিবাজীর চোখে যে, রামসিংহ সোজা তাকাতে পারলো না, বসতেও পারলো না, দাঁড়িয়ে রইলো চক্ষু অবনত করে। শিবাজীর ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হোলো।

"বলুন, শুধু ওদের নাম জানানোর জন্যেই এসেছিলেন?" শিবাজীর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হোলো।

"না," মুখ তুলে অসঙ্কোচে উত্তর দিলো রামসিংহ। সেও রাজপুত বীর, স্বয়ং মহারাজা জয়সিংহের পুত্র, অম্বর রাজ্যের যুবরাজ। মনের কুণ্ঠা কাটিয়ে সগর্বে উত্তর দিলো, "না, আরো কথা ছিলো আপনার সঙ্গে, তবে এখন মনে হচ্ছে সে সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি পত্র প্রেরণ করেছি আমার পিতা মহারাজা জয়সিংহের কাছে। তিনি যা নির্দেশ দেবেন, তাই করবো। যদ্দিন তাঁর কোনো নির্দেশ না আসে, এখন যেরকম ব্যবস্থা হয়েছে এটাই চলবে।"

"কুমার-জী!"

"বলুন।"

"আপনি এসেছিলেন আমায় একথা বোঝাতে যে, আমি যেন আওরংজেবের কাছে আমার আনুগত্য প্রকাশ করে আবার আরজ পেশ করি, তিনি আমায় যা হুকুম দেবেন তাই যেন বিনা দ্বিধায় পালন করি, কাবুল হোক আসাম হোক যেখানে আমায় পাঠানো হয় সেখানেই যেতে যেন সাগ্রহে প্রস্তুত হই। এই তো?"

"উপস্থিত এরকম ব্যবস্থায় কোনো ক্ষতি হোতো না," উত্তর দিলো রামসিংহ, "বরং ভালোই হেতো।"

"রামসিংহ!" দূরাগত মেঘগর্জনের মতো একটা আওয়াজ এলো শিবাজীর কণ্ঠ থেকে, "রামসিংহ! আওরংজেবকে আপনি এখনো চেনেন নি।"

রামসিংহ কোনো উত্তর দিলো না।

"নির্বোধ!" ব্যঙ্গ ভরে অধর বঙ্কিম করে বললো শিবাজী।

রামসিংহ অধর দংশন করলো। বাঁ-হাত হঠাৎ উঠে এলো তলোয়ারের হাতলে। সঙ্গে সঙ্গে দত্ত ত্রিম্বকের হাতও তার নিজের অসি স্পর্শ করলো। শিবাজী হাসলো একটুখানি, তারপর হাতের ইশারায় নিবৃত্ত করলো দত্ত ত্রিম্বককে। রামসিংহের দিকে ফিরে

বললো, "কুমার-জী, আপনি আমার জন্যে জামীন হয়ে আওরংজেবের কাছে মুকল্‌চাহ্‌ দস্তখত করে দিয়েছেন। আমার এখন অনুরোধ, আপনি সেটা ফেরত নিয়ে নিন। আপনাদের বাদশাহ আমায় নিয়ে যা খুশী করুক, আপনার আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না। আমি চাই না যে আমার জন্যে আপনি দায়ী হোন।"

রামসিং বিবর্ণ হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "মুকল্‌চাহ্‌ ফেরত নেবো? একথা কেন বলছেন, শিবাজী?"

"আপনি বুঝতে পারেন নি?"

"না তো।"

"আমি পালিয়ে যাবো," শিবাজী শান্ত কণ্ঠে বললো।

"কি!" রামসিংহ স্তম্ভিত হোলো শিবাজীর নির্বিকার আত্ম-বিশ্বাসের ভঙ্গি দেখে।

"আমি পালিয়ে যাবো আগ্রা থেকে," আস্তে আস্তে বললো শিবাজী, "আপনাকে না জানিয়ে আমি কিছু করবো না বলে কথা দিয়েছিলাম। তাই আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি এখন যা খুশী করতে পারেন, যেভাবে খুশী আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টা করতে পারেন। ইচ্ছে হয়, আপনার মালিক শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌কেও জানিয়ে দিতে পারেন। যদি কারো সাধ্য থাকে, আমায় এখানে আটকে রাখুক।"

রামসিংহ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো শিবাজীর দিকে। সবাইকে জানিয়ে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করবে শিবাজী! একথা সে বিশ্বাস করতে পারলো না। সে জানতো শিবাজী অসাধারণ বুদ্ধিমান। মনে হোলো এ নিশ্চয়ই শিবাজীর কোনো একটা নতুন চাল। কিন্তু কিছুতেই তার আসল মতলব অনুধাবন করতে পারলো না। সে তাকালো নিরাজী রাওজীর দিকে, দত্ত ত্রিম্বকের দিকে। ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলেশহীন তাদের গম্ভীর মুখ। রামসিংহ ফিরে তাকালো শিবাজীর দিকে। দেখলো শিবাজীর মুখে মৃদু হাসি।

"আমি তো বলছি, আপনাদের বাদশাহ্‌কে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসুন। আরো কড়া পাহারার ব্যবস্থা হোক। আমাকে নিয়ে রাখা হোক আগ্রার দুর্গের কয়েদখানায়। সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করুক আমায় এখানে আটক করে রাখার।"

রামসিংহ উত্তর দিলো, "আপনি জানেন যে, আপনার কোনো ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার অনুরোধ, আপনি উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ কিছু করে বসবেন না, অন্তত একটি মাস। আমি আমার পিতা মহারাজা জয়সিংহের কাছে পত্রপ্রেরণ করেছি। তাঁর উত্তর না আসা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।"

"কুমার রামসিংহ," তীব্র কণ্ঠে বললো শিবাজী, "আমি যা করি, আমার সুবিধে মতোই করবো। আপনাদের সুবিধে মতো কোনো কিছু করার ধৈর্য আমার আর নেই।"

রামসিংহের মুখের উপর দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কোনো উত্তর দিলো না সে। দু'চার মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর চলে গেল বিদায় নিয়ে। শিবাজী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো না। নিরাজী রাওজী, দত্ত ত্রিম্বক কেউ গেল না তাকে এগিয়ে দিতে।

পরদিন সন্ধ্যার পর শক্তিসিংহ রাঠোর আবার মিলিত হোলো পান্নার সঙ্গে। তিনদিন আগে তাকে জানিয়েছিলো মহারাজা জসবন্ত সিংহের পরিকল্পনা। পান্না বলেছিলো, শুক্রবার এসে শিবাজীর উত্তর জেনে যেতে।

"কি বললেন শিবাজী," শক্তি সিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"তিনি রাজী হয়েছেন," পান্না উত্তর দিলো, "মহারাজা জসবন্ত সিংহকে একথা জানাতে বলেছেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আজ থেকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে শুরু করেছেন।"

শক্তিসিংহ খুশী হোলো এ খবর জেনে। জিজ্ঞেস করলো, কি

ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন শিবাজী। পান্না জানালো যে, আজ সকালে জোহ্‌রী-বাজার থেকে মুলচন্দ সাহুকারকে ডাকিয়ে এনে সমস্ত মোতি সোনাদানা, নগদ দক্কানী হুন ও সোনার মোহর তার জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে। মুলচন্দ সাহুকারের লোক সেগুলো দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাবে যথাসময়ে।

"শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে নিশ্চয়ই এ খবর যাবে," শক্তিসিংহ বললো।

"উনি শুধু জানবেন যে মুলচন্দ সাহুকারকে ডাকিয়ে আনা হয়েছে অর্থের জন্যে। শিবাজীর যে ইদানীং অর্থাভাব হয়েছে, এমন একটা ধারণা করিয়ে দেওয়া হচ্ছে চারদিকে। শাহ-ইন-শাহ্‌ একথাই অনুমান করবেন যে মুলচন্দজী হীরামোতি সোনা বাঁধা নিয়ে নগদ অর্থ ঋণ দিয়েছেন শিবাজীকে। ওঁকেও একথা বলার জন্যেই নির্দেশ দেওয়া আছে। এর জন্যে তাঁকেও প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে।"

"মারাঠাদের শিবির আজ খুব স্তব্ধ মনে হচ্ছে," বললো শক্তিসিংহ।

পান্না উত্তর দিলো, "শিবাজী তাঁর সমস্ত অনুচর ভৃত্য পিয়াদা বারগিরদের এখান থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"সে কি! কোনো খবর তো পাইনি!"

"আজ শুক্রবার, ছুটির দিন। দরবারে কোনো খবর যায়নি। তাই হয়তো জানো না। শিবির উঠে গেছে এখান থেকে। শিবাজী তাঁর সহচরদের বললেন,—তোমরা চলে যাও, আমার সঙ্গে কারো আর থাকার প্রয়োজন নেই। আওরংজেব যদি আমায় নিহত করতে চান, তাই করুন, তোমরা কিছুই করতে পারবে না।"

"মারাঠারা কোনো প্রতিবাদ না করেই মেনে নিলো একথা?"

"হ্যাঁ, কেউ একটি কথাও বললো না।"

"ওদের নিশ্চয়ই গোপনে কিছু জানানো হয়েছে।"

"হতে পারে।"

"তারপর?"

পান্না বলে গেল, "মারাঠারা তাঁবু তুলে ফেলে বানজারা সাজিয়ে ঘোড়া অশ্বতরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে কুঁবর-সার কাছে খবর পাঠালো যে, আমরা চলে যাচ্ছি। কুঁবর-সা তেজসিংহ কছওয়ার মারফত তাদের আশ্বাস দিয়ে জানালেন যে, তাদের অতো ব্যস্ত হবার কিছু নেই। উজীরের কাছারি থেকে শহর ত্যাগ করার দস্তক না এলে এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু মারাঠারা শুনবে না। তাদের রাজার আদেশ, তারা যেন চলে যায়। এই আদেশ তারা অমান্য করতে পারবে না।

কুঁবর-সা জানালেন,—বেশ, শিবাজীর মঞ্জিলের কাছে থাকার দরকার নেই। খোজা ফিরোজার বাগের অন্য প্রান্তে কছওয়া ফৌজের ছাউনির পিছন দিকে গিয়ে ওরা তাঁবু খাঁটিয়ে থাকুক।

"কিন্তু শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুম না নিয়ে শিবাজী মারাঠাদের শহর ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেই বা পারেন কি করে," শক্তি সিংহ সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো।

"শিবাজী কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর মারফত শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে আরজ পেশ করেছেন যে, আমি আমার সহচরদের দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছি। তাদের সবাইকে দস্তক দেওয়ার হুকুম হোক।"

"আজ ছুটির দিন," বললো শক্তিসিংহ, "আজ তো শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে এই আরজ পৌঁছাবে না। কাল খাস দরবারে নিশ্চয়ই পেশ করা হবে।"

"কিন্তু উনি কি আরজ মঞ্জুর করবেন?"

"হয়তো করবেন। সেরকমই ব্যবস্থা করা হয়েছে। উজীর-উল-মুলক্ জাফর খাঁ নিজে সুপারিশ করবেন আরজ মঞ্জুর করার জন্যে।"

পান্না হাসলো "জানো শক্তিসিংহ, এর জন্যে শিবাজী তাঁর কাছে দুটি বহুমূল্য হীরা পাঠিয়েছেন।"

শক্তিসিংহও হাসলো। "পান্না, একটি হীরা আমাদের মহারাজার আঙুলে দেখলে আমি বিস্মিত হবো না।"

পান্না আর শক্তিসিংহ দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো। তারপর পান্না বললো, "শক্তিসিংহ, অতো জোরে হেসো না। কেউ শুনতে পেলে অসুবিধে হবে। গিরধরলালজী আমাকে মানা করে দিয়েছেন এদিকে আসতে। আচ্ছা, এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে আর কদ্দিন চলবে?"

শক্তিসিংহ ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললো, "পান্না!"

"কি?"

"এভাবে আর বেশীদিন নয়।"

"আর তো উপায় নেই শক্তিসিংহ।"

"পান্না, আমাকেও আগ্রা ত্যাগ করতে হবে। মহারাজার হুকুম

"তুমি চলে যাচ্ছো!" পান্না ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কবে?"

"রাঠোরদের যে দলটির সঙ্গে শিবাজী আগ্রা ত্যাগ করছেন, সেই দলে আমিও আছি।"

পান্না চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি চলে গেলে আমি কি করে এখানে দিন কাটাবো?"

"তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।"

"তোমার সঙ্গে!"

"হ্যাঁ। আমি স্থির করেছি গিরধরলালজীর কাছে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করবার অনুমতি চাইবো।"

পান্না একটু ভাবলো, তারপর বললো, "শক্তিসিংহ, কুঁবর-সার

অনুমতি না নিয়ে গিরধরলালজী তোমাকে কোনো কথা দিতে পারবেন না। আর, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাঠোরের সঙ্গে কছওয়া-কন্যার বিবাহের অনুমতি কুঁবর-সা কিছুতেই দেবেন না।"

"সেই সম্ভাবনার কথাও আমি ভেবে রেখেছি। যদি গিরধর-লালজীর অনুমতি পাওয়া না যায়—"

"অনুমতি চাইতে যেয়ো না শক্তিসিংহ। অনুমতি তো পাবেই না, বরং আমার উপর কড়াকড়ি শুরু হবে। যদি তোমার সঙ্গে এভাবে গোপনে দেখা করার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে শিবাজীর মুক্তির পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, তাও তো বটে," চিন্তান্বিত হয়ে বললো শক্তিসিংহ, "তা হলে অন্য ব্যবস্থাই অবলম্বন করা যাক।"

"কি ব্যবস্থা ?"

"শোনো। যেদিন শিবাজী এখান থেকে পালিয়ে যাবেন আমার ঘোড়ায় চেপে, আমারই পোষাক পরে,—সেদিন আমি ছুটি ঘোড়া নিয়ে আসবো।"

"কেন ?"

"শিবাজীর সঙ্গে তুমিও যাবে। খুফিয়ানবিসেরা ভাববে তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছো। ইশকবাজির উপর সব মোগলেরই একটা দুর্বলতা আছে। একথা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করবে না।"

"সময়মতো ঘরে না ফিরলে গিরধরলালজী খোঁজাখুঁজি করবেন।"

"আমি গিয়ে ওঁর হাত পা মুখ বন্ধ করে রেখে আসবো। তাহলে পরদিন সকাল পর্যন্ত কেউ আর টের পাবে না। চাকরটি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় থাকবে শিবাজীর শয়নকক্ষে।"

"পরদিন কছওয়ারা ক্ষেপে যাবে রাঠোরদের উপর।"

"তাই তো আমাদের কাম্য। শিবাজী যে রাঠোরদের সঙ্গে যেতে পারেন এই সন্দেহ কারো হবে না।"

"আমার খোঁজে কছওয়ারা রাঠোরদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে। তাতে শিবাজীর ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।"

"শিবাজী, আমি, দুর্গাদাস রাঠোর আর তুমি, আমরা এই চারজন অন্যপথ ধরবো।"

পান্না মুখ নিচু করে ভাবতে লাগলো।

"কি হোলো পান্না," শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো, "তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?"

মুখ তুলে পান্না উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, যাবো।"

কিছুক্ষণ পর শক্তিসিংহ চলে গেল। পান্নাও ফিরে চললো নিজের বাড়ির দিকে।

ঝাড়ের আড়াল থেকে চুপচাপ এদের কথা শুনছিলো কৃষ্ণাজী আপ্তে। ওরা অদৃশ্য হওয়ায় পর কৃষ্ণাজী বেরিয়ে এলো। সন্তর্পণে চারদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রওনা হোলো শিবাজীর মঞ্জিলের দিকে। কাছাকাছি আসতেই দেখতে' পেলো, অন্যদিক থেকে আসছে দত্তজী ত্রিম্বক।

"ছিলে কোথায়," সে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণাজীকে, "তোমায় চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মহারাজা তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।"

দত্তজীর সঙ্গে কৃষ্ণাজী উপস্থিত হোলো শিবাজীর কাছে। রণসিংহ আর দুজন রাজপুত বাইরে বসেছিলো চুপ করে। তারা শিবাজীর পাহারায় থাকলেও তাদের উপর রামসিংহের নির্দেশ ছিলো কোনোরকম খবরদারিসূচক মনোভাব যেন তাদের আচরণে প্রকাশ না পায়। এজন্যে বাইরের অলিন্দে তারা একটি চার-পাইয়ের উপর বসে থাকতো সাধারণ অভ্যাগতের মতো। কাউকে কিছু বলতো না। ওরা নীরবে হাত তুলে অভিবাদন করলো কৃষ্ণাজীকে। কৃষ্ণাজীও প্রত্যভিবাদন করে দত্তজীর পেছন পেছন ভিতরে চলে গেল।

"কৃষ্ণাজী," শিবাজী জিজ্ঞেস করলো, "সেদিন আমার কাছে আওরংজেবের এক খুফিয়ানবিস এসেছিলো। তার নাম আবিদ হুসেন খাঁ। তার কোনো খবর জানো?"

কৃষ্ণাজী উত্তর দিলো, "শুনেছি, বাদশাহ্ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন, তাকে মানা করে দিয়েছেন দরবারে আসতে।"

"হ্যাঁ, সেরকম একটা কথা আমিও শুনেছি বটে। লোকটা বড়ো ভালো। এসব লোকের একটু উপকার করা উচিত, কি বলেন নিরাজী? কৃষ্ণাজী, তুমি আবিদ হুসেন খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে?"

"সে শক্তিসিংহ রাঠোরের বন্ধু। তার মারফতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।"

শিবাজীর চোখের দৃষ্টি এক পলকের জন্যে তীক্ষ্ণ হোলো। কিন্তু কৃষ্ণাজীর চোখে পড়লো না এই ভাবান্তর।

শিবাজী দৃষ্টি ফিরিয়ে উত্তর দিলো, "শক্তিসিংহ রাঠোর? সে আবার কে?"

এবার মুহূর্তের জন্যে তীক্ষ্ণ হোলো কৃষ্ণজীর দৃষ্টি, এবং শিবাজী পরিষ্কার লক্ষ্য করলো কৃষ্ণাজীর মুখের ভাব। তারপরই বললো, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হ্যাঁ, ওর কথা আমি শুনেছি। না, কৃষ্ণাজী, অন্য কারো মারফতে আমি আবিদ হুসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই না। তুমি নিজেই যাও। কয়েকটি কথা আওরংজেবের কানে ওঠা দরকার। জসবন্ত সিংহের ফৌজের যে কয়েকজন রাঠোর আগ্রা ত্যাগ করে মারওয়াড় রওনা হওয়ার জন্যে দস্তক মঞ্জুর করবে আরজ জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে যে আমারও থাকবার সম্ভাবনা আছে, এ খবর তুলে দাও আবিদ হুসেনের কানে।"

অভিবাদন করে কৃষ্ণাজী চলে গেল।

দত্তজী ত্রিম্বক বললো, "রাঠোরদের দস্তক না-মঞ্জুর হলে আমাদের কি লাভ?"

শিবাজী উত্তর দিলো, "দস্তক ঠিকই মঞ্জুর হবে। আমি আওরংজেবকে যদ্দুর চিনি, সে আমাকে ধরতে চাইবে আগ্রার দরওয়াজায়, রাঠোরদের সঙ্গে। তাহলে তার অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাই এখন থেকে পাহারার কড়াকড়ি শুরু হবে শহরের দরওয়াজায়। সে চাইবে আমার এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া যেন ব্যাহত না হয়। এখানে ওর খুফিয়ানবিসের নজর ঠিকই থাকবে, কিন্তু কেউ আমায় আটকাবে না। ব্যস, ততোটুকু সুযোগই আমি চাই, তার বেশী নয়।"

নিরাজী রাওজী হাসলো। বললো, "মহারাজা জসবন্ত সিংহ যদি একথা জানতে পারতেন তাহলে খুবই ক্ষুণ্ণ হতেন।"

শিবাজী উত্তর দিলো, "জসবন্ত সিংহের বুদ্ধিতে চলতে হলে শিবাজীকে দাক্ষিণাত্যে পৌছানোর সব আশা ত্যাগ করতে হবে। ওকে যতোটুকু দরকার ততোটুকুই ব্যবহার করবো। কিন্তু আসল পরিকল্পনা আমার একলার। সেটা কাউকে জানতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

শক্তিসিংহ দুদিন ধরে খুঁজছিলো আবিদ হুসেনকে। কিন্তু সময়মতো ধরতে পারলো না কোথাও, মোতিজানের বাড়িতে নয়, তার নিজের বাড়িতে নয়, বাজারের কাফিখানাতেও নয়। তারপর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সোমবার দিন।

মহারাজা জসবন্ত সিংহের মিসল্‌-এর সঙ্গে শক্তিসিংহও এসেছিলো কেল্লার ভিতর। জসবন্ত সিংহ চলে গেল আম-দরবারে। শক্তিসিংহ বাইরে গুলালবারে এসে গল্প করতে লাগলো অন্যান্য রাঠোরদের সঙ্গে। বিভিন্ন উমরাহদের মিসল্‌এর লোকেরা এখানে এসে ভিড় জমায়। দরবারের, শহরের, মহলের নানারকম গুজব খবরাদি শোনা যায় নানাজনের মুখে। সেখানেই শুনতে পেলো কুমার রামসিংহের সঙ্গে দরবারে এসেছে শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী।

শিবাজীর মঞ্জিলের চারদিকে একদল শাহী লশকরকে মোতায়েন করা হয়েছে কাল সন্ধ্যা থেকে। আম দরবারে মহম্মদ আমিন খাঁ উজীর জাফর খাঁর মারফতে শিবাজীর একটি আরজ পেশ করেছিলো। শিবাজী সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চান। তাই বেনারস যাওয়ার হুকুম চেয়েছেন বাদশাহ্‌র কাছে। বাদশাহ্‌ সলামত জানিয়েছেন—শিবাজী ফকির হয়ে এলাহাবাদের কেল্লায় থাকতে পারে। এলাহাবাদের সুবাদার বাহাদুর খাঁ সেখানে তার উপর নজর রাখতে পারবে।

গুলালবারে বিভিন্ন দলের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হোলো। রাঠোরেরা বললো, শিবাজীকে মুক্তি দেওয়া উচিত। মোগলেরা বললো, শিবাজীকে কেল্লার কয়েদখানায় স্থানান্তরিত করা উচিত। একটি বিষয়ে সবাই একমত হোলো যে, বাদশাহ সলামত শিবাজীর সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অত্যন্ত বিলম্ব করছেন। এই বিলম্ব বাদশাহ আলমগীরের মতো ব্যক্তির পক্ষে অস্বাভাবিক। একজন কছওয়া রাজপুতের মুখে শোনা গেল, শাহ-ইন-শাহ পত্রপ্রেরণ করেছেন মির্জা রাজা জয়সিংহের কাছে। এখন পর্যন্ত কোনো উত্তর আসেনি। মির্জা রাজার উত্তর আসবার পর একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

শক্তিসিংহ মনে মনে হেসে ভাবলো,—মির্জা রাজার উত্তর আসবার আগেই আমরা আগ্রা থেকে উধাও।

চারদিকে নানারকম আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে সমাপ্ত হোলো আম-দরবার। উমরাহ্‌ মনসবদারেরা এসে ভিড় করলো গুলালবারে। আরো অনেক রকম গুজব শোনা গেল। শিবাজীর মারাঠা অশ্বারোহীরা দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কয়েকদিন আগে ওদের জন্যে দস্তকের আরজ পেশ করেছেন শিবাজী। শাহ-ইন-শাহ এখনো মনস্থির করতে পারেন নি। তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছে, এখানে একজন নকল শিবাজীকে রেখে আসল

শিবাজী মারাঠা বারগির সেজে চলে যেতে পারে তাদের সঙ্গে। তাই কাল থেকে শাহী লশকর মোতায়েন করা হয়েছে শিবাজীর মঞ্জিলের চারদিকে।

একথা শুনে শক্তিসিংহের মনে একটু ভাবনা হোলো। এখন খোজা ফিরোজার বাগে পাহারার কড়াকড়ি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কান পেতে এর কথা ওর কথা শুনতে শুনতে শক্তিসিংহ হঠাৎ দেখতে পেলো এদিকে এগিয়ে আসছে আবিদ হুসেন খাঁ। তাকে দেখে শক্তিসিংহ একটু বিস্মিত হোলো। সে জানতো যে, সম্প্রতি আবিদ হুসেন বাদশাহ্‌র নেকনজরে নেই। তার দরবারে আসার হুকুম রদ করে দেওয়া হয়েছে।

শক্তিসিংহ তার দিকে এগিয়ে গেল। তাকে ধরে টেনে নিয়ে গেল একটু নিরালায়, জিজ্ঞেস করলো, "তুমি হঠাৎ এখানে কেন?"

"খিলওয়াতগাহ্‌তে শাহ-ইন-শাহকে কুর্নিস জানাতে যাচ্ছি।"

"সে কি!" অবাক হোলো শক্তিসিংহ, "শাহ-ইন-শাহ তোমায় মার্জনা করেছেন?"

"এখনো করেন নি, আজকে করবেন," অকুণ্ঠ আত্মবিশ্বাসে জানালো আবিদ হুসেন, "আকিল খাঁর মারফৎ কাল আরজ পেশ করেছিলাম আজ অন্তত একটিবারের জন্যে খিলওয়াতগাহতে আমাকে হাজির হওয়ার হুকুম দেওয়ার জন্যে। বাদশাহ সলামত আমার আরজ মঞ্জুর করেছেন।"

শক্তিসিংহ একটু ভাবলো। তারপর বললো, "আবিদ হুসেন, তুমি আমার বন্ধু। একটা বিশেষ ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই।"

"আমি তোমার খাদিম, কি করতে হবে বলো।"

"ব্যাপারটা খুব গোপনীয়।"

"আমি কসম খেয়ে বলছি তুমি যা বলবে আমি কাউকে জানাবো না।"

"আমি পালিয়ে যাচ্ছি।"

"তুমিও!" আবিদ হুসেন সবিস্ময়ে বললো।

"আমিও মানে? আর কে পালাচ্ছে?"

"আর বোলো না। মোতিজানকে নিয়ে আমি গোয়ালিয়র পালিয়ে যাবো এই মতলব করেছিলাম। কাল সকালে কৃষ্ণাজী এসে জানালো শিবাজীও পালিয়ে যাচ্ছে—"

"কি?" চমকে উঠলো শক্তিসিংহ।

"আরে হ্যাঁ। খুব গোপনীয় খবর। কাউকে বোলো না। আচ্ছা,—তারপর, এখন তুমি বলছো তুমিও পালিয়ে যাচ্ছো। শুনছি কয়েকমাস পরে বাদশাহ সলামতও আগ্রা ছেড়ে দিল্লী চলে যাচ্ছেন। ভাই, এরকম পালিয়ে যাওয়ার হিড়িক শুরু হলে আগ্রায় থাকবে কে?"

অধৈর্য হয়ে উঠছিলো শক্তিসিংহ। সে বলে উঠলো, "আবিদ হুসেন খাঁ, কৃষ্ণাজী এসেছিলো তোমার কাছে?"

"হাঁ ইয়ার।"

"সে তোমায় কি বলেছে?"

"সে বলেছে, তোমাদের মহারাজা একদল রাঠোরকে পাঠাচ্ছেন জোধপুর। তাদের জন্যে দস্তক মঞ্জুর করার আরজ পেশ করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে শিবাজী গোপনে আগ্রা ত্যাগ করবেন। সে আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন খবরটা শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে তুলে দিই।"

"কৃষ্ণাজী! কৃষ্ণাজী তোমাকে এই অনুরোধ করেছে?" স্তম্ভিত হোলো শক্তিসিংহ। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এখন শাহ-ইন-শাহ্‌কে খবরটা দিতে যাচ্ছো?"

"না।"

"তাহলে?" আরো বিস্মিত হোলো শক্তিসিংহ।

"দেখ ভাই শক্তিসিংহ, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। রাজা

বাদশাহ্‌র নেকনজর ভালো নয়। আজ একটা খবর দিলাম বলে আমার প্রতি খুব অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন, কাল কোনো একটা খবর দিতে পারিনি বলে বিরূপ হবেন, এসব আমি আর সহ্য করতে রাজী নই। আমি স্থির করেছি পুরো খবর আর দেবো না। আধখানা খবর দেবো, আধখানা খবর হাতে রাখবো। কাল আকিল খাঁকে গিয়ে ধরে পড়লাম। আকিল খাঁর অনুরোধে শাহ-ইন-শাহ আমায় আজ খিলওয়াতগাহ্‌তে গিয়ে তাঁকে কুর্নিস জানানোর হুকুম দিলেন।"

"শাহ-ইন-শাহ তো খিলওয়াতগাহ্‌তে যাবেন অপরাহ্নে। এবেলা তো আর যাবেন না।"

"আজকে যাবেন। খাসদরবার থেকে আজ আর সোজা মহলে ফিরবেন না।"

"কি জানাবে বাদশাহ্‌কে ?"

"আধখানা খবর।"

"শুনি না সেটা কি ?"

"ওঁকে শুধু জানাবো যে কৃষ্ণাজী কাল আমার কাছে এসেছিলো। ব্যস আর কিছু নয়।"

"তিনি জানতে চাইবেন কৃষ্ণাজী কেন এসেছিলো।"

"আমি বলবো, কৃষ্ণাজী বলেছে,—আবিদ হুসেন খাঁ, তুমি যদি বিনা পরিশ্রমে একশো আশরফি রোজগার করতে চাও, তাহলে খোজা ফিরোজার বাগের কাছে যে পাঁচটি তালগাছ আছে সড়কের ধারে, সেখানে একবার আসবে।—ওরকম একটা কথা সে যে বলেনি তা নয়। আমি বাদশাহকে বলবো, আপনি আমার উপর রাগ করে থাকুন বা যাই করুন আমি আপনার খাদিম তো বটে। আমি এ ব্যাপারে মনস্থির করতে পারিনি বলে আপনার হুকুম জানতে এসেছি। শাহ-ইন-শাহ আমায় নিশ্চয়ই হুকুম দেবেন ব্যাপারটা কি তলিয়ে দেখবার জন্যে। শিবাজীর খাদিম যখন

বাদশাহ আলমগীরের খাদিমকে নিজে সেধে একশো আশরফি দিতে চায়, তখন ব্যাপারটা যে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, একথা বাদশাহ সলামত বেশ ভালোই বোঝেন।"

"কৃষ্ণাজী তোমাকে একশো আশরফি দিতে চেয়েছে?" চিন্তিত হয়ে শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"তোমায় গোপনে দেখা করতে বলেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"আজ সন্ধ্যার পর।"

"শাহ-ইন-শাহ তোমায় নিশ্চয়ই সেখানে যেতে বলবেন।"

"আমার তো তাই ধারণা।"

"আবিদ হুসেন খাঁ, আমার একটা কথা রাখবে?"

"বলো—।"

"একা যেও না। আমিও সঙ্গে যাবো।"

"তোমায় আমার সঙ্গে দেখলে কৃষ্ণাজী খুশী হবে না।"

"আমি আড়ালে থাকবো।"

"বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই" এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল আবিদ হুসেন খাঁ, "আমরা কোথায় মিলিত হবো বলো।"

"আমাদের মিলিত হওয়ার দরকার নেই। তুমি তোমার মতো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমি আগেই গিয়ে কাছাকাছি কোথাও আত্মগোপন করে থাকবো।"

"খুব ভালো কথা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাস দরবার শেষ হবে। মহলে ফিরে যাওয়ার আগে একবার খিলওয়াতগাহ্‌তে যাবে আওরংজেব। শক্তিসিংহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবিদ হুসেন খাঁ এগিয়ে চললো তার গন্তব্যস্থলের দিকে। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো,

শক্তিসিংহকে জিজ্ঞেস করা হয়নি সে কোন ব্যাপারে তার সাহায্য চায়। সে আবার ফিরে এলো, কিন্তু শক্তিসিংহকে দেখতে পেলো না।

মুশরিফ-ই-খওয়াস আবিদ হুসেনকে নিয়ে এলো খিলওয়াত গাহ্‌র ভিতরে। আবিদ হুসেন বাদশাহ্‌কে কুর্নিস করে এক পাশে দাঁড়ালো। আওরংজেব তার দিকে চোখ তুলে তাকালোই না। সেখানে উপস্থিত ছিলো মহম্মদ আমিন খাঁ, জাফর খাঁ, জসবন্ত সিংহ আর আকিল খাঁ।

জাফর খাঁ নামের একটা তালিকা পড়ে শোনাচ্ছিলো।

"—ইন্দ্র সিংহ, দুর্জন সিংহ, ছত্তর সিংহ, শক্তি সিংহ—"

হঠাৎ বন্ধুর নাম শুনে আবিদ হুসেন চোখ তুলে তাকালো।

"—আর দুর্গাদাস রাঠোর," শেষ করলো জাফর খাঁ।

"মোট কজন?" আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো।

"পঞ্চাশজন জাহাঁপনাহ্‌।"

"পঞ্চাশজন রাঠোর জোধপুর যাচ্ছে?" আওরংজেব বলে উঠলো।

এবার উত্তর দিলো মহারাজা জসবন্ত সিংহ। কিন্তু আবিদ হুসেনের কানে আর কোনো কথা ঢুকলো না। তার মনে একটা নতুন চিন্তার সৃষ্টি হোলো।

হ্যাঁ, কৃষ্ণাজী এ খবরই তাকে দিয়েছিলো বটে, পঞ্চাশজন রাঠোর আগ্রা থেকে জোধপুর রওনা হবে একদিন প্রত্যুষে। তাদের দস্তকের জন্যে আরজ পেশ করা হয়েছে। সেই আরজই বোধ হয় এখন বিবেচনা করছেন শাহ-ইন-শাহ।

তাদের সঙ্গে শক্তিসিংহও যাচ্ছে?—আবিদ হুসেন ভাবলো,—কই সে তো একথা জানায় নি। তাই তো, জানানোর সুযোগ পেলো কোথায়? তার আগে কৃষ্ণাজীর কথা শুনেই তো সে

চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো। কেন? আবিদ হুসেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কেন শক্তিসিংহের এত ভাবনা?

হঠাৎ মাথায় এলো। হ্যাঁ, তাইতো। শক্তিসিংহ বলছিলো পান্নাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই এই রাঠোরদের সঙ্গে যাচ্ছে শক্তি সিংহ আর পান্না। পান্নার প্রতি কৃষ্ণাজীর আসক্তির খবর আবিদ হুসেনের অজানা ছিলো না। তার মনে হোলো কৃষ্ণাজী নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে এ খবর। সে শক্তি সিংহের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে চায়। তাই বাদশাহ যাতে রাঠোরদের আগ্রা ত্যাগ করার দস্তক মঞ্জুর করার হুকুম না দেন,—মনে মনে বিচার বিশ্লেষণ করলো আবিদ হুসেন,—সে জন্যে শিবাজীর উল্লেখ করে একটা মিথ্যে খবর বাদশাহ্‌র কানে পৌঁছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে কৃষ্ণাজী আপ্তে।

তাই তো! আমি কী বোকা!—আবিদ হুসেন মনে মনে ভাবলো,—কৃষ্ণাজী আপ্তের কথা আমি বিশ্বাস করলাম? শিবাজীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে মহারাজা জসবন্ত সিংহের রাঠোরেরা? তাও কি হয়? সত্যি সত্যিই যদি শিবাজী রাঠোরদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার মতলব করতেন, তাহলে কৃষ্ণাজীর মতো একজন বিশ্বস্ত মারাঠা কি শিবাজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আবিদ হুসেনের মারফত খবরটা বাদশাহ্‌র কানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতো?

আবিদ হুসেন খাঁ যত ভাবলো, ততোই নিঃসন্দেহ হোলো। না, শিবাজীর পালানোর খবরটা একেবারে নিছক বানানো। কৃষ্ণাজীর আসল উদ্দেশ্য শক্তিসিংহ আর পান্নার গোপনে পালিয়ে যাওয়ার মতলবটা ব্যর্থ করা।

আচ্ছা! - মনে মনে ভাবলো আবিদ হুসেন খাঁ,—কৃষ্ণাজী এই চক্রান্ত করছিলো তাহলে? শক্তিসিংহকে বিপদাপন্ন করার জন্যে তারই দোস্ত্‌ আবিদ হুসেনকে মিথ্যে বলে কাজে লাগানোর চেষ্টা?

আচ্ছা, কৃষ্ণাজী, তুমি আবিদ হুসেনকে চেনো না। তোমায় আমি এমন শিক্ষা দেবো যে তুমি জীবনে ভুলবে না।

কানে এলো আওরংজেব বলছে, "এরা প্রত্যেকেই খুব অভিজ্ঞ যোদ্ধা। এখন কাউকেই শহর ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই, অন্তত যদ্দিন শিবা কুমার রামসিংহের হিফাজতে আছে। শিবার মারাঠা সিলাহ্‌দার ও বারগিরেরা যদি কোনো গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে শহরের ভিতর, কোনো মোগল বা কোনো কছওয়া রাজপুত লশকরকে তাদের সামলানোর ভার দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। আমি সে ভার দিতে চাই রাঠোর রাজপুতদের উপর। সুতরাং যদ্দিন মারাঠারা শহরে আছে, তদ্দিন কোনো রাঠোরই শহর ত্যাগ করবে না।"

"মারাঠাদের তো অবিলম্বেই শহর ত্যাগ করার দস্তক দেওয়া হবে বলে শুনেছি," বললো মহারাজা জসবন্ত সিংহ।

"অবিলম্বে নয়," উত্তর দিলো আওরংজেব, "সবাইকে একসঙ্গে যাওয়ার অনুমতি আ।ম দেবো না। অল্প কয়েকজন করে ছোটো ছোটো দলে ওরা শহর ছাড়বে, এই আমার হুকুম। ওরা সংখ্যায় মোট আড়াইশো জন। সুতরাং পাঁচ হপ্তা তো লেগেই যাবে।"

"পাঁচ হপ্তা পরে কি আমার এই কজন রাঠোরকে জোধপুর পাঠানোর অনুমতি পাওয়ার আশা করতে পারি?" জসবন্ত সিংহ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, তা আশা করতে পারেন।"

"জাহাঁপনাহ্‌ খুব মেহেরবান।" জসবন্ত সিংহের আর কিছু বলার ছিলো না।

আওরংজেব আকিল খাঁর দিকে তাকালো। "এবার পেশ করো তোমার আরজ।"

"জাহাঁপনাহ্‌," আকিল খাঁ বললো, "শিবাজী একটি পত্র প্রেরণ করেছেন মহম্মদ আমিন খাঁ আর আমার কাছে।"

"তোমাদের কাছে? কেন?"

"শাহ-ইন-শাহ শিবাজীর এত আরজ নামঞ্জুর করেছেন যে আপনার কাছে আর নতুন কোনো আরজ পেশ করবার সাহস ওঁর নেই। সুতরাং আমাদের কাছেই একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন যাতে আমরা আপনার কাছে সেটা উল্লেখ করি। যদি আপনার কাছ থেকে কোনো সহানুভূতিব্যঞ্জক মনোভাবের আভাস পাওয়া যায় তাহলে শিবাজী আপনার কাছে সোজাসুজি আরজ পেশ করবেন।"

"শোনা যাক, কি তার প্রস্তাব।"

আকিল খাঁ বললো, "শিবাজী তাঁর সমস্ত দুর্গই জাহাঁপনাহ্‌র হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এখান থেকে হুকুমনামা পাঠালেই শিবাজীর সর-নায়কেরা আর কিলাদারেরা সেকথা মানবে না। সুতরাং শিবাজীকে নিজের এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলে তিনি সেখানে গিয়ে সমস্ত দুর্গ দিলির খাঁর হাতে সমর্পণ করার ব্যবস্থা করবেন। কিলাদারেরা যদি তাঁর কথার অবাধ্য হয়, তাহলে তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত আছেন।"

"হুঁম।" গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলো আওরংজেব। তারপর একটু হেসে বললো, "কাল কুমার রামসিংহের কাছেও একটা খবর শুনলাম এ প্রসঙ্গে। কুমার শিবাকে বলেছিলো মারাঠাদের বাদবাকী সমস্ত দুর্গই মোগলদের হাতে ছেড়ে দিতে। শিবা কি উত্তর দিয়েছিলো জানো? সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলো,—আপনার পিতা মহারাজা জয়সিংহ আমার তেইশটি দুর্গ শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌কে নজরানা দিয়ে টোঁক পরগনা ইনাম পেয়েছেন। এখন আপনি আমার অন্য দুর্গগুলি হস্তগত করবার চেষ্টা করছেন আপনাদের বাদশাহ্‌র জন্যে। বলুন আপনি কোন পরগনা ইনাম পাচ্ছেন?—টোডা পরগণা?"

আকিল খাঁ ও মহম্মদ আমিন খাঁ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

আওরংজেব বলে গেল, "আকিল খাঁ, এই হোলো শিবার মনোভাব। আজ আবার তোমার আর মহম্মদ আমিন খাঁর মারফতে একই প্রস্তাব আমার কাছে পাঠাচ্ছে তার মুক্তির শর্ত হিসেবে। তাকে আমায় বিশ্বাস করতে বলো? সত্যি সত্যি যদি সব কিলা আমাকে দিতে চায়, তার সেখানে ফিরে যাওয়ার কি দরকার? তার হুকুমনামা পেলে মারাঠারা শুনবে না? আমি বিশ্বাস করি না একথা।"

মহম্মদ আমিন খাঁ বললো, "জাহাঁপনাহ, আপনার যুক্তি অকাট্য, কিন্তু—" বলতে বলতে একটু ইতস্তত করে থেমে গেল।

"কিন্তু কি?" ভ্রূকুঞ্চিত করে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো।

"শিবাজীকে অন্তত একটিবার তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারতো। যদি সে দক্কানে ফিরে গিয়ে শাহ্-ইন-শাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে মারাঠাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার ক্ষমতা আমাদের ফৌজের আছে। আর যদি সত্যিই শাহ-ইন-শাহ্‌র আনুগত্য সে স্বীকার করে, তাহলে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা দখল করার প্রচেষ্টায় তার সহায়তা আমাদের পক্ষে লাভজনক হবে।"

আওরংজেব অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকালো মহম্মদ আমিন খাঁর দিকে। তারপর খুব মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আকিল খাঁ, তোমার কি অভিমত?"

আওরংজেবের এই ভঙ্গির সঙ্গে আকিল খাঁ চোদ্দো পনেরো বছর ধরে সুপরিচিত। সে সতর্ক হয়ে গেল। একটু কেশে গলা সাফ করে আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "আলমপনাহ্, শিবাজীকে যদি ফিরে যাওয়ার হুকুম দিতে হয় তো শাহ-ইন-শাহ্‌র মেহের-বানিতেই সে হুকুম হওয়া বাঞ্ছনীয়, বিজাপুর কি গোলকুণ্ডার প্রলোভনে নয়।"

"ম্।" আওরংজেবের চক্ষু দুটি সম্পূর্ণ মুদিত হোলো। ঈষৎ

হাসি দেখা দিলো অধরপ্রান্তে। তারপর বললো, "জসবন্ত সিংহ, তোমার কি বক্তব্য ?"

"শিবাজীকে কিলার ভিতরে কয়েদখানায় এনে বন্দী করে রাখা হোক," উত্তর দিলো মহারাজা জসবন্ত সিংহ।

নিমীলিত নেত্রে আবার হাসলো আওরংজেব। জিজ্ঞেস করলো, "এবার তোমার অভিমত শোনা যাক, উজীর-উল-মুল্‌ক্‌।"

উজীর জাফর খাঁ জসবন্ত সিংহের দিকে একবার আড়চোখে তাকালো। তারপর বললো, "জাহাঁপনাহ্‌, এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে মির্জা রাজা জয়সিংহের অভিমত আমাদের জানা দরকার। যদ্দিন ওঁর আরজদশত শাহ্‌-ইন-শাহ্‌র দরবারে পেশ করার সুযোগ আমি না পাচ্ছি, তদ্দিন এই আলোচনা মুল্‌তুবি রাখা হোক। এখন যে ব্যবস্থা আছে তাই বহাল থাকুক।"

সবার অলক্ষ্যে জসবন্ত সিংহ একটু হাসলো জাফর খাঁর দিকে তাকিয়ে।

আওরংজেব চোখ খুললো না। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। সবাই স্তব্ধ। পরিষ্কার শোনা গেল বাদশাহ্‌র শ্বাস-প্রশ্বাস। মনে হোলো যেন একটু একটু ঝিমুচ্ছে আওরংজেব। হঠাৎ একটু জড়িত-কণ্ঠে ডাকলো, "আবিদ হুসেন খাঁ।"

আবিদ হুসেন হঠাৎ চমকে উঠলো। তারপর দুপা সামনে এগিয়ে কুর্নিস করে বললো, "হুকুম করুন জাহাঁপনাহ্‌—।"

"তোমার অভিমতও শুনতে পেলে আমি খুশী হবো।"

"আমার অভিমত!" আবিদ হুসেন আকাশ থেকে পড়লো। উজীর জাফর খাঁ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ ও মহম্মদ আমিন খাঁর মুখ লাল হয়ে গেল। ওরা বাদশাহ্‌র প্রধান উপদেষ্টা। তাদের উপস্থিতিতে আবিদ হুসেনের মতো একজন সামান্য লোকের অভিমত চাওয়াটা তাদেরই অসম্মান। শুধু আকিল খাঁ মনে মনে হাসলো। সে বাদশাহকে চিনতো খুব ভালো করেই।

"আমার কোনো অভিমত নেই জাহাঁপনাহ্," বললো আবিদ হুসেন, "আমি আপনার খাদিম। আপনার হুকুম তামিল করতে জানি, আর কিছু জানি না।"

"আবিদ হুসেন খাঁ," আস্তে আস্তে বললো বাদশাহ আওরংজেব, "মনে করো, তুমি যদি উজীর-উল-মুলক্ হতে, আমায় এ ব্যাপারে কি পরামর্শ দিতে?"

আকিল খাঁর পেলো হাসি, জাফর খাঁর মুখ হোলো রাঙা,—কিন্তু আবিদ হুসেনের বুক ফুলে দশ হাত হোলো। বললো, "শাহ-ইন-শাহ মেহেরবান, আমি কিন্তু তাহলে অকপটে বলবো আমার বক্তব্য।"

"তাই তো আমি শুনতে চাই, মির আবিদ হুসেন খাঁ—।"

"তাহলে আমার অভিমত শোনার মেহেরবানি হোক জাহাঁপনাহ," মুখে হাত চাপা দিয়ে আবিদ হুসেন খাঁ একটু কাশলো, "বিষয়টা যে অত্যন্ত গুরুতর তাতে আমাদের কারো কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং শিবাজীর সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে বিবেচনা করতাম।"

বেওকুফ—মনে মনে গজরালো জাফর খাঁ।

"খুব গভীরভাবে বিবেচনা করবার পর আমার এ কথাই মনে হোতো," আবিদ হুসেন বলে গেল, "শিবাজীর সম্বন্ধে শাহ-ইন-শাহ্‌র এত বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

বেতমিজ,—দাঁতে দাঁত ঘষলো মহম্মদ আমিন খাঁ। কিন্তু আওরংজেব নিমীলিত নেত্রে শুনতে লাগলো মন দিয়ে।

"শাহ-ইন-শাহ্‌র মেহমান হয়ে থাকা শিবাজীর পছন্দ হচ্ছে না, তিনি দক্ষিণে ফিরে যেতে চান। দুরকম ভাবে যাওয়া যেতে পারে। দরবারের হুকুম নিয়ে, কিংবা নিজের উদ্যমে। শাহ-ইন-শাহ হুকুম দেবেন না, আর নিজের চেষ্টায় শিবাজী আগ্রা ত্যাগ করতে পারবেন না, যদি না—," কথা শেষ না করেই আবিদ হুসেন একটু থামলো।

"যদি না?" চোখের পাতা ঈষৎ উন্মীলিত করে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো।

"যদি না আমি আজ সন্ধ্যাবেলা গোপনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কৃষ্ণাজী আপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

আওরংজেব আবার চক্ষু মুদিত করলো। অন্য সবাই অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে। কিন্তু আওরংজেব মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "কৃষ্ণাজী আপ্তের সঙ্গে? কেন?"

"কারণটা আমি এখনও জানি না জাহাপনাহ। কৃষ্ণাজী আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করে একথা বলেছে। আর একশো আশরফি দেবে বলে প্রলোভনও দেখিয়েছে। মনে হোলো, সে শিবাজীর অনুচর, সুতরাং কারণটা শিবাজী সম্পর্কিত নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি শাহ-ইন-শাহ্‌র খাদিম। শাহ-ইন-শাহ আমার উপর বিরূপ হলেও, ওঁর হুকুম ছাড়া আমি এরকম ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারি না। এজন্যেই শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে তসলিম পৌঁছাতে এসেছিলাম। এখন আপনি আমায় বলছেন, আমি উজীর হলে আপনাকে কি পরামর্শ দিতাম। জাহাঁপনাহ, আমি উজীর হলে এই আরজই পেশ করতাম যে, এই কমবখ্‌ৎ আবিদ হুসেনকে কয়েদ করা হোক, যাতে সে মারাঠার একশো আশরফি নিজের জেব্‌এ প্রবিষ্ট করানোর সুযোগ না পায়।"

জাফর খাঁ, জসবন্ত সিংহ ও মহম্মদ আমিন খাঁ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো। শাবাশ—মনে মনে ভাবলো আকিল খাঁ।

আওরংজেব তার উজ্জ্বল আয়ত দৃষ্টি সম্পূর্ণ উন্মিলীত করে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললো, "না, আবিদ হুসেন খাঁ। তোমার পরামর্শ আমি গ্রহণ করতাম না। আজকাল অনেকেই নানারকম ভাবে অর্থোপার্জন করছে। আবিদ হুসেনই বা করবে না কেন? আমি আবিদ হুসেনকে পরামর্শ দিতাম সে

যেন কৃষ্ণাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তবে একা নয়, আকিল খাঁও যাবে তার সঙ্গে। আকিল খাঁ যদি ইচ্ছে করে তবে আরো একজন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে নিতে পারে।"

আওরংজেব গাত্রোত্থান করে চলে যাচ্ছিলো নির্গমন পথের দিকে। যেতে যেতে আবার ফিরে এলো, বললো, "মির আবিদ হুসেন খাঁ, তোমার আগের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে আমার অসীম মেহেরবানি প্রকাশ করছি। তুমি কাল থেকে আমার দরবারে আবার নিয়মিত হাজির হবে।"

আবিদ হুসেন তসলিম করলো।

আওরংজেব অন্য সবার দিকে ফিরে বললো, "আপনাদের অন্য সবাইকে বিদায় গ্রহণ করবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আকিল খাঁর সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে। সে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুক। আবিদ হুসেন, তুমি এখন তোমার দৌলতখানায় গিয়ে আরাম করো, সন্ধ্যাবেলা আকিল খাঁর সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হবে সে তোমায় যথাসময় জানিয়ে দেবে।"

সবাই তসলিম করে বেরিয়ে গেল একজনের পেছনে একজন।

"আকিল খাঁ!" সম্বোধন করলো বাদশাহ আওরংজেব।

"হুকুম করুন আলমপনাহ!"

"সন্ধ্যার একটু পরে তুমি খিজিরিতে এসে দাঁড়াবে। একেবারে একলা। সেখানে আমি এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।"

"আপনি!" আকিল খাঁ বিস্মিত হয়ে বাদশাহ্‌র দিকে তাকালো।

"হ্যাঁ, আবিদ হুসেনের সঙ্গে তুমি যাবে, তোমার সহচরের ছদ্মবেশে যাবো আমি।"

"আপনি যাবেন!" আকিল খাঁ তাকিয়ে রইলো স্তম্ভিত হয়ে।

"হ্যাঁ আকিল খাঁ। আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে যার মধ্যে আমার দরবারের কয়েকজনও লিপ্ত আছে।

আবিদ হুসেনের কথার মধ্যে আমি তার আভাস পেয়েছি। আমি সব কথা নিজের কানে শুনতে চাই। আবিদ হুসেন ঠিক সে ধরণের অত্যন্ত সরল, বিশ্বস্ত, সোজাবুদ্ধির লোক, যাদের কূটবুদ্ধি লোকেরা বোকা মনে করে। কিন্তু এরাই সত্যিকারের বুদ্ধিমান। এই হুসেনকে আমি একদিন আমার দরবারের প্রধান উমরাহদের মধ্যে দেখতে চাই।”

শাহী কেল্লার যে দরওয়াজার ঠিক ধার ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে যমুনা নদী, তারই নাম খিজিরি। সেখানকার বাইরের পাহারায় মোতায়েন থাকে দুজন ঝিমন্ত পিয়াদা। অধিক লোকজন থাকলে নদীতীরের শান্ত পরিবেশের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি থাকবে না বলে শাহ্‌জাহানের আমল থেকে এই ব্যবস্থা। আসল জবরদস্ত পাহারা থাকে লোহার গরাদ দেওয়া রুদ্ধ ফাটকের পেছনে। আরো ভেতর দিকে আস্ত লোহার পাত দিয়ে বাঁধানো ভারী কাঠের ফাটক। সেটাও সব সময় বন্ধ। সেই দরজার অভ্যন্তরেও যে খুব কড়া পাহারা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটু দূর থেকে খিজিরির কাছে কোনো পাহারা দেখা যায় না বটে, কিন্তু খিজিরি যে অত্যন্ত সুরক্ষিত সে কথা কারো অজানা নয়। কেউ ধারে কাছে যায় না, সঙ্গত কারণ ছাড়া ধারে-কাছে ঘোরাঘুরি করলে হঠাৎ দেখা যাবে আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসেছে আট দশজন সশস্ত্র পিয়াদা। তারপর কোতোয়ালিতে নিয়ে নানারকম প্রশ্ন। সে অভিজ্ঞতা খুব প্রীতিপ্রদ নয়। তাই এদিকটা নির্জনই থাকে সব সময়।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আকিল খাঁ অশ্বারোহণে খিজিরির কাছে এসে দাঁড়ালো। চারদিক থমথমে নির্জন। কাউকে দেখা গেল না, কেউ এগিয়ে এলো না তাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে। আকিল খাঁ বুঝলো যে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে আগের থেকেই নির্দেশ দেওয়া আছে খিজিরির চৌকিকে। একটু পরে শোনা গেল

লোহার ফাটক উন্মুক্ত হওয়ার ধাতব শব্দ। দুটি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ কাছে এগিয়ে এলো। আবছা দেখা গেল দুজন ঘোড়-সওয়ারকে। আকিল খাঁ অশ্বচালনা করে এগিয়ে গেল সেদিকে।

একজন ঘোড়সওয়ার একটু দূরে থেমে গেল। আরেকজন এগিয়ে এলো। আকিল খাঁও এগিয়ে গেল তার দিকে। মুখোমুখি এসে দুজনে রাশ টেনে থেমে গেল।

"আকিল খাঁ ?"

"বান্দা হাজির, হজরত।"

এরকম অবস্থায় দরবারের সাধারণ কিতাকায়দা মানা হয় না। যেখানে শাহ-ইন-শাহ্ ছদ্মবেশে, সেখানে কুর্নিস কি তসলিম করার রেওয়াজ নেই। জাহাঁপনাহ কি আলমপনাহ্ বলে সম্বোধন করার রীতিও নেই। দাক্ষিণাত্যে এরকম উপলক্ষ অনেকবার হয়েছে, ছদ্মবেশে শাহজাদা আওরংজেবের সঙ্গে তফরি করতে বেরিয়েছে আকিল খাঁ। কিন্তু বাদশাহ আওরংজেবের সঙ্গে এই প্রথম।

"চলো," বললো আওরংজেব।

"আর কেউ আসবে না ?"

"না, খোজা রহিমউদ্দিন এখানে অপেক্ষা করবে আমি না ফেরা পর্যন্ত।"

"কিন্তু হজরত," আকিল খাঁ বললো, "দু-তিন ঘড়ি সময় বাইরে থাকলে মহলে আপনার অনুপস্থিতি সবার জানাজানি হয়ে যেতে পারে।"

"সবাই জানে গুসলখানায় আমি গুরুতর কাজে ব্যস্ত আছি মির মুনশী কাবিল খাঁকে নিয়ে। গুসলখানার দ্বার রুদ্ধ করে কাবিল খাঁ বসে থাকবে আমি না ফেরা পর্য্যন্ত। বাইরে বিশ্বস্ত পাহারা মোতায়েন আছে। সেখানে গিয়ে আমাকে বিরক্ত করার সাহস কারো হবে না। গুপ্তপথ দিয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি। জানাজানি হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

সাধারণ মনসবদারের পোশাক পরিধান করেছে বাদশাহ্। গায়ের উপর গাঢ় নীল রঙের কাবা। সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখের চেহারা স্পষ্ট নয়।

আকিল খাঁ তাকিয়ে দেখলো।

না, বাদশাহ্কে চিনে ফেলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আবিদ হুসেন খাঁকে নির্দেশ দেওয়া ছিলো এক নির্জন জায়গায় অপেক্ষা করবার জন্যে। সেস্থান শহর প্রান্তে এক জনবিরল অঞ্চলে। আওরংজেব আর আকিল খাঁ দ্রুত অশ্বচালনা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হোলো।

আকিল খাঁ এসে দাঁড়ালো আবিদ হুসেনের কাছে। আবিদ হুসেন দেখলো অন্যজন দাঁড়িয়ে পড়েছে একটু তফাতে।

"এ লোকটি কে?" জিজ্ঞেস করলো আবিদ হুসেন।

"ওঁকে সমীহ করে কথা বলবে," ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো আকিল খাঁ, "উনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমরা ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," উত্তর দিলো আবিদ হুসেন, "ওঁর নাম জানতে পারি?"

"নাম জানার প্রয়োজন নেই আবিদ হুসেন। উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। বাদশাহ্ সলামতের তাই নির্দেশ।"

আবিদ হুসেন আকিল খাঁকে পেরিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে এলো অন্যজনের কাছে। তাকিয়ে দেখলো ভালো করে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখের চেহারা পরিষ্কার বুঝতে পারলো না। হাত কপালে ঠেকিয়ে সালাম আলায়কুম জানিয়ে বললো, "আপনি যদি আকিল খাঁ সাহেবের দোস্ত হন্, তাহলে আপনি আমারও দোস্ত। আপনি আমাদের সঙ্গদান করছেন জেনে আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি।"

আকিল খাঁ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো, "এবার রওনা হওয়া যাক, আবিদ হুসেন।"

আবিদ হুসেন অপরিচিত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলে গেল, "আপনার পরিচয় পেলে আরো আনন্দিত হতাম। তাহলে পরেও আবার সাক্ষাৎকারের সুযোগ আশা করতাম, হয়তো মোতিজানের মাইফিলখানায় বসে দু-চার পিয়ালা শরাবও পান করতে পারতাম ফুলাদ খাঁ আর রদ অন্দাজ খাঁর সঙ্গে। আমাদের বাদশাহ্ সলামতের রাজত্বে জীবন উপভোগ করতে হলে কতো ঝুঁকি যে নিতে হয় কি বলবো—"

"বেতমিজ—," আকিল খাঁ বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "চলো, কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের।"

তিন অশ্বারোহী রওনা হোলো খোজা ফিরোজার বাগের দিকে। পথে কেউ কোনো কথা বললো না। অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল কৃষ্ণাজীর নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখানে সড়কের একপাশে পাঁচটি মস্তো বড়ো তাল গাছ একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে ঘন অন্ধকারের মধ্যে। ওরা তাল গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটু পরেই শোনা গেল দূরে আরেকটি অশ্বের পদধ্বনি।

"আবার কে? কৃষ্ণাজী?" জিজ্ঞেস করলো আকিল খাঁ।

তাকিয়ে দেখলো আবিদ হুসেন। একটি সাদা ঘোড়া এগিয়ে আসছে। বললো, "না, ওটা শক্তিসিংহের ঘোড়া।"

"শক্তিসিংহ?" বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো আকিল খাঁ।

তার অন্য সঙ্গীও যেন একটু বিচলিত হোলো।

আবিদ হুসেন বললো, "হ্যাঁ, ওরও আসবার কথা। আমি তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তার ধারণা, কৃষ্ণাজী আপ্পের নিশ্চয়ই কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে। তাই প্রয়োজন হলে আমার সহায়তা করবার জন্যে আসবে বলেছিলো। ক্ষতি কি? আমরা তিনজন ছিলাম, এবার চারজন হবো।"

আকিল খাঁ তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। সে ঈষৎ মাথা

নাড়লো। আকিল খাঁ বললো, "শক্তিসিংহকে আমাদের পরিচয় দিয়ো না।"

"আচ্ছা।"

"আবিদ হুসেন," শক্তি সিংহ কাছে এসে ডাকলো।

"হাজির। এসো, এসো, কাছে এসো—।"

শক্তি সিংহ অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলো। অন্ধকারে মুখ চেনবার উপায় নেই। বললো, "আবিদ হুসেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি একাই আসবে।"

"তাই আসতাম, কিন্তু এরাও আমার দোস্ত তোমারই মতো, আমাকে একা আসতে দিতে চাইলো না!"

"তোমার দোস্ত!" জিজ্ঞেস করলো শক্তিসিংহ।

"হ্যাঁ। দোস্তের চেয়েও আপন," বললো আবিদ হুসেন। আকিল খাঁর দিকে হস্ত প্রসারিত করে বললো, "এ আমার মাশুকার ভাই। মোতিজানকে যখন বিয়ে করবো তখন ও আমার শালা হবে। আর অন্য লোকটির পরিচয় আমি ঠিক জানি না। ও আমার দোস্তের দোস্ত। ও যদি আমার দোস্তের মাশুকার আব্বাজান হয় তাহলেও আমার বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। যা দিনকাল পড়েছে, সবই সম্ভব, কি বলো," বলে আবিদ হুসেন আচমকা আকিল খাঁর সঙ্গীর পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলো জোরে জোরে।

আকিল খাঁর সঙ্গী ঘোড়ার রাশ টেনে সরে গেল একপাশে। অপ্রতিভ আকিল খাঁ তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়া নিয়ে তার বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী আর আবিদ হুসেনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। চাপা গলায় বললো, "বেতমিজ, কি বলেছিলাম তোমায়? হজরতের সঙ্গে এভাবে কথা বলবে না।"

"ও। মাপ করো ভাই, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।"

দূরে আবার শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।

"এবার নিশ্চয়ই কৃষ্ণাজী আপ্তে," বলে উঠলো আবিদ হুসেন।

"আমরা সরে যাই একপাশে," বললো শক্তি সিংহ, "ও নিশ্চয়ই আমাদের তোমার সঙ্গে দেখলে খুশী হবে না।"

শক্তি সিংহ, আকিল খাঁ ও অন্যজন ঘোড়া নিয়ে সরে গিয়ে মিশে গেল তালগাছগুলোর পেছনদিকের অন্ধকারে। এখান থেকে তাদের উপস্থিতি বোঝার উপায় নেই, খুব কাছে হলেও।

কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা খাটো পাহাড়ী ঘোড়ায় চেপে উপস্থিত হোলো কৃষ্ণাজী আপ্তে।

"আবিদ হুসেন?"

"কৃষ্ণাজী?"

তুজনেই নিজের নিজের পরিচয় স্বীকার করলো।

"আবিদ হুসেন," কৃষ্ণাজী বললো, "হাতে সময় বেশী নেই। কয়েকটা জরুরী কথা আছে মন দিয়ে শোনো।"

"বলুন।"

"ও এসে পড়বে এক্ষুনি।"

"কে?"

"শক্তি সিংহ।"

"শক্তি সিংহ?" আবিদ হুসেন বিস্মিত হোলো।

"হ্যাঁ, শক্তি সিংহ রাঠোর।"

"কোথায় আসবে?"

"এখানে?"

"আপনি কি করে জানেন?" চকিত হয়ে আবিদ হুসেন জিজ্ঞেস করলো।

"আমি খবর পেয়েছি যে শক্তি সিংহ আজ খোজা ফিরোজার বাগে এসে তার রাজপুতানী মাশুকা পান্নার সঙ্গে মিলিত হবে ঠিক ওই জায়গায়," বলে কৃষ্ণাজী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

"ও।" এবার আবিদ হুসেন একটু আশ্বস্ত হোলো। শক্তিসিংহের যে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এখানে আসার কথা,

এ সংবাদ কৃষ্ণাজী জানেনা,—একথা বুঝতে পেরে সে নিশ্চিন্ত হোলো।

"তোমাকে দেখাবো বলেই এখানে এনেছি।"

আবিদ হুসেন এবার হাসলো, "এটাই দেখাবেন বলে একশো আশরফির লোভ দেখিয়ে আমায় ডেকেছেন? আশরফি আজকাল খুব শস্তা হয়ে উঠেছে দেখছি।"

"না, আবিদ হুসেন। শুধু এটুকু দেখবো না। আরো অনেক কিছু দেখাবো। সে খবর তুমি যখন বাদশাহকে দেবে, তিনি তোমায় অনেক ইনাম দেবেন।"

"তাই নাকি?" আবিদ হুসেন চেষ্টা করলো আনন্দ প্রকাশ করবার।

"হ্যাঁ। ওখানে আরো একজন আসছেন। স্বয়ং রাজা শিবাজী।"

"আচ্ছা!"

"হ্যাঁ। শক্তিসিংহ পান্নার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে এখানে আসে শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। শিবাজীকে মুক্তি দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত। মহারাজা জসবন্ত সিংহের রাঠোরেরা বাদশাহ্‌র অনুমতি পেয়ে যখন শহর ত্যাগ করবে, তখন শক্তিসিংহের সহায়তায় তাদের দলে ভিড়ে যাবে শিবাজী। এভাবেই তিনি শহর থেকে চলে যাওয়ার মতলব আঁটছেন।"

"বটে!" বিস্ময় প্রকাশ করবার চেষ্টা করলো আবিদ হুসেন।

"হ্যাঁ। তোমাকে এখন একটা কাজ করতে হবে। তুমি নিজের চোখে দেখবে যে শক্তিসিংহ এসে এখানে শিবাজীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। সে কথা তুমি গিয়ে জানাবে বাদশাহ্‌কে।"

"তা হলে কি হবে?"

"বাদশাহ শক্তিসিংহকে কয়েদ করবেন। তোমাকে এখন দেবো

পঞ্চাশ আশরফি, শক্তিসিংহের কয়েদ হওয়ার হুকুম হলে আর পঞ্চাশ আশরফি।”

“কিন্তু আমাদের বাদশাহ সলামত তো শুধু শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোনো বিচার করবেন না।”

“সে ব্যবস্থাও আমি করেছি।”

“কি ?”

“আমি কোতোয়াল ফুলাদ খাঁকে খবর দিয়েছি। তিনি এখানে এসে পড়বেন এখনই। এখানে দাঁড়িয়ে তিনিও দেখবেন। শক্তিসিংহ যখন বেরিয়ে আসবে তখন ফুলাদ খাঁ তাকে গিরফতার করবেন।”

“তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে আর প্রয়োজন কি ?”

“প্রয়োজন আছে। শক্তিসিংহ মহারাজা জসবন্ত সিংহের প্রিয়পাত্র। হয়তো মহারাজা ফুলাদ খাঁকে উৎকোচ দিতে পারেন। হয়তো শিবাজী নিজেই আশরফি দিতে পারেন ফুলাদ খাঁকে। ফুলাদ খাঁ হয়তো চুপ করে থাকতে পারে। শিবাজীকে নজরবন্দী করে রাখাই ফুলাদের দায়িত্ব। সুতরাং যতক্ষণ শিবাজী চোখের আড়াল না হচ্ছে, ততক্ষণ কোনো ষড়যন্ত্রকারীকে সে ধরলো কি ছাড়লো, তা নিয়ে সে বাদশাহ ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। সুতরাং এ খবর বাদশাহ্‌র কানেও ওঠা দরকার। তার জন্যে প্রয়োজন তোমাকে। তাহলে ফুলাদ উৎকোচ গ্রহণ করে শক্তি-সিংহকে মুক্তি দিতে পারবে না।”

“কৃষ্ণাজী!” একটু গম্ভীর শোনালো আবিদ হুসেনের কণ্ঠস্বর।

“কি ?”

“আপনার আসল উদ্দেশ্য হোলো শক্তিসিংহকে কয়েদখানায় পাঠানো। তাই না ?”

“আমার কি উদ্দেশ্য তা নিয়ে তোমার বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি তোমায় কিছু অর্থ উপার্জন করার সুযোগ দিচ্ছি, বাদশাহ্‌র খিদমত করার সুযোগ দিচ্ছি, পদোন্নতির সুযোগ দিচ্ছি।

তুমি বুদ্ধিমান লোক, মোগল দরবারের অন্যান্য বুদ্ধিমান লোকের মতো মুখ বন্ধ করে থাকো। লাভ তোমার একশো আশরফি," বলে কৃষ্ণাজী আগে একটি ভারী বটুয়া এগিয়ে দিলো তার দিকে।

বাদশাহ্‌র নির্দেশ তাকে জানিয়েছিলো আকিল খাঁ,—সে যেন আশরফি নিতে কোনো দ্বিধা প্রকাশ না করে। কৃষ্ণাজীর যেন কোনো সন্দেহ না হয়, কোনো অবিশ্বাস না আসে আবিদ হুসেনের উপর।

আবিদ হুসেন বললো, "হ্যাঁ, নিচ্ছি, কিন্তু তার আগে একটি কথা জানাও, শক্তিসিংহ কয়েদ হলে তুমি পান্নাকে নিজে বিবাহ করবার আশা রাখো, তাই না?"

কৃষ্ণাজী হাসলো। উত্তর দিলো, "সে খবর যখন বাদশাহ্‌কে জানানোর প্রয়োজন নেই, তখন তোমার সঙ্গে সে বিষয় আলোচনা করাও দরকার নেই। এই নাও আশরফি। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনছো? বোধ হয় ফুলাদ খাঁ। লুকিয়ে ফেল আশরফির বটুয়া। ফুলাদ খাঁ দেখলে আবার বখরা চাইবে।"

আবিদ হুসেন বটুয়া লুকোবার চেষ্টা করলো না। হাতেই ধরে রইলো। কাছে এগিয়ে এলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। কয়েক মুহূর্ত পরে ফুলাদ খাঁ এদের কাছে এসে দাঁড়ালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কৃষ্ণাজী?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"এ লোকটি কে?"

"আবিদ হুসেন খাঁ।"

"আবিদ হুসেন? সে আবার এখানে কেন?"

"আমিই তাকে আসতে খবর দিয়েছিলাম।"

"কেন? কি দরকার ছিলো একে খবর দেওয়ার?"

"আজ এখানে যে ঘটনা ঘটবে, তার খবর বাদশাহ্‌র কানে যাওয়া দরকার," বললো কৃষ্ণাজী।

"ও," ফুলাদ খাঁ হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, "শক্তিসিংহের

ইশক্ বাজীর সময় হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। কোথায় সে?" বলে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ফুলাদ খাঁ খোজা ফিরোজার বাগের দিকে তাকালো।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করলো কৃষ্ণাজী আগ্রে, বললো, "আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। এখনই এসে পড়বে।"

কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলো ফুলাদ খাঁ আর কৃষ্ণাজী। আবিদ হুসেন দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে।

"কোথায় তোমার শক্তিসিংহ," অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো ফুলাদ খাঁ।

আবিদ হুসেন হাসলো, বললো, "আপনারা ওদিকে মিছেমিছি তাকিয়ে আছেন। শক্তিসিংহ ওখানে নেই।"

"কোথায় সে?" গর্জন করলো ফুলাদ খাঁ।

"শক্তি সিংহ এখানেই আছে।"

"এখানে!" কৃষ্ণাজী আর ফুলাদ খাঁ দুজনেই বিস্মিত হয়ে আবিদ হুসেনের দিকে তাকালো। সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নির্দেশ করলো তাল গাছের পেছন দিকে। ওরা তাকিয়ে দেখলো ছায়ার মতো তিনজন অশ্বারোহী বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে।

কাছে এগিয়ে এলো তিনজনই। একজন বললো, "আমি শক্তি সিংহ।"

কৃষ্ণাজীর ডান হাত চলে গেল তার তলোয়ারের খাপে। কিন্তু ফুলাদ খাঁ তাকে নিবৃত্ত করে বললো "বিচলিত হয়ো না কৃষ্ণাজী। আমি দেখছি, কি ব্যাপার। তুমি এখানে কেন শক্তিসিংহ?"

"ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি," উত্তর দিলো আবিদ হুসেন। "এই নিন আপনার আশরফি," বলে সে ভারী বটুয়া ছুঁড়ে দিলো কৃষ্ণাজীর দিকে। কিন্তু কৃষ্ণাজী হাত বাড়ানোর আগেই ফুলাদ খাঁ লুফে নিলো সেই বটুয়া।

"আশরফি!" বলে উঠলো ফুলাদ খাঁ, "কৃষ্ণাজী দিয়েছে? আবিদ হুসেন, তোমায় কিন্তু এর জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে

বাদশাহ্‌র কাছে। মোগল দরবারের খাদিম মারাঠার কাছ থেকে আশরফি নেবে কেন? ভালোই হোলো, ধরতে এসেছিলাম শক্তি সিংহকে, পেয়ে গেলাম আবিদ হুসেনকেও। দুজনেই চলো কোতোয়ালিতে। ওরা দুজন আবার কে?"

"ওঁরা আমার বন্ধু," বললো আবিদ হুসেন।

"তোমরাও চলো কোতোয়ালিতে।"

আকিল খাঁ প্রমাদ গুণলো। তার সঙ্গী তার কাঁধে হাত রেখে চাপ দিলো একটুখানি। আকিল খাঁ চুপ করে রইলো।

আবিদ হুসেন বলে উঠলো, "বাঃ, ব্যাপারটা বেশ জমেছে। কৃষ্ণাজী পান্নাকে লাভ করবার জন্যে শক্তিসিংহকে কয়েদে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করলো, আর এই মওকায় ফুলাদ খাঁ কয়েদখানায় পাঠানোর মতলব করছে আমাকেও। আরে মিঞা, তুমি কি ভেবেছো, আমি কয়েদখানায় থাকলে মোতিজান আমাকে ভুলে তোমাকে প্যার করবে? সে কোনোদিন হবার নয়।"

আকিল খাঁ আর ওর সঙ্গী পরস্পরের দিকে তাকালো।

"চলো সবাই কোতোয়ালিতে," হুকুম দিলো ফুলাদ খাঁ।

"যদি না যাই—," জিজ্ঞেস করলো শক্তিসিংহ।

"আমার পিয়াদারা সব ওদিকে আছে আমার সঙ্কেতের অপেক্ষায়। তাদের ডাকি তাহলে," বলে ফুলাদ খাঁ মুখে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট করালো শিস দেওয়ার জন্যে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আবিদ হুসেন নিজের ঘোড়া নিয়ে আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ফুলাদ খাঁর ঘোড়ার উপর। দুজনে জড়াজড়ি করে মাটির উপর গড়িয়ে পড়লো।

"যারা যারা পালাতে চাও, পালাও," শোনা গেল আবিদ হুসেনের কণ্ঠস্বর। আকিল খাঁ ও তার সঙ্গীকে বাঁচানোর জন্যেই সে এই উপায় গ্রহণ করলো। সে বুঝতে পেরেছিলো যে এ ব্যাপারে আকিল খাঁ জড়িয়ে পড়লে বাদশাহ বিব্রত বোধ করবেন।

চকিতে সড়কের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো আকিল খাঁর সঙ্গী। পেছন পেছন ছুটলো আকিল খাঁও। কৃষ্ণাজী আস্তে তার ঘোড়া নিয়ে মিশে গেল গাছপালার অন্ধকারে। শুধু দাঁড়িয়ে রইলো শক্তি সিংহ।

ফুলাদ খাঁ তখন দৃঢ়মুষ্টিতে আবিদ হুসেনের জামা ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। রাগে কাঁপছে ঠকঠক করে। বললো, "কমবখ্‌ত্‌ পাজী, তোমার কি সাজার ব্যবস্থা করি একবার দেখ।"

আবিদ হুসেন তার দিকে ফিরেও তাকালো না। শক্তিসিংহের দিকে তাকিয়ে নিজের বসন থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, "তুমি পালালে না?"

শক্তিসিংহ শান্ত কণ্ঠে বললো, "না দোস্ত, তোমায় রেখে কি করে যাই? এ লোকটা কোতোয়াল না হলে আজ একবার ওকে দেখে নিতাম।"

ফুলাদ খাঁর সঙ্কেত পেয়ে এসে পড়লো একদল পিয়াদা।

আবিদ হুসেন বললো, "ভাই শক্তি সিংহ, ফুলাদ খাঁ আমার জন্যে থাক, তুমি কৃষ্ণাজীর ভাবনা ভাবো।"

"কৃষ্ণাজী?" হাসলো শক্তি সিংহ, "ওকে আমি—"

ফুলাদ খাঁ পিয়াদাদের নির্দেশ দিচ্ছিলো, এবার গর্জে উঠলো, "চুপ করো। বন্দী দুজন নিজেদের মধ্যে কোনো কথা বলবে না।"

বেশ কিছুক্ষণ পরের কথা। গুসলখানায় আস্তে আস্তে পায়চারি করছিলো আওরংজেব। দুপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো আকিল খাঁ আর মির মুনশী কাবিল খাঁ।

কিছুক্ষণ পরে আওরংজেব পায়চারি করা বন্ধ করে আকিল খাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, "আকিল খাঁ, বড়ো ভুল করেছি। শুধু তোমাকে পাঠালেই হোতো। অতো সব নোংরা কথাবার্তা আমায় শুনতে হোতো না। ভেবেছিলাম, শিবা সংক্রান্ত কোনো

গোপন ষড়যন্ত্রের খবর নিজের কানে শুনবো, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো এক নারীঘটিত ব্যাপারের ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমি বাদশাহ আলমগীর, ওই বেতমিজ আবিদ হুসেনের কথায় ভুলে আমাকে গিয়ে শুনতে হোলো এক সামান্য মারাঠা ও রাঠোরের ব্যক্তিগত ব্যাপার, শুনতে হোলো এক সামান্য তওআয়ফকে নিয়ে ফুলাদ ও আবিদ হুসেনের ঝগড়ার কাহিনী। উঃ, কী বেঁচে গেছি। ওই কমবখ্‌ত্‌ ফুলাদ আমাদের শুদ্ধ ধরে কোতোয়ালিতে হাজির করতে চেয়েছিলো! ওই অবস্থায় বাধ্য হয়ে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে হোতো, আর তাহলে কি বেইজ্জতি হোতো একবার ভেবে দেখতো! দরবারের সবাই আড়ালে হাসাহাসি করতো।"

আকিল খাঁ বললো, "আবিদ হুসেনকে কাল থেকে যে দরবারে নিয়মিত হাজির হতে বলা হয়েছে, সে হুকুম বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে।"

"না আকিল খাঁ," বললো আওরংজেব। মুখের ভাব স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। "না, ওর কোনো দোষ নেই। ও খুব সরল লোক। ও যা শুনেছে, তাই আমায় এসে বলেছে। মির মুনশী কাবিল খাঁ, লিখে নিন—কাল থেকে আবিদ হুসেন খাঁ হাজারী মনসবদারের পদে নিযুক্ত হবে। হ্যাঁ, হাজারী জা-ত্‌ দো সদ্‌ সওয়ার।"

এক হাজারী মনসবদার হবে আবিদ হুসেন! শুনে আকিল খাঁ বিস্মিত হোলো।

বাদশাহ বুঝলো আকিল খাঁর মনের ভাব। একটু হেসে বললো, "আবিদ হুসেন খাঁ আমার একটা উপকার করেছে। আমি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি সমস্ত ব্যাপারটা। আমার চোখে ধুলো দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছিলো। শিবা আগ্রায় লোক এনেছে বেছে বেছে,—এদের কেউই শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার সঙ্গে বেইমানি করবে না। শিবার অনুমোদন না থাকলে কৃষ্ণাজী রাঠোরদের সাহায্যে শিবার পলায়ন করার পরিকল্পনা আমার কানে তুলবার জন্যে এত

ব্যগ্র হোতো না। শিবাকে সাহায্য করবার জন্যে জসবন্ত সিংহের উৎসাহ থাকতে পারে,—না, অতো বিস্মিত হয়ো না আকিল খাঁ, জসবন্তের চরিত্রই ওরকম। খজওয়ার যুদ্ধে আমার সঙ্গে ওর বেইমানির ঘটনা ভুলে যেও না। আজমেরের যুদ্ধের আগে বেইমানি করেছিলো দারার সঙ্গেও।—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, শিবাকে সাহায্য করবার জন্যে জসবন্ত সিংহের উৎসাহ থাকতে পারে, কিন্তু ওর সাহায্য গ্রহণ করবার উৎসাহ যে শিবার নেই, একথা আমি বেশ বুঝি। শিবা নিজের মতলবে চলে। অন্যকে সে ব্যবহার করে, কিন্তু অন্যের বুদ্ধিতে চলে না। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোতো যদি না কৃষ্ণাজী নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলে শক্তিসিংহকে কয়েদখানায় ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করতো, যদি না আবিদ হুসেন সেটা তার সামনে বলে বসতো, যদি না আমিও নিজের কানে শুনতাম সে কথা। আমায় যে ভুল করে শক্তিসিংহের উপর অবিচার করতে হয় নি, তার জন্যে আমি আবিদ হুসেনের প্রতি কৃতজ্ঞ।' আর হ্যাঁ,— একথাও ভুলে যেয়োনা, আজ আবিদ হুসেন আমার আর তোমার মান রক্ষা করেছে, আমাদের পালিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছে।"

"শিবাজীর সম্বন্ধে কি আপনার কোনো নতুন হুকুম আমাদের জানানো হবে?" আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ," বললো আওরংজেব, "কুমার রামসিংহকে জানিয়ে দেওয়া হোক, শিবাকে স্থানান্তরিত করা হবে সেই মন্‌জিল থেকে। যেখানে মারাঠাদের তাঁবুগুলো ছিলো, সব তাঁবু তুলে দিয়ে, শুধু শিবার জন্যে খাটানো হবে একটি তাঁবু। সেখানে থাকবে শিবা আর তার কয়েকজন সহচর। অন্য সব মারাঠারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে খোজা ফিরোজার বাগের পেছন দিকে রামসিংহের লশকরদের সঙ্গে গিয়ে থাকতে শুরু করেছে।"

"ওরা চলে যেতে চাইছে আগ্রা ছেড়ে।"

"হ্যাঁ, ওরা চলে যাক। দিন পনেরোর মধ্যে ওরা রওনা হোক

এখান রামসিংহকে জানানো হোক শিবার তাঁবুর চারদিকে কড়া পাহারা বসবে। শুধু কছওয়া রাজপুতেরা নয়, তাদের সঙ্গে ফুলাদ াহেলিয়ারাও পাহারায় মোতায়েন হবে। শিবা যেন বাইরের া লোকের সঙ্গে কোনো র যোগাযোগ করতে না পারে। খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে কোতোয়ালির পিয়াদা, লশকর ও খুফিয়ানবিসের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে কাল থেকে।"

"শক্তিসিংহ রাঠোরের খুব অসুবিধে হবে," আকিল খাঁ একটু হেসে বললো।

আওরংজেবের চোখ দুটি হাসিতে ভরে গেল, কিন্তু মুখের ভাব রইলো গম্ভীর। নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো, "কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কোনো আগ্রহ দেখাতে চাই না। আশিক মাশুকার সঙ্গে দেখা করবেই কোনো না কোনো উপায়ে, কে তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে," বলে আওরংজেব একটি ফারসী বয়েৎ আবৃত্তি করলো।

আকিল খাঁ মনে মনে সায় দিলো বাদশাহ্‌র কথায়। বুঝে নিলো যে বাদশাহ্‌র আসল বক্তব্য, শক্তিসিংহের অভিসারে যেন কোনোরকম বিঘ্ন না ঘটায় পিয়াদা ও লশকরেরা। জিজ্ঞেস করলো, "আর কারো সম্বন্ধে যদি কোনো হুকুম থাকে—"

"আর কারো সম্বন্ধে?" আওরংজেব বিস্মিত হয়ে তাকালো আকিল খাঁর দিকে, তারপর বলে উঠলো, "না আকিল খাঁ, আর কারো সম্বন্ধে কোনো হুকুম নেই। বাদশাহ্‌কে অনেক সময় অন্ধ হয়ে থাকতে হয় আকিল খাঁ। কি করবো বলো, এই জাফর খাঁ জসবন্ত সিংহ, ফুলাদ খাঁ, মহম্মদ আমিন খাঁ, এদের মতো লোক নিয়েই সারা জীবন আমায় রাজ্যশাসন করতে হবে।"

ঈষৎ বেদনাতুর শোনালো আওরংজেবের কণ্ঠস্বর। আকিল খাঁ আর কিছু বললো না। বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলো। আওরংজেব বললো, "আমাদের খাদিম আবিদ হুসেন আর শক্তিসিংহ এখনো কোতোয়ালিতে আটক হয়ে আছে। একবার ওখানে ঘুরে যেয়ো।

ওদের যদি কোতোয়ালিতেই রাত্রিবাস করতে হয় আমি খুব দুঃখিত হবো।"

"আমি এখনই গিয়ে ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করছি," বলে আকিল খাঁ চলে গেল।

মোতিজান বসে ছিলো খুব বিমর্ষ মুখে। সে খবর পেয়েছিলো যে, আবিদ হুসেনকে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। রদ-অন্দাজ খাঁকে গিয়ে ধরে পড়বে কিনা একথা যখন ভাবছিলো এমন সময় দেখতে পেলো হাসিমুখে ঘরে ঢুকছে আবিদ হুসেন।

"তোমায় ছেড়ে দিয়েছে?" মোতিজান ছুটে গেল তার কাছে।

"একটা খুশখবর আছে মোতিজান," আবিদ হুসেন উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলো।

মোতিজান আবিদ হুসেনের হাত ধরে বললো, "আমি আর কোনো খুশখবর শুনতে চাই না আবিদ হুসেন। তুমি যে আমার কাছে ফিরে এসেছো, তাই যথেষ্ট।"

আবিদ হুসেনকে ভেতরে নিয়ে গেল মতিজান। সামনে পিয়ালা রেখে শরাব ঢেলে দিলো। তারপর বললো, "বড়ে মিঞা, তোমায় আমি আর এই শহরে থাকতে দেবো না। চলো, কালই আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

আবিদ হুসেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিলো, "বিবিজান, অতো ভালো নসীব নিয়ে জন্মাই নি। কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়েছি, কিন্তু পায়ে আরেকটি জিন্‌জির জড়িয়ে গেছে।"

"সে কি!"

"সত্যি তাই। কাল থেকে আমি দরবারের একজন উমরাহ্‌। মেহেরবান বাদশাহ্‌ আমাকে হাজার জাৎ দো সদ্‌ সওয়ারের মনসব দিয়েছেন। একথা শোনবার পর এদিকে আমি কপাল চাপড়াচ্ছি, ওদিকে ফুলাদ খাঁ কপাল চাপড়াচ্ছে।"

॥ চার ॥

প্রায় তিন হপ্তা পরের কথা। জুন শেষ হয়ে জুলাই মাস এসে গেছে। সেদিন মাসের প্রায় মাঝামাঝি এক বৃহস্পতিবার, সাপ্তাহিক আধা ছুটির দিন। সন্ধ্যায় খাস দরবার সেদিন হয় না। শাহী মহল থেকে বেগমেরা তাজমহলে গিয়েছিলো জিয়ারত করতে। জিয়ারত শেষ হবার পর সবাই ঘুরে বেড়াতে লাগলো তাজের সম্মুখস্থ বাগিচায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে জেব-উন-নিসা আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে, সবার অলক্ষ্যে তাজের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে যমুনার তীরে এক নিরিবিলি ছায়াঘন জায়গায় এসে দাঁড়ালো। সেদিন কৃষ্ণা একাদশী। এক ফালি চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাজের মর্মর-গম্বুজের উপর। কিন্তু জেব-উন-নিসা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে আবছা অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ। দূর থেকে ভেসে আসছে নারী-কণ্ঠের মৃদু কলরব। আর শোনা যাচ্ছে একঘেয়ে ঝিল্লিরব। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না শাহজাদীকে। একটা মৃদু শব্দ কানে এলো। দেখতে পেলো কিছুদূরে একটি ছিপ নিঃশব্দে ভেসে এসে পাড়ে লাগলো। একজন লাফিয়ে পড়লো পাড়ের উপর। ছিপ সরে গেল সেখান থেকে, আবার নিঃশব্দে ভেসে গিয়ে নদীর বুকে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করলো। সেই ব্যক্তি সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে এলো এদিকে।

"রাজি!" খুব আস্তে ডাকলো জেব-উন-নিসা।

"মক্‌ফি!" কাছে এসে দাঁড়ালো আকিল খাঁ।

"বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না," জেব-উন-নিসা বললো, "ওরা জানে আমি জিনত-উন-নিসার সঙ্গে সিরহিন্দি বেগমের রওজার ওদিকে বেড়াতে গেছি।"

"কবে আমরা বেশীক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পেরেছি, মক্‌ফি, ?" বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলো আকিল খাঁ।

"এভাবেই সারা জীবন কাটাতে হবে, রাজি। কখনো কখনো অনেক চেষ্টা করে কয়েক মুহূর্ত দেখা হওয়ার সুযোগ করে নিতে হবে, প্রত্যেকবারেই দেখা হওয়ার পর মনে হবে আবার কবে দেখা হবে কে জানে, হয়তো এই শেষ দেখা। এই দু-চার মুহূর্ত তোমার হাত ধরে দুটো কথা বলা, আমার জীবনে এটুকুই সুখ।"

"মক্‌ফি, হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ আর হবে না," বললো আকিল খাঁ, "শাহ-ইন-শাহ মহলের পাহারা সম্বন্ধে নতুন হুকুম দিয়েছেন। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করার আর কোনো পথই থাকবে না তোমাদের।"

"আমিও শুনেছি সে কথা। কিন্তু এত কড়াকড়ি কেন ?"

"শাহ-ইন-শাহ্‌র ধারণা শিবাজীর সমর্থক উমরাহ্‌দের ষড়যন্ত্রের মধ্যে মহলের কোনো কোনো বেগমও আছে। সেখান থেকেই তারা অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। মহারাজা জসবন্ত সিংহ, মহম্মদ আমিন খাঁ, খুদ উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁ, সবারই উপর নজর রেখেছে শাহ-ইন-শাহ্‌র খাস হরকরা ও খুফিয়ানবিসেরা। বাদশাহ সলামত এখন আর কাউকে বিশ্বাস করেন না।"

"আমরা কয়েকদিন ধরে কোনো খোঁজ-খবর পাচ্ছি না।"

"কোনো খবর নেই মক্‌ফি," আকিল খাঁ উত্তর দিলো, "শিবাজীকে রাখা হয়েছে খোজা ফিরোজার বাগের ভিতর এক তাঁবুতে, চারদিকে কছওয়া লশকর আর মোগল বাহেলিয়াদের কড়া পাহারা। শিবাজীর মারাঠা লশকরেরা অনেকেই চলে গেছে শহর ছেড়ে, অল্প কয়েকজন যারা আছে ওরাও সাত আট দিনের মধ্যেই

চলে যাবে। শিবাজী নিজের পূজোঅর্চনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, কারো সঙ্গে দেখা করেন না। আসবাবপত্র সব দান করে দিয়েছেন। ওঁর সভাকবি কবীন্দ্র কবিশ্বরকেও ছুটি হাতি, একটি ঘোড়া আর এক হাজার সিক্কা তঙ্কা দিয়েছেন। কবীন্দ্র কবিশ্বর আজ আমের রওনা হোলো। শিবাজী বলছেন,—বাদশাহ আমায় দস্তক দিচ্ছেন না, সুতরাং যে ভাবে অশ্বারোহণে আগ্রায় এসেছি, সে ভাবে আর আগ্রা ত্যাগ করতে পারবো না। সুতরাং হাতি ঘোড়া রেখে আর কি করবো। আমি এখানে ফকিরের মতোই থাকবো।"

"শুনছি উনি আর আগের মতো কোনোরকম সওদা করছেন না আগ্রার বাজারে।"

"হ্যাঁ, ওঁর টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে বলেই শোনা যাচ্ছে।"

"নিশ্চয়ই খুব অসুবিধের মধ্যে আছেন।"

"তা মনে হয় না। বাদশাহ সলামতের মেহমান উনি, ওঁর কোনো রকম অসুবিধে হবে না।"

"আমরা কি ওঁর জন্যে কিছু করতে পারি না?" জেব-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো।

"না মক্‌ফি, আমাদের কিছু করার নেই। কিছু করবার চেষ্টা করা নিরাপদও নয়। দু-হপ্তা আগে শিবাজীর হয়ে আমি আর মহম্মদ আমিন খাঁ শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে আরজ্ পেশ করেছিলাম। তাতে তিনি আমাদের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।"

জেব-উন-নিসা চুপ করে রইলো।

"কি ভাবছো মক্‌ফি?" আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

"জিনত-উন-নিসা এসব কথা শুনলে খুব দুঃখিত হবে।"

"এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্যে আমাদের সবারই খুব আফসোস হয়েছে মক্‌ফি, কিন্তু কারো কিছু করার নেই। যা করার করতে পারেন বাদশাহ সলামত, আর পারেন শিবাজী নিজে।"

"রাজি?"

"কি মক্‌ফি ?"

"ওই দেখ পশ্চিম আকাশে বাঁকা চাঁদ। একটু পরেই অস্ত যাবে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওই তাজমহল। এখানে এই নির্জন যমুনার তীরে তুমি আমি একা। কিন্তু আগের দিনের মতো শুধু আমাদের নিজেদের কথাগুলো আর বলা হচ্ছে না। দরবারে, মহলে, উর্দুতে, বাজারে যা আলোচনা চলছে, এখানে আমরাও তাই করছি। কেন ?"

"মক্‌ফি," আকিল খাঁ আস্তে আস্তে বললো, "জীবনের ধারা বদলে গেছে। ফিরদৌস আশয়ানি শাহ-ইন-শাহ্‌ বাদশাহ্‌ শাহজাহানের রাজত্বের মন্থর শান্তিময় দিনগুলো আর নেই। এখন জীবনটা অনেক দ্রুত। একটা বিরাট গৃহযুদ্ধ আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। সামনেও শান্তির কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না। বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, হয়তো মেবারের সঙ্গেও যুদ্ধ হবে। আমাদের শাহ-ইন শাহ বাদশাহ্‌ তামাম হিন্দুস্তান, তামাম দক্কান নিজের দখলে আনতে চান। হুকুমতের মনোভাব এরকম জঙ্গী হলে দেশে শান্তি থাকতে পারে না। অথচ শান্তি না থাকলে তুমি আমি কোনো সুখ পাবো না। তাই আমাদের নিরালা অবসর মুহূর্তেও আমরা দেশের সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ আলোচনা না করে পারি না। এসব সমস্যার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সুখশান্তির প্রশ্নও জড়িয়ে আছে।"

জেব-উন-নিসা বললো, "আমাদের বয়েসও অনেক বেড়ে গেছে। তাই বোধ হয় সাত আট বছর আগেকার দিনগুলোর মতো অতো ভাবপ্রবণ আমরা হতে পারি না।"

"না, সেজন্যে নয় মক্‌ফি। দিনকাল বদলে গেছে। আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে খোয়াব দেখার দিন আর নেই। আগে শের রচনা করতে কতো ভালো লাগতো। এখন ওসব ছেলেমানুষী মনে হয়।"

"এর চেয়ে যদি কিসান-মেয়ে হয়ে জন্মাতাম," বললো জেব-উন-নিশা, "অনেক সুখে থাকতাম।"

আকিল খাঁ হেসে বললো, "ওদের যে কী কষ্ট এখানে শাহী মহলে বসে তুমি কল্পনা করতে পারবে না মক্‌ফি।"

জেব-উন-নিসা আকিল খাঁর হাত ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, "রাজি, তোমায় কতো কথা বলবো বলে ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু কিছুই বলা হোলো না। সময় হয়ে গেছে, এবার আমায় যেতে হবে।"

আকিল খাঁ উত্তর দিলো, "মক্‌ফি, এই যে কিছুক্ষণ তুজনে তুজনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি, এতেই সব কিছু বলা হয়ে গেছে।"

"আবার কবে দেখা হবে রাজি?"

"জানি না। তিন মাস পরে দরবার দিল্লী রওনা হচ্ছে, সেখান থেকে হয়তো রওনা হতে হবে পেশাওয়ারের উদ্দেশে। ইউসুফ-জাইরা বিদ্রোহ করার আয়োজন করছে বলে শোনা যাচ্ছে।"

"দেশে কি আর শান্তি আসবে না রাজি?"

"হয়তো আমাদের কালে আর নয়।"

তুজন তুজনার কাছে বিদায় নিলো। আকিল খাঁর সঙ্কেত পেয়ে ওর ছিপ এসে নিঃশব্দে ওকে নিয়ে গেল। জেব-উন-নিসা ফিরে গেল তাজের ওদিকে। একটু নিরিবিলিতে একজায়গায় জিনত-উন-নিসা অপেক্ষা করছিলো তার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর জন্যে। জেব-উন-নিসা ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করলো, "শিবাজীর কোনো খবর দিলো তোমার আশিক?"

"বিশেষ কিছুই নয়," বললো জেব-উন-নিসা। তার মুখ খুব বিষণ্ণ গম্ভীর। শুধু এটুকু জানালো যে শিবাজীর সম্প্রতি কিছু আর্থিক অসুবিধে হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

তখন রাত্রি প্রথম প্রহর। খোজা ইয়ার লতিফ সাক্ষাৎ করতে

এসেছিলো রোশন-আরা বেগম সাহিবার সঙ্গে। সে যখন চলে গেল, তখন অত্যন্ত চিন্তান্বিত দেখালো রোশন-আরাকে। কিছুক্ষণ চিন্তা করলো নিজের মনে, তারপর মর্মর খচিত অঙ্গন অতিক্রম করে কোনো সংবাদ না দিয়েই চলে এলো জেব-উন-নিসার মহলে।

জেব-উন-নিসার কক্ষে তখন ফতিল-সোজ্-এর উপর একটি চিরাগ মাত্র জ্বলছে। সেই সামান্য আলোয় দেখতে পেলো শাহজাদী জিনত-উন-নিসা শুয়ে আছে শয্যার উপর, পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জেব-উন-নিসা। এক পাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটি সোনার অলঙ্কার।

রোশন-আরাকে অকস্মাৎ কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে জেব-উন-নিসা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তসলিম করলো। খাদিমান মারফত খবর না দিয়ে বিনা ঘোষণায় মহলের কোনো বেগমের অন্য মহলে যাওয়া রেওয়াজ নয়, তাই বিস্মিত হয়ে ভাবলো, নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কারণ ঘটেছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই রোশন-আরা জিনত-উন-নিসার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জানতে চাইলো, ছোটী শাহজাদী সাহিবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিনা। রোশন-আরার কণ্ঠস্বর শুনে জিনত-উন-নিসা মুখ তুলে তাকালো। তারপর আবার মুখ লুকিয়ে ফেললো তাকিয়ায়। কিন্তু রোশন-আরা দেখে ফেললো জিনত-উন-নিসার চোখের জল।

"কি হয়েছে জিনত-উন-নিসার?" জিজ্ঞেস করলো রোশনআরা।

জেব-উন-নিসা না বলে পারলো না। শিবাজীর সমস্ত অর্থ ফুরিয়ে গেছে, উনি নিঃসম্বল হয়ে পড়েছেন, এখবর পেয়ে জিনত-উন-নিসা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে। নিজের গলা থেকে, হাত থেকে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার অপসারণ করে রেখে দিয়েছে একপাশে। বলছে, আমার কাছে হীরা জহরৎ যা আছে সব ওঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। জেব-উন-নিসা বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে সে অসম্ভব, কিন্তু জিনত-উন-নিসা কিছুতেই মানতে চাইছে না।

একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রোশন-আরা বেগম সাহিবা।

"যতো ছেলেমানুষী,' -উন-নিসা নিজের মনে বললো ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, "যার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না, যে কোনোদিন জানতে পারবে না এর মনের খবর, তাকে শুধু দরবারে জাফরির আড়াল থেকে এক নজর দেখেই এরকম ভাববিলাসিতার কোনো অর্থ হয়?"

রোশন-আরা আস্তে আস্তে বললো, "ওর কোনো দোষ নেই জেব-উন-নিসা, দোষ আমাদের শাহী মহলের কায়দা কানুনের। বেগমদের শাহজাদীদের চিরকাল ভাব-বিলাসের স্বর্ণ-পিঞ্জরেই আবদ্ধ করে রাখা হয়। আমাদের বাদশাহ্‌দের মনে থাকে না যে এরাও রক্তমাংসের মানুষ। সুতরাং এই ভাব-বিলাসিতাই তাদের জীবনে একমাত্র সত্য, এর থেকে যে জহর তৈরী হয়, তারই জ্বালা সইতে হয় সারাজীবন, তারপর সবকিছু ভুলে থাকবার জন্যে শরাব আর আরো কতো কি,—নিজের চোখেই তো দেখছো জেব-উন-নিসা। বাদশাহ আলমগীর নিজে এত নিষ্ঠাবান, এত ধর্মভীরু—কিন্তু তাঁর এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও কিছুই আটকাচ্ছে না।"

"জিনত-উন-নিসাকে নিয়ে যে কি করবো, ভেবে পাচ্ছি না।"

"কিছুই করবার নেই," বললো রোশন-আরা, "আমরা বরং আকাশের চাঁদ এনে ওর হাতে তুলে দিতে পারি, কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। ও যা চায় তা হবে না।"

জিনত-উন-নিসা উঠে বসলো। তারপর বললো, "ছোটী ফুফীজান, আমি তো নিজের জন্যে কিছু চাই না।"

"কি চাও তুমি?" জিজ্ঞেস করলো রোশন-আরা।

"আমি শুধু চাই, শিবাজী যেন নিরাপদে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারেন। উনি সুখে থাকুন, উনি শান্তিতে থাকুন, আমি আর

কিছু চাই না। আমি শাহজাদী হওয়ার দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, নিজের জন্যে কিছু চাওয়ার স্পর্ধা আমার নেই।”

“শিবাজী সুখেও থাকবে না, শান্তিতেও থাকবে না,” বললো রোশন-আরা, “আমার ভাই শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ ওকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, সেও আমার ভাইকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। এ শুধু দুজন ব্যক্তির সংঘর্ষ নয়, একথা কেন বুঝতে পারছো না? এরা দুজন দুটো বিভিন্ন আদর্শবাদের প্রতীক, এদের সংঘর্ষ—দুটো আদর্শবাদের সংঘাত। একজন চায় সাম্রাজ্যের বিস্তার, আরেকজন চায় আঞ্চলিক স্বাধীনতা। এদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া হতে পারে না। আমরা হারেমের বেগম, আমরা যাদের পায়ের নিচে থাকি, তাদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায়, সেই বিদ্রোহীদের জন্যে আমাদের মনে মনে একটা গোপন সহানুভূতি থাকা কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু তাকে তুমি অন্য কোনো প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে ভুল কোরো না। তার কোনো উপকার হবে না, নিজে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।”

দুই শাহাজাদী স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর জিনত-উন-নিসা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, “শিবাজীকে কি সারাজীবন এভাবে কয়েদ হয়েই কাটাতে হবে?”

“বোধ হয় তাই,” বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে জেব-উন-নিসা বললো। “আমাদের শেষ আশা ছিলো মির্জা রাজা জয়সিংহ। ভেবেছিলাম হয়তো তিনি শাহ্-ইন-শাহ্‌কে পরামর্শ দেবেন শিবাজীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। শাহ্-ইন-শাহ তাঁর পরামর্শ চেয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলো। আমিও গোপনে এক নিশান পাঠিয়েছিলাম দিলির খাঁর কাছে, যাতে আমার হয়ে তিনি মির্জা রাজার সঙ্গে কথা বলেন। আমার নিশানের জবাব আসেনি, শাহ্-ইন-শাহ্‌র কাছেও কোনো জবাব আসেনি। শুধু গোপনে উত্তর এসেছে কুমার রামসিংহের কাছে, যাতে দরবারের কেউ মহারাজা জয়সিংহের মনোভাবের

কোনো খবর না পায়। কুমার রামসিংহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে যেন এই পত্রের বিষয়বস্তু শাহ্-ইন-শাহ্কে গোপনে মৌখিক জানায়। আজ সকালে খিলওয়াত-গাহ্তে এসে কুমার রামসিংহ শাহ্-ইন-শাহ্কে সেই পত্র দেখিয়েছে। আমি এই মাত্র খবর পেলাম ইয়ার লতিফের কাছে।"

"কি লেখা ছিলো সেই পত্রে?" জিনত-উন-নিসা ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

রোশন-আরা শোনালো সেই পত্রের বক্তব্য। মির্জা রাজা জয়সিংহ কুমার রামসিংহকে লিখেছেন,—তুমি অন্যের অগোচরে আমার এই কথাগুলো শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্কে জানাবে। সময়ের পরিবর্তন হয়, সেই সঙ্গে নীতিরও পরিবর্তন করতে হয়। আগে যখন আমি শাহ-ইন-শাহ্কে অনুরোধ করেছিলাম শিবাকে এখানে দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসবার অনুমতি দেওয়ার জন্যে, তখন এখানে একরকম পরিস্থিতি ছিলো। এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। এই অবস্থায় তাকে এ অঞ্চলে ফিরে আসতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্কে জানিয়ো যে, শিবাকে যেন নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে সেখানে আটকে রাখা হয়। তবে সে যে বন্দী এরকম কোনো ধারণার সৃষ্টি হতে দেওয়া যেন না হয়। তা নইলে তার সেনাধ্যক্ষেরা আদিল-শাহ্র সঙ্গে যোগদান করে জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। তাহলে এখানে আর নতুন ফৌজও পাঠাতে হবে না।

চুপচাপ শুনলো জিনত-উন-নিসা আর জেব-উন-নিসা। জেব-উন-নিসা আস্তে আস্তে বললো, "এই যদি মির্জা রাজার অভিমত হয়, তাহলে শাহ-ইন-শাহ কোনোদিনই শিবাজীকে মুক্তি দেবেন না। শিবাজীর জানা দরকার এই পত্রের খবর।"

"আমিও সেকথা ভেবেছি।"

কিন্তু কি করে জানানো যায় শিবাজীকে?"

"সে ব্যবস্থাও আমি করছি," বললো রোশন-আরা।

"কি ব্যবস্থা করবেন," জেব-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো, "শিবাজীর তাঁবুর চারদিকে তো কড়া পাহারা সারাদিন, সারারাত।"

রোশন-আরা হাসলো, "খোজা ইয়ার লতিফ পত্রের নকল নিয়ে যাচ্ছে শক্তিসিংহ রাঠোরের কাছে।"

"কিন্তু কোনো রাঠোর কি সাক্ষাৎ করতে পারবে শিবাজীর সঙ্গে? কছওয়াদের মধ্যেও বাছা বাছা কয়েকজন ছাড়া আর কারো শিবাজীর তাঁবুতে যাওয়ার হুকুম নেই।"

রোশন-আরা বললো, "শক্তিসিংহের রাজপুতানী মাশুকা পান্নাবাঈ খাবার নিয়ে যায় শিবাজীর জন্যে। পান্নার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে কোনো বাধা দেওয়া হয় না শক্তিসিংহকে।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো জেব-উন-নিসার মুখ। সে একটু হাসলো।

"আমাদের আর কিছু করার নেই," রোশনআরা বললো, "কিন্তু আমি মনে মনে কামনা করছি, শিবাজী যেন পালিয়ে যেতে পারে। বাদশাহ্‌র উপর মহারাজা জয়সিংহ, ফুলাদ খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ এদের খুব প্রভাব। এরা জাহান-আরা বেগম সাহিবার অনুরাগী, তাই আজকাল বাদশাহ্ জাহান-আরাকেও খুব খাতির করেন। তখ্‌ত্‌এর লড়াইয়ের সময় আমি আওরংজেবের যে খিদমত করেছিলাম, সে ভুলে গেছে। যদি শিবাজী পালিয়ে যেতে পারে, তাহলে জাহান-আরার পক্ষের উমরাহ্‌দের খুব বেইজ্জতি হবে। তখন বাদশাহ্‌র উপর প্রভাব হবে জসবন্তসিংহ, জাফর খাঁ, মহম্মদ আমিন খাঁ, দিলির খাঁ প্রভৃতির। এরা সব আমার লোক।"

জিনত-উন-নিসা শয্যা ছেড়ে উঠে এলো। তারপর হঠাৎ মাটিতে জানু পেতে বসে রোশন-আরা বেগমের হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললো, "ছোটী ফুফীজান, আমার একটি কাজ করে দিতে হবে, তাহলে সারাজীবন আপনার বাঁদী হয়ে থাকবো।"

রোশন-আরা সস্নেহে জিনত-উন-নিসার হাত ধরে তাকে টেনে তুললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "বলো কি করতে হবে।"

"করে দেবেন তো?

রোশন-আরা ম্লান হাসি হাসলো। উত্তর দিলো, "একটা সময় ছিলো যখন রোশন-আরা বেগম সাহিবার অসাধ্য কিছুই ছিলো না। কিন্তু এখন দিন বদলে গেছে। ওকথা আর জোর গলায় বলতে পারি না।"

"ছোটী ফুফীজান, আমার হীরে জহরৎ অলঙ্কার পত্র যা আছে সব শিবাজীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ওঁর জন্যে আমার আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। যদি এটুকুও করতে না পারি, আমি নিজেকে কোনো সান্ত্বনাই দিতে পারবো না। ওঁর হাতে অর্থ না থাকলে উনি আত্মরক্ষা করার কোনো উপায়ই করতে পারবেন না।"

রোশন-আরা জেব-উন-নিসা দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। কিছুক্ষণ পর রোশন-আরা বললো, "কাজটা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়।"

"কেন অসম্ভব?" জিজ্ঞেস করলো জিনত-উন-নিসা।

"বাদশাহ্‌জাদীর সমস্ত অলঙ্কার পত্র নিখোঁজ হয়ে গেলে সেটা যে কারো চোখে পড়বে না তা নয়। তখন অনেক প্রশ্ন উঠবে। শাহ-ইন-শাহ্‌র কানে গেলে তিনি খুব ক্রুদ্ধ হবেন।"

"আমার নিজের জন্যে আমি ভাবি না," জিনত-উন-নিসা উত্তর দিলো।

"আমিও উপস্থিত তোমার জন্যে ভাবছি না," রোশন-আরা বললো, "আমি ভাবছি শিবাজীর কথা। যদি একথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে তোমার অলঙ্কারপত্র ওঁর হাতে চলে গেছে, তিনিই বিপদে পড়বেন। শাহ-ইন-শাহ্‌র সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে ওঁর উপর।"

"আরেকটা কথা আমাদের ভাবতে হবে," বলে উঠলো জেব-উন-নিসা, "ধরেই নিলাম জিনত-উন-নিসার সমস্ত অলঙ্কারপত্র আমরা

ওঁর কাছে পৌঁছে দিতে রাজী হলাম,—যদিও আমার কোনো অনুমোদন নেই এ প্রস্তাবে—"

"জেব-উন-নিসা," জিনত-উন-নিসা বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "তুমি কি কিছুই বোঝো না?"

"আমি সবই বুঝি," জেব-উন-নিসা উত্তর দিলো, "কিন্তু অকারণ ভাবপ্রবণতার অনুমোদন আমি করি না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, অলঙ্কারপত্র ছুটো চারটে নয়। যে পরিমাণ মূল্যের অলঙ্কারপত্র শিবাজীকে দিলে ওঁর উপকার হবে, সেটা অনেকখানি। অতো অলঙ্কারপত্র সবার অলক্ষ্যে মহল থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? শাহ-ইন-শাহ্‌র খুফিয়ানবিসেরা কড়া নজর রেখেছে মহলের চারদিকে।"

জিনত-উন-নিসা কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

রোশনআরাও ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো। অলঙ্কার পত্র বাইরে পাঠানো যাবে না।"

জিনত-উন-নিসা দুহাতে মুখ ঢাকলো।

রোশনআরা বললো, "তবে হ্যাঁ, আরেকটা ব্যবস্থা হতে পারে।"

জিনত-উন-নিসা আবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো।

"মিরজুমলা গোলকুণ্ডা ত্যাগ করে আগ্রার দরবারের খিদমতে হাসিল হবার সময় উনি আমাদের প্রত্যেককে অনেক হীরে সওগাত দিয়েছিলেন।"

সেসব প্রায় দশবছর আগেকার কথা। বাদশাহ শাহজাহানের দরবারে উজীর নিযুক্ত হওয়ার আগে মিরজুমলা ছিলো গোলকুণ্ডার উজীর। সে সময় তার নিজের হীরের খনি ছিলো কয়েকটি। তার নিজের কাছেই ছিলো বিশ মন হীরে। মোগল দরবারের খিদমতে নিযুক্ত হওয়ার পর বাদশাহ ও তাঁর পরিজনবর্গকে অনেক মূল্যবান হীরে উপহার দিয়েছিলো মিরজুমলা। স্বয়ং বাদশাহ শাহজাহানকেই যে সব হীরে দিয়েছিলো তার কোনোটাই একশো রতির কম নয়,

সব চেয়ে বড়োটা ছিলো হুশো ষোলো রতি ওজনের। জাহানআরা রোশনআরা, জেব-উন-নিসা, জিনত-উন-নিসা এরাও অনেক হীরে পেয়েছিলো প্রত্যেকেই, কোনোটাই চল্লিশ পঞ্চাশ রতির কম নয়, একশো একশো পঁচিশ রতিরও কয়েকটি হীরে প্রত্যেকের কাছেই ছিলো।

রোশনআরা বললো, "আমাদের তিনজনের হাতে যা হীরে আছে সেখান থেকে কয়েকটি বড়ো ও মাঝারি হীরে বেছে নেওয়া যাক, যার মোট দাম অন্তত পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা হয়। এতে জায়গা নেবে কম, গোপনে মহলের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।"

"পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকায় কি হবে?" বললো জিনত-উন-নিসা।

"উপস্থিত এটাই পাঠিয়ে দেওয়া যাক। তারপর অন্য কোনো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা যাবে।"

রোশনআরার এ প্রস্তাব সবার অনুমোদন লাভ করলো। কিন্তু তার পরের সমস্যা হোলো শিবাজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে কি করে। মহলের কোনো লোক খোজা ফিরোজার বাগের দিকে গেলে খুফিয়ানবিসেরা জানতে পারবে। শিবাজীকে এনে রাখা হয়েছে একটি তাঁবুতে। চারদিকে কছওয়া রাজপুত আর মোগলদের কড়া পাহারা থাকে অষ্টপ্রহর। তাদের লক্ষ্য এড়িয়ে শিবাজীর কাছে পৌঁছোনো অসম্ভব।

মহলের বাইরের অনেক খবর রাখতো রোশনআরা। বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা আলোচিত ও বাতিল হবার পর সে বললো, "একটা মাত্র উপায় আছে। শিবাজীর কাছে প্রত্যেকদিন যাবার হুকুম আছে শুধু সেই কছওয়া রাজপুতানীর, যার সঙ্গে ইশক্‌বাজী করে শক্তিসিংহ রাঠোর। তার কাছে যদি পৌঁছে দেওয়া যায় এসব হীরে, সে শিবাজীর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে সবার অলক্ষ্যে।"

কিন্তু পান্নার কাছেই বা পৌঁছে দেওয়া যাবে কি করে? রোশন-আরা বললো সে ভার দিতে হবে শক্তিসিংহকে। শক্তিসিংহের সঙ্গেই বা কি করে যোগাযোগ করা যায়,—জানতে চাইলো জেব-উন-নিসা। শাহ-ইন-শাহ্‌র খুফিয়ানবিসেরা জেনে যেতে পারে। রোশনআরা জানালো তার পরিকল্পনা। মমতাজ-আবাদে থাকে আগ্রার মশহূর তওআয়ফেরা। তাদের ওখান থেকে মাঝে মাঝে দু-একজনকে ইত্তলা দেওয়া হয় রংমহলের মুশায়েরাতে। সুতরাং মহলের কোনো খোজা যদি মমতাজ-আবাদে যায়, তাহলে কারো মনে কোনো সন্দেহ হবে না। সেই মমতাজ-আবাদে থাকে আবিদ হুসেন খাঁর মাশুকা। তার ওখানে শক্তিসিংহও মাঝে মাঝে যায়। সুতরাং একদিন সন্ধ্যার পর হীরের ছোটো পেটিকা রেখে আসা যেতে পারে আবিদ হুসেন খাঁর মাশুকা সেই তওআয়ফের হিজাফতে। তারপরদিন সকালে দরবারের সময় জসবন্ত সিংহের মিস্‌ল্‌এর সঙ্গে যখন শক্তিসিংহও কেল্লার ভিতর আসবে, তখন তাকে গোপনে জানিয়ে দেওয়া হবে বিশ্বস্ত খোজা ইয়ার লতিফের মারফতে। শক্তিসিংহ গিয়ে হীরে নিয়ে আসবে সেই তওআয়ফের কাছ থেকে।

সেই তওআয়ফ হীরের দায়িত্ব নিতে রাজী হবে কেন?—জানতে চাইলো জেব-উন-নিসা। তাকে কি এতগুলি মূল্যবান হীরে দিয়ে বিশ্বাস করা যাবে?—জিজ্ঞেস করল জিনত-উন-নিসা। রোশনআরা উত্তর দিলো,—দিতে হবে আবিদ হুসেনের নাম করে। শুনেছি ওদের দুজনের মধ্যে নাকি খুব গভীর ভালোবাসা। সুতরাং আবিদ হুসেনের নাম করে দিলে হয়তো সে রাজী হবে। হীরের পেটিকায় কুলুপ এঁটে দিতে হবে। তাহলে সে জানতে পারবে না এর ভিতর কি আছে।

"আমি একটা নিশানও দিয়ে দেবো সেই পেটিকার ভিতর," বললো জিনত-উন-নিসা।

"নিশান?" রোশনআরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কার কাছে?"

"শিবাজীর কাছে।"

রোশনআরা স্তম্ভিত হোলো। তারপর বললো, "এটা নিরাপদ হবে না জিনত-উন-নিসা।"

"আমরা অনেক ঝুঁকিই নিচ্ছি," জিনত-উন-নিসা উত্তর দিলো, "সুতরাং আরেকটি ঝুঁকিও নিতে পারি।"

"জিনত-উন-নিসা,"—বলে উঠলো রোশনআরা।

সে বাধা দিয়ে উত্তর দিলো, "শিবাজীর জানা দরকার। আমাদের কোনোদিন মুলাকাৎ হবে সে আশা আমি করি না। কিন্তু উনি আমার কথা জানবেন,—এটা কি আমি আশা করতে পারি না?"

রোশনআরা আর জেব-উন-নিসা বুঝলো। আর কিছু বললো না। রোশনআরা সস্নেহে একটি হাত রাখলো জিনত-উন-নিসার কাঁধের উপর। জেব-উন-নিসা হঠাৎ বলে উঠলো, "কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি।"

"কি?" জিজ্ঞেস করলো রোশনআরা।

"আবিদ হুসেন খাঁ শাহ-ইন-শাহ্‌র অত্যন্ত বিশ্বস্ত খাদিম। নতুন উমরাহ হয়েছে। সে তো এসব ব্যাপারে সায় দেবে না। এবং তার তওআয়ফের হাত দিয়ে একটি জিনিস দেওয়া হবে শক্তিসিংহকে একথা তার অজানা থাকবে, কি করে আমরা সেটা ভাবতে পারি? তার নাম করে সেই তওআয়ফকে কিছু দিলে সে আবিদ হুসেনকে জানাবেই।"

রোশনআরা হাসলো। বললো, "একথা আমি ভেবে রেখেছি। কাল সন্ধ্যার দরবারের পর আবিদ হুসেন খাঁ তার দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ী মমতাজ-আবাদে যাবে সেই তওআয়ফের কাছে। খোজা মহম্মদ উসমান গিয়ে তাকে কোনো একটা ছুতো করে নিয়ে আসবে এখানে।"

"এখানে ?" জেব-উন-নিসা বিস্মিত হয়ে বললো।

"হ্যাঁ। চোখ বেঁধে নিয়ে আসবে। আমি তার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। যদি তাকে আমাদের দলে আনতে পারি তো কোনো ভাবনাই নেই। যদি না পারি, সে একরাত বন্দী থাকবে নিচের তহ্‌খানায়। ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে তার পরদিন অপরাহ্নে। ততক্ষণে শক্তিসিংহ গিয়ে হীরের পেটিকা নিয়ে আসবে সেই তওআয়ফের কাছ থেকে।"

"তওআয়ফের কাছে সেই পেটিকা দিয়ে আসা হবে কখন ?" জিনত-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো।

"আবিদ হুসেনকে তার ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরে, খোজা মির হাসান যাবে সেই তওআয়ফের কাছে। হীরের পেটিকা দিয়ে বলবে,—এই পেটিকা নিরাপদে রাখবার জন্যে আপনাকে দিতে বলে পাঠিয়েছেন মির আবিদ হুসেন খাঁ। এ জিনিস সেই কছওয়া রাজপুতানীর—নামটা আমি ভুলে গেছি। খবর নিয়ে জানতে হবে।—মির হাসান আরো জানাবে যে পরদিন শক্তিসিংহ রাঠোর এটা নিতে এলে যেন তাকে দিয়ে দেওয়া হয়।"

জেব-উন-নিসা বললো, "কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আবিদ হুসেন খাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর সে তার মাশুকার কাছে ব্যাপারটা জানতে পারবে। হয় তো শাহ-ইন-শাহ্‌কে জানাবে সে কথা।"

"না," উত্তর দিলো রোশনআরা, "শক্তিসিংহ তার বন্ধু। সেই রাঠোর আর তার মাশুকার ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। সে সরল লোক। যা শুনবে তাই বিশ্বাস করে নেবে।"

"তার মনে সন্দেহ হতে পারে ?"

"সে সুযোগ তাকে দেবো না। যদি আমার কথা শুনে আমার পক্ষভুক্ত হতে রাজী হয় তো কোনো ভাবনা নেই। শাহ-ইন-শাহ্‌র

বিশ্বাসভাজন দু একজন লোক আমার হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি সে রাজী না হয়, তাহলে একরাত একদিন তহ্‌খানায় বন্দী থাকার অভিজ্ঞতা তার মনে এমন উত্তেজনা এনে দেবে যে, সে আর অন্য কিছু ভাববার সময় পাবে না কয়েকদিন।”

“সে যদি শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে গিয়ে ফরিয়াদ পেশ করে?” জেব-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো।

“আমার নামে!” রোশনআরা বাঁকা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো। “সারা হিন্দুস্তানে কার এত হিম্মত আছে? তার মগজে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে, সে চুপ করে থাকবে। আমি তাকে সেকথা বুঝিয়েও দেবো।”

রোশনআরা ফিরে চললো। জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা তার পেছন পেছন এলো তাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে।

বাইরের প্রাঙ্গণে আবছা অন্ধকার। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো রোশনআরা। তারপর নিচু গলায় বললো, “সব কিছু নির্ভর করছে আবিদ হুসেন খাঁকে রংমহলের ভিতর নিয়ে আসতে পারার উপর। তাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারলে সেই পেটিকা শিবাজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। একাজের ভার নিতে হবে তোমাদেরই বিশ্বাসী খাদিম খোজা মহম্মদ উসমানকে। তাকে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার ভার তোমাদের। আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে।”

জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা সসম্ভ্রমে তসলিম করলো। রোশনআরা দ্রুত হেঁটে চলে গেল নিজের মহলের দিকে। জিনত-উন-নিসা আর জেব-উন-নিসা ফিরে গেল নিজেদের মহলে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো তার কাছেই ছিলো একটি চওড়া মর্মর-স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক খাদিমান। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল উদিপুরী মহলের কক্ষের দিকে। সেখানে উদিপুরীর সঙ্গে বসে নিচু

গলায় আলাপ করছিলো গওহরআরা। খাদিমান তাদের তসলিম করলো।

"রোশনআরা নিজের মহলে ফিরে গেছে," বললো সে।

"কিছু শুনতে পেলে?"

"মহলের ভিতরে যাওয়ার সুযোগ পাইনি, সুতরাং সেখানে কি কথাবার্তা হয়েছে কিছুই জানি না। তবে বাইরে যখন এলেন তখন দু-একটা কথা কানে এলো। আমি কাছেই একটি সং-মর্মরের স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম।"

"কি শুনলে?" জিজ্ঞেস করলো গওহরআরা।

"ছোটী বেগম সাহিবা শাহজাদী সাহিবাদের বললেন,—সব কিছু নির্ভর করছে আবিদ হুসেন খাঁকে রংমহলের ভিতর নিয়ে আসতে পারার উপর। তাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারলে সেই পেটিকা শিবাজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। একাজের ভার নিতে হবে তোমাদেরই বিশ্বাসী খাদিম খোজা মহম্মদ উসমানকে। তাকে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার ভার তোমাদের।—ব্যস, এইটুকু। আর কোনো কথা হয়নি।"

গওহরআরা আর উদিপুরী দৃষ্টি বিনিময় করলো।

"আচ্ছা, তুমি বিদায় গ্রহণ করতে পারো," বললো উদিপুরী।

খাদিমান তসলিম করে চলে গেল। গওহরআরা জিজ্ঞেস করলো, "উদিপুরীজী, কিছু বুঝলে?"

"হ্যাঁ বুঝলাম," উত্তর দিলো উদিপুরী।

"শাহ-ইন-শাহ্‌কে এখনই গিয়ে খবরটা জানাতে হয়।"

"না, এখন নয়," গম্ভীর কণ্ঠে উদিপুরী বললো।

"কেন?"

"তাতে কোনো কাজ হবে না।"

"কাজ হবে না? এরকম একটা গুরুতর খবর, একথা শাহ-ইন-শাহ্‌কে জানিয়ে কাজ হবে না?"

উদিপুরী একটু হেসে বললো, "গওহরআরা, সেবারের কথা মনে নেই? মহলের এক বেগম আরেক বেগমের উপর খবরদারি করা পছন্দ করেন না, একথা জানিয়ে শাহ-ইন-শাহ আমাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। শাহ-ইন-শাহ্‌কে একথা দ্বিতীয়বার বলার সুযোগ আমি দেবো না।"

"কিন্তু শাহ-ইন-শাহ্‌র তো জানা দরকার।"

"হ্যাঁ, জানা দরকার।"

"কি ভাবে জানবেন তাহলে?"

"এসব ব্যাপারে খবরদারি করার দায়িত্ব ফুলাদ খাঁর। সেই শাহ-ইন-শাহ্‌কে খবর দেবে।"

"সে কি করে জানবে?"

"আমরাই খবর দেবো। কাল সকালে আমাদের একজন বিশ্বস্ত খোজা খাদিম গোপনে সাক্ষাৎ করবে কোতোয়াল সিদ্দী ফুলাদ খাঁর সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, আবিদ হুসেন খাঁকে যেন সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ করা হয়।"

"না গওহরআরা, অতো ব্যস্ত হলে চলবে না। একেবারে হাতে হাতে ধরতে হবে। শুধু আবিদ হুসেনকে নয়,—রোশনআরা, জেব-উন-নিসা, জিনত-উন-নিসা সবাইকেই। শাহ-ইন-শাহ্‌র চোখ খুলে যাক। তা নইলে উনি আমার বশ হবেন না।"

"কি তোমার মতলব, উদিপুরীজী?"

"আবিদ হুসেন খাঁকে আসতে দাও রংমহলের ভিতর। এর সাজা কি জানো? মৃত্যু। আগে উপড়ে ফেলা হবে চোখ দুটো, তারপর হাতির পায়ের নিচে," একটু হাসলো উদিপুরী, "আর যারা বাইরের পুরুষকে মহলের ভিতর নিয়ে আসে তাদের সাজা কি জানো? তপ্ত লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাদের চোখের ভিতর, তারপর সারাজীবন জেনানা কয়েদখানায় বন্ধ। শাহজাদী হলেও তার নিস্তার নেই।"

শরাবের পিয়ালা মুখে তুললো উদিপুরী। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে নেশার ঘোরে। গওহরআরা শঙ্কিত চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে ছিলো তার দিকে।

উদিপুরী খুব জোরে হেসে উঠলো।

পরদিন যথা সময়ে খবর গেল ফুলাদ খাঁর কাছে। ফুলাদ খাঁ উল্লাসভরে কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁর কাছে ছুটে এলো।

"এইবার," ফুলাদ খাঁ দু হাত কচলে বললো, "এইবার।"

"এইবার কি ?" জিজ্ঞেস করলো রদ-অন্দাজ খাঁ।

"এইবার দেখে নেবো আবিদ হুসেন খাঁকে।"

ফুলাদ খাঁর কাছে খবরটা শুনলো রদ-অন্দাজ খাঁ। তার মনেও উল্লাসের সঞ্চার হোলো। এত বড় ষড়যন্ত্র! এর মধ্যে জড়িয়ে আছে খুদ ছোটী বেগম সাহিবা আর দুই শাহজাদী! এরকম উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা তাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

"কি করবে ভাবছো ?" জিজ্ঞেস করলো রদ-অন্দাজ খাঁ।

"কতো কি করবার আছে," ফুলাদ খাঁ হাসতে হাসতে বললো, "সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন পিয়াদা নিয়ে লুকিয়ে থাকবো মোতিজানের বাড়ির কাছে। আবিদ হুসেন খাঁ যখন খোজা ইয়ার লতিফের সঙ্গে শাহী কিলার দিকে যাবে, গোপনে তাদের অনুসরণ করবো। ছোটী বেগম সাহিবা নিশ্চয়ই আবিদ হুসেনকে মহলের ভিতর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে খিজিরীর ওদিক দিয়ে। খিজিরীর চৌকির ভার মহলের খোজাদের উপর। ওদের বশ করা সোজা।"

"অনুসরণ করে তো তুমি আর মহলে ঢুকতে পারবে না," বললো রদ-অন্দাজ খাঁ।

"না। কিন্তু আমার পিয়াদারা মুতায়েন হবে খিজিরীর দরওয়াজায়। ওদিক দিয়ে আর কেউ বেরোতে পারবে না।"

"তারপর।"

"তারপর আর কি?" হেসে উঠলো রদ-অন্দাজ খাঁ, "খবর পাঠাবো শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে। পরদিন দেখবে আবিদ হুসেনের শির ঝুলছে কিলার লাল দেওয়ালের গায়ে।"

রদ-অন্দাজ খাঁ বললো, "আমিও আসবো তোমার সঙ্গে।"

"না।"

"কেন, তোমার তাতে আপত্তি কিসের?"

"না ভাই রদ-অন্দাজ মিঞা, আবিদ হুসেন সম্বন্ধে এতবড়ো খবর দেওয়ার কেরামতি আমার। তুমি যে তাতে ভাগ বসাবে, সেটা হবে না।"

"ভাই ফুলাদ মিঞা, সব কেরামতি তোমার। তারিফ, ইনাম যা পাবে সব তুমিই পাবে। আমি কোনো ভাগ চাই না। আমি শুধু নিজের চোখে দেখতে চাই এই বিচিত্র ঘটনা।"

ফুলাদ খাঁ আশ্বস্ত হয়ে রদ-অন্দাজ খাঁকে সঙ্গে নিতে রাজী হোলো।

মমতাজআবাদে বিভিন্ন তওআয়ফদের মাইফিলখানায় তখন সন্ধ্যার আসর জমজমাট হয়ে উঠেছে। চারদিকে শোনা যাচ্ছে ঘুঙুরের বোল, তবলার আওয়াজ, আর লঘুছন্দের গান। বিভিন্ন মঞ্জিলের ঝরোকা থেকে ঝাড়ফানুসের মৃদু আলো এসে পড়েছে পথের উপর। শুধু মোতিজানের ঝরোকা থেকে কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। মাসখানেকের উপর মোতিজানের মাইফিলখানার দরজা সবার জন্যেই বন্ধ। তার কাছে যায় শুধু আবিদ হুসেন, মাঝে মাঝে আবিদ হুসেনের সঙ্গে আসে শক্তিসিংহ। আর কেউ এলে দরজা খুলে দেয় না মোতিজানের ফরাশ।

নিঃশব্দে পথের একপাশে অন্ধকারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিলো কয়েকজন অশ্বারোহী।

একজন পাশের লোকটির দিকে ঝুঁকে বললো, "রদ-অন্দাজ খাঁ, ওই দেখ—।"

উপর দিকে তাকিয়ে দেখলো রদ-অন্দাজ খাঁ।

নকাবে মুখ ঢেকে ঝরোকায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি নারীমূর্তির ছায়া। কাচের পুতির পর্দা সরিয়ে দেখছে পথের দিকে।

"মোতি বিবি," বললো রদ-অন্দাজ খাঁ।

অন্যজন মাথা নাড়লো।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে রদ-অন্দাজ খাঁর চোখ পড়লো পথের অন্য প্রান্তে। একজন খুব ভারিক্কীচালে ঘোড়া হাঁকিয়ে আস্তে আস্তে আসছে।

"ওই দেখ ফুলাদ খাঁ," রদ-অন্দাজ খাঁ বলে উঠলো, "দেখ কে আসছে।"

"আবিদ হুসেন," বললো ফুলাদ খাঁ।

রদ-অন্দাজ খাঁ মাথা নাড়লো।

ফুলাদ খাঁ বললো, "খোজা ইয়ার লতিফও এসে পড়বে একটু পরে।"

খোজা ইয়ার লতিফ বেরিয়ে পড়বার আগে তসলিম করতে গেল রোশনআরাকে।

রোশনআরা বললো, "আমার নির্দেশ পরিষ্কার বুঝে নাও। আবিদ হুসেন খাঁকে গিয়ে বলবে, আমি ইত্তলা দিয়েছি। যদি আসতে না চায়, তাহলে বাইরে এসে অপেক্ষা করবে, যখন বেরিয়ে আসবে আচমকা ধরে জোর করে নিয়ে আসবে। মুখ বেঁধে নিয়ে আসবে যাতে চিৎকার চেঁচামেচি করতে না পারে। যদি সুযোগ পাও, অর্থাৎ সামনে আর কেউ যদি না থাকে, তাহলে বাড়ির ভিতর থেকেই ধরে নিয়ে আসতে পারো। তবে সাবধান, সেই তওআয়ফ যেন টের না পায়। খিজিরীর কাছে এনে চোখও বন্ধ করে দেবে। সোজা নিয়ে যাবে তহ্‌খানায়। আমরা সেখানেই গিয়ে তাকে দর্শন দেবো।"

একটু পরে তসলিম জানাতে এলো খোজা মহম্মদ উসমান।

রোশনআরা তার হাতে তুলে দিলো একটি সুদৃশ্য হস্তিদন্তের কাজকরা পেটিকা। তাতে একটি ছোটো রুপোর কুলুপ আঁটা। বললো, "মনে থাকে যেন, দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করবে। যখন দেখবে আবিদ হুসেনকে নিয়ে ইয়ার লতিফ দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তার কিছুক্ষণ পরে সেই তওআয়ফের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।"

নির্দেশ নিয়ে চলে গেল মহম্মদ উসমান।

আবিদ হুসেন মোতিবিবির গৃহের সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো। একপাশে খুঁটির সঙ্গে তার লাগামটি বেঁধে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু দরজায় করাঘাত করতে হোলো না। তার আগেই মোতিজানের ফরাশ হানিফ এসে দরজা খুলে দিলো। আবিদ হুসেন খাঁ আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। মোতিজানের ফরাশ পাহারায় রইলো খোলা দরজার পাশে।

মোতিজান ঝরোকার কাছ থেকে সরে এলো। আবিদ হুসেন এগিয়ে গেল তার কাছে। দুজন দুজনের হাত ধরে দুজনের মুখের দিকে তাকালো। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর মোতিজান বললো, "হাত ছাড়ো।"

"কেন?" আবিদ হুসেন হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি দরবারের একজন উমরাহ। আমি এক সামান্য তওআয়ফ।"

"মোতিজান, আমি সব চাইতে ছোটো উমরাহ। হাজারী হলেও উমরাহ হয়। কিন্তু কাজ ওই একই। চোখ মেলে এদিকে তাকাও ওদিকে তাকাও কৌয়ার মতো, তারপর শাহ-ইন-শাহ্‌র কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিশ ফিশ করো। আমার ভালো লাগে না। চুপিচুপি যদি কথা বলতে হয় তো আমার মাশুকার সঙ্গে। শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে কেন?"

মোতিজান হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, "কে তোমার মাশুকা ?"

"কেন ?—তুমি।"

মোতিজান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

"কেন, কি হোলো মোতিজান ?"

"আমি তো তোমার বিবি নই। মাশুকা দুদিনের, বিবি চিরকালের।"

"ভাই, তুমি জানো না। তুমি যেকথা বললে, ওটা বাইরের দুনিয়ায়। কিন্তু অন্তরের দুনিয়ায় বিবি দুদিনের, মাশুকা চির-কালের।"

আবিদ হুসেনের কথা শুনে মোতিজান হাসলো, তারপর বললো, "বোসো, আমি আসছি।"

"তুমি আবার যাচ্ছো কোথায় ?"

"আজ খুব ভালো শরাব যোগাড় করেছি তোমার জন্যে। সিরাজীর থেকেও ভালো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে এসো," বললো আবিদ হুসেন, "খিদেও পেয়েছে খুব। দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠ্যাং ধরে যায়। লোকে কেন উমরাহ হতে চায় বুঝি না। কি খেতে দেবে আমায় ?"

"কাবাব।"

আবিদ হুসেন শুনে খুব খুশী হোলো। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলো। মোতিজান তার জন্যে নিয়ে এলো তসতরি ভর্তি কাবাব, ঝারি ভর্তি ইতালিয়ান ওয়াইন আর কাচের পিয়ালা।

শরাব মুখে তুলবার আগে আবিদ হুসেন হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "মোতিজান, একটা কথা এখন বলে নিই, পরে বললে, ভাববে, শরাবের নেশার ঝোঁকে এমনি বলছি।"

"কি কথা দিল-গীর মিঞা ?"

দিল-গীর ? হৃদয় বিজয়ী ? আবিদ হুসেন খুব হাসলো একথা

শুনে। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে বললো, "মোতিজান, তোমায় এবার শাদী করবো।"

"কেন মিঞা?" মোতিজানের মুখে হাসি ছিলো, কিন্তু চোখ দুটি হঠাৎ জলে ভরে উঠলো।

"তাহলে তুমি আর আমায় কোনো কথা শোনাতে পারবে না। তুমি আমার বিবিও হবে চিরদিনের, মাশুকাও থাকবে চিরকালের জন্যে।"

"বিবি হলে আরো বেশী বেশী করে কথা শোনাবো।"

"বেশ শুনিয়ো। কিন্তু এখন তো তুমি বিবি নও, তুমি শুধু মাশুকা। সুতরাং এখন একটি গান শোনাও।"

দিলরুবা বাজিয়ে গান গাইতে বসলো মোতিজান। শুধু তাদের দুজনার আসর। সারেঙ্গিয়া নেই, তবলচি নেই, দুহার নেই, অন্য মেহমান নেই। সামনে একটা তসতরির উপর রাখা আছে জলে ভেজানো টাটকা চামেলি। মধুর গন্ধে ঘর ভরে আছে। যমুনা এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ঝরোকা দিয়ে ঝির ঝির করে ঘরে ঢুকছে নদীর হাওয়া।

একটা মধুর আবেশে আবিদ হুসেন খাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এলো।

বেশ নেশা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

গান শেষ করে মোতিজান বললো, "গান ভালো লাগলো না দিল-গীর মিঞা?"

আবিদ হুসেন চোখ খুললো, "গান খুব ভালো লেগেছে মাশুকা সাহিবা, তবে আমি আরেকটি কথা ভাবছিলাম।"

"কি ভাবছিলে।"

"না, থাক।" আবিদ হুসেনের ফরশা মুখ একটু লাল হোলো।

"কি ভাবছিলে বলো না।"

"তুমি হাসবে না?"

"না, হাসবো না। বলো।"

"একটা নতুন কিছু করা যাক। এরকম তো প্রত্যেক দিনই হচ্ছে।"

"নতুন কি করবে?"

"মনে করো আজ তুমি হলে আবিদ হুসেন খাঁ, আর আমি মোতি বিবি।"

"সে কি করে হয়," মোতিজান হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি আমার পোশাক পরো, আমি তোমার পোশাক পরি।"

মোতিজান হাসিমুখে তাকিয়ে রইলো আবিদ হুসেনের দিকে। তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো। সেও হঠাৎ যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠলো আবিদ হুসেনের মতো। বললো, "মতলব মন্দ নয়। কিন্তু তোমার গোঁফ দাড়ি আছে যে।"

"রেশমের নকাব দিয়ে মুখ ঢেকে দেবো।"

"মাথার বাবরী চুল ঢাকবে কি দিয়ে?"

"মাথায় বাঁধবো ফুলদার রেশমী লচক।"

মোতিজান আবার চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো আবিদ হুসেনের দিকে। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বললো, "হ্যাঁ, তোমার চোখ ছুটো বড়ো বড়ো আছে, তোমার ভুরু ছুটো অতো ঘন নয় ফুলাদ মিঞার মতো। তোমার হাতগুলো নরম নরম, ফরশা। হাতে মেহেদির নক্সা এঁকে দিলে বেশ দেখাবে। হ্যাঁ ভাই আবিদ হুসেন, আমি তোমায় গহনা দিয়ে সাজিয়ে দেবো কেমন? এক-দিনের মতো ভাবা যাক, তুমি আমার মোতিজান।"

আবিদ হুসেন হাসলো, "তুমিও পরো আমার পোশাক, আমি ভাববো তুমি আমার আবিদ হুসেন।"

"তোমার পোশাক তো আমার গায়ে হবে না। তবে ভাবনা নেই। আমার মাপের এক প্রস্থ ছেলের পোশাক আমার কাছে আছে। আমার ছোটো ভায়ের জন্যে বানিয়েছিলাম।" হঠাৎ

বিষণ্ণ হয়ে গেল ভায়ের কথা মনে পড়ে। বললো, "সেই যে গোয়ালিয়র গেল, আর বড় বোনের খবরই নেয় না। নিশ্চয়ই আরো বড়ো হয়ে গেছে এতদিনে— ।"

আবিদ হুসেন তাড়াতাড়ি তার মন হাল্কা করে দেওয়ার চেষ্টা করলো অন্য কথা পেড়ে। "আরে ভাই মোতিজান, তোমার তো দাড়ি নেই গোঁফ নেই, আমি কি করে তোমাকে আমার আবিদ হুসেন ভাববো বলো।"

মোতিজান হাসলো। বললো, "তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি ব্যবস্থা করছি।"

মোতিজান ভিতরে চলে গেল। আবিদ হুসেন আরো দু'পিয়ালা শরাব পান করলো। একটু পরে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে কে একজন বেরিয়ে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে।

"কে আপনি?"

মোতিজানের হাসি শোনা গেল। তসলিম করে বললো, "আমায় চিনতে পারছো না? আমি মির আবিদ হুসেন খাঁ।"

"আবিদ হুসেন? ও। হাঃ হাঃ হা," আবিদ হুসেন হেসে উঠলো। অন্যান্য পুরুষের তুলনায় আবিদ হুসেন ঈষৎ খর্বকায় ও পেলবকান্ত। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় মোতিজান ঈষৎ দীর্ঘকান্তি। সুতরাং পুরুষের পোশাকে হঠাৎ চেনা যায় নি মোতিজানকে।

"কিন্তু আমার মতো দাড়ি গোঁফ বানালে কি করে?" আবিদ হুসেন হাসতে হাসতে বললো।

মোতিজান হাসিমুখে বললো, "আমার চুলের ডগা থেকে একটু একটু কেটে নিয়ে। তোমার পাতলা পাতলা দাড়ি, একটু একটু হাল্কা গোঁফ। তাই বানিয়ে নিতে অসুবিধে হয়নি। মধু আর মোম মিশিয়ে তাই দিয়ে এঁটে দিয়েছি। রাতের বেলা আসল গোঁফ দাড়ি বলে মনে হয়, তাই না?"

মোতিজান বাইরে বসে রইলো। আবিদ হুসেন ভিতরে গিয়ে পরিধান করলো মোতিজানের পোশাক। একটু আঁট হোলো, কিন্তু পরে নিলো কোনো রকমে। মাথার চুল ঢাকলো রঙীন রেশমী লচক বেঁধে। তারপর গাঢ় নীল রঙের রেশমী নকাবে মুখ ঢেকে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো।

"এসো এসো মোতিজান," নকল আবিদ হুসেন মিহি গলায় হাসিমুখে নকল মোতিজানকে অভ্যর্থনা করলো।

নকল মোতিজান তসলিম করে ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলো, "আমায় কেমন দেখাচ্ছে আবিদ হুসেন?"

দুজনেই হেসে উঠলো একসঙ্গে। "অসাধারণ খুবসুরত," বললো মোতিজান, "বোসো এবার তোমায় সাজিয়ে দিই।"

আবিদ হুসেন বসলো মোতিজানের সামনে। মোতিজান তাকে পরিয়ে দিলো তার সমস্ত অলঙ্কার। লচকের নিচে কপালের উপর দেখা গেল সোনার বিন্দুলি, কানে পিপ্‌ল-পত্তি। কর্ণবেধ করার রেওয়াজ ছিলো সেসময়, তাই কর্ণাভরণ পরাতে অসুবিধে হোলো না।—গলায় পরালো চন্দ্রহার আর নকল মুক্তোর মালা, হাতে বালা, বাজুবন্দ আর কঙ্কন। কোমরে পরানো হোলো রুপোর চূড়-ঘন্টিকা আর পায়ে পরালো জেহর, ঘুংরু আর খল্‌-খল্‌। চোখে এঁকে দিলো সুরমা। তারপর বাটিভরা মেহেদি বাটা এনে বিচিত্র ছাঁদে হাতের পাতায় আর আঙুলের ডগায় লাগিয়ে দিলো।

মেহেদির রং শুকোতে সময় লাগে। মোতিজান বললো, "বসে থাকো এমনি করে যতক্ষণ রং না শুকোয়। ততক্ষণ আমি গান শোনাই।"

আবিদ হুসেন মুখের নকাবের আড়ালে হেসে বললো, "মোতিজান, এ খেলা তো বেশ মজার। তুমি আর তুমি নও। তুমি হলে আমি। আমি আর আমি নই, আমি হলাম তুমি। তবু এখনকার তুমি-আমি মিলে সেই আগেকারই তুমি-আমি, সেখানে

কোনো পরিবর্তন নেই। যা ছিলো, তাই আছে, অনন্তকাল ধরে তাই থাকবে।”

“বুঝলে মিঞা,” মোতিজান হাসিমুখে কিন্তু সজল কণ্ঠে বললো, “এরই নাম ভালোবাসা।”

আর ঠিক এমনই সময় সিঁড়িতে শোনা গেল কয়েকজনের পদশব্দ।

“কেউ আসছে,” বললো আবিদ হুসেন।

“সর্বনাশ, হানিফ দরজা বন্ধ করে দেয় নি?”

“আমাদের এভাবে দেখলে কি ভাববে?”

“আমি বাড়ির ভিতর চললাম,” মোতিজান বললো, “তুমি সামলাও।”

“মাথা খারাপ!” আবিদ হুসেন বলে উঠলো, নকাব দিয়ে কি গোঁফ দাড়ি সত্যি সত্যি ঢাকা যায়? আমি চললাম বাড়ির ভিতর। ওদের তুমি সামলাও।”

“নকল গোঁফ দাড়ি পরে?”

আবিদ হুসেন কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে পর্দা সরিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

ভারী পায়ের শব্দ তখন উপরে উঠে এসেছে। মোতিজান একটুখানি মুখ ফিরিয়ে আড় চোখে দেখলো, তিন-চারজন অপরিচিত লোক। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলো।

ওরা কাছে এগিয়ে এলো। একজন বললো, “খাঁ-সাহাব, হজরত ছোটী বেগম সাহিবা আপনাকে ইত্তলা দিয়েছেন।”

মোতিজান কি করবে ভেবে পেলো না। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে। মনে হোলো, এই মুহূর্তে আবিদ হুসেনের সান্নিধ্যই বেশী বাঞ্ছনীয়। সে কোনো উত্তর না দিয়ে ওদের দিকে না ফিরেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো ভিতরে যাওয়ার দরজার দিকে। হঠাৎ দুজন তাকে ধরে ফেললো পেছন থেকে। একজন ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিলো।

শোনা গেল প্রথম জনের গলা। "এখানে কেউ নেই। এখান থেকেই ওর মুখ বেঁধে নিয়ে চলো। কেউ টের পাবে না।"

দুজন লোক একটা বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলে তাকে ধরে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। ওরা যখন নামতে শুরু করেছে, আরেকজন ফিরে এসে চকমকি ঠুকে প্রদীপটা আবার জ্বালিয়ে দিলো। তারপর অন্য সবার অনুসরণ করলো।

ব্যাপারটা ঘটে গেল এক নিমেষের মধ্যে। পাশের ঘরের এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আবিদ হুসেন। ওঘরে কি কথাবার্তা হয়ে গেল সে শুনতে পেলো না। পায়ের শব্দ যখন নিচে নেমে গেল তখন সে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো।

ঘর শূন্য। আবিদ হুসেন বিস্মিত হোলো। কোথায় গেল মোতিজান! নিচে শুনতে পেলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ঝরোকার কাছে। দেখতে পেলো, মোতিজানকে তারই ঘোড়ার উপর বসিয়ে তিন চারজন অপরিচিত লোক ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছে।

মোতিজান!—ডাক দিলো আবিদ হুসেন। কিন্তু আওয়াজটা গলা দিয়ে বেরোলো না। শরাবের প্রভাব এখনো কাটেনি। গলাটা ঘড়ঘড় করে উঠলো। তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করলো সিঁড়ি দিয়ে।

ইয়ার লতিফ আর তার সঙ্গী তিনজন যখন এসেছিলো, তখন মোতিজানের ফরাশ দরজার কাছে পাহারায় ছিলো না। সে গিয়েছিলো কাছেই এক চেনা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। হঠাৎ সেখান থেকে দেখতে পেলো তিনচারজন লোক খাঁ সাহাবকে ধরে নিচে নামিয়ে এনে ঘোড়ায় তুলে তাড়াতাড়ি চলে গেল। সে ফিরে আসছিলো, দূর থেকে হঠাৎ চোখে পড়লো আরো একটা বিস্ময়কর দৃশ্য। একটা রহস্যময় অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটি নারীমূর্তি সিঁড়ি দিয়ে পথের উপর নেমে এসে কয়েক পা ছুটে এসে আবার

ফিরে গেল বাড়ির ভিতর। ব্যাপারটা ঠিক স্ত্রী-সুলভ নয়,—বিশেষ করে আগ্রার মতো শহরে, যেখানে ছোটোবড়ো সবাই অত্যন্ত কেতাদুরস্ত,—এবং আদবকায়দা কেতা সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী সচেতন, শহরের মশহুর সুন্দরী তওআয়ফেরা।

বিবিজান ফিরে গেল কেন,—ভাবলো তার ফরাশ। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলো। ঘোড়ার পিঠে চেপে ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ, কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁ আর আরো চার পাঁচজন ঘোড়সওয়ার।

ফরাশ ভাবলো, এখন ওখানে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বড় বড় উমরাহদের কাছাকাছি না থাকাই ভালো। সে কিছু বুঝতে না পারলেও অনুমান করলো, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল নিজের দোস্তের কাছে।

রদ-অন্দাজ খাঁ ফুলাদ খাঁকে বলছিলো, "আরে, বিবিটা কি ভাবে ছুটে নেমে এলো, আবার আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল দেখেছো? তুমি এগোও, আমি ওর কুশল সংবাদ নিয়ে আসি।"

"না, না," প্রতিবাদ জানালো ফুলাদ খাঁ, "এসো আমাদের সঙ্গে। মোতিবিবির খবর পরে নেওয়া যাবে।"

উপরে ঝরোকার আড়াল থেকে দেখছিলো আবিদ হুসেন। সে শুনতে পেলো রদ-অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁর হাসি। দেখতে না দেখতে ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজও মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

আবিদ হুসেন একটু শান্ত হয়ে ভাববার চেষ্টা করলো কি করা যায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস হোলো, এটা রদ-অন্দাজ খাঁ ও ফুলাদ খাঁর কাজ। সে স্থির করলো তাকে কোতোয়ালিতে যেতে হবে। কিন্তু ওরা যে পথে গেছে, সেটাতো কোতোয়ালিতে যাওয়ার পথ নয়। ওদিকে একটু অনুসন্ধান করা দরকার,—সে ভাবলো। হঠাৎ চোখ পড়লো নিজের পোশাকের উপর। নাঃ, এ পোশাকে তো এখান

থেকে বেরোনো চলবে না। ওঘরে পড়ে আছে তার নিজের পোশাক। এবার তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করা দরকার।

সে ভিতরে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই শুনতে পেলো আরেকটি পদশব্দ উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। একজন আগন্তুককে দেখা গেল সিঁড়ির মুখে। বাড়ির ভিতরে যাওয়ার পথ ওদিকে। তাকে পেরিয়ে যেতে হয়। সেটা নিরাপদ নাও হতে পারে। আবিদ হুসেন তাড়াতাড়ি মুখের নকাব ঠিক করে নিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো।

আগন্তুক এগিয়ে এলো তার কাছে। আবিদ হুসেন আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো। লোকটিকে সে চেনে। খাসমহলের খোজা খাদিম মহম্মদ উসমান। তার হাতে একটি ছোটো হাতির দাঁতের কাজ করা পেটিকা। এ আবার এখানে কেন ?—ভাবলো আবিদ হুসেন। সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জড়োসড়ো হয়ে।

মহম্মদ উসমান কাছে এসে পেটিকা নামিয়ে রাখলো এক পাশে। নম্রকণ্ঠে বললো, "বিবি সাহিবা, আবিদ হুসেন খাঁ সাহাব এটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। উনি খুব জরুরী কাজে ব্যস্ত আছেন বলে দু-একদিন আসবেন না। খুব সাবধানে তুলে রেখে দিতে বললেন। আর কারো হাতে যেন না পড়ে। এটি পান্নাবাঈয়ের জিনিস। কাল শক্তিসিংহ রাঠোর এলে ওঁকে দিয়ে দেবেন। আবিদ হুসেন খাঁ আপনাকে জানাতে বলেছেন, কাল সন্ধ্যায় উনি আপনার এই দৌলতখানায় তশরীফ নিয়ে আসবেন।"

নকাবের উপরের চোখজোড়া দেখতে পেলে মহম্মদ উসমান অবাক হোতো। সে চোখের চাউনি নারীসুলভ নয়। বিপুল বিস্ময়ে চোখ দুটো বর্তুলাকৃতি ধারণ করে কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। আবিদ হুসেন অতি কষ্টে মনের ভাব চেপে রইলো।

মহম্মদ উসমানকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে, প্রথম প্রহরের সঙ্গে সঙ্গেই পাহারা বদল হবে দেওরিতে, তার আগেই পৌঁছোতে হবে রংমহলে। সে ভালো করে তাকালোও না। অভিবাদন করে দ্রুত প্রস্থান করলো।

সে চোখের আড়াল হওয়ার একটু পরে যখন বাইরের অন্ধকার পথে শোনা গেল তার অপস্রিয়মান পদশব্দ, আবিদ হুসেন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দ্বার রুদ্ধ করলো। তারপর এক এক বারে দু-তিন ধাপ অতিক্রম করে উপরে উঠে এসে বিপুল কৌতূহলের সঙ্গে তুলে নিলো হাতির দাঁতের পেটিকা। জোরে জোরে নাড়লো কানের কাছে, বুঝতে পারলো না ভিতরে কি আছে। দেখলো, একটি রুপোর কলুপ আটা আঁছে। স্থির করলো এটি খুলে দেখতে হবে। ভিতরে গিয়ে খুঁজে পেতে আনলো একটি লোহার শিক। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর কব্জা শুদ্ধ ভেঙে উন্মুক্ত করলো পেটিকার ডালা। প্রদীপের আলোয় ঝলসে উঠলো অনেকগুলি বৃহদাকার বহুমূল্য হীরকখণ্ড। একপাশে একটি গোলাপী রঙের কাগজ। সন্তর্পণে ভাঁজ করে গালা দিয়ে এঁটে অঙ্গুশতরী দিয়ে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। চিঠির উপরে ফারসী লিপিতে লেখা রাজা শিবাজীর নাম।

আবিদ হুসেন তাড়াতাড়ি ডালা বন্ধ করলো। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি। পান্নাবাঈ রাজপুতানী নিশ্চয়ই ফারসী লিপি জানেনা, তার লেখা চিঠি এটা নয়, তার কাছে এত বহুমূল্য হীরে থাকবার কথাও নয়। সুতরাং তার জিনিস এসব নয়, এই পেটিকা শক্তিসিংহের জন্যেও নয়,—মনে মনে বিচার বিশ্লেষণ করতে লাগলো আবিদ হুসেন। মহম্মদ উসমান এসে বললো এটা আবিদ হুসেন পাঠিয়ে দিয়েছে। একথা সত্যি হতে পারে না যেহেতু আমিই আবিদ হুসেন,—সে ভাবলো।—তাহলে?

হঠাৎ একটা কথা তার মাথায় এলো। নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র,

আবিদ হুসেনকে বিপদে ফেলবার জন্যে কোনো একটা পরিকল্পনা। হয়তো তার শত্রু আছে দরবারে, তার দ্রুত পদোন্নতি তাদের ভালো লাগছে না। নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে আছে ফুলাদ খাঁ। হয়তো ওরা শাহ্-ইন-শাহ্কে বলেছে যে, আবিদ হুসেন গোপনে খিদমত করছে শিবাজীর। হয়তো তাই শুনে শাহ্-ইন-শাহ তাকে গিরফতার করে নেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। তাই ফুলাদ খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে,—অর্থাৎ প্রদীপের আবছা আলোয় চিনতে না পেরে ভুল করে নিয়ে গেছে মোতিজানকে। এবার নিশ্চয়ই শাহ-ইন-শাহ্র হরকরারা এখানে আসবে খুফিয়ানবিসদের দারোগার সঙ্গে। খানাতল্লাস করবে মোতিজানের বাড়ি। খুঁজে পাবে এই পেটিকা। অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে এসব হীরে আর এই চিঠি দাখিল করা হবে বাদশাহ্র সামনে। বাদশাহ সলামত আবিদ হুসেনকে জিজ্ঞেস করবেন,—তুমি কোথায় পেলে এত হীরে? এ চিঠি তোমার কাছে কেন?—আবিদ হুসেনের কৈফিয়ত শুনে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। তারপর বাদশাহ হুকুম দেবেন কোতল করা হোক আবিদ হুসেনকে। তারপর—আর ভাবতে পারলো না, শিউরে উঠে চোখ বুঁজলো আবিদ হুসেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই ছিলো ফুলাদ খাঁর মতলব। কিন্তু এমন জোর বরাত, আবিদ হুসেন আর মোতিজান নিজেদের মধ্যে নিজেরা একটা ছেলেমানুষীতে লিপ্ত হওয়ায় ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল, জোর বেঁচে গেল আবিদ হুসেন।

হঠাৎ খেয়াল হোলো, হ্যাঁ তাইতো, ওরা যে ধরে নিয়ে গেছে মোতিজানকে। তাকে আজ রাত্তিরে থাকতে হবে কয়েদখানায়,—যদি না অবশ্যি ওরা বুঝতে পারে যে সে আবিদ হুসেন নয়। বুঝতে পারলে আরো মুশকিল। ওরা আবার এখানে আসবে তার খোঁজে। সুতরাং এখান থেকে সরে পড়াই বিধেয়।

আবিদ হুসেন পাশের ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন

করে পরে নিলো নিজের পোশাক। আস্তে আস্তে ক্রোধের সঞ্চার হোলো তার মনে। কী! ফুলাদ খাঁ এত নীচ প্রকৃতির? সে এভাবে তার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে? সে ধরে নিয়ে গেছে তারই প্রিয়তমা মোতিজানকে? মনে মনে সংকল্প করলো, ফুলাদকে শিক্ষা দিতে হবে।

কিন্তু একবার মোতিজানেরও খবর নিতে হবে। আবিদ হুসেন খাঁ কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর হাতির দাঁতের পেটিকা বগলে নিয়ে কাবা দিয়ে ভালো করে ঢেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘোড়-সওয়ায়েরা যে দিক দিয়ে গেছে, এগিয়ে গেল সেদিকে। মাঝে মাঝে দু-একজন পথিককে জিজ্ঞেসও করলো। এমনি করে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছে গেল কেল্লার কাছে। পাশ দিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

হঠাৎ চোখে পড়লো, এক জায়গায় ঘোড়ার পিঠের উপর বসে আছে রদ-অন্দাজ খাঁ। পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মশাল হাতে। চিনতে পারলো মশালের আলোয়। আবিদ হুসেন ছায়ার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে কাছে এসে একজায়গায় আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু পরে শুনতে পেলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দুজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে, কাছাকাছি আসতে মশালের আলো পড়লো তাদের মুখের উপর। আবিদ হুসেন দেখলো, সে যা ভেবেছিলো তাই। রদ-অন্দাজ খাঁর কাছে ফিরে আসছে ফুলাদ খাঁ।

কাছে এসে ফুলাদ খাঁ বললো, "খিজিরীর ওদিকের একটি গুপ্ত পথ দিয়ে আবিদ হুসেনকে নিয়ে যাচ্ছে রংমহলের দিকে। বোধ হয় ওকে নিয়ে যাওয়া হবে তহ্‌খানায়। খিজিরীর কাছে চারজন পিয়াদাকে মোতায়েন করে এসেছি। এবার শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে খবর পাঠাতে হবে।"

"চলো, আমরা হাথীপোল দিয়ে ঢুকবো," বললো কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁ।

ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

আবিদ হুসেন একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সে বুঝলো, আপাতত আর কিছু করার নেই। শাহ-ইন-শাহ এসময় খোয়াবগাহ্‌তে। আর কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। এসময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে শুধু মহল চৌকির ভারপ্রাপ্ত মনসবদার, কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁ, ফৌজদার ফিদাই খাঁ আর কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ,—তাও শুধু দেওরির দারোগার মারফতে। আর কারো সে হুকুম নেই।

আবিদ হুসেন খাঁ অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ। তারপর যখন দেখলো ধারে কাছে আর কেউ নেই, তখন অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে শহরের পথ ধরলো। নিজের বাড়িতেও ফিরলো না। মনে হোলো, আজকের রাত ফুলাদ খাঁর হাতের নাগালের বাইরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। উজীরপুরার দিকে থাকতো তার এক পুরোনো বন্ধু। আবিদ হুসেন খাঁ চলে গেল তারই ওখানে।

রোশনআরার মহলে রোশনআরার সঙ্গে কথা বলছিলো জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা। এমন সময় খোজা মির হাসান এসে খবর দিলো পরিকল্পনার প্রথম পর্ব নির্বিঘ্নে হাসিল হয়েছে। খোজা ইয়ার লতিফ আবিদ হুসেনকে নিয়ে নিরাপদে খিজিরীর ওদিক দিয়ে খাসমহলের চৌহদ্দির ভিতর নিয়ে এসেছে। ওরা এখন তহ্‌খানার ওদিকে যাচ্ছে।

রোশনআরা সন্তুষ্ট হোলো একথা শুনে। হুকুম দিলো, "তুমি গিয়ে দেখে এসো ওকে তহখানার ভিতরে পূবদিকের কুঠরিতে আনা হয়েছে কিনা। ওর আরামের সব ব্যবস্থাই যেন সেখানে থাকে। লোহার দরজার বাইরে দুজন খোজাকে পাহারায় রাখবে। আমরা

যাবো আরো এক ঘড়ি পরে, যখন সবাই নিজের নিজের মহলে শুতে যাবে। এখনো সবাই জেগে আছে। আমরা মহল থেকে বেরোলে কারো না কারো চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

খোজা মির হাসান তসলিম করে চলে গেল।

খোয়াবগাহ্‌তে বসে উদিপুরী মহলের সঙ্গে আলাপ করছিলো বাদশাহ আওরংজেব। অন্যান্যদিন উদিপুরী এসময় নানারকমভাবে বাদশাহ্‌র মনোরঞ্জন করতে উদগ্রীব থাকে, কিন্তু আজ তার মন খুব অস্থির। বার বার চঞ্চল দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাচ্ছিলো প্রবেশদ্বারের দিকে। রাত্রি প্রথম প্রহর হয়ে গেছে। এখন যে কোনো মুহূর্তে খবর নিয়ে হাজির হতে পারে দেওরির খোজা দারোগা।

আওরংজেব লক্ষ্য করলো তার অমনোযোগিতা ও চাঞ্চল্য। একবার কারণ জিজ্ঞেস করলো। কোনো সদুত্তর না পেয়ে আর কিছু বললো না। একটি পুস্তক সামনে আধারের উপর রেখে তাতে মনোনিবেশ করলো।

একটু পরে পদশব্দ শোনা গেল খোয়াবগাহ্‌র বাইরে। বাদশাহ্‌র খাস খোজা খাদিম ভেতরে এসে কুর্নিস করলো।

আওরংজেব তাকালো চোখ তুলে। উদিপুরী বসে রইলো পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে।

আওরংজেব একবার তাকালো উদিপুরীর দিকে, তারপর খাস খাদিমের দিকে ফিরে বললো, "পেশ করো তোমার কি বক্তব্য।"

খাদিম বললো, "জাহাঁপনাহ্‌, দেওরির দারোগা আপনার কাছে হাজির হওয়ার হুকুম পাওয়ার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"কেন ?"

"বলছে, খুব গুরুতর প্রয়োজন। আপনার কাছে জরুরী আরজ নিয়ে এসেছে কিলাদার রদ-অন্দাজ খাঁ আর কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর

কাছ থেকে। ওঁরা জাহাঁপনাহ্‌র হুকুমের জন্যে হাজির হয়েছে দেওরিতে।"

বাদশাহ্‌র অনুমতি পেয়ে ভিতরে এলো দেওরির দারোগা। জানালো ফুলাদ খাঁ খবর পেয়েছে যে, দরবারের উমরাহ মির আবিদ হুসেন খাঁ গোপনে রংমহলের তহ্‌খানায় এসেছে ছোটী বেগম সাহিবা এবং শাহজাদী সাহিবাদের ইত্তলা পেয়ে। এরকম সন্দেহ করার কারণ ঘটেছে যে বেগম সাহিবারা আবিদ হুসেন খাঁর মারফতে শিবাজীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছেন।

আওরংজেবের কপালের দু' পাশের শিরাগুলো ফুলে গেল। কিন্তু মুখের উপর অন্য কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালো উদিপুরী মহলের দিকে। দেখলো, একটু হাসির স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে তার গোলাপী অধরের প্রান্তে।

"কথাটা বিশ্বাস করার মতো নয়," বললো আওরংজেব।

"খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে," উদিপুরী বলে উঠলো।

"বেশ। খোঁজ নাও," সংযতকণ্ঠে বললো আওরংজেব।

উদিপুরী নিজে উঠে পড়ছিলো।

"না, না, তোমাকে যেতে হবেনা," বলে আওরংজেব তাকালো তার খোজা খাদিমের দিকে।

"আমি এক্ষুনি খবর নিয়ে আসছি জাহাঁপনাহ, "বলে খাদিম চলে গেল। সে ফিরে এলো একটু পরে। বললো, "জাহাঁপনাহ, তহ্‌খানার ভিতর নিয়ে আসা হয়েছে এক ব্যক্তিকে।"

"আর কে আছে সেখানে ?"

"দুজন খোজা পাহারাদার।"

"ওরা কার খাদিম ?—না থাক, বলতে হবে না। শোনো! ওদের ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় পাহারায় মোতায়েন করো খোজা হানিফ আর খোজা সগিরউদ্দিনকে। দরজায় কুলুপ এঁটে দাও। কাল ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কয়েদখানায়।

তহ্‌খানায় যাওয়ার সিঁড়ির মুখে কড়া পাহারা মোতায়েন করো। রংমহল থেকে কেউ যেন নিচে যেতে না পারে।

"যে দুজন পাহারাদার এখন মোতায়েন আছে, ওদেরও কয়েদ করা যেতে পারে," বললো উদিপুরী।

"না," আওরংজেব উত্তর দিলো, "ওরা হয়তো কিছুই জানেনা। ওরা শুধু হুকুম তামিল করেছে মাত্র। ওদের জানানো হোক যে আমার হুকুমে পাহারার বদল করা হোলো।" আওরংজেব ফিরলো দেওরির দারোগার দিকে। বললো, "ফুলাদ খাঁ ও রদ-অন্দাজ খাঁকে ফিরে যেতে বলো। ওরা নিয়মিত রীতিতে কাল সকালে দরবারের আগে হাজির হবে খিলওয়াতগাহ্‌তে, তখন যা হুকুম দেওয়ার আমি দেবো। বেগম সাহিবারা যে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, বিশেষ করে শিবার জন্যে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই আবিদ হুসেন কোনো গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে মহলে প্রবেশ করেছে। এটা গুরুতর অপরাধ। এর যথাবিহিত সাজা তাকে দেওয়া হবে।"

"আবিদ হুসেনকে কি কাল কয়েদখানার থেকে এনে দরবারে হাজির করা হবে?"

"না," বললো আওরংজেব, "ওর সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা হবে।"

দেওরির দারোগা ফুলাদ খাঁ আর রদ-অন্দাজ খাঁকে গিয়ে জানালো যে শাহ-ইন-শাহ্‌ আবিদ হুসেন খাঁকে গিরফতার করে কয়েদ করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই গুরুতর অপরাধের যথাবিহিত সাজা তাকে দেওয়া হবে।

বাইরের কোনো পুরুষের রংমহলে প্রবেশ করার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। ফুলাদ খাঁ খুব উল্লসিত হয়ে কোতোয়ালিতে ফিরে গেল। রদ-অন্দাজ খাঁ তাকে কেল্লার দরওয়াজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো নিজের আবাসস্থলে।

এদিকে খোয়াবগাহ্‌তে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো বাদশাহ আওরংজেব।

উদিপুরী মহল আস্তে আস্তে বললো, "শুনেছি আপনি এই আবিদ হুসেনকে খুব বিশ্বাস করতেন।"

আওরংজেব কোনো উত্তর দিলো না। শুভ্র মুখমণ্ডল এক মুহূর্তের জন্যে রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তারপর আবার ফিরে এলো মুখের শুভ্র পাণ্ডুরতা।

"জাহাঁপনাহ্," উদিপুরী মহল বললো, "আমার মনে হয় বেগম সাহিবারা যখন গিয়ে সাক্ষাৎ করতেন আবিদ হুসেনের সঙ্গে, ঠিক তখনই পাহারাদার পাঠিয়ে আবিদ হুসেনকে গিরফতার করা যেতো। তাহলে তার ষড়যন্ত্রের অপরাধ প্রমাণ করা খুব সহজ হোতো।"

আওরংজেব চোখ তুলে তাকালো উদিপুরীর দিকে। উদিপুরী চোখ নামিয়ে নিলো সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে।

আওরংজেব বললো, "তাহলে বেগম সাহিবাদেরও কয়েদ করতে হোতো, ওদেরও সাজা দিতে হোতো।"

উদিপুরী বলে উঠলো, "প্রয়োজন যদি হয়—,"

তার কথায় বাধা দিয়ে আওরংজেব উত্তর দিলো, "না উদিপুরী। সেটা আমি চাই না। মহলের বেগমেরা যে আমার অজ্ঞাতে শিবাজীর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে, এরকম কোনো সম্ভাবনার কথা বাইরে জানাজানি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

উদিপুরী মুখের হতাশ ভাব গোপন করতে পারলো না। বললো, "আবিদ হুসেনের নামে যখন ফরিয়াদ পেশ করা হবে, তখন তো একথা উঠবেই।"

"আবিদ হুসেনের নামে এরকম কোনো ফরিয়াদ পেশ করা হবে না," উত্তর দিলো আওরংজেব।

"তাহলে?"

"আবিদ হুসেনকে শুধু অভিযুক্ত করা হবে মহলের ভিতরে

প্রবেশ করার অপরাধে। এই অপরাধের বিচার প্রকাশ্য দরবারে হয় না। এই অপরাধের বিচার হয় মহলের ভিতর মালিকা আলমের দরবারে। প্রথমে আবিদ হুসেনের চোখ উৎপাটিত করে নেওয়া হবে। তারপর তাকে মালিকা আলমের দরবারে হাজির করা হবে। মালিকা আলম তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেবেন। সে হুকুম আমার কাছে আসবে অনুমোদনের জন্যে। আমি হুকুম অনুমোদন করবো।"

উদিপুরীর আর কোনো আগ্রহ রইলো না এ ব্যাপারে। রোশন-আরা বা জেব-উন-নিসার যখন কোনো ক্ষতি হোলো না, যখন তাদের অপদস্থ করার কোনো সুযোগই রইলো না, তখন আবিদ হুসেন নামে এক সামান্য ব্যক্তিকে কোতলই করা হোক কি খিলাত দেওয়া হোক, উদিপুরীর কিছু আসে যায় না। গম্ভীর হয়ে সে উঠে পড়ে বললো, "আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি জাহাঁপনাহ্। আমায় এবার নিজের মহলে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হোক।"

উদিপুরী ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বেরিয়ে চলে গেল।

আওরংজেবও উঠে দাঁড়ালো, তারপর আস্তে আস্তে পদচারণা করতে লাগলো খোয়াবগাহ্‌র এধার থেকে ওধারে।

রোশনআরা, জেব-উন-নিসা আর জিন্নত-উন-নিসা প্রস্তুত হচ্ছিল তহ্‌খানায় যাওয়ার জন্যে। মির হাসানের কাছ থেকে সংবাদ পেলেই ওরা রওনা হবে। এমন সময় ফিরে এলো মহম্মদ উসমান। সে জানালো যে, হাতির দাঁতের পেটিকা তওআয়ফ মোতিজানের কাছে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে সেদিকে ফুলাদ খাঁকে টহল দিতে দেখে সে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেনি, তাড়াতাড়ি চলে এসেছে।

"পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বও সফল হোলো," পরিতুষ্ট হয়ে বলে উঠলো রোশনআরা, "কাল মির হাসান খবর দেবে শক্তিসিংহ

রাঠোরকে। আশা করছি সমস্ত হীরে শিবাজীর কাছে ঠিকমতো পৌঁছে যাবে। এখন দেখা যাক, আবিদ হুসেন আমার অনুগত হতে রাজী কিনা।"

জেব-উন-নিসা বললো, "রাজী হবে কিনা বলা শক্ত। আবিদ হুসেন শাহ-ইন শাহ্‌র খুব বিশ্বস্ত খাদিম।"

"আমরা সবাই শাহ-ইন-শাহ্‌র খুব বিশ্বস্ত, জেব-উন-নিসা," উত্তর দিলো রোশনআরা, "মোগলদরবারে এমন কে আছে যে শাহ-ইন-শাহ্‌র বিশ্বস্ত নয়। আমাদের মধ্যে যা কিছু মতভেদ সে শুধু শাহ-ইন-শাহ্‌র যথার্থ খিদমত করার পদ্ধতি নিয়ে। এবং আমি মোগলদরবারে এমন একজন কাউকে দেখিনা যাকে অর্থ দিয়ে কিংবা সুন্দরী নারী দিয়ে বশীভূত করা যায় না। সবারই একটা মূল্য চাই, কারো কম, কারো বেশী। দেখা যাক কতো দামে কেনা যায় আবিদ হুসেনকে।"

মহম্মদ উসমান তসলিম করে বিদায় নিচ্ছিলো, কিন্তু সে যাওয়ার আগেই ছুটে এলো মির হাসান। তার খুব উদব্যস্ত বিচলিত ভাব। এসে বললো, "ছোটী বেগম সাহিবা, সব গোলমাল হয়ে গেছে।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"ছোটী বেগম সাহিবা, ইয়ার লতিফ একটা সাংঘাতিক ভুল করেছে।"

"কি হয়েছে বলো।"

"যাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, সে আবিদ হুসেন নয়।"

"সে কি!" সমস্বরে বলে উঠলো জেব-উন-নিসা আর জিন্নত-উন-নিসা।

"আবিদ হুসেন নয়?" বিচলিত শোনালো রোশন-আরার কণ্ঠস্বর, "কে সে?"

এমন সময় উপস্থিত হোলো খোজা ইয়ার লতিফও। তার মুখে একটা উত্তেজনা, একটা অপরাধী ভাব। তসলিম করে বললো,

"ছোটী বেগম সাহিবা, কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। কি করে এ ভুল হোলো বুঝতে পারছি না। আমরা যখন মোতিজানের মাইফিলখানায় ঢুকলাম তখন সেখানে বসেছিলো আবিদ হুসেন আর সেই তওআয়ফ। আমাদের দেখে স্ত্রীলোকটি ভিতরে চলে গেল। আবিদ হুসেনকে যখন বলা হোলো আপনি ইত্তলা দিয়েছেন, সেও উঠে পালাচ্ছিলো। আমরা তাকে ধরে নিয়ে এলাম।"

"সে আবিদ হুসেন নয়?"

"না।"

"কে সে?"

"সে বলছে সে মোতিজান।"

"মোতিজান!" স্তম্ভিত হোলো রোশনআরা।

জেব-উন-নিসা বলে উঠলো, "একজন পুরুষ মানুষ বলছে সে মোতিজান?"

"সে পুরুষ মানুষ নয়।"

"সে কি? তুমি একজন পুরুষ মানুষকে ধরতে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে ধরে এনেছো, এই অসম্ভব কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো রোশনআরা।

"ছোটী বেগম সাহিবা, এর পোশাক পরিচ্ছদ পুরুষ মানুষের, এর দাড়ি গোঁফ আছে ঠিক আবিদ হুসেনের মতো—"

রোশনআরার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। ইয়ার লতিফের কথায় বাধা দিয়ে বললো, "এসব অসংলগ্ন কথাবার্তার কোনো অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। পুরুষের পোশাক, মুখে গোঁফ দাড়ি, আর সে বলছে সে মোতিজান, আর তুমি তার কথা বিশ্বাস করে ছুটে এসেছো আমার কাছে?"

"ছোটী বেগম সাহিবা, আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি। সারাটা পথ তার মুখ বাধা ছিলো। তাকে তহ্‌খানার কুঠরিতে ঢুকিয়ে যখন মুখের বাঁধন খুলে দিলাম, তখন সে জিজ্ঞেস করলো,—

তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো কেন? তার মেয়েলী গলা শুনে আমরা অবাক। মুখের কাছে চিরাগ ধরে দেখি সে তো আবিদ হুসেন নয়, সে একটি স্ত্রীলোক। মুখে নকল গোঁফ-দাড়ি। মোতিজানের মাইফিলখানায় ব্যস্ততার মধ্যে খেয়াল করিনি, পথের অন্ধকারে টের পাইনি, মুখ বাধা ছিলো বলে তহ্‌খানার ভিতরে আসবার পরও আমাদের কোনো সন্দেহ হয়নি। মাথার লম্বা চুলে বেণীবন্ধন করে এমনভাবে পাগ পরেছে আর ঢিলেঢালা কাবাতে শরীর এমনভাবে ঢেকেছে যে স্ত্রীলোক বলে মনে করার কোনো কারণই ছিলো না। এরকম ভুল আমি জীবনে কোনোদিন করিনি ছোটী বেগম সাহিবা।"

চাপা রাগে ফুলতে ফুলতে রোশনআরা জিজ্ঞেস করলো, "কে এই স্ত্রীলোক?"

"ও বলছে ও মোতিজান।"

মহম্মদ উসমান সবিস্ময়ে শুনছিলো ইয়ার লতিফের কথা। এবার জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে মোতিজানের মাইফিলখানার সেই অন্য স্ত্রীলোকটি কে? আমি যে মোতিজান মনে করে তাকেই দিয়েছি হাতির দাঁতের পেটিকা।"

"তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখনি?" ঠোঁট কামড়ে রোশন-আরা জিজ্ঞেস করলো।

"তার মুখ নকাবে ঢাকা ছিলো।

"এক্ষুনি যাও," ত্রস্ত কণ্ঠে হুকুম দিলো রোশনআরা, "এক্ষুনি গিয়ে খোঁজ নাও কে সেই স্ত্রীলোক। সব গোলমাল হয়ে গেছে। আমরা বিপদে পড়ে যাবো। আমার ফেরত চাই ওই হাতির দাঁতের পেটিকা, যেমন করেই হোক।"

মহম্মদ উসমান ইতস্তত করে বললো, "ছোটী বেগম সাহিবা, মহল চৌকির পাহারাদার বদল হয়ে গেছে, এখন কিলা থেকে বাইরে যাওয়া মুশকিল।"

"আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ওসব তুমি বুঝবে। তোমরা ভুল করেছো। সুতরাং সব ঝুঁকি সব দায়িত্ব তোমাদের। আমি আমার জিনিস ফেরত চাই। যাও—।"

মহম্মদ উসমান তসলিম করে চলে গেল। রোশনআরা একটু ভাবলো, তারপর জেব-উন-নিসা ও জিন্নত-উন-নিসার দিকে ফিরে বললো, "তোমরা এখানেই থাকো। আমি একাই যাচ্ছি সেই তওআয়ফের কাছে। কেন সে পুরুষের পোশাক পরে বসেছিলো তার মাইফিলখানায়? এ প্রশ্নের উত্তর শুনতে হবে তার কাছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো একটা রহস্য আছে।"

রোশনআরা খোজা ইয়ার লতিফ আর খোজা মির হাসানের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিলো এমন সময় ছুটে এলো আরেকজন খোজা খাদিম।

"কি হয়েছে ইব্রাহিম?" জিজ্ঞেস করলো রোশনআরা।

"ছোটী বেগম সাহিবা," খোজা ইব্রাহিম শঙ্কিত কণ্ঠে বললো, "সর্বনাশ হয়েছে, শাহ-ইন-শাহ্ সব জেনে গেছেন।"

"সে কি!" বলে উঠলো রোশনআরা। অস্ফুট ভয়ার্ত আওয়াজ বেরোলো জেব-উন-নিসা আর জিন্নত-উন-নিসার মুখ থেকে।

"তহ্খানার কুঠ্রির সামনে যে দুজন খোজা পাহারাদার মোতায়েন করেছিলো খোজা ইয়ার লতিফ, শাহ-ইন-শাহ্র হুকুমে দেওরির দারোগা খোজা নসরত খাঁ তাদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে মোতায়েন করেছে খোজা হবিব আর খোজা সগিরউদ্দিনকে। কুঠরির দরজায় কুলুপ এঁটে দেওয়া হয়েছে। তহ্খানায় যাওয়ার সিঁড়ির মুখেও পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে। শাহ-ইন-শাহ্র কড়া হুকুম, কেউ যেন রংমহল থেকে তহ্খানায় না যেতে পারে।"

রোশনআরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আচ্ছা, তোমরা যাও।"

তসলিম করে চলে গেল ইয়ার লতিফ, মির হাসান আর ইব্রাহিম। রোশনআরা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো ঝরোকার কাছে। বাইরে অন্ধকার, রংমহলের অনেক কক্ষেই আলো নিভে গেছে। রোশনআরা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে। জিন্নত-উন-নিসা আস্তে আস্তে এসে শয্যার উপর বসে পড়লো, তারপর মাথা রাখলো পালঙ্কের বাজুতে। জেব-উন-নিসা নিঃশব্দে পদচারণা করতে লাগলো ঘরের মধ্যে।

এক ঘড়ির কিছু বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে খোজা মহম্মদ উসমান ফিরে এসে জানালো,—মোতিজানের গৃহে কাউকে পাওয়া যায়নি। সেই অন্য স্ত্রীলোকটির কোনো চিহ্নই নেই। হাতির দাঁতের পেটিকারও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মোতি-জানের ফরাশ কিছু বলতে পারলো না। সে অনেকক্ষণ বাড়িতে ছিলো না। ফিরে এসে কাউকে দেখতে পায়নি।

চুপচাপ শুনলো শাহজাদী। মহম্মদ উসমান চলে যাওয়ার পরে তাকিয়ায় মুখ লুকালো জিন্নত-উন-নিসা। জেব-উন-নিসা একপাশে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে পত্র রচনা করতে বসলো। রোশন-আরা তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না। গালিচার উপর বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে অবসন্ন কণ্ঠে শুধু বললো, "আমার হীরেগুলোর অনেক দাম, জেব-উন-নিসা। সবই গেল।"

পরদিন সকালে দরবারের আগে খিলওয়াতগাহ্‌তে যাচ্ছিলো আকিল খাঁ। দিওয়ান-ই-খাসের পাশ কাটিয়ে আরেকটু এগিয়ে যেতেই পাশের বাগিচার একটি ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো খোজা মির হাসান। আকিল খাঁকে সেলাম আলেকুম জানিয়ে চারদিক সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখে একটি ভাঁজ করা রঙীন কাগজ হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেল। আকিল খাঁ বুঝতে পারলো এটা জেব-উন-নিসার পত্র। তাড়াতাড়ি আড়ালে গিয়ে সেটি খুলে

পড়লো। জেব-উন-নিসা পূর্বদিন রাত্রির ঘটনাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করে জানিয়েছে যে একটি হাতির দাঁতের কাজকরা পেটিকা মোতি-জানের মাইফিলখানায় পাঠানো হয়েছিলো আবিদ হুসেনের নাম করে, যাতে সুযোগ মতো শক্তিসিংহ ও পান্নার মারফতে সেটি শিবাজীর কাছে স্থানান্তরিত করা যায়। সেটি খোয়া গেছে। আকিল খাঁ যেন তার সন্ধান করবার চেষ্টা করে। এসব সংবাদ দিয়ে, একটি শের আর দুচারটি প্রণয়-সম্ভাষণ করে পাঠ সমাপ্ত করবার পর সেটি বিনষ্ট করবার অনুরোধ জানিয়ে নিজের নামই স্বাক্ষর করেছে জেব-উন-নিসা, মক্‌ফি ছদ্মনামটি ব্যবহার করেনি। আকিল খাঁ বুঝতে পারলো যে উত্তেজনাবশতই এ ভুল করেছে শাহজাদী জেব-উন-নিসা। একটু চিন্তিত হয়ে সে কাগজটি ভাঁজ করলো। তারপর মুখ তুলে তাকাতেই সামনে দেখতে পেলো হনহন করে হেঁটে আসছে আবিদ হুসেন খাঁ।

আবিদ হুসেন কাছে আসতেই আকিল খাঁ তাকে কাছে ডাকলো। বললো, "শোনো, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।"

আবিদ হুসেন কোনো উত্তর না দিয়ে গায়ের কাবা ভালো করে টেনে ঠিক করে নিলো। একটু রহস্যময় মনে হোলো তার হাব-ভাব। আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো, "কাবার আড়ালে ঢেকে রেখেছো ওটা কি?"

আবিদ হুসেন একটু ব্যস্ত হয়ে বললো, "না, এমন কিছু নয়। কতকগুলো কাগজপত্র।" সে কথার মোড় ফেরাতে চাইলো, তার চোখ পড়লো আকিল খাঁর হাতের ভাঁজ করা রঙীন কাগজটির উপর। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো, "ওটা কি? আপনার মাশুকার পত্র?"

আকিল খাঁ মনে মনে চটে গেল আবিদ হুসেনের এই বেআদবিতে। বাদশাহ সলামতের কন্যার সম্বন্ধে উল্লেখ করা

উচিত সম্ভ্রমের সঙ্গে। আবিদ হুসেন যখন জানেই তার আর জেব-উন-নিসার সম্পর্ক, তার উচিত শাহজাদীর সম্মান রেখে কথা বলা। বিশেষ করে আকিল খাঁ নিজেই যখন আবিদ হুসেনের চাইতে পদমর্যাদায় বড়ো, তার উচিত এ সম্বন্ধে কোনো কথাই উল্লেখ না করা। কিন্তু আকিল খাঁ আবিদ হুসেনকে বুঝতে দিতে চাইলো না তার মনোভাব। সে হাসিমুখে মধুর কণ্ঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পেছন থেকে একজন হাত রাখলো তার কাঁধের উপর। আবিদ হুসেনের চোখে মুখে ফুটে উঠল সম্ভ্রমের দৃষ্টি। আকিল খাঁ পেছন ফিরে দেখলো, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে আগ্রার ফৌজদার ফিদাই খাঁ। সেও যাচ্ছে খিলওয়াত-গাহ্‌তে।

ফিদাই খাঁ হাসিমুখে বললো, "কি ব্যাপার আকিল খাঁ? ইশক-বাজি চলছে নাকি?"

"ইশকবাজি?" আকিল খাঁ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

"এই সকালবেলা খাসমহলের খোজা খাদিম এসে রঙীন চিঠি দিলো তোমায়। আমি দূর থেকে দেখলাম তুমি আড়ালে লুকিয়ে চিঠি পড়ছো—।"

"ওটা আমার," বললো আবিদ হুসেন। এবং আকিল খাঁ কিছু বুঝবার আগেই সেই পত্র তার হাত থেকে নিয়ে নিজের জামাহ্‌র জেবে স্থানান্তরিত করলো। তারপর ফিদাই খাঁর অলক্ষ্যে চোখ টিপলো আকিল খাঁর দিকে তাকিয়ে।

আকিল খাঁ বলে উঠলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা আবিদ হুসেনের।"

"খাসমহলের খোজা খাদিম আবিদ হুসেনের জন্যে পত্র নিয়ে আসছে কার কাছ থেকে?" জিজ্ঞেস করলো ফিদাই খাঁ।

"খাসমহলে আছে আমার মাশুকা," অম্লান বদনে উত্তর দিলো আবিদ হুসেন।

"তোমার মাশুকা? হাঃ হাঃ," হাসলো ফিদাই খাঁ, "কোনো সুন্দরী খাদিমানের হৃদয়হরণ করেছো বুঝি? শাহ-ইন-শাহ্ শুনলে কি খুশী হবেন?"

"আপনি শাহ-ইন-শাহ্কে জানাবেন। তা হলেই বুঝতে পারবেন তিনি খুশী হবেন কি হবেন না," আবিদ হুসেন বললো নির্বিকার ভাবে।

ফিদাই খাঁ একটু দমে গেল আবিদ হুসেনের অটল আত্মবিশ্বাস দেখে। বললো, "হ্যাঁ, হয়তো তিনি তোমায় খিলাত দিতে পারেন। তোমার উপর তো শাহ-ইন-শাহ্র খুব নেকনজর। কিন্তু ভাই আবিদ হুসেন, তোমার পত্র তোমার মাশুকার হরকরা আকিল খাঁকে দিলো কেন?"

"আমার তাই নির্দেশ, আমাকে না পেলে আকিল খাঁ সাহাবকে দেবে। তিনি আমার বড়ো ভায়ের মতো।"

"ও।" আকিল খাঁর দিকে ফিরে তাকালো ফিদাই খাঁ। "বড়ো ভাই? আচ্ছা আকিল খাঁ, তুমি তোমার ছোটো ভায়ের মাশুকার পত্র ওকে দেওয়ার আগে নিজে পড়ে দেখছিলে, এটা কি ঠিক?"

এবারও উত্তর দিলো আবিদ হুসেন। বললো, "উনি পড়েন আমারই অনুরোধে। আমি ওঁকে বলেছি, আমাকে দেওয়ার আগে উনি নিজেই যেন পড়ে নেন। তারপর যখন আমি পড়ি, উনি মনে মনে একটি শের রচনা করেন। সেই শের আমি লিখে দিই আমার উত্তরে। আকিল খাঁ 'রাজি' মশহুর শায়র, ওঁর সহায়তা পাই বলেই আমার উত্তরগুলো আমার মাশুকা এত পছন্দ করে।"

আকিল খাঁ খুব অসোয়াস্তি বোধ করছিলো। সে চাইছিলো না এই আলোচনা বেশীক্ষণ চলুক। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "চলো, চলো, খিলওয়াতগাহ্র দিকে যাওয়া যাক। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।"

তিনজনে খিলওয়াতগাহ্র দিকে এগিয়ে গেল একসঙ্গেই।

আকিল খাঁ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। আবিদ হুসেনের কাছ থেকে জেব-উন-নিসার পত্রটা ফিরে পাওয়া দরকার। কিন্তু ফিদাই খাঁর সামনে সেটা সম্ভব নয়। আকিল খাঁ স্থির করলো আবিদ হুসেনকে আর চোখের আড়াল করা চলবে না। খিলওয়াতগাহ্‌র মন্ত্রণাসভা শেষ হওয়ার পর আম-দরবারে আসবার আগে আবিদ হুসেনকে একটু নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে হবে জেব-উন-নিসার পত্র, আর জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে সেই পত্রে উল্লিখিত আগের রাত্রির কোনো ঘটনার কথা আবিদ হুসেন জানে কিনা।

সে বার বার তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে। চোখে চোখ পড়লে একটু চোখের ইশারা করে নিতো। কিন্তু আবিদ হুসেন কারো দিকে তাকালোই না। গম্ভীর ভাবে হেঁটে চললো ওদের আগে আগে।

ফিদাই খাঁ হাঁটছিলো আকিল খাঁর কাঁধে হাত রেখে ঠিক তার পাশাপাশি। আগ্রায় একটা নতুন গুজব শুরু হয়েছে, জসবন্ত সিংহের সঙ্গে নাকি জাফর খাঁর মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। সে সম্বন্ধেই নানারকম মুখরোচক কথা বলছিলো ফিদাই খাঁ।

কিন্তু আকিল খাঁর কানে ঢুকছিলো না কিছুই।

খিলওয়াতগাহ্‌তে বাদশাহ আওরংজেব তখন কথা বলছিলো জাফর খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁর সঙ্গে।

জাফর খাঁ এই প্রথম শুনেছে খবরটা। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। দরবারের একজন নতুন উমরাহকে গিরফতার করা হয়েছে খাসমহলের তহ্‌খানায়,—এ একটা সাংঘাতিক খবর। এ সংবাদ বাইরে জানাজানি হওয়া পছন্দ করবেন না শাহ-ইন-শাহ। কিন্তু খবরটা কোনোরকমে রটিয়ে দিতে পারলে উজীর জাফর খাঁর সুবিধে। বাদশাহ্‌র হরকরা

আর খুফিয়ানবিসদের ঔৎসুক্য তাহলে অন্য দিকে চলে যাবে, সে আর মহম্মদ আমিন খাঁ জসবন্ত সিংহকে লুকিয়ে দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের সঙ্গে যে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, সেটা তাদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম। শিবাজীর উদ্ধারে সহায়তা করার জন্যে দাক্ষিণাত্যের মারাঠা রাজদরবার থেকে যেই বিপুল অর্থের প্রতিশ্রুতি এসেছে এক মারাঠা খুফিয়ানবিসের মারফত, তার সুযোগ নেওয়ার ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে, বাদশাহ্‌র খুফিয়ানবিসদের মনোযোগ অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করাই বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটা মনে মনে বিচার করে জাফর খাঁ খুশী হোলো। হ্যাঁ, এখন এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়াতে ভালোই হয়েছে। সে মনে মনে পরিকল্পনা করতে লাগলো কি ভাবে খবরটা আগ্রা শহরে এমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় যাতে বাদশাহ কিছুতেই সন্দেহ করতে না পারেন যে সেই খবর খিলওয়াতগাহ্‌ থেকেই বেরিয়েছে। এমন গোপন খবর প্রকাশ্য দরবারে কোনোদিন আলোচিত হবে না, আবিদ হুসেনের বিচারও প্রকাশ্যে হবে না। তবু জেনে যাবে আগ্রা শহরের লোক, এবং জাফর খাঁর উপরই পড়বে এই গুজবের উৎস অনুসন্ধান করার ভার। উজীর-উল-মুলক্‌ জাফর খাঁ মনে মনে হাসলো, মনে মনে তা দিলো নিজের আতর মাখানো গুম্ফতে। প্রকাশ্যে, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বাদশাহ্‌র চারপাইয়ের একপাশে, যেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে আওরংজেবের কথাগুলো।

আওরংজেব ফুলাদ খাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু তুমি কি করে জানতে পারলে?"

ফুলাদ খাঁ সগর্বে উত্তর দিলো, "জাহাঁপনাহ্‌, আমি টহল দিচ্ছিলাম কয়েকজন সিলাহ্‌দারের সঙ্গে। যমুনার তীর ধরে আসছিলাম, সেখানে রদ-অন্দাজ খাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজনে

কথা বলছি, হঠাৎ দেখি তুজন লোকের সঙ্গে আবিদ হুসেন খাঁ এগিয়ে যাচ্ছে খিজিরীর দিকে। আমরা ওকে ধরে ফেলার আগেই ও একটা গুপ্তপথ দিয়ে ভিতরে চলে গেল। দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গেল ভিতর থেকে। আমি তখন দেওরির দারোগা খোজা নসরত খাঁর কাছে গিয়ে খবর দিলাম।"

আওরংজেব গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "আমি তোমার তৎপরতায় খুব প্রসন্ন হয়েছি। বাইরের কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে গোপনে রাত্রিবেলা খাসমহলে প্রবেশ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে মহল-চৌকির ব্যবস্থায় খুব সাংঘাতিক গলদ আছে। রদ-অন্দাজ খাঁ, তুমি এর অনুসন্ধানের ভার নাও। কাল মহল-চৌকির পালা ছিলো জুলফিকর খাঁর। তাকে এখানে ইত্তলা দেওয়া হোক অপরাহ্নে। তার কাছেও কৈফিয়ত চাইতে হবে। খিজিরীর চৌকিকে বরতরফ করা হোক। আর—"

খিলওয়াতগাহ্‌র দরজা খুলে দিলো বাইরের খাস চৌকি। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে যারা ঢুকলো তাদের দিকে তাকালো না আওরংজেব। কথা বলে চললো নিজের মনে। শাহ-ইন-শাহ্‌ কথা বলছেন। সুতরাং জাফর খাঁ, রদ-অন্দাজ খাঁ আর ফুলাদ খাঁও ফিরে তাকালো না। বাদশাহ্‌র কথার মাঝখানে ফিরে তাকানো বেআদবি।

পাহারাদার আবার দরজা বন্ধ করে দিলো। "—আজই আবিদ হুসেন খাঁর চোখ তুটি জ্বলন্ত সাঁড়াশী দিয়ে উৎপাটিত করা হোক," বলছিলো আওরংজেব, "তারপর ওকে হাজির করা হোক মালিকা আলমের দরবারে।"

হঠাৎ শোনা গেল, "আমার কি কসুর জাহাঁপনাহ্‌?"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ফুলাদ খাঁ চমকে উঠলো। সে আর রদ-অন্দাজ খাঁ আর জাফর খাঁ তিনজনেই সবিস্ময়ে ফিরে তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে।

আওরংজেব খুব বিস্মিত হয়েছিলো, কিন্তু সে-বিস্ময় মুখের উপর প্রকাশ পেলো না। খুব সংযতভাবে ফিরে তাকালো।

বিস্মিত হয়েছিলো আকিল খাঁ আর ফিদাই খাঁও। আচমকা একথা শুনে তারা ভেবেই পাচ্ছিলো না কেন অকারণ আবিদ হুসেনের প্রতি বাদশাহ্‌র এই কঠোর মনোভাব।

আবিদ হুসেন বাদশাহ্‌র সামনে এসে কুর্নিস করে আবার জিজ্ঞেস করলো, "আমি কী অপরাধ করেছি জাহাঁপনাহ্‌?"

আওরংজেব শান্ত সংযত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আবিদ হুসেনের দিকে। তারপর ফুলাদ খাঁর দিকে ফেরালো তার দৃষ্টি। সে দৃষ্টি শীতল হয়ে উঠলো, শাণিত হয়ে উঠলো।

ফুলাদ খাঁ সে দৃষ্টির সামনে নিজের দৃষ্টি অবনত করলো। কি বলবে ভেবে পেলো না। কিভাবে আবিদ হুসেন এখানে এলো তাও ভেবে পেলো না। তার হাঁটু দুটো ঈষৎ কম্পিত হতে লাগলো।

আওরংজেব খুব মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "ফুলাদ খাঁ, তহ্‌খানার পাহারার চোখে ধূলিনিক্ষেপ করে কারো খাসমহলের বাইরে পালিয়ে আসা সম্ভব?"

ফুলাদ খাঁর গলা শুকিয়ে গেছে। কোনো উত্তর দিতে পারলো না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

আবিদ হুসেনের দিকে ফিরে আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো, "কাল রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে আবিদ হুসেন খাঁ?"

"একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম জাহাঁপনাহ্‌।"

"কি কাজ সেটা কি আমরা জানতে পারি?"

"সেকথা জানাবার জন্যেই এখানে হাজির হয়েছি জাহাঁপনাহ্‌। কিন্তু তার আগে আমার একটা ফরিয়াদ আছে।"

"কি ফরিয়াদ আবিদ হুসেন খাঁ?"

"কাল রাত্তিরে কয়েকজন ব্যক্তি আমার মাশুকা মোতি বিবিকে

মমতাজ-আবাদে তার গরীবখানা থেকে জোর করে ধরে মুখ বেঁধে নিয়ে গেছে।"

"কোথায় নিয়ে গেছে সেকথা জানো?"

"জানি জাহাঁপনাহ্। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শাহ-ইন-শাহ্র খাসমহলে। এখন সে কয়েদ হয়ে আছে তহ্খানায়।"

বিস্ময়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলো ফুলাদ খাঁর চোখ দুটো। আওরংজেব আবার শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। তারপর আবিদ হুসেনকে জিজ্ঞেস করলো, "সে যে তহ্খানায় আছে তুমি কি করে জানো?"

আবিদ হুসেন উত্তর দিলো, "মোতিবিবি অনেক কাকুতি মিনতি করে এক খোজা খাদিমের মারফত আমাকে পত্র লিখেছে আপনার দরবারে তার ফরিয়াদ পেশ করবার জন্যে। সেই পত্র খোজা খাদিম আকিল খাঁ সাহেবের হাতেই এনে দিয়েছিলো আমাকে দেওয়ার জন্যে। আকিল খাঁ সাহাব পড়েছেন সেই পত্র। ফিদাই খাঁ সাহাবকে জিজ্ঞেস করুন। তিনিও ব্যাপারটা জানেন।"

আওরংজেব ফিদাই খাঁর দিকে তাকালো। ফিদাই খাঁ বললো, "হ্যাঁ, আমি এক খোজা খাদিমকে একটি রুকা এনে আকিল খাঁর হাতে দিতে দেখেছি। আকিল খাঁ সেটি পাঠ করে আবিদ হুসেনের হাতে দিলো। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন আকিল খাঁ বললো, ওটা আবিদ হুসেনের মাশুকার পত্র।"

আওরংজেব আকিল খাঁর দিকে তাকালো। আকিল খাঁ তখন মনে মনে আঙুল কামড়াচ্ছে। সকালে কার মুখ দেখে উঠেছে যে এমন দুর্বিপাকে পড়তে হোলো। জেব-উন-নিসার পত্র নিয়ে এরকম বিপদে তাকে পড়তে হয়নি কোনোদিন। এমন বদ নসীব যে চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হোলো ফিদাই খাঁ আর আবিদ হুসেন।

কিন্তু বাদশাহ তাকিয়েছেন তার দিকে। উত্তর দিতে হবে।

আকিল খাঁ ঠোঁট চেটে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, জাহাঁপনাহ্ ওটা আবিদ হুসেনের মাশুকার পত্র।"

"তুমি পড়েছো?"

"হ্যাঁ জাহাঁপনাহ্।"

"সে তহ্খানায় আছে?"

আকিল খাঁর কান দুটো লাল হয়ে গেল। উপায় নেই। ফিদাই খাঁকে মিছে কথা বলেছিলো, এখন সেই কথারই প্যাঁচে জড়িয়ে পড়েছে। বললো, "হ্যাঁ, জাহাঁপনাহ্।"

আওরংজেব নিস্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার তাকালো ফুলাদ খাঁর দিকে।

একটা শঙ্কার স্তব্ধতা নামলো খিলওয়াতগাহ্‌তে।

আবিদ হুসেন হঠাৎ বলে উঠলো, "জাহাঁপনাহ্, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আপনি আমার মাশুকার পত্র পড়ে দেখুন।"

জেবের ভিতর হাত ঢুকিয়ে আবিদ হুসেন বার করে আনলো সেই ভাঁজ করা রঙীন কাগজ। আকিল খাঁর মুখের সমস্ত রক্ত হঠাৎ নেমে গেল। আবিদ হুসেন কাগজটি এগিয়ে দিলো উজীর জাফর খাঁর দিকে। জাফর খাঁ সেটি নিয়ে বাদশাহ্‌র হাতে দিলো।

আর আকিল খাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো রাশি রাশি সরষের ফুল। ঘেমে গেল সমস্ত মুখমণ্ডল। মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। আবিদ হুসেন!—সে তার সঙ্গে এরকম বেইমানি করলো। ঘন ঘন ঢোক গিলতে লাগলো আকিল খাঁ। শাহ-ইন-শাহ্ এবার খুলে পড়বেন। ব্যস, তারপর সব শেষ। আকিল খাঁ, জেব-উন-নিসা, আবিদ হুসেন কেউ আর রক্ষা পাবে না। চারদিকে অন্ধকার দেখলো আকিল খাঁ। ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার হাত পা শরীর।

বাদশাহ ভাঁজ করা রঙীন কাগজটি হাতে নিলো, চোখ বুঁজে

একটু ভাবলো, তারপর বললো, "আবিদ হুসেন খাঁ, দরবারের উমরাহদের প্রণয়িণীদের পত্র পাঠ করা আমাদের কাজ নয়।" বাদশাহ পত্রখানি ফিরিয়ে দিলো জাফর খাঁর হাতে, জাফর খাঁ ফিরিয়ে দিলো আবিদ হুসেনকে। আবিদ হুসেন সেই পত্র আবার রেখে দিলো জামাহ্‌র জেবে।

আকিল খাঁ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রুমালি বার করে পুঁছলো কপালের ঘাম।

"সেই মোতি বিবিকে কারা ধরে নিয়ে গেছে তুমি জানো?" বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো আবিদ হুসেনকে।

"জাহাঁপনাহ্‌ আমি কারো নামে কোনো অভিযোগ করতে চাই না। আমি চাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাক।"

"হুম্‌। আমি বুঝেছি তুমি কি বলতে চাইছো। যারা ধরে নিয়ে গেছে, তাদের কি তুমি দেখেছো?"

"হ্যাঁ, দেখেছি জাহাঁপনাহ্‌। আমি ঝরোকা থেকে দেখতে পেয়েছি তাদের মুখ।"

"তখন রাত্রির সময়টা ছিলো কতো?"

"এক প্রহরের কিছু আগে জাহাঁপনাহ্‌।"

আওরংজেব স্তব্ধ রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "আবিদ হুসেন খাঁ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মোতিবিবি নিরাপদে ঘরে ফিরে যাবে দ্বিপ্রহরের আগেই।"

আবিদ হুসেন সসম্ভ্রমে কুর্নিস করলো। তারপর বললো, "জাহাঁপনাহ, আরো একটি গুরুতর বিষয় আপনাকে জানাতে চাই। আপনার হুকুম হওয়ার মেহেরবানি হোক।"

"বলো।"

আবিদ হুসেন বললো, "একটি গভীর ষড়যন্ত্র আমি ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রকাশ্যে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না। আপনি এটি খুলে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।"

আকিল খাঁ দেখলো, আবিদ হুসেন তার কাবার আড়াল থেকে বার করলো হাতির দাঁতের কাজ করা একটি সুদৃশ্য ছোটো পেটিকা। এটার কথাই লিখেছিলো জেব-উন-নিসা? এটা আবিদ হুসেনের কাছেই ছিলো এতক্ষণ।

উজীর জাফর খাঁ সেই পেটিকা আবিদ হুসেনের কাছ থেকে নিয়ে বাদশাহ্‌র হাতে দিলো। এবার আর বিস্ময় গোপন করতে পারলো না আওরংজেব। পেটিকা দেখেই চিনতে পারলো এটি কয়েক বছর আগে বিজাপুরের বড়ী সাহিবা সওগাত দিয়েছিলো আওরংজেবকে। আওরংজেবের কাছ থেকে পেয়েছিলো জিন্নত-উন-নিসা।

খুব কৌতূহলের সঙ্গে আস্তে আস্তে ডালা উন্মুক্ত করলো! ভিতরটা মখমলে মোড়া। ভিতরের জিনিসগুলো দেখে বাদশাহ চমকে উঠলো, তারপর আস্তে আস্তে তুলে নিলো গোলাপী রঙের মোহর করা নিশানখানি। নীরবে পড়লো ফারসী অক্ষরে লেখা শিবাজীর নাম। তারপর আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে ডালা বন্ধ করলো।

"এটি আমার কাছেই থাক," বললো আওরংজেব, "আবিদ হুসেন খাঁ, নানা কারণে আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আজ আম দরবারে হাজির থাকবে। তোমাকে খিলাত দিয়ে আমার মেহেরবানি জানাবো। উজীর-উল-মুলক্ জাফর খাঁ, আবিদ হুসেন খাঁর মনসব আরো দুশো জাৎ বাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম হোলো। তুমি এবার বিদায় গ্রহণ করতে পারো।"

আবিদ হুসেন কুর্নিস করে চলে গেল। আকিল খাঁ ছটফট করতে লাগলো। এবার গিয়ে ওকে ধরা দরকার। কিন্তু বাদশাহ্‌র হুকুম ছাড়া বাইরে যাওয়ার উপায় নেই।

আওরংজেব এবার ফিরে তাকালো ফুলাদ খাঁর দিকে। বললো, "ফুলাদ খাঁ, তুমি আগ্রা শহরের কোতোয়াল, একাজে দায়িত্বের

পরিচয় দিয়ে তুমি অনেকবার আমাকে সন্তুষ্ট করেছো। কিন্তু এবার তুমি অত্যন্ত নির্বোধের মতো কাজ করেছো। অন্য কেউ হলে তাকে কোতোয়ালের পদ থেকে বরতরফ করা হোতো, তবে তোমাকে অতো কঠিন সাজা আমি দিতে চাই না। কিন্তু একটি রাত আমার অশান্তিতে কেটেছে তোমারই ভুলের জন্যে। উজীর-উল-মুল্‌ক, ফুলাদ খাঁর মনসব তিনশো জাৎ কমিয়ে দেওয়ার হুকুম হোলো।"

বাদশাহ্‌র সাজার হুকুমও মেহেরবানি। ফুলাদ খাঁ বিবর্ণ মুখে কুর্নিস করলো।

আওরংজেব চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, "জাফর খাঁ, মহারাজকুমার রামসিংহকে জরুরী ইত্তলা দেওয়া হোক দরবারের পর এসে খিলওয়াতগাহ্‌তে আমার কাছে হাজির হওয়ার জন্যে।"

আরো তুচারটি নির্দেশ দেওয়ার পর আওরংজেব উঠে পড়ে ভিতরে চলে গেল।

আকিল খাঁ ছুটে বেরিয়ে এলো খিলওয়াতগাহ্‌ থেকে। দেখলো আবিদ হুসেন বাইরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে এগিয়ে এলো হাসি মুখে। জেবের ভিতর থেকে বার করে দিলো জেব-উন-নিসার পত্রখানি। আকিল খাঁ চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সেটি তাড়াতাড়ি নিজের জেবে স্থানান্তরিত করলো। তারপর ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে আঙুল তুলে কিছু বলার উপক্রম করতেই আবিদ হুসেন এক গাল হেসে আকিল খাঁর পিঠ চাপড়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল তাকে কোনো কথা বলার অবসর না দিয়ে।

আকিল খাঁর ইচ্ছে হোলো তার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে তার পশ্চাৎপ্রদেশে একটি পদাঘাত করে, কিন্তু বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনে তাকে সে লোভ সংবরণ করতে হোলো। ফিরে তাকিয়ে দেখলো উজীর জাফর খাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে আসছে রদ-অন্দাজ খাঁ, ফিদাই খাঁ আর ফুলাদ খাঁ।

খিলওয়াতগাহ্ থেকে আম-দরবার, আম-দরবার থেকে খাস-দরবার, খাস-দরবার থেকে আবার খিলওয়াতগাহ্। দৈনন্দিন কর্মসূচি সেরে মধ্যাহ্নের পর বাদশাহ আওরংজেব ফিরে এলো খোয়াবগাহ্তে। ফিরে এসেই ইত্তলা দিলো শাহজাদী জিন্নত-উন-নিসা বেগমকে। অনতিবিলম্বে জিন্নত-উন-নিসা খোয়াবগাহ্তে এসে বাদশাহ্কে তসলিম জানালো।

আওরংজেব খোয়াবগাহ্র ঝরোকার পাশে দাঁড়িয়েছিলো শাহজাদীর দিকে পেছন ফিরে। দূরে যমুনার পাড়ে তাজমহলের শুভ্র গম্বুজ থেকে ঠিকরে পড়ছে মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি। আওরংজেব সেদিকে তাকিলো ছিলো। কন্যার দিকে ফিরেও তাকালো না।

কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করবার পর জিন্নত-উন-নিসা বললো, "শাহ-এ-আদিল, আমায় কি কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো আওরংজেব, "আজ কুমার রামসিংহকে ইত্তলা দিয়েছিলাম।"

জিন্নত-উন-নিসা ভেবে পেলো না তাকে এসংবাদ জানানোর কী প্রয়োজন। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে বাদশাহ আওরংজেব কিছু বলেন না। সুতরাং জিন্নত-উন-নিসা মনে মনে একটু শঙ্কিত হোলো।

আওরংজেব বলে গেল, "শিবা রামসিংহের কাছে হুণ্ডির বিনিময়ে ছেষট্টি হাজার টাকা ঋণ চেয়েছিলো। রামসিংহ এত টাকা ঋণ দিতে ইতস্তত করছিলো। তার ভয় ছিলো, আমি যদি জানতে পারি খুব অসন্তুষ্ট হবো। খবরটা আমার কানে এসেছিলো পর্তিত রায় হরকরার মারফত।"

জিন্নত-উন-নিসা চকিত দৃষ্টিতে তাকালো আওরংজেবের দিকে। কিন্তু ঝরোকার ধারে আওরংজেব তার দিকে পেছন ফিরে আছে। আওরংজেবের মুখের ভাব সে দেখতে পেলো না।

আওরংজেব ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলছিলো, "আমি কুমার রাম

সিংহকে জানিয়ে দিলাম সে যদি নিজের দায়িত্বে হুণ্ডির বিনিময়ে শিবাকে টাকা দেয়, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। শিবা রামসিংহের মেহমান, তার যাতে কোনোরকম অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রাখা রামসিংহের কর্তব্য। রামসিংহ একথা শুনে খুব খুশী মনেই চলে গেল। আমার ধারণা রামসিংহ শিবাকে টাকা দিয়ে দেবে।"

জিন্নত-উন-নিসা খুশী হোলো একথা শুনে। কিন্তু তার মনের উপর থেকে দুর্ভাবনার ভার নামলো না। আওরংজেব তাকে ডাকিয়ে এনে কেন এসংবাদ শোনাচ্ছে একথা তার বোধগম্য হোলো না কিছুতেই।

ভাবলেশবিহীন কণ্ঠে আওরংজেব বলে গেল, "এসব সামান্য ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো হিন্দুস্তানের শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র কাজ নয়। কিন্তু আমারই খাসমহলের দুএকজনের মুর্খতার জন্যে আমি এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলাম। হুকুমতের কোনো ব্যাপারে হারেমের বেগমদের জড়িয়ে পড়া উচিত নয়, একথা যেন দ্বিতীয়বার আমায় বলতে না হয়। আমার নির্ধারিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা আমি ঘোর অপরাধ মনে করি। চাঘতাইয়া শাহী খানদানের শরম আমার কাছে সব কিছুর ওপরে। এজন্যে এবার চোখ বুঁজে সহ্য করেছি, যারা পথভ্রান্ত হতে যাচ্ছিলো, তাদের সম্মান বাঁচিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে দিয়েছি। এমন সৌভাগ্য আমাদের দ্বিতীয়বার নাও হতে পারে।"

জিন্নত-উন-নিসা শিউরে উঠলো। শাহ-ইন-শাহ কি তবে জানতে পেরেছেন?

আওরংজেব শীতল কণ্ঠে বললো, "আমার পিতা আলা হজরত ফিরদৌসি আশয়ানি শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ শাহজাহান, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা শিকো, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ বক্স, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান শিকো, আমার প্রিয় সন্তান মহম্মদ সুলতান,—

কাউকে আমি ক্ষমা করিনি। প্রয়োজন হলে আরো ছু-একজনকে কয়েদ করবার হুকুম দিতে পারি, সে পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোকই হোক।"

জিন্নত-উন-নিসা দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে।

আওরংজেব আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়ালো। বললো, "ওপাশে ওই লাল মখমলের ঢাকনিটা দেখছো?"

জিন্নত-উন-নিসা সেদিকে ফিরে তাকালো।

"ওটি তুলে নাও," হুকুম দিলো আওরংজেব।

জিন্নত-উন-নিসা এগিয়ে গিয়ে ঢাকনিটা তুললো, আর সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও বিস্ময় মেশানো একটা অস্ফুট শব্দ করে ছুতিন পা পেছনে সরে গেল। সে ভেবেই পেলো না তার হাতির দাঁতের কাজ করা পেটিকা শাহ-ইন-শাহ্‌র খোয়াবগাহ্‌তে কি করে এলো।

আওরংজেব গম্ভীরস্বরে বললে, "ওর ভিতরে যা আছে সে সব ফিরে পেলে ছু-একজন খুশী হবে,—বিশেষ করে একটি গোলাপী রঙের মোহর করা নিশান। সেই নিশানের উপর লেখা আছে শিবা ভোঁসলের নাম।"

জিন্নত-উন-নিসার মুখ পাণ্ডুর হোলো।

আওরংজেব বলে গেল, "এই নিশান অন্য কারো হাতে পড়েনি। সুতরাং আমিও নিশান খুলে দেখা প্রয়োজন বোধ করিনি, জানা দরকার মনে করিনি কে লিখেছে এই নিশান এবং কেন লিখেছে। আমার ধারণা এটি কোনো নির্বোধ স্ত্রীলোকের মূর্খতার চরম নিদর্শন। আমি তোমার উপর ভার দিচ্ছি, তুমি এই নিশান তোমার মহলে নিয়ে বিনষ্ট করে ফেলবে।"

জিন্নত-উন-নিসার চোখ ফেটে জল এলো। সে আত্মসংবরণ করে রইলো অতিকষ্টে।

"ওই পেটিকা আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও," রূঢ় কণ্ঠে আওরংজেব হুকুম দিলো।

জিন্নত-উন-নিসা আস্তে আস্তে তুলে নিলো হাতির দাঁতের পেটিকা, তারপর বাদশাহ্‌কে তসলিম করে বেরিয়ে গেল খোয়াবগাহ্‌ থেকে।

একলা দাঁড়িয়ে রইলো শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আওরংজেব। এসময় কেউ বাদশাহ্‌কে দেখতে পেলে বিস্মিত হোতো। মুখের উপর ভাবলেশহীন কাঠিন্যের মুখোশ আর নেই। চোখের চাউনি খুব স্নিগ্ধ, মুখে একটা বিষণ্ণ বেদনার অভিব্যক্তি। ঠোঁট কামড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো হিন্দুস্তানের বাদশাহ।

হুণ্ডি লিখে দিলো নিরাজী রাওজী। তার উপর পড়লো শিবাজীর পাঞ্জার রক্তচন্দনের ছাপ। কুমার রামসিংহের মুনশী গিরধরলালজী সেটি তুতিনবার ভালো করে পড়ে ভাঁজ করে রাখলো জামাহ্‌র ভিতরে। তারপর শিবাজীকে অভিবাদন করে বিদায় নিলো। তার সঙ্গে গেল দত্ত ত্রিম্বক আর কৃষ্ণাজী আপ্তে। মহারাজ-কুমারের খাজাঞ্চীর কাছ থেকে নিয়ে আসবে ছেষট্টি হাজার টাকা।

ওরা চলে যাওয়ার পর নিরাজী রাওজী বললো, "আমাদের সঙ্গীরা প্রায় সবাই চলে গেছে আগ্রা থেকে। টাকার ব্যবস্থাও হোলো। এবার আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করা যেতে পারে।"

শিবাজী একটু হাসলো। তারপর বললো, "এখন নয়। আরো কিছুদিন যাক। আওরংজেব নিশ্চয়ই জানে যে আমি কুমারজীর কাছ থেকে টাকা হাওলাত নিয়েছি। হয়ত তার মনে কোনো সন্দেহ জাগতে পারে। কয়েকদিন খুব ঘটা করে দানধ্যান করা যাক। তারপর সময় বুঝে আমাদের মতলব হাসিল করতে হবে।"

হীরাজী ফরজন্দ জিজ্ঞেস করলো, "কুমারজী টাকা দিতে এত ইতস্তত করছিলো কেন? তার কি ভয় ছিলো যে আপনার হুণ্ডি দাক্ষিণাত্যে ভাঙানো যাবে না?"

শিবাজী হেসে উঠলো। তারপর বললো, "না, যতোক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ এ ভয় করার কোনো কারণ যে নেই একথা সে জানে। তবে আমার কোনো দুর্ঘটনা হলে আমার অবর্তমানে এই হুণ্ডি ভাঙানো যে মির্জা রাজার পক্ষে সহজ হবে না এটাও সত্যি। তাই রামসিংহ যখন কাল এসে টাকা হাওলাত দিতে রাজী হোলো, তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলাম হয়তো আমি এখনো বেশ কিছু-দিনের জন্যে নিরাপদ।"

দত্ত ত্রিম্বক ও কৃষ্ণাজী আপ্তে কুমার রামসিংহের খাজাঞ্চীর কাছ থেকে টাকা বুঝে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কুমারের কাছে অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করলো তেজসিংহ। বললো, "হুণ্ডিতো পাঠিয়ে দেওয়া হবে দাক্ষিণাত্যে মহারাজার কাছে। কিন্তু মারাঠারা ওঁকে টাকাটা দেবে তো?"

রামসিংহ উত্তর দিলো, "রাজা শিবাজী সম্বন্ধে কোনো খারাপ খবর যদি না পায় তো নিশ্চয়ই দেবে। আর শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র কথা শুনে মনে হোলো এখনো কিছুদিন কোনো খারাপ খবর পাওয়ার দুর্ভাগ্য মারাঠাদের হবে না। তদ্দিনে নিশ্চয়ই ভাঙানো যাবে এই হুণ্ডি।"

তেজসিংহের আশঙ্কা যে অমূলক এবং রামসিংহের অনুমানই ঠিক, এর প্রমাণ আছে ঐতিহাসিক নথিপত্রে। ইতিহাসে একথা লিপিবদ্ধ করা আছে যে, এই ছেষট্টি হাজার টাকার হুণ্ডি নিরাপদে পৌঁছে গিয়েছিলো দাক্ষিণাত্যে মির্জা রাজা জয়সিংহের কাছে। মির্জা রাজা শিবাজীর মারাঠা অমাত্যদের কাছে হুণ্ডি দাখিল করতেই ওরা বিনা দ্বিধায় মিটিয়ে দিয়েছিলো ছেষট্টি হাজার টাকা।

॥ পাঁচ ॥

বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিনতার মধ্যে কেটে গেল প্রায় একটি মাস। পান্না খুব হতাশ হয়ে পড়লো। শক্তিসিংহ নিয়মিত আসে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। কিছু উৎকণ্ঠায়, কিছু মাধুর্যে দ্রুত কেটে যায় কয়েকটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। কিন্তু এভাবে আর কদ্দিন,—কখনো জিজ্ঞেস করে পান্না, কখনো জিজ্ঞেস করে শক্তিসিংহ। দুজনে দুজনকে প্রবোধ দেয়। তাদের নিজেদের পরিকল্পনা জড়িয়ে আছে শিবাজীর পরিকল্পনার সঙ্গে। শিবাজী আগ্রা থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে পান্নাও যেতে চায় না খোজা ফিরোজার বাগ ছেড়ে। শক্তি সিংহের পক্ষেও পান্নাকে নিয়ে আগ্রা ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। রাঠোরেরা আগ্রা ত্যাগ করার দস্তক পেয়ে গেছে, কিন্তু শিবাজী তাদের পরিকল্পনায় বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না বলে, বার বার পেছিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের রওনা হওয়ার তারিখ। শক্তিসিংহ একদিন পান্নাকে বললো,—শিবাজীর তো আগ্রা ছেড়ে যাওয়ার খুব ইচ্ছে আছে বলে মনে হচ্ছে না। পান্না উত্তর দিলো, —উনি যখন এভাবে সময় নিচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণ আছে। শক্তিসিংহ জানালো যে, আর বেশীদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই।

"কিন্তু আমাদের আর কি করার আছে," পান্না হতাশ কণ্ঠে বললো।

শক্তিসিংহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে উত্তর দিলো, "সত্যি, উপস্থিত আমাদের কিছু করার নেই। এখানে সামাজিকভাবে কছওয়া কন্যার সঙ্গে রাঠোরের বিয়ে হওয়ার অনুমোদন মহারাজকুমার রামসিংহ কি

মহারাজা জসবন্ত সিংহ কারো কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। মুনশী গিরধরলালজী মহারাজকুমারের অনুচর। মহারাজকুমারের যা অভিমত, গিরধরলালজীরও তাই অভিমত। সুতরাং তিনিও আমাদের বিয়ের বিরোধিতা করবেন। একমাত্র উপায় ক্ষত্রিয়ের মতো তোমাকে এখান থেকে হরণ করে নিয়ে আগ্রা থেকে চলে যাওয়া। কিন্তু যদ্দিন শিবাজী এখানে আছেন, আমাদের মহারাজা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না,—"

"এবং আমিও যাবো না," পান্না ম্লান হেসে বললো, "শিবাজীর খাওয়া দাওয়ার তদারক করার ভার আমার উপর। আমি হঠাৎ চলে গেলে ওঁর খুব অসুবিধে হবে।"

এই প্রসঙ্গই আলোচনা হোতো প্রত্যেকদিন। দুজনেরই মনে হতাশা, কিন্তু দুজনে দুজনকে প্রবোধ দিতো যে শিবাজীও তো এভাবে বেশীদিন আগ্রায় থাকবেন না। একদিন না একদিন ওঁর মুক্তির কোনোরকম একটা উপায় হবেই।

"কিন্তু কবে?" একজন জিজ্ঞেস করতো আরেকজনকে, "দেখতে দেখতে তো তিন মাস কেটে গেল। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ। এখন শ্রাবণও শেষ হয়ে আসছে।"

"হয়তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই," অন্যজন উত্তর দিতো, "কোনো নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।"

নতুন পরিস্থিতির আশায় আশায় কেটে গেল ষোলো শ' ছেষট্টি খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের কয়েকটা দিন। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা খুব উত্তেজিত হয়ে শক্তিসিংহ এলো খোজা ফিরোজার বাগে।

সেদিন আগস্টের আট তারিখ, বৃহস্পতিবার। সাপ্তাহিক আধাছুটির দিন বলে মহারাজকুমার দরবারে যায়নি। নাচ গানের মাইফিল হচ্ছে মহারাজকুমারের মঞ্জিলে। অনেক অভ্যাগত এসেছে। তাই খোজা ফিরোজার বাগের প্রধান দরওয়াজার ওদিকে মোতায়েন করা হয়েছে অনেক কছওয়া লশকর। শিবাজীর তাঁবুর চারদিকেও

অনেক পাহারাদার। আলো জ্বলছে চারদিকে। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকজনের ব্যস্ততা। খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে টহলদার সৈন্যেরা ঘুরছে। তাদের নজর এড়িয়ে ভেতরে আসতে শক্তিসিংহের একটু অসুবিধেই হয়েছিলো।

শক্তিসিংহ দেখলো পান্না অন্ধকারের আড়ালে অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট জায়গায়। মনে হোলো সেও যেন খুব উৎকণ্ঠিত। সে বললো, "শোনো, আজ আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। শিবাজীর কাছে ফিরে যেতে হবে।"

শক্তিসিংহ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "বাজারে জোর গুজব রটেছে যে শিবাজী খুব অসুস্থ। কথাটা কি সত্যি?"

পান্না একটু ইতস্তত করলো, তারপর বললো, "হ্যাঁ, উনি আজ তিন দিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।"

"পান্না!"

"কি?"

"ওঁর অসুখ যদি গুরুতর হয়, তাহলে সেরে উঠতে হয়ত সময় লাগবে," বললো শক্তিসিংহ।

"কিছুই বলা যায় না।"

"তাহলে আমাদেরও অদূর ভবিষ্যতে আগ্রা ছেড়ে যাওয়ার কোনো আশা নেই।"

পান্না চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর উত্তর দিলো, "আমাদের জন্যে আমি এখন অতো ভাবছি না। আমার এখন ভাবনা শিবাজীর জন্যে।"

নয়ই আগস্ট,—শুক্রবার।

সেদিন সমস্ত সরকারী দফতর পূর্ণদিবস বন্ধ। আবিদ হুসেনের কোনো কাজ ছিলো না। সারা দুপুর কাটালো ঘুমিয়ে। সন্ধ্যার পর স্নান করে, পাতলা মলমলের জামাহ পরিধান করে মাথায়

রঙীন পাগ চাপিয়ে হাতে রুমালি বেঁধে গোঁফের ডগায় আতর মেখে ছড়ি হাতে হাজির হোলো মোতিবিবির কাছে।

দীর্ঘ বিনুনিতে আর হাতে চামেলীর মালা জড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো মোতিবিবি। তার পাশে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে শের শুনিয়ে আর শের শুনে, শরাবের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে দিয়ে কেটে গেল কিছুক্ষণ সময়। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলো আবিদ হুসেন। বললো, "মোতিজান, এবার একটা তারিখ স্থির করতে হয়।"

"কিসের তারিখ?" মোতিবিবি জিজ্ঞেস করলো।

"তোমায় আর বেশীদিন মমতাজআবাদে রাখতে চাইনা। এবার আমার গরীবখানায় নিয়ে গিয়ে সেখানে স্বর্গ গড়ে তুলতে চাই।"

মোতিজান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ হেসে জিজ্ঞেস করলো, "মিঞা, তুমি কোতোয়াল হচ্ছো কবে?"

"কেন মোতিজান, তুমি কি কোতোয়ালের বিবি হতে চাও?"

"না ভাই আবিদ হুসেন, আমি শুধু আমার আশিকের বিবি হতে চাই। তুমি আগে বলতে কিনা যে একদিন তুমি কোতোয়াল হবে, তাই ঠাট্টা করছিলাম।"

"আজ আমি আর কোতোয়াল হতে চাই না," বললো আবিদ হুসেন।

"তুমি কোতোয়াল হতে যাবে কোন দুঃখে," বলে উঠলো মোতি বিবি, "তুমি হবে ফৌজদার, সুবাদার, তারপর উজীর-উল-মুল্‌ক। শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ তোমায় কতো খাতির করেন তোমার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার জন্যে।"

"যোগ্যতা? কর্মদক্ষতা?" আবিদ হুসেন খুব জোরে হেসে উঠলো, তারপর বললো, "মোতিজান, যে ভাবে আমার মনসব বাড়ছে, একদিন সত্যি সত্যি উজীর-উল-মুল্‌ক হলে আমি তাজ্জব হবো না। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতা কিছুই

নেই। কতকগুলো চালাক লোক অতিরিক্ত চালাকি করতে গিয়ে ভুল করে, আমার নসীবটা খুব ভালো বলে সে সব ভুলের ফায়দা জোটে আমার। যেদিন কর্মদক্ষতা দেখাতে যাবো সেদিনই খতম হয়ে যাবো।”

“না, না, খতম হবে কেন? ওকথা বোলো না।”

“তুমি জানো না মোতিজান, এসব রাজা বাদশাহ্ আমীর উমরাহ্দের আমি মনে মনে বড়ো ভয় পাই। এদের যখন যা খেয়াল, একদিন আশমানে উঠিয়ে দেবে, একদিন দরিয়ায় ডুবিয়ে দেবে। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। মনে মনে আমি সাধারণ লোক, সাধারণ লোকের মতোই থাকতে চাই।”

মোতিজান একটু ভেবে বললো, “ছেড়ে দাও দরবারের কাজ। আমাদের তুজনার ডাল-রুটির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।”

“মোতিজান,” আবিদ হুসেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, “দরবারের খিদমতে হাসিল হওয়া শক্ত, কিন্তু দরবারের কাজে ইস্তফা দেওয়া আরো শক্ত। ছাড়তে চাইলে ছাড়তে দিচ্ছে কে?”

“কেন আবিদ হুসেন?”

“অনেক ভৈতরের কথা জানি যে। আমার মতো লোককে বাদশাহ্ সলামত সহজে চোখের আড়াল হতে দেবেন না।”

মোতিজান আবিদ হুসেনের কাঁধে হাত রেখে বললো, “অতো ভাবনা কোরো না মিঞাজান, আমি আছি।”

“আছো তো?”

“নিশ্চয় আছি।”

“সারা জিন্দগীর জন্যে?”

“হ্যাঁ, সারা জিন্দগীর জন্যে।”

আবিদ হুসেন খুব খুশী হয়ে মোতিজানের হাত তুটো নিজের তুহাতে তুলে নিলো, বলতে গেল কিছু একটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত তুটো ছেড়ে দিতে হোলো।

সিঁড়িতে পাওয়া গেল ভারী পায়ের আওয়াজ। একজন ধুপ
াপ করে উঠে আসছে, তার পেছন পেছন আরো একজন।

"আমি কি কোনোদিন শান্তিতে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি বসে
ুটো কথা বলতে পারবো না?" আবিদ হুসেন বিরক্তি প্রকাশ করে
ললো, "কোথায় আমার তলোয়ার? আজ যে আসুক, আমার
াতে তার নিস্তার নেই, সে ফুলাদ খাঁর লোকই হোক আর খাস-
হলের খোজাই হোক।"

তলোয়ার হাতে বীরদর্পে দরজার দিকে এগিয়ে গেল আবিদ
হুসেন।

"ও কি খাঁ সাহাব, তলোয়ার হাতে কেন? আমি কি আপনার
ুশমন নাকি?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো কৃষ্ণাজী আপ্তে। তার
পেছন পেছন এলো এক মারাঠী ভৃত্য। কাঁধে একটি ডাণ্ডির দুদিকে
ঝুলছে দুটো বড়ো বড়ো ভারী বেতের ঝুড়ি।

আবিদ হুসেন সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকালো। গম্ভীরকণ্ঠে
জিজ্ঞেস করলো, "আমার সঙ্গে আবার কি দরকার?"

কৃষ্ণাজী একটু হাসলো। তারপর বললো, "আমায় রাজা
শিবাজী পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। তিনি এসব সওগাত
পাঠিয়েছেন আপনাদের দুজনের জন্যে।"

আবিদ হুসেন তাকালো বেতের ঝুড়ি দুটোর দিকে।

"কি আছে ওর মধ্যে?" মোতিজান জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু মেওয়া মিঠাই আর ফল।"

"মেওয়া মিঠাই?" আবিদ হুসেনের মুখে হাসি দেখা দিলো।
কিন্তু আবার মিলিয়ে গেল সেই হাসি। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো,
"রাজা শিবাজীকে আমার শুকরিয়া জানাবেন। কিন্তু উনি সওগাত
পাঠিয়েছেন কেন?"

"উনি খুব অসুস্থ," কৃষ্ণাজী উত্তর দিলো, "নিজের আরোগ্য
কামনায় উনি সন্ন্যাসী ফকিরদের দান খয়রাত করছেন এবং যাঁদের

যাঁদের ভালোবাসেন বা শ্রদ্ধা করেন তাদের কাছে পাঠাচ্ছেন সওগাত।"

"শিবাজী অসুস্থ?" মোতিজান বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, তোমায় বলতে ভুলে গেছি, বাজারে তো তাই গুজব তিন চারদিন ধরে," বললো আবিদ হুসেন, "দরবারেও সবাই বলাবলি করছে!"

"উনি সত্যিই খুব অসুস্থ," একটু বিষণ্ণ হয়ে বললো কৃষ্ণাজী আপ্তে।

"আহা, বড়ো ভালো লোক আপনাদের রাজা শিবাজী," সহানুভূতির কণ্ঠে বললো আবিদ হুসেন, "উনি তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হোন।"

কৃষ্ণাজী চলে যাওয়ার উপক্রম করছিলো, মোতিজান বললো, "এখনই চলে যাবেন? বসুন একটুখানি।"

"উৎকৃষ্ট সিরাজী আছে ওই ঝারিতে। আপনার জন্যে একটা পিয়ালা আনতে বলি ফরাশকে," আবিদ হুসেন বললো অমায়িকতার সঙ্গে।

কৃষ্ণাজী বসলো না। তাকে আরো কয়েক জায়গায় যেতে হবে শিবাজীর সওগাত নিয়ে। বাদশাহ্‌র খাঁ-ই-সামান ইফতিকর খাঁ, ফিদাই খাঁ, ফুলাদ খাঁ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ, ফিরিঙ্গী নিকোলো ম্যানুচি, কাজি-উল-কুজাত—অনেকের নাম করলো কৃষ্ণাজী আপ্তে।

কৃষ্ণাজী বিদায় গ্রহণ করার পর আবিদ হুসেন সন্তর্পণে ঝুড়ির ডালা তুলে দেখলো, তারপর হাসিমুখে বার করে আনলো একটি লাড্ডু। আধখানা ভেঙে দিলো মোতিজানের হাতে। বাকি আধ খানাতে নিজে কামড় বসালো।

"বাঃ, চমৎকার লাড্ডু," বলে উঠলো মোতিজান।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লাড্ডু খেতে খেতে পরস্পরের দিকে

তাকিয়ে হাসলো। মোতিজানের হঠাৎ চোখ পড়লো আবিদ হুসেনের হাতের তলোয়ারের উপর নামিয়ে বললো, "মিঞা।"

"কি ?"

"একটা কথা দাও।"

"কি কথা ?"

"তুমি আর কথায় কথায় তলোয়ার হাতে আস্ফালন করবে না কারো সামনে। সেবার একদিন তেড়ে গিয়েছিলে ফুলাদ খাঁর দিকে। আজ ছুটে গেলে কৃষ্ণাজীর দিকে। এরা প্রত্যেকে খুব ভালো তলোয়ার ঘোরাতে জানে। অথচ তুমি তলোয়ার ভালো করে ধরতেও জানো না। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, কবে একদিন বিপদে পড়ে যাবে।"

আবিদ হুসেন হাসলো। তারপর বললো, "মাশুকা সাহিবা, একটা কথা বলবো তোমার কানে কানে ? কাউকে বলবে না ?"

"না বলবো না। কি বলছিলে বলো।"

"আমি আজ দুমাস ধরে তলোয়ারের লড়াই শিখছি উজীরপুরার উস্তাদ আলি হাসানের কাছে। ও আমার বন্ধু আবুল হাসানের বড়ো ভাই, আমাকে খুব স্নেহ করেন। দেখবে ? এই দেখ—।"

আবিদ হুসেন ঘরের মাঝখানে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ নিজের চার দিকে তলোয়ার ঘোরালো লাড্ডু খেতে খেতে। তারপর ক্লান্ত হয়ে বললো, "দেখলে ?"

মোতিজান হাসলো।

"একদিন সব্বাইকে তাজ্জব বনিয়ে দেবো।"

"আমি আজই তাজ্জব বনে গেছি," মোতিজান লাড্ডু খেতে খেতে বললো, "কি ইনাম চাই বলো।"

"আরেকটি লাড্ড দাও," উত্তর দিলো আবিদ হুসেন

দশই আগস্ট।—শনিবার

বাদশাহ আওরংজেব আম-দরবার সমাপ্ত করে চলে এলো দিওয়ান-ই-খাসে। উজীর জাফর খাঁকে প্রথম কথাই জিজ্ঞেস করলো, "খোজা ফিরোজার বাগ থেকে কোনো খবর পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ জাহাঁপনাহ্। শিবাজী যে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন, এ সংবাদ সমর্থিত হয়েছে।"

"খুব ভালো খবর। এরকম খোশখবর অনেকদিন আমাকে কেউ দেয়নি। ওই মারাঠা বর্বর যদি অসুখে ভুগে ইহলীলা সংবরণ করে আমার মনের উপর থেকে একটা বিরাট দুর্ভাবনার বোঝা নেমে যাবে। কিন্তু শিবার যখন এত অসুখ, তখন সেদিন কুমার রামসিংহের মঞ্জিলে মাইফিল হয়েছিলো কেন?"

উজীরকে সব খবরই নিতে হয়। জাফর খাঁ কোনোরকম ইতস্তত না করে উত্তর দিলো, "তখনো শিবাজীর রোগ গুরুতর হয়ে ওঠেনি। কুমার রামসিংহ জানতে পারলেন পরদিন।"

"চিকিৎসা করছে কে?"

"কছওয়া দরবারের প্রধান বৈদ্য।"

আওরংজেব হুকুম দিলো, "আমাদের চৌকিকে জানিয়ে দেওয়া হোক, তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। বৈদ্য সেজে অন্য কেউ যেন শিবার কাছে যাওয়া আসা না করে। আর, শাহী দরবারের হাকিম জিয়াউদ্দিন খাঁকে একবার সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।"

"জিয়াউদ্দিন খাঁর দেওয়া ঔষধতো শিবাজী গ্রহণ করবে না জাহাঁপনাহ্। আমাদের হাকিম শিবাজীর ঔষধে জহর মিশিয়ে দিতে পারে এরকম একটা ভয় তাদের মনে সৃষ্টি হতে পারে।"

"শিবা ঔষধ সেবন করে সেরে উঠুক, এটা আমার বাসনা নয়। শিবার রোগের বিস্তারিত বিবরণ আমি জিয়াউদ্দিন খাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই।"

জসবন্ত সিংহ বললো, "জাহাঁপনাহ্, কছওয়া দরবারের রাজবৈদ্য যখন শিবাজীর চিকিৎসা করছেন, তখন শাহী দরবার থেকে হাকিম পাঠালে কছওয়া দরবারের অসম্মান হবে। শিবাজীর রোগের বিবরণ আমরা কুমার রামসিংহের কাছ থেকেই জানতে পারবো।"

ফুলাদ খাঁকে কাছে ডেকে দেওয়ার হুকুম হোলো। উজীরের মারফতে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, "রোগের বিবরণ কিছু জানা গেছে?"

ফুলাদ খাঁ জানালো, বাইরের লক্ষণ বিশেষ কিছু নেই। তবে শিবাজীকে ঈষৎ রুগ্ন দেখাচ্ছে। শয্যা ত্যাগ করে তিনি উঠতে পারছেন না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা আর সর্বাঙ্গে জ্বালা, এ দুটো উপসর্গের কথাই শোনা যাচ্ছে। কছওয়া দরবারের রাজবৈদ্য ঠিক মতো রোগ নির্ণয় করতে পারছে না। শিবাজীও কোনো ঔষধ সেবন করতে চাইছেন না। ওঁর জন্যে পূজা মানত করা হচ্ছে, আর ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হচ্ছে। মেওয়া মিঠাইয়ের সওগাত পাঠানো হচ্ছে বিশিষ্ট উমরাহ্‌দের মহলেও।

"মেওয়া-মিঠাইয়ের সওগাত পাঠানো হচ্ছে?" আওরংজেব চোখ তুলে তাকালো, "কারা নিয়ে যায় সেসব?"

"অনেক বারবরদার নিযুক্ত করা হয়েছে।"

আওরংজেব চট করে সোজা হয়ে বসলো, "ওরা কোথাকার লোক?"

"আগ্রারই লোক। তবে বিশেষ বিশেষ জায়গায় শিবাজীর মারাঠী ভৃত্যেরাই সওগাত নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে যাচ্ছে নিরাজী রাওজী কিংবা দত্ত ত্রিম্বক অথবা কৃষ্ণাজী আপ্তে।"

"তাদের সবার উপর কড়া নজর রাখবে," তীক্ষ্ণকণ্ঠে হুকুম দিলো বাদশাহ আওরংজেব, "শিবা নিজে যেন বারবরদার সেজে বেরিয়ে না পড়ে। ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। চৌকির পাহারাদারদের

হুকুম দেবে কেউ না কেউ যেন কিছুক্ষণ পর পর সব সময় নিয়মিত ভাবে তাঁবুর ভিতর গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসে শিবাকে। আর সওগাতের ডালা সব সময় ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবে।"

"সমস্ত রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হবে জাহাঁপনাহ," ফুলাদ খাঁ উত্তর দিলো।

"রদ-অন্দাজ খাঁকে আমার সামনে হাজির করা হোক," হুকুম দিলো আওরংজেব।

রদ-অন্দাজ খাঁ সামনে এসে কুর্নিস করলো।

"জাফর খাঁ," উজীরের দিকে তাকিয়ে বাদশাহ বললো, "রদ-অন্দাজ খাঁকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে কিলা থেকে এক হাজার লশকর ফুলাদ খাঁর জিম্মায় দিয়ে দেওয়ার হুকুম হোলো। ফুলাদ খাঁ ওদের খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে মোতায়েন করবে।"

এক হাজার লশকর! জাফর খাঁ সবিস্ময়ে তাকালো বাদশাহ্‌র দিকে, জসবন্ত সিংহ তাকালো জাফর খাঁর দিকে, রদ-অন্দাজ খাঁ, ফুলাদ খাঁ এবং অন্যান্য সবাই অবলোকন করলো পরস্পরের মুখ।

গম্ভীরকণ্ঠে বাদশাহ্‌ বললো, "শিবা যে অসুস্থ, এতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হয়েছি। আমার হুকুমে খাঁ-ই-সামান ইফতিকর খাঁ শিবার ন্যায়াধীশ নিরাজী রাওজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিবার তবিয়ত সম্বন্ধে আমাদের উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করে আসুক। কিন্তু—" হঠাৎ আরো কঠিন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো আওরংজেবের কণ্ঠস্বর, "—কিন্তু আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনা। শিবার এই অসুস্থতার মধ্যে যদি কোনো ছলচাতুরি থাকে, তার জন্যে সতর্ক থাকা আমাদের কর্তব্য।"

কেটে গেল পাঁচ ছয়দিন। আগ্রার বাজারে সবার মুখে একই আলোচনা,—শিবাজী গুরুতর অসুস্থ। এতদিন পরেও রোগের

কোনো উপশম দেখা যাচ্ছে না। নানারকম জল্পনাকল্পনা শোনা গেল। কেউ বললো, ওয়াকিবহাল লোকেরা বলছে, এ অসুখ আর সারবে না, দু-চার পাঁচ দিনের মধ্যেই শোনা যাবে শিবাজীর মৃত্যু সংবাদ। কেউ বললো, শিবাজীকে জহর খাওয়ানো হয়েছে, এ অসুখ তারই প্রতিক্রিয়া। কারো মুখে শোনা গেল, শিবাজীর সত্যিসত্যি কোনো অসুখ করেনি। তাকে যাতে বর্ষার শেষে বাদশাহ্‌র সঙ্গে কাবুল যেতে না হয়, সেজন্যে অসুখের ভান করে পড়ে আছে শিবাজী। বাদশাহ শিবাজীর এই চাতুরি ধরে ফেলেছেন, দু-চার দিনের মধ্যেই শিবাজীকে জোর করে দরবারে নিয়ে আসা হবে, তার অবাধ্যতার জন্যে কঠিন দণ্ড দেবেন বাদশাহ।

শিবাজীর অসুখের খবর পৌঁছে গিয়েছিলো রংমহলেও। বিস্তারিত খবর পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো জিন্নত-উন-নিসা। কিন্তু খোজা ফিরোজার বাগ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ সংগ্রহ করার উপায় নেই। মহল চৌকির পাহারার খুব কড়াকড়ি, মহলের খোজাদের উপর খুফিয়ানবিসদের তীক্ষ্ণ নজর। তা সত্ত্বেও জেব-উন-নিসা আর জিন্নত-উন-নিসা খোজা মির হাসানকে খোজা ফিরোজার বাগে পাঠাবার চেষ্টা করলো দু-তিনবার। ব্যর্থ হোলো প্রত্যেক বারই। একবার খোজা মির হাসান ফুলাদ খাঁর হাতেই ধরা পড়ে নাস্তানাবুদ হোলো। তারপর রোশনআরা বেগম নিজে এসে সতর্ক করে দিলো দুই শাহজাদীকে। শিবাজীর খবর জানবার জন্যে শাহজাদীদের ব্যগ্রতা উমরাহ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যদি ওরা এই বেলা সাবধান না হয়ে যায়, তাহলে নানারকম অপ্রীতিকর ও মর্যাদা-হানিকর কথাবার্তা শোনা যাবে। ফৌজদার ফিদাই খাঁ রোশন-আরা বেগমের কাছে খবর পাঠিয়েছে, নিকোলো ম্যানুচি নামে এক জন ফিরিঙ্গী,—যে কয়েক বৎসর আগে দারা শিকোর গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিলো,—তার অন্তরঙ্গ উমরাহদের কাছে নাকি কোনো এক শাহজাদী সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছে। কাজি-উল-কুজাত তার

বিশেষ বন্ধু। তার কাছে এই ফিরিঙ্গী নাকি জানিয়েছে, মোগলদের সম্বন্ধে একটি কিতাব রচনা করার মতলব করেছে সে। কাজি-উল কুজাত বলেছে ফিদাই খাঁকে। ফিদাই খাঁর মনে হয়েছে, এরকম কোনো কিতাবে শাহজাদীর সম্বন্ধে কোনো কিংবদন্তি বা গুজবের উল্লেখ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, সুতরাং বেগম সাহিবাকে জানিয়েছে শাহজাদীদের সম্বন্ধে কোনোরকম আপত্তিকর গুজব সৃষ্টি করার সুযোগ যেন কেউ না পায়।

কিন্তু রোশনআরার নিজেরও প্রয়োজন ছিলো শিবাজীর তবিয়তের হাল সম্বন্ধে নিয়মিত খবর পাওয়ার। ফিদাই খাঁর মারফতে প্রত্যেকদিন খবর জানার ব্যবস্থা করা হোলো। দরবারে যে খবর আসতো, সে খবরই ফিদাই খাঁ রোশনআরার কাছে পাঠাতো খোজা ইয়ার লতিফের মারফতে। রোশনআরার কাছ থেকে খবর শুনতো জেব-উন-নিসা, জেব-উন-নিসার কাছ থেকে শুনতো জিন্নত-উন-নিসা। দরবারের খবর ভাসা-ভাসা, প্রায় প্রত্যেকদিন একই রকম পুনরাবৃত্তি,—আজ অমুক খাঁ আর অমুক সিংহ শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন; আজ শিবাজীর শিবির থেকে সওগাত পাঠানো হয়েছে রাজা অমুকের কাছে আর খাঁ-ই-খানান অমুকের কাছে, কছওয়াদের রাজবৈদ্য দিবা তিন ঘড়ির সময় একবার, আট ঘড়ির সময় একবার এসেছিলো শিবাজীর নাড়ি পরীক্ষা করতে; আজ কুমার রামসিংহ শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সন্ধ্যেবেলা, প্রায় দুদণ্ড সময় কাটিয়েছেন সেখানে।……

ক্রমশ দৈনন্দিন খবর একঘেয়ে হয়ে উঠলো শাহজাদীদের কাছে।

সেদিন ষোলোই আগস্ট, শুক্রবার। ছুটির দিন, দরবারে যেতে হবে না, সুতরাং সন্ধ্যার আগেই শিবাজীর তাঁবুতে হাজির হোলো মহারাজকুমার রামসিংহ।

সুবৃহৎ তাঁবুতে পাশাপাশি তিনটি প্রকোষ্ঠ। ডানদিকের কক্ষ হোলো আবদরখানা, সেখানে রাশি রাশি মেওয়ামিঠাই ভর্তি বেতের ঝুড়ি। মারাঠী আর বক্সারিয়া বারবরদারেরা অনবরত যাওয়া আসা করছে। শিবাজীর বিশ্বস্ত অনুচর ভৃত্যদেরও সমাগম সেখানেই। মাঝখানের প্রকোষ্ঠে সব সময় উপস্থিত থাকে শিবাজীর অন্তরঙ্গদের মধ্যে কেউ না কেউ,—হয় নিরাজী রাওজী, নয়তো বা দত্ত ত্রিম্বক, রঘু মিত্র কিংবা হীরাজী ফরজন্দ। কৃষ্ণাজী আপ্তের উপর বাইরের কাজের ভার। সে বারবরদারদের তদারক করে, শহরে যাওয়া আসা করে অনবরত। প্রায় সারাদিন খোঁজখবর নিতে আসে অনেক লোক। তাদের বসানো হয় মাঝখানের কক্ষেই। সবার সঙ্গে শিবাজী সাক্ষাৎ করে না। মাঝে মাঝে দুএকজনকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় শিবাজীর কাছে। শিবাজী কারো সঙ্গে কথা বলে না। সবাই দেখে শিবাজী অত্যন্ত রুগ্ন, অত্যন্ত দুর্বল। শয্যায় শায়িত আছে চক্ষু মুদিত করে।

বাম দিকের কক্ষে থাকে শিবাজী। শম্ভুজী বসে থাকে পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয় মাঝে মাঝে।

সে ঘরেই কুমার রামসিংহকে নিয়ে এলো ন্যায়াধীশ নিরাজী রাওজী। শিবাজীর শয্যার পাশে একটি ছোটো চারপাই ছিলো, তার উপর বসলো রামসিংহ। পান্না তখন একটু একটু করে ফলের রস খাওয়াচ্ছিলো শিবাজীকে। খাওয়ানো শেষ হবার পর হাত জোড় করে অবনত মস্তকে রামসিংহকে প্রণাম জানিয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলো। এতক্ষণ চুপ করে ছিলো রামসিংহ, পান্না ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মৃদুকণ্ঠে বললো, "আমার খুবই দুর্ভাগ্য যে আমাদের অতিথি হয়ে এসে এখানে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন নিজের আত্মীয় পরিজনবর্গের কাছ থেকে অনেক দূরে।"

"আপনি আমার জন্যে অনেক করছেন," ক্ষীণকণ্ঠে শিবাজী উত্তর দিলো, "আগের জন্মে আপনি আমার ভাই ছিলেন।"

রামসিংহ খুশী হোলো একথা শুনে। জিজ্ঞেস করলো, "আজ কি আপনি আগের চাইতে একটু সুস্থ বোধ করছেন ?"

শিবাজী আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। বললো, "সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা। উপশম হচ্ছে না কিছুতেই।"

রামসিংহ জানালো যে, বাদশাহ্ শিবাজীর জন্যে খুব উৎকণ্ঠিত। কালও দরবারে তাকে কাছে ডেকে শিবাজীর খোঁজখবর জানবার মেহেরবানি প্রকাশ করেছেন।

শিবাজী অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকালো রামসিংহের দিকে। তারপর ঈষৎ হেসে বললো, "আপনাদের বাদশাহ্ ?—জানেন, আমি অসুস্থ এখবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক হাজার লশকর মোতায়েন করেছে খোজা ফিরোজার বাগের চারপাশে। এটা বাদশাহ্‌র খবরদারি।"

রামসিংহ চুপ করে রইলো তুএক মুহূর্ত। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো, "খবরদারির ভার শুধু কোতোয়ালের হাতে থাকলেই আমি খুশী হতাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, সে ভার বাদশাহ্ আমাকেও দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ," ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হাসলো শিবাজী, "আমি চারদিকে যে সওগাত পাঠাচ্ছি, মেওয়ামিঠাই পাঠাচ্ছি সবার কাছে, সেই সব মেওয়ামিঠাইর ঝুড়ি ভালো করে তল্লাশ করার খবরদারি করার ভার আপনার। এটা কছওয়া খবরদারি।"

রামসিংহ ক্রুদ্ধ হোলো শিবাজীর ব্যঙ্গোক্তি শুনে, কিন্তু মুখের উপর সেভাব প্রকাশ করলো না অসুস্থ ব্যক্তির সামনে। শুধু বললো, "এসব কিছু নয়, এ শুধু সন্দেহপ্রবণ বাদশাহ্‌র অতিরিক্ত সতর্কতা। ওঁর ধারণা খবরদারি একটু শিথিল হলে আপনি পালিয়ে যাবেন।"

"হ্যাঁ, পালিয়ে তো যাবোই," মৃদুকণ্ঠে শিবাজী বলে উঠলো।

"আগে সুস্থ হয়ে উঠুন," একটু হেসে রামসিংহ বললো। এটুকু ব্যঙ্গ করার লোভ সামলাতে পারলো না।

শিবাজী চোখ বুঁজে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমার জন্যে আপনি বাদশাহ্‌কে যে মুচলকাহ্‌ সই করে দিয়েছেন সেটা ফেরত নিয়ে নিন। তা নইলে আমি পালিয়ে যাওয়ার পর আপনি মুশকিলে পড়বেন।"

রামসিংহ কোনো উত্তর দিলো না, শুধু একটু হাসলো। হয়তো বা ভাবলো, একথা শুধু অসুস্থ লোকের প্রলাপ।

শিবাজী বুঝলো রামসিংহের মনের ভাব। বললো, "আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু পালিয়ে যাবো। পরে আমাকে দোষ দেবেন না।"

রামসিংহ আবার হাসলো। জানালো, "হ্যাঁ, সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবেন। কেন পড়ে থাকবেন এখানে।"

শিবাজী বুঝলো, রামসিংহ শুধু অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রবোধ দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, "আমি পালিয়ে গেলে আপনি নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হবেন?"

রামসিংহ কি ভাবলো কে জানে। এবার অপেক্ষাকৃত গম্ভীর শোনালো তার কণ্ঠস্বর। বললো, "শিবাজী, আপনি যদি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র একজন বিশ্বস্ত মনসবদার হিসেবে আমার কর্তব্য আপনার প্রচেষ্টা সফল হতে না দেওয়া। কিন্তু আমার অগোচরে আপনি যদি সত্যিই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, তাহলে আমার চাইতে বেশী খুশী আর কেউ হবে না।"

শিবাজী চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলো, তারপর আবার চোখ বুঁজলো। বললো, "আমি খুব খুশী হলাম আপনার কথা শুনে। আমার মনের উপর থেকে একটা ভার নেমে গেল। কিন্তু কুমারজী, আমি কি করে পালাবো? খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে এক হাজার লশকর। খুদ ফুলাদ খাঁ তাদের নেতৃত্ব করছেন। আপনার কছওয়া রাজপুত পাহারাদারেরা ঝুড়ির আবরণ খুলে খুলে দেখছে,

এত সব মেওয়ামিঠাইয়ের একটি শিবাজী কিনা। এত সতর্কতা এত খবরদারি! সত্যি, মোগলদের খিদমতে হাসিল হয়ে কছওয়ারা অনেক নতুন নতুন কাজের বৈচিত্র্য উপভোগ করছে। রামসিংহ, কছওয়ারাই বোধ হয় একমাত্র রাজপুত, যাদের তলোয়ারে মাঝে মাঝে মরচে ধরে যায়।"

রামসিংহের মুখ লাল হয়ে গেল। উঠে পড়লো সংযতভঙ্গিতে, বললো, "শিবাজী, আপনি অসুস্থ। বেশীক্ষণ কথা বললে আপনি অবসন্ন হয়ে পড়বেন। আমাকে এবার বিদায় গ্রহণ করবার অনুমতি দিন।"

রামসিংহ বেরিয়ে যাওয়ার পর শিবাজী নিজের মনে একটু হাসলো।

বাইরে এসে কুমার রামসিংহ দেখলো দুজন কছওয়া পাহারাদার একজন বারবরদারের পথরোধ করেছে। সে কাঁধের ভারা নামিয়ে রেখেছে। কছওয়া দুজন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাশ করে দেখছে মেওয়ামিঠাইয়ের ঝুড়ি। হঠাৎ রামসিংহ তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠলো। শিবাজীর ব্যঙ্গ তখনো তাকে হুলের মতো বিঁধছে। সঙ্গে ছিলো তেজসিংহ। তাকে নিয়ে কুমার রামসিংহ পাহারাদারদের কাছে এসে দাঁড়ালো। বারবরদার ভারা উঠিয়ে চলে যাওয়ার পর, তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "শিবাজীকে পেলে মেওয়ামিঠাইয়ের ভিতরে?"

তেজসিংহ বিস্মিত হয়ে রামসিংহের দিকে তাকালো। কছওয়া পাহারাদার দুজনে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। রামসিংহ এগিয়ে চলে গেল নিজের ঘোড়ার দিকে, তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে গেল খোজা ফিরোজার বাগের অন্য প্রান্তে নিজের মহলে।

ইতিমধ্যে এগিয়ে এলো আরেকজন বারবরদার।

একজন পাহারাদার তাকে রুখতে যাচ্ছিলো। অন্যজন বললো "না ঠিক আছে। ওকে যেতে দাও।"

সে চলে যাওয়ার পর বললো, "কুঁবর-সা ঠিকই বলেছেন। আমরা কি খুফিয়ানবিস না শুল্কের পিয়াদা যে, লোকের মালপত্র তল্লাশ করবো সব সময়? বেশ দেখতে পাচ্ছি ওখানে শিবাজী অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন, আমাদের কুঁবর-সা নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন, আর আমরা বেওকুফের মতো এখানে মেওয়ামিঠাইয়ের ঝুড়ির আবরণ তুলে তুলে দেখছি। এতদিন ধরে অনেক দেখেছি। আর নয়।"

অন্যজন চারদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো, "কিন্তু শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুম, প্রত্যেকটি ঝুড়ি যেন তল্লাশ করে দেখা হয়।"

"বেশ, মাঝে মাঝে দুএকটা দেখা যাবে তল্লাশ করে। তবে যে ব্যক্তিকে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তাঁবুর ভিতর শুয়ে আছেন, তাঁকে সব সময় প্রত্যেকটি ঝুড়ির মধ্যে খুঁজবো, অতোখানি মূর্খতা আমাকে দিয়ে হবে না।"

দুদিন পরে রোববার, আঠারোই আগস্ট। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে শিবাজীর কক্ষে সম্মিলিত হোলো নিরাজী রাওজী, হীরাজী ফরজন্দ আর কৃষ্ণাজী আপ্তে। প্রবেশ পথের কাছে পাহারায় রইলো দত্ত ত্রিম্বক আর রঘু মিত্র, যাতে হঠাৎ কেউ এসে না পড়ে। নিরাজী রাওজী আর হীরাজী ফরজন্দ উপবেশন করলো শিবাজীর শয্যার পাশে চারপাইয়ের উপর, অন্য পাশে দাঁড়িয়ে রইলো কৃষ্ণাজী। শিবাজী শয্যার উপর শায়িত অবস্থাতেই কথা বলতে লাগলো। খুব মৃদু তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু দুর্বল অসুস্থ লোকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর নয়। কুমার রামসিংহ কিংবা আওরংজেব এই কণ্ঠস্বর শুনলে বিস্মিত হোতো।

শিবাজী বললো, "সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমার মনে হয়, এর চাইতে বেশী সুযোগ আর হবে না।"

নিরাজী রাওজী জানালো, "আজ দুদিন ধরে কছওয়া

পাহারাদারেরা ঝুড়িগুলো আর তল্লাশ করছে না। মাঝে মাঝে দু-একবার ঢাকনি তুলে একটু দেখে নিচ্ছে মাত্র। তবে যে কোনো দিন আবার কড়াকড়ি শুরু করতে পারে। কিছুই বলা যায় না।"

"আমি স্থির করেছি, আমাদের পরিকল্পনা এবার কাজে পরিণত করতে হবে।"

"আমরা প্রস্তুত," উত্তর দিলো হীরাজী ফরজন্দ।

"আপনি কি দিন স্থির করেছেন?" নিরাজী রাওজী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যার পর।"

ঠিক এরকম কণ্ঠস্বরেই শিবাজী চিরকাল কোনো দুর্গ আক্রমণের সময় ঘোষণা করেছে। সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনলো। কোনো মন্তব্য করলো না। বড়ো রকম যুদ্ধের আগে যেমন হয়, তেমন একটা দৃঢ়তা দেখা দিলো সবার মুখের চেহরায়।

"দত্ত ত্রিম্বক আর রঘু মিত্র কাল পূর্বাহ্নে বিভিন্ন সময়ে আলাদা ভাবে যে যার মতো চুপচাপ চলে যাবে আগ্রা শহর ছেড়ে," শিবাজী বলে গেল, "শহর থেকে তিন ক্রোশ দূরে সেই নির্দিষ্ট স্থানে জঙ্গলের মধ্যে ওরা অপেক্ষা করবে সন্ধ্যার পর।"

"ঘোড়া তৈরী থাকবে সেখানে," নিরাজী রাওজী বললো, "ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে আছে।"

"অপরাহ্নে চলে যাবে নিরাজী রাওজী। প্রথমে যাবে শহরের অভ্যন্তরে বাজারের দিকে, যাতে সড়কের মোগল পিয়াদাদের মনে কোনো সন্দেহ না হয়। যদি কোনো খুফিয়ানবিস গোপনে অনুসরণ করে, তাকে এড়ানো যাবে বাজারের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে। তারপর একসময় সুযোগ মতো শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দত্ত ত্রিম্বক, রঘুমিত্র আর অন্য সবার সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মিলিত হবে।"

শিবাজী এভাবে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি করলো, চূড়ান্ত নির্দেশ দিলো সবাইকে।

"কাল সন্ধ্যার পর, প্রথমে দুজন লোক এখান থেকে বেরোবে দুটো ভারা কাঁধে নিয়ে। ওদের ঝুড়িতে থাকবে মেওয়ামিঠাই। তারপর আরেকজন বারবরদার বেরোবে, সে আমাদেরই ভৃত্য বাসুদেব। তার একটি ঝুড়িতে থাকবে কৃষ্ণাজী। সে যদি নিরাপদে পাহারাদারদের অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমি আরো নিশ্চিন্ত হতে পারবো। তারপর তিনচারজন বারবরদার বেরোবে মেওয়ার ঝুরি নিয়ে। হয়তো তাদের দুএকজনকে পাহারাদারেরা তল্লাশ করে দেখতে পারে। তারপর—"

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল।

রঘুমিত্র তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে বললো, "মুনশী গিরধরলাল আসছেন। বোধহয় কুমারজী তাঁকে পাঠিয়েছেন আপনার কুশল জানবার জন্যে।"

অন্য সবাই নিঃশব্দে ছায়ার মতো সরে গেল সেখান থেকে। শুধু রইলো নিরাজী রাওজী।

মুনশী গিরধরলাল যখন শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভিতরে ঢুকলো, হীরাজী ফরজন্দ আর রঘুমিত্র মাঝখানের কক্ষে বসে সাধারণ কথাবার্তা বলতে লাগলো নিজেদের মধ্যে, খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে। মাঝে মাঝে এক একজন পাহারাদার এসে তাঁবুর ভিতর উঁকি মেরে যায়। তাদেরই একজন এসে শুনতে পেলো, রঘুমিত্র আগামী বুধবার দিন বাজারে কি কি সওদা করবে তারই ফিরিস্তি দিচ্ছে। সে চলে যাওয়ার পর হীরাজী ফরজন্দ রঘুমিত্রের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

কৃষ্ণাজী আপ্তে চলে গিয়েছিলো তাঁবুর পেছন দিকে। সেখানে কাজে ব্যস্ত ছিলো কৃষ্ণাজীর ব্যক্তিগত ভৃত্য বাসুদেব। তাকে

আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল কৃষ্ণাজী। বললো, "আমি চলে যাচ্ছি কালই। সুতরাং তোমায় যে কথাটা বলেছিলাম, সেই মতলব হাসিল করতে হবে কাল সন্ধ্যার পর।"

"আপনি যা বলবেন, তাই হবে," বাসুদেব বললো।

"কেউ যেন টের না পায়।"

"কেউ জানতে পারবে না কৃষ্ণাজী।"

"এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিন্তু শিবাজীর সঙ্গে আর যোগ দেওয়া যাবে না। উনি জানতে পারলে আমাদের ক্ষমা করবেন না।"

"আপনি কি স্থির করেছেন আমরা কোথায় যাবো?"

"আমরা অন্যপথ ধরবো। আমরা যাবো মালব হয়ে বুন্দেলখণ্ডে। উরছার বুন্দেলা রাজার দরবারে আমার চেনা লোক আছে। যে তলোয়ার ধরতে জানে আজকালকার দিনে তার কাজের অভাব হয় না।"

কৃষ্ণাজীর কথা শুনে বাসুদেব একটু হাসলো।

কৃষ্ণাজী একটি আশরফি গুঁজে দিলো তার হাতে।

সে চলে যাচ্ছিলো। কৃষ্ণাজী ডেকে বললো, "কাল আমার তলোয়ার তোমার সঙ্গে রাখতে হবে। ঝুড়ির ভিতর তো ধরবে না।"

বাসুদেব বললো, "বেরোনোর সময় তো তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পারবো না। যদি ওরা তল্লাশ করে তো মুশকিল হবে। যে পথ দিয়ে আমরা যাবো, কাল দিনের বেলা কোনো এক সময় গিয়ে সেপথের কোথাও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে আসবো আপনার তলোয়ার। তারপর সন্ধ্যার পর এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়ার সময়, আবার সেখান থেকে সেটি তুলে নিয়ে আমার চাদরের আড়ালে লুকিয়ে ফেলবো। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে আর কেউ খেয়াল করে দেখবে না। পরে আপনি যখন ঝুড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বেন, তখন দিয়ে দেবো আপনাকে।"

"হ্যাঁ, এ ব্যবস্থাই ভালো," বললো কৃষ্ণ

পরদিন উনিশে আগস্ট, সোমবার। পান্না প্রত্যেকদিনকার মতো মধ্যাহ্নে এলো শিবাজীর জন্যে ফলের রস নিয়ে।

রুগ্ন ব্যক্তি এত দুর্বল যে উঠে বসে পথ্য সেবন করতে পারে না। তাই পান্না সামনে ঝুঁকে পড়ে একটু একটু রস খাওয়াচ্ছিলো শিবাজীকে।

হঠাৎ একসময় শিবাজী বললো, "মা, আজ অপরাহ্নে আমার ভৃত্য গিয়ে তোমায় জানিয়ে আসবে যে আমি গুরুতর অসুস্থ, রাত্রে কিছু খাবো না। সুতরাং তুমি রাত্রে আর আসবে না, কিন্তু আমার জন্যে ব্যস্তও হবে না।"

শিবাজীর এরকম কণ্ঠস্বর শুনে পান্না হঠাৎ চমকে উঠলো। এ তো রুগ্ন লোকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর নয়।

"না, না, ওরকম মুখের ভাব কোরো না," শিবাজী বলে উঠলো, "যে রকম খাইয়ে যাচ্ছো খাইয়ে যাও কোনো দ্বিধা না করে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম,—তোমার কাছে যা যত্ন পেলাম, আমি সারাজীবন মনে রাখবো। মা, এই শেষবারের মতো তোমার হাতে খাচ্ছি।"

"কেন, আপনাকে কি ওরা এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে ?" পান্না একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"না।" শিবাজী হাসলো। আমি নিজেই সরে যাচ্ছি এখান থেকে।"

পান্না বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকালো শিবাজীর দিকে।

শিবাজী মৃদুকণ্ঠে বললো, "আমি আজ পালিয়ে যাচ্ছি। কথাটা খুব গোপনীয়, আমার অন্তরঙ্গ সহচরেরা ছাড়া আর কেউ জানে না। আর শুধু তুমি জানলে। আমি তোমার ছেলে, তাই তোমায় বললাম।"

পান্নার মুখে একটা আনন্দের আভাস দেখা দিলো। বললো,

"তাহলে আপনার সত্যি সত্যি অসুখ করেনি? আমার কিন্তু এই ক'দিন খুব ভাবনা হয়েছিলো।"

"আমার একমাত্র অসুখ, এই বন্ধনদশা। আজ আমার রোগ-মুক্তি হবে।"

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলো শিবাজী। তাকিয়ে দেখলো পান্নার দিকে। ঈষৎ হেসে বললো, "তোমার ছেলে তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাই খুব কষ্ট হচ্ছে—না?"

"না, না, আমার সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে," পান্না বলে উঠলো, "আপনি নির্বিঘ্নে নিরাপদে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে পারলে আমরা সবাই খুব খুশী হবো।"

শিবাজী নিজের গলা থেকে খুলে নিলো একটি বহুমূল্য মুক্তোর মালা। সেটি পান্নার হাতে দিয়ে বললো, "মা, এটি রেখে দাও তোমার কাছে। এটি দেখলে আমায় মাঝে মাঝে মনে পড়বে।"

পান্নার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। শিবাজী তাড়াতাড়ি বললো, "না, মা, এখন কোনোরকম বিচলিত ভাব দেখাবে না। কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু যেন কারো চোখে না পড়ে। অনেক সতর্ক চোখ আমাদের সবাইকে সব সময় লক্ষ্য করছে। কারো মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

রস খাওয়ানো হয়ে গেল। শিবাজী বললো, "আমাদের আর দেখা হবে না। কিন্তু তোমায় বেশীক্ষণ বসতে বলতে পারছি না। তোমার যাওয়ার সময় হয়েছে। অন্যান্য দিনের মতোই এবার তোমায় উঠে পড়তে হবে।"

পান্না বেরিয়ে যাওয়ার পথে একবার ফিরে তাকালো। শিবাজী তার দিকে তাকিয়েছিলো একটা গভীর স্নেহের দৃষ্টিতে।

পান্নার সারাজীবন মনে ছিলো সেই চাউনি।

সেদিন অপরাহ্ণে আবিদ হুসেন খাঁ ছিলো মোতিবিবির ওখানে

এ সময় সে সাধারণত থাকে খিলওয়াতগাহ্‌তে। কিন্তু সেদিন তার খিলওয়াতগাহ্‌তে হাজির থাকার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। বললো, "পেশাওয়ারের ওদিক থেকে নানারকম খারাপ খবর আসছে। ইউসুফজাইরা নাকি বিদ্রোহ করার আয়োজন করছে। তাই শাহ্‌-ইন-শাহ উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁ, আকিল খাঁ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ আর রদ অন্দাজ খাঁর সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। এসব যুদ্ধটুদ্ধ আমার কাজ নয় বাবা, তাই আর ওখানে গেলাম না। আকিল খাঁ বললো,—খিলওয়াতগাহ্‌তে আমার না থাকলেও চলবে। তোমার কথা মনে পড়লো। তাই এখানে চলে এলাম। মনে মনে একটি শের বানিয়ে ফেললাম। তাই শোনাতে ইচ্ছে করছে।"

"কি শের ?" মোতিজান হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো।

আবিদ হুসেন হাত নেড়ে আবৃত্তি করলো সুললিত ফারসীতে, "বুলবুলি এসে গোলাপকে জিজ্ঞেস করলো, কখন আসবে নও-বহার। শরম-রাঙা মুখে গোলাপ হেসে বললো,—তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো শুরু হোলো।"

"ওয়াহ্‌," তারিফ করলো মোতিজান। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কিসের ফরমায়েস করার মেহেরবানি হবে, শরবৎ না শরাব।"

"সাকীর হাতে কেউ শরবৎ খায় না বিবিজান।"

মোতিজান হেসে উঠলো।

আবিদ হুসেন শরাবের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো, "আরেকটা খবর দিতে এলাম। খবর ঠিক বলা যায় না, এই ধরো একটা প্রত্যাশা।"

"সেটাই আমার কাছে খবর," আবিদ হুসেনের কাঁধে হাত রেখে মোতিজান বললো, "বলো শুনি।"

"দুতিন মাসের মধ্যেই শাহ-ইন-শাহ্‌ ফৌজ নিয়ে রওনা হবেন আগ্রা থেকে। সম্ভবত লড়াই হবে ইউসুফজাইদের সঙ্গে। ওঁর ইচ্ছে ফৌজের সঙ্গে ফুলাদ খাঁকেও নিয়ে যাওয়া।"

"ফুলাদ মিঞা যাবে আগ্রা ছেড়ে?"

"ওর মনসব বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কেন যাবে না?"

"তাহলে তো ভালোই হয়। তুমি এখানে থাকবে তো?"

"বিবিজান, তোমাকে ছেড়ে আমি বেহেশত্‌এও যেতে রাজী নই। আর একটা কথা কি জানো,—যেখানে ফুলাদ খাঁ নেই, শুধু তুমি আছো, সে জায়গা যদি বেহেশত্‌ না হয় তো বেহেশত কাকে বলে আমি জানিনা, জানতে চাইও না।"

"আগ্রা থেকে ফুলাদ মিঞা বিদায় হচ্ছে তাহলে," মোতিজান হেসে বললো, "এতো বেশ ভালো খবর।"

"আরো একটা ভালো খবর আছে।"

"কি?"

"হয়তো—কিছু ঠিক নেই, তবে হয়তো—আমাকেই নিয়োগ করা হবে আগ্রার কোতোয়াল।"

"তাই নাকি?" খুশিতে ভরে উঠলো মোতিজানের গোলাপ ফুলের মতো ঢলঢলে মুখখানি।

"শাহ-ইন-শাহ্‌ আকিল খাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আবিদ হুসেনকে যদি কোতোয়াল নিয়োগ করা যায়, কোনো তরফ থেকে আপত্তি উঠবে কিনা। আকিল খাঁ উত্তর দিলো, শাহ-ইন-শাহ মালিক, তাঁর নিয়োগের উপর কোনো কথা বলবে এমন হিম্মত কার? তবে হয়তো সওদাগর বানিয়ারা খুশী হবেনা।—ব্যস, এই পর্যন্ত কথা হয়ে আছে। আকিল খাঁই আজ বললো আমায়। কিন্তু মোতিজান, একটা ভাবনা হচ্ছে। উজীর জাফর খাঁ একথা শুনতে পেলে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে ঘুস চাইবে, তা নইলে আমার নামে নানা কথা বলে শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে অন্য লোকের নাম সুপারিশ করবে। আহা, এমন মেহেরবান বাদশাহ, কিন্তু চারদিকে কী ভয়ানক ঘুসের রাজত্ব।"

মোতিজানের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। আস্তে আস্তে

বললো, "একটা কথা বলবো আবিদ হুসেন? তোমার কোতোয়াল হয়ে দরকার নেই, আমরা এমনিতেই বেশ আছি।"

আবিদ হুসেন তাকালো মোতিজানের দিকে। বললো, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। কোতোয়াল হয়ে আমার দরকার নেই। তারপর একদিন ফৌজদার হতে ইচ্ছে হবে, তারপর সুবাদার, তারপর উজীর তারপর—"

"থাক, আর বোলো না," মোতিজান আবিদ হুসেনের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো।

"কেন?"

"বাদশাহ্‌র কানে গেলে বাদশাহ্‌——," কথা শেষ না করে মোতিজান গলার উপর ছুরি চালানোর ভঙ্গি করলো।

"ঠিকই বলেছো, যতো উপর দিকে এগোবো, ততোই শত্রু বাড়বে। তারপর একদিন খুদ বাদশাহ্‌ই শত্রু না হয়ে দাঁড়ায়।"

"আমরা এমনিতেই বেশ সুখে আছি।"

"সত্যি আমরা খুব সুখে আছি," একমত হোলো আবিদ হুসেন।

আলোচনা ক্রমশ মধুরতর হোলো, শব্দবিরল সংক্ষেপতর হোলো। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়লো আবিদ হুসেন। বেলা পড়ে গেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে চারদিকে।

"আমায় এবার যেতে হবে," বললো আবিদ হুসেন, "আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে ঘোড়ায় চেপে কিছুক্ষণ টহল দিতে হবে সন্ধ্যার পর। বাদশাহ্‌ সলামতের তাই হুকুম আমার উপর। জানো, ফুলাদ খাঁ এক হাজার লশকর ও বন্দুকচি মোতায়েন করেছে খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে। তোপ বসিয়েছে শিবাজীর শিবিরের বাইরে সড়কের ঠিক মুখে।"

"তোপ বসিয়েছে কেন?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো মোতিজান।

"শিবাজী যখন ঘোড়ায় চেপে পালাবেন, তখন ফুলাদ খাঁ তোপ দাগবে," উত্তর দিলো আবিদ হুসেন, "সত্যি, ফুলাদ খাঁর মতো এত বড়ো বেওকুফ আমি আর দেখিনি।"

আবিদ হুসেন যখন চলে আসছিলো, মোতিজান হঠাৎ ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। ছোটো বাচ্চার মতো অনুনয় করে বললো, "আজ তুমি যেয়ো না।"

"কেন মোতিজান?"

"এমনি বলছি। আজ তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না।"

আবিদ হুসেন খাঁ হেসে বললো, "আমারও কি যেতে ইচ্ছে করছে নাকি? কিন্তু কি করবো? শাহ-ইন-শাহ্‌র হুকুম, আমার না গিয়ে উপায় নেই। তবে বেশীক্ষণ থাকবো না। কিছুক্ষণ টহল দিয়ে আবার এখানেই ফিরে আসবো।"

"আসবে তো?"

"হ্যাঁ আসবো।"

"আমি কিন্তু বসে থাকবো তোমার জন্যে।"

"নিশ্চয়ই আসবো মোতিজান।"

আবিদ হুসেন ঘোড়া হাঁকিয়ে খোজা ফিরোজার বাগের কাছাকাছি যখন এলো তখন চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। দীর্ঘ সড়কের জায়গায় জায়গায় চল্লিশ পঞ্চাশজন করে লশকর মোতায়েন করা হয়েছে। দুচারজন পথিক যারা সড়ক ধরে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, তাদের লক্ষ্য করছে লশকরেরা কিন্তু কিছু বলছেনা।

একদল লশকরকে পেরিয়ে আবিদ হুসেন আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। বাম দিক থেকে একটা সরু গলি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চওড়া সড়কের কাছে এসে পড়েছে। ওদিক থেকে ঘোড়ার খুরের

আওয়াজ পেয়ে আবিদ হুসেন নিজের ঘোড়ার রাশ টেনে থামালো। ঘোড়া কাছে আসতে জানতে চাইলো সওয়ারের পরিচয়।

"কে ? আবিদ হুসেন খাঁ ?" বলে উঠলো ঘোড়সওয়ার।

"শক্তিসিংহ ?" উল্লাস ভরে বললো আবিদ হুসেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হোলো। একা একা টহল দিতে ভালো লাগছিলো না। এখন তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে টহল দেওয়া যাবে।"

"ভাই আবিদ হুসেন, তোমার সঙ্গে টহল দেওয়ার ফুরসত তো আমার নেই।"

"কেন ?—ও হ্যাঁ। হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমার খেয়াল ছিলো না। তুনিয়ার সব কাজ থেকে ছুটি আছে, মাশুকার কাছ থেকে ছুটি নেই। তার কাছে যেতেই হবে প্রত্যেকদিন। ভাই, আমার মাশুকার সামনে একথা বলতে পারবো না, ও শুনলে রাগ করবে। ওকে প্যার করি, তাই ওর রাগকে ভয়ও পাই। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে একথা খোলাখুলি বলা যায়, কি বলো ? পান্না বাঈকেও একথা বলতে তোমার সাহস হবেনা, কিন্তু প্যারের পুকার কি এতোই সাংঘাতিক যে, ফুলাদ খাঁর তু-তুটো তোপ আর এক হাজার লশকরের তোয়াক্কা না করে তোমাকে দেওয়াল টপকে যেতেই হবে খোজা ফিরোজার বাগের ভিতর ?"

শক্তিসিংহ হাসলো আবিদ হুসেনের কথা শুনে। তারপর বললো "বেশীক্ষণ পান্নার কাছে থাকবো না। তুমি কি ধারে কাছেই থাকবে ?"

"যদি বলো তো এখানেই অপেক্ষা করি তোমার জন্যে।"

"বেশ, একটু অপেক্ষা করো। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। তুমি ধারে কাছে থাকলে অবশ্যি আমার ভাবনাও কম থাকে।"

আবিদ হুসেন ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ে একটি গাছের

গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। তার ঘোড়া ঘাস খেতে লাগলো নিজের মনে।

শক্তিসিংহের ঘোড়া মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার আবছায়ায়।

শক্তিসিংহ প্রত্যেকদিনই আসে, আজও আসবে—একথা পান্না জানতো। তবু অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশী অধৈর্য হয়ে উঠছিলো সে। গাছের ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বার বার তাকাচ্ছিলো দূরে দেওয়ালের ওদিকে। পথের ওদিক থেকে মাঝে মাঝে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলেই উন্মুখ হয়ে উঠছিলো, আবার হতাশ হয়ে পড়ছিলো সে আওয়াজ অন্য দিকে চলে যাওয়ার পর।

হয়তো বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তাকে, তবু মনে হচ্ছিলো প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন কাটতে চাইছে না কিছুতেই।

তারপর এক সময় দেখতে পেলো একটা পরিচিত আকৃতি সন্ধ্যার আবছায়ায় প্রাচীর অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। কাছে আসতেই চাপা গলায় ডাকলো, "শক্তিসিংহ!"

"পান্না!"

"হ্যাঁ, এদিকে এসো, আমি এখানে।"

শক্তিসিংহ কাছে এসে বললো, "শুনতে পেলাম, আজ অপরাহ্ণ থেকেই শিবাজী নাকি বড়ো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?"

"হ্যাঁ, তাইতো শুনলাম," টেনে টেনে নিস্পৃহ উত্তর দিলো পান্না, তারপর বললো, "শক্তিসিংহ, তোমার যোধপুর যাওয়ার কি কিছু স্থির হয়েছে?"

"শিবাজী যদ্দিন অসুস্থ থাকবেন, তদ্দিন কিছুই স্থির হবে না," শক্তিসিংহ উত্তর দিলো।

"শিবাজী অবিলম্বে সুস্থ হয়ে উঠবেন," পান্না বললো, "তারপর তোমার সঙ্গী হতে আমারও কোনো বাধা নেই।"

"পান্না!" খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো শক্তিসিংহের কণ্ঠস্বর, "পান্না, আমি একথা ভাবতে পারিনি। আমার ধারণা ছিলো আরো অনেক দেরি হবে।"

"আমাদের এবার তৈরী হতে হবে শক্তিসিংহ।"

"আমি সব ব্যবস্থা করে নেবো পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই," বললো শক্তিসিংহ, তারপর কি একটা কথা মনে হতে চট করে গলার সুর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "শিবাজী সুস্থ হয়ে উঠবেন?—শিগগরই?—আমাদের মহারাজা শুনলে খুশী হবেন। শিবাজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উনি খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। ওঁকে জানাতে কোনো বাধা আছে?"

"এখন কিছু না জানানোই ভালো," পান্না গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "শিবাজী যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন তোমাদের মহারাজা নিজের থেকেই জানতে পারবেন। আজও উনি গুরুতর অসুস্থ। সুতরাং, উনি কবে সুস্থ হয়ে উঠবেন সে আলোচনা আপাতত স্থগিত থাকতে পারে।"

"বেশ, তুমি যা বলবে, তাই হবে।"

"শোনো, এই কয়েকদিন তুমি আর এখানে এসো না। এই ধরো, চার পাঁচ দিন।"

"কেন পান্না?"

"আজ বলতে পারবো না। পরে জানাবো কোনো এক সময়। এখানে দু চারদিন নানারকম ঝঞ্ঝাট হতে পারে। তোমার একটু দূরে দূরে থাকাই ভালো।"

শক্তিসিংহ একটু ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আবার কবে আমাদের দেখা হবে?"

"আজ থেকে পাঁচদিন পরে, শনিবার সন্ধ্যায়।"

"এখানেই?"

"হ্যাঁ, এখানেই।"

"বেশ। আমি আশা করছি আমি সেদিন তোমায় জানাতে পারবো কবে আমরা আগ্রা থেকে রওনা হবো।"

পান্না উত্তর দিলো, "আমি কিভাবে এখান থেকে গোপনে বেরিয়ে যাবো, সেকথাও স্থির করবো সেদিনই।"

শক্তিসিংহ বললো, "পান্না, এই পাঁচদিন আমার কাটতে চাইবে না কিছুতেই।"

পান্না হাত রাখলো শক্তিসিংহের কাঁধে। তারপর বললো, "আমারও তাই। কিন্তু উপায় নেই, এই কদিন তোমার এখানে আসা নিরাপদ নাও হতে পারে। আজ তোমায় সব কথা খুলে বলার উপায় নেই, কিন্তু তুমি সবই জানতে পারবে।"

"তোমার কথাগুলো হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে, পান্না।"

"এ দু একদিন হেঁয়ালিই থাক। কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, কিছু জানবার চেষ্টা কোরো না। আজও তোমার এখানে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। ইদানীং পাহারার কি রকম কড়াকড়ি হয়েছে দেখছো? আমায় এবার বাড়ি ফিরতে হবে। গিরধরলালজী আজ বাড়িতেই আছেন। আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না।"

শক্তিসিংহ বিদায় নিয়ে চলে গেল। পান্না তাকিয়ে রইলো তার যাওয়ার পথের দিকে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলো দেওয়ালের ওধারে অদৃশ্য হোলো শক্তিসিংহের দীর্ঘ ছায়া। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হোলো। সে আওয়াজ মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

পান্না ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে এদিকে ফিরলো। ফিরে দাঁড়িয়েই চমকে উঠলো।

একজন খর্বকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। পান্না চিনতে পারলো। সে আর কেউ নয়, কৃষ্ণাজী আপ্তে।

"আপনি! আপনি এখানে কেন?" চকিত কণ্ঠে পান্না জিজ্ঞেস করলো।

কৃষ্ণাজী কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলো। পান্না তার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু কৃষ্ণাজী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললো। পান্না চিৎকারও করতে পারলো না। আরেকজনের একখানি কর্কশ হাত পেছন থেকে চেপে ধরলো তার মুখ।

"হাত পা মুখ ভালো করে বাঁধো বাসুদেব," বললো কৃষ্ণাজী, "তাড়াতাড়ি। হাতে বেশী সময় নেই।

আবিদ হুসেন যেখানে অপেক্ষা করার কথা, শক্তিসিংহ সেখানে এসে তাকে দেখতে পেলো না। মন্থরগতিতে অশ্বচালনা করে চারপাশে একটু খোঁজাখুঁজি করলো, কিন্তু ধারে কাছে কোথাও আবিদ হুসেনের কোনো চিহ্ন নেই। খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে চওড়া সড়কের উপর জায়গায় জায়গায় মোতায়েন হয়ে আছে এক একদল লশকর। এদিকে সেদিকে ঘোড়ায় চেপে টহল দিচ্ছে দু চারজন টহলদার। তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওরা পর্যবেক্ষণ করলো। একবার একদল তার নাম জিজ্ঞেস করলো। মহারাজা জসবন্ত সিংহের ফৌজের লোক শুনে আর কিছু বললো না। শক্তি-সিংহের মনে হোলো এদিকে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়। সে প্রধান সড়ক ছেড়ে আরেকটি সড়ক ধরে এগিয়ে চললো নিজের মনে। ভাবলো, আবিদ হুসেন হয়তো চলে গেছে, তার জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে চায়নি।

এদিকটা একেবারে নির্জন। পথের একদিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল। অন্যদিকে ফাঁকা মাঠ, দূরে দূরে বিস্তৃত উদ্যানের মাঝখানে এক একটা মঞ্জিল। শহরতলির এই নিরিবিলি অঞ্চলে থাকে শুধু অভিজাত উমরাহেরা। পথ চলে গেছে পশ্চিম দিকে। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে শহরের প্রাচীর। কিন্তু এদিকে কোনো দরওয়াজা নেই, শহরের ঢুকবার প্রবেশ পথ অন্যদিকে। তাই এদিকে লোকজনের যাওয়া আসা অনেক কম, সন্ধ্যার পরে একেবারেই দেখা যায়না কাউকে।

চারদিক খোলামেলা। হু হু করে বইছে আগস্ট মাসের পূব-হাওয়া। শক্তিসিংহের মন খুব হাল্কা মনে হোলো। পান্না তার সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েছে। আর মাত্র পাঁচ সাতদিন অপেক্ষা করতে হবে তাকে। আকাশের মাঝখানে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সপ্তমীর আধখানা ম্লান চাঁদ। চারদিকের আবছা অন্ধকার, আকাশের ঝিলমিল তারা, ঝিল্লির একটানা সুর, সবই শক্তিসিংহের খুব ভালো লাগলো। সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো খুব দ্রুতবেগে।

কিন্তু খানিকটা যেতে না যেতেই পেছন থেকে হাওয়ায় ভেসে এলো দূরাগত ডাক।

কে যেন তাকে ডাকছে। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিষ্কার শুনতে পেলো শক্তিসিংহ। ঘোড়ার রাশ টেনে ফিরে দাঁড়ালো। অশ্বের পদধ্বনি ছুটে আসছে এদিকে।

দেখতে দেখতে সে কাছে এসে গেল। শক্তিসিংহের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে থামালো, বললো, "কী জোরে ছুটিয়েছিলে তোমার ঘোড়া। আমি প্রাণপণে তোমায় ধরবার চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণ। ছুটতে ছুটতে হাঁফিয়ে গেছি।"

"তুমি ছিলে কোথায়?" শক্তিসিংহ জিজ্ঞেস করলো, "আমি তোমায় কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে যখন আর পেলাম না কিছুতেই, তখন এদিকে তফরি করতে এলাম"

আবিদ হুসেন কপালের ঘাম পুঁছে বললো, "আমাদের ফৌজের লোকেরা অত্যন্ত বেওকুফ।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"আর বোলো না। তুমি তো বাগিচার ভিতর ঢুকলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মশার কামড় খেলাম। তারপর ভাবলাম, তোমার তো আসতে দেরী হবে, ততক্ষণ এদিক ওদিক একটু টহল দিই। মারাঠাদের তাম্বুর ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম কাঁধে

ভারা নিয়ে মেওয়া-মিঠাইর ঝুড়ি ঝুলিয়ে একজন লোক বেরিয়ে আসছে। দেখে মনে পড়লো যে, খিদে পেয়ে গেছে। যাই হোক, ওখান থেকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখি, কী কাণ্ড! দেওয়ালের ওধারে যেদিকটায় মুনশী গিরধরলালের বাড়ি, সেদিকে চোখ পড়লো। হঠাৎ দেখি মুনশী গিরধরলাল ঘরে ঢুকছে দুজন লোকের সঙ্গে। আমি ভাবলাম, ওরা আবার কে। ঠাহর করে তাকিয়েও ঠিক চিনতে পারলাম না। গিরধরলালকে চিনলাম তার মোটাসোটা আকৃতি দেখে। ঘরের ভিতর থেকে চিরাগের আলো এসে পড়েছিলো ওদের উপর। আমি একবার ভাবলাম তোমায় গিয়ে জানিয়ে আসবো কিনা যে, মুনশীজী বাড়িতেই আছে। তারপর মনে হোলো, বাড়িতে ঢুকছে, বাড়ির বাইরে তো আসছে না। সঙ্গে দুজন লোক আছে। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই কিছুক্ষণ সময় কেটে যাবে। ততক্ষণে তুমিও চলে আসবে। তাই তাড়াহুড়ো করলাম না। ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে একটু দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, সেই দুজন লোক ঘরের ভিতর মুনশীজীকে চেপে ধরলো, একজন তার দুটো হাত, অন্যজন তার মুখ। প্রথমজন ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলো। আমি ভাবলাম, দেওয়াল টপকে ভিতরে ছুটে যাবো কিনা। কিন্তু উপায় নেই, দরবারের কড়া হুকুম, কছওয়া মহারাজকুমারের অনুমতি ছাড়া কোনো মোগল খোজা ফিরোজার বাগে ঢুকবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম কি করি। স্থির করলাম, কাছে যেখানে মোতায়েন হয়ে আছে একদল লশকর, তাদের গিয়ে বলি।”

শক্তিসিংহ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো আবিদ হুসেনের কথা শুনে। ব্যগ্রকণ্ঠে বললো, “তারপর?”

“ওদের গিয়ে বললাম। ওরা জানালো, ও জায়গা ছেড়ে ওদের নড়বার হুকুম নেই। আরেকটু এগিয়ে এসে আরেকদলকে বললাম। ওরাও একই কথা জানালো। তারপর একদল টহলদার পিয়াদার

সঙ্গে দেখা হোলো। ওদের বললাম। ওদের মির-দহ্ জানালো, তাদের উপর হুকুম শুধু শিবাজীর তাম্বুর উপর নজর রাখা। অন্যদিকে কে কোথায় কোন কছওয়ার বাড়ির ভিতর ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে কাকে কি করছে, সে সব নিয়ে মাথা ঘামানোর কাজ তাদের নয়। কোনো রাহাজানি যদি হয়, সে নিশ্চয়ই কাল কোতোয়ালিতে নালিশ জানাবে। তখন কোতোয়ালির লোক এসে যা করবার করবে। ওরা তো চলে গেল। আমি আরেক জায়গায় গিয়ে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর খোঁজ করলাম। শুনলাম সে চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। দরবারে শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে সারাদিনের বিবরণ শোনাতে গেছে। ফিরে আসবে রাত প্রথম প্রহরের পর। আমি দেখলাম পঁচিশ-পঁচিশজন লোকের চল্লিশটি দল খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে মোতায়েন হয়ে আছে, এমনি করে প্রত্যেকের কাছে যেতে হলে আমার দু-তিন ঘড়ি সময় নষ্ট হবে, কোনো কাজও হবে না। একই কথা শুনতে হবে প্রত্যেকের কাছে। তখন স্থির করলাম, তোমাকে এসে জানাই, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে কি করা উচিত।"

শক্তিসিংহ খুব গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করছিলো।

আবিদ হুসেন বললো, "অন্য কেউ হলে আমি অতো ভাবনা করতাম না। কিন্তু গিরধরলালজীর পালিতা কন্যা তোমার মাশুকা, দুজনে একলা থাকে, বাড়িতে শুধু একজন ভৃত্য, আর কেউ নেই। সুতরাং আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত, বিষয়টা গুরুতর কিনা।"

শক্তিসিংহ বললো, "গুরুতর নিশ্চয়ই। গিরধরলালজীর উপর কেউ হামলা করবে কি উদ্দেশ্যে? পান্না আছে সেখানে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর সে ঘরে ফিরে যাবে। তার উপরও হামলা না হয়। না, আবিদ হুসেন, বিষয়টা অবহেলা করবার মতো নয়।"

"আমরা কি করতে পারি?"

“আমি গিয়ে দেখে আসছি।”

“তুমি আবার যাবে?”

“যেতে তো হবেই। পান্নার জন্যেই যেতে হবে আমাকে—।”

“চলো আমিও যাচ্ছি,” আবিদ হুসেন বললো।

দুজনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হোলো খোজা ফিরোজার বাগের দিকে। শক্তিসিংহ অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলো। আবিদ হুসেনকে বললো, “আমাদের দুজন একসঙ্গে এভাবে গেলে হয়তো লশকরদের সন্দেহ হতে পারে। আমি ওদের নজরে পড়তে চাই না। এক কাজ করো। তুমি এপথ ধরে ধীরেসুস্থে এসো। প্রথমে যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, সেখানেই অপেক্ষা কোরো আমার জন্যে। আমি এদিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছি। তাহলে তাড়াতাড়ি পৌঁছাবো।”

শক্তিসিংহ ঘোড়া নিয়ে পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। আবিদ হুসেন ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে চললো আস্তে আস্তে।

খানিকটা পথ চলে আসবার পর দেখতে পেলো একজন লোক একটি ভারা কাঁধে নিয়ে এদিকে আসছে। ভারার দুদিকে দুটো বড়ো বড়ো বেতের ঝুড়ি। বারবরদার যেভাবে দুলতে দুলতে হেঁটে আসছে, আবিদ হুসেনের মনে হোলো নিশ্চয়ই ঝুড়ি দুটো খুব ভারী, প্রচুর মেওয়া মিঠাই আছে ঝুড়ি দুটোর মধ্যে। তার খিধে পেয়েছিলো খুব, খাবারের কথা মনে হতে জিভে জল এলো। নিজের মনে বললো,—দুনিয়ার নিয়মই এই, যার পেটে খুব খিধে তার সামনে দিয়ে চলে যায় মেওয়া মিঠাইয়ের ঝুড়ি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্যে, যে ব্যক্তি নিশ্চয়ই হোমরাচোমরা এক উমরাহ, যার এত খাবারের প্রয়োজন নেই।

লোকটাকে পেরিয়ে আবিদ হুসেন এগিয়ে চলে গেল। তারপর ভাবলো, এত খাবার নিয়ে যাচ্ছে লোকটা, দুটো লাড্ডু চাইলে দেবে

না? না হয় কিছু পয়সা চাইবে। ওকে বলে দেখা যাক, যদি কয়েকটা লাড্ডু মিঠাই পাওয়া যায়।

সে আবার ঘোড়ার মুখ ফেরালো।

শক্তিসিংহ ফিরে এলো খোজা ফিরোজার বাগের কাছে। যেদিকটায় সে পান্নার সঙ্গে দেখা করে সে জায়গা শিবাজীর শিবির থেকে বেশ একটু দূরে। ওদিকে কোনো পাহারা মোতায়েন থাকে না। সে একটি গাছের নিচে ঘোড়া রেখে প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলো। যেখানে তার জন্যে পান্না অপেক্ষা করতো সেখানে কেউ নেই। এদিকটা একেবারে নির্জন, নিরিবিলি।

শক্তিসিংহ গাছের ছায়ায় ছায়ায় সন্তর্পণে এগিয়ে গেল মুনশী গিরধরলালের গৃহের দিকে। কারো কোনো সাড়াশব্দ পেলো না। আরো কাছে এগিয়ে গেল। বাড়ির ভিতরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। আস্তে আস্তে ঘুরে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। চারদিক নিসাড় নিস্তব্ধ। অনেক দূরে কছওয়া ফৌজের শিবির থেকে ঢাক ঢোল গান হৈ-হল্লার আওয়াজ ভেসে আসছে। অন্যদিকে অনেক দূরে কছওয়া মহারাজার মঞ্জিল, সেখানে বিভিন্ন ঝরোকায় দেখা যাচ্ছে ঝাড়ফানুসের আলো।

কিন্তু গিরধরলাল মুনশীর ছোটো একতলা বাড়ি একেবারে অন্ধকার। কোনো ঘরে প্রদীপ জ্বলছে না।

শক্তিসিংহ সন্তর্পণে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। আবছা চাঁদের আলো এসে পড়লো ঘরের ভিতর। শক্তিসিংহ মৃদুকণ্ঠে ডাকলো মুনশী গিরধরলালকে। কোনো উত্তর পেলো না। তারপর ডাকলো পান্নার নাম ধরে। এবারও কোনো সাড়া এলো না।

শক্তিসিংহ সামনের ঘর পার হয়ে ভিতরে গেল। দুপাশে দুতিনটি ছোটো ছোটো কুঠরি। কোথাও কারো সাড়া নেই। একটি ঘরে চাঁদের আলোয় দেখতে পেলো এক কোণে পড়ে আছে দুটো বড়ো

ঝুড়ি। এরকম ঝুড়ি সম্প্রতি খুব দেখা যাচ্ছে চারদিকে। সবাই জানে এসব ঝুড়ি ভরে মেওয়া-মিঠাই পাঠাচ্ছেন শিবাজী।

শক্তিসিংহ দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলো। ভাবলো, আবিদ হুসেন বোধ হয় ভুল দেখেছে। ঘরে তো কোথাও রাহাজানির কোনো চিহ্ন নেই। সব জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিলো তেমনই আছে। হয়তো গিরধরলালজী এখন আছে কুমার রামসিংহের দিওয়ানখানায়। আর পান্না হয়তো শিবাজীর পথ্য নিয়ে গেছে মারাঠাদের শিবিরে।

হ্যাঁ, আবিদ হুসেন নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে,—শক্তিসিংহ ভাবলো। অন্য কোথাও কিছু হয়ে থাকবে, আবিদ হুসেন ভুল করে ভেবেছে, ওটা গিরধরলাল মুনশীর বাড়ি।

শক্তিসিংহ বাড়ির পেছন দিকের ছায়াঘন জায়গাটি পার হয়ে এসে প্রাচীর অতিক্রম করে নিজের ঘোড়ার উপর সওয়ার হোলো। যে পথ ধরে এসেছিলো, ফিরে চললো সে পথ ধরে।

আবিদ হুসেন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেই বারবরদারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

সে লোকটি তাকে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু আবিদ হুসেন ঘোড়ার উপর থেকে নেমে তাকে থামালো। বললো, "তুমি কি খোজা ফিরোজার বাগ থেকে আসছো?"

"হ্যাঁ," বললো সেই বারবরদার।

"তোমাদের শিবাজী খুব রইস লোক। ভালো ভালো মেওয়া মিঠাই পাঠাচ্ছেন সর্বত্র। আমার কাছেও পাঠিয়েছেন। আমি কে জানো?"

"না," সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো সেই লোকটি।

"আমি মির আবিদ হুসেন খাঁ, শাহ-ইন-শাহ্‌র দরবারের একজন উমরাহ।"

সে লোকটি হাত তুলে তসলিম জানালো।

"এসব নিয়ে যাচ্ছো কার জন্যে?" জিজ্ঞেস করলো আবিদ হুসেন।

"খাঁ-ই-খানান্ ইনায়ৎ খাঁর মহলে যাবে এই সওগাত।"

"ইনায়ৎ খাঁ। আচ্ছা। হ্যাঁ, ইনায়ৎ খাঁ। বড়ো শরীফ লোক। আমার খুব বন্ধু। ওর ওয়ালিদ আমার ওয়ালিদের ইয়ার ছিলো। ওর নানা আমার নানার ইয়ার ছিলো।"

লোকটি মাথা নাড়লো। তারপর আবার চলে যাওয়ার উপক্রম করলো পাশ কাটিয়ে।

"দাঁড়াও ইয়ার, যাচ্ছো কোথায়," আবিদ হুসেন তাকে থামিয়ে বললো, "তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে বলেই তোমায় থামিয়েছি।"

"আমার খুব তাড়া আছে খাঁ সাহাব।"

"তাড়া আমারও আছে ইয়ার, আমার দোস্তের মাশুকার ওয়ালিদের উপর হামলা করেছে কোনো এক বদবখ্‌ত্‌ পাজী। সেখানে যেতে হবে। আমার দোস্ত চলে গেছে সেখানে। আমি ধীরেসুস্থে যাচ্ছি। ব্যাপারটা কি জানো? বড্ড খিধে পেয়েছে। ইনায়ৎ খাঁ আমার খুব বন্ধু। সে যখন শুনবে যে তার জন্যে যে সওগাত যাচ্ছিলো, পথের মধ্যে আমি তার থেকে দুটো লাড্ডু বার করে খেয়েছি, সে নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করবে। নিশ্চয়ই খুব হাসবে। আমার নিজেরই একথা ভাবতেই হাসি পাচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ। কি হোলো, তোমার হাসি পাচ্ছে না?"

সে লোকটির হাসি পাওয়া দূরে থাক, রীতিমতো ভয় পেয়েছে বলে মনে হোলো। সে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি।

"আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, ইয়ার, যাচ্ছো কোথায়," একগাল হেসে বললো আবিদ হুসেন, "না হয় কিছু পয়সা নেবে আমার কাছ

থেকে, নামাও তোমার ভারা, আমি বেছে বেছে দু তিনটে লাড্ডু মিঠাই বার করে নিই।"

"আমাদের রাজা খুব রাগ করবেন?" বললো সেই বারবরদার।

"তোমাদের রাজা? শিবাজী? হাঃ হা। তুমি জানো না, উনিও আমার দোস্ত। খুব প্যার করেন আমায়। একদিন ওঁর শরীর দলাই মলাই করে দিয়েছিলাম। বোলো আমার কথা। খুশী হয়ে ইনাম দেবেন তোমায়। হ্যাঁ, ভালো কথা, উনি এখন আছেন কেমন। দেখি দেখি," বলতে না বলতে ঝুড়ির ডালা তুলে সে হাত বাড়িয়ে দিলো।

হাঁ-হাঁ করে উঠলো বারবরদার, কিন্তু তার আগেই আবিদ হুসেন ভিতরে হাত ঢুকিয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো হাত বার করে নিলো। সবিস্ময়ে বলে উঠলো, "এতো লাড্ডু মিঠাই নয়, মানুষের শরীর বলে মনে হচ্ছে। নামাও তোমার ভারা। আমি দেখবো।"

বারবরদারের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"ভারা নামাও," আবিদ হুসেনের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠলো। সে টেনে বার করলো তার তলোয়ার।

বরবরদার ভারাটা নামালো।

আবিদ হুসেন সামনে ঝুঁকে ঝুড়ির ডালা তুলে দেখলো। তারপর বলে উঠলো, "আরে এতো দেখছি এক জেনানা। আচ্ছা! উমরাহদের বাড়ি এমন সওগাতও যাচ্ছে?"

সে লক্ষ্য করলো না যে পেছনদিকের অন্য ঝুড়িটার ডালা সরিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো আরেকজন ব্যক্তি। বারবরদার নিজের চাদরের আড়াল থেকে একটি খাটো তলোয়ার বার করে তার হাতে দিলো।

আবিদ হুসেন বলে গেল, "এমন সওগাত পাঠাবেন শিবাজী?

আমার তো মনে হয় না। হাত পা মুখ বেঁধে? অসম্ভব। কি ব্যাপার বলো তো," বলে সে ফিরলো বারবরদারের দিকে।

আর ফিরে দাঁড়ানোর জন্যেই সে বেঁচে গেল। দেখতে পেলো মাথার উপর চাঁদের আবছা আলোয় ঝিলমিল করে উঠেছে একটি তলোয়ার। সেটি নেমে আসার আগেই চকিতে একপাশে সরে গেল আবিদ হুসেন। তলোয়ার আবার উদ্যত হোলো। কিন্তু এবার আবিদ হুসেন ঠেকালো নিজের তলোয়ার দিয়ে। বললো, "কৃষ্ণাজী আপ্তে, বড্ড ধরা পড়ে গেছ। আমি ওকে চিনতে পেরেছি। পান্না-বাঈকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছো তুমি?"

"আমার হাতে আজ তোমার জানটা যাবে দেখছি," বলে কৃষ্ণাজী তাকে আক্রমণ করলো তলোয়ার দিয়ে।

তার আঘাত প্রতিহত করতে করতে আবিদ হুসেন বললো, "জান আমার যেতে পারে, কিন্তু আমার দোস্তের মাশুকাকে এভাবে ধরে নিয়ে যেতে তো তোমায় দেবো না ইয়ার। কাজটা যে সহজ নয়, একথা তোমায় বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।"

কিন্তু তাদের দ্বন্দ্ব বেশীক্ষণ চললো না। কারণ এমন সময় সেখানে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত হোলো শক্তিসিংহ। কৃষ্ণাজীর আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে আবিদ হুসেন উচ্চকণ্ঠে বললো, "ঝুড়ির ভিতর পান্নাবাঈ। হাত পা বাঁধা। কৃষ্ণাজী ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

শক্তিসিংহ একলাফে এসে ঝুড়ির ভিতর ঝুঁকে পড়ে দেখলো।

বাসুদেব এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আবিদ হুসেন আর কৃষ্ণাজী আপ্তের অসিযুদ্ধ দেখছিলো। এবার আরো একজনের আবির্ভাব দেখে সে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলো সেখান থেকে।

শক্তিসিংহ দুহাত দিয়ে তুলে বার করে আনলো পান্নাকে। নিজের তলোয়ার দিয়ে কেটে দিলো তার হাতের পায়ের দড়ি, খুলে দিলো তার মুখের বাঁধন।

তারপর তলোয়ার বাগিয়ে ধরে আবিদ হুসেনের কাছে এসে দৃঢ়কণ্ঠে বললো, "কৃষ্ণাজীকে তুমি ছেড়ে দাও আমার জন্যে।"

আবিদ হুসেন একলাফে পেছন দিকে সরে গেল। শক্তিসিংহ প্রতিহত করলো কৃষ্ণাজীর তলোয়ারের আঘাত। বললো, "তোমার মোকাবিলা করার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। আজ এতদিনের সব দুর্ব্যবহারের শিক্ষা তোমায় ভালো করেই দেবো।"

"রাজপুতের মুখের আস্ফালন শুনে ভয় পায়না আমার মত মারাঠা," দাঁতে দাঁত ঘষে কৃষ্ণাজী বললো, "দেখা যাক তুমি কিরকম তলোয়ার ধরতে শিখেছো।"

"এই দেখ—," বলে অতি দ্রুত অসিচালনা করতে শুরু করলো শক্তিসিংহ।

কৃষ্ণাজীও অসিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ। দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্বচললো বেশ কিছুক্ষণ। দূরে একপাশে দাঁড়িয়ে প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে দেখতে লাগলো পান্না, অন্যপাশে আবিদ হুসেন দাঁড়িয়ে তারিফ করতে লাগলো শক্তিসিংহকে,—যেন একটা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে দর্শকদের জন্যে।

দুজনের একটু ভাবনার কারণ ঘটলো। কৃষ্ণাজী লড়ছে মরিয়া হয়ে। তার মুখে একটা ক্রুর নিষ্ঠুর চেহারা। আস্তে আস্তে সে যেন শক্তিসিংহকে বেকায়দায় ফেলে পেছন দিকে হটিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা ঝিলিক—কৃষ্ণাজীর তলোয়ার বিদ্যুৎগতিতে শক্তিসিংহের বুকের দিকে ছুটে গেল,—আর দুটো ঝিলিক সঙ্গে সঙ্গে, ঝন ঝন দুটো শব্দ,—আশ্চর্য ক্ষীপ্রতার সঙ্গে শক্তিসিংহ কৃষ্ণাজীর আঘাত লক্ষ্যচ্যুত করে তার নিজের তলোয়ার বসিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণাজীর বাম কাঁধের উপর। কৃষ্ণাজী একটু টলে উঠলো। তারপরেই পড়ে গেল মাটিতে।

পান্না ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো শক্তিসিংহকে। আবিদ হুসেন এগিয়ে এসে শক্তিসিংহের এক হাত নিজের হাতে নিয়ে গভীর

আনন্দের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, "সত্যি, কী অসাধারণ তলোয়ার চালিয়েছো। আমি এরকম খুবই কমই দেখেছি।"

পান্না তখন থরথর করে কাঁপছে। রুদ্ধকণ্ঠে বললো, "শক্তিসিংহ, আরেকটু হলেই ও আমায় ধরে নিয়ে যেতো চিরকালের জন্যে। তুমি আমার খোঁজ পেতে না। তোমরা এসে না পড়লে আমার কী হোতো!"

"আবিদ হুসেনের জন্যেই তুমি বেঁচে গেলে পান্না," বললো শক্তিসিংহ। তারপর আবিদ হুসেনের দিকে ফিরে বললো, "বন্ধু, তোমার এই উপকার আমি জীবনে কোনোদিন ভুলবো না।"

"সে কথা পরে ভেবো দোস্ত," আবিদ হুসেন বললো ঝুড়ি দুটো পা দিয়ে পথের পাশে সরিয়ে দিতে দিতে, "আপাতত বাঈ সাহিবাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

"সত্যি শক্তিসিংহ," পান্না হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো, "আমায় না পেলে যদি আমাকে সবাই খোঁজখুঁজি করতে শুরু করে, তাহলে ভয়ানক বিপদ হবে—"

বিপদ হবে!—আবিদ হুসেন ভাবলো,—বিপদ হবে কেন?

শক্তিসিংহ বললো, "চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পান্নাকে ঘোড়ার উপর তুলে নিলো শক্তিসিংহ।

আবিদ হুসেন বললো, "বন্ধু, সাবধানে যেয়ো। টহলদারেরা ঘুরছে চারদিকে। তোমায় এ অবস্থায় দেখলে সমস্ত বৃত্তান্ত জানবার জন্যে ওরা উৎসুক হতে পারে। সে অভিজ্ঞতা তুমি বা বাঈসাহিবা খুব উপভোগ করবে বলে মনে হয় না।"

আবিদ হুসেনও উঠে বসলো তার ঘোড়ার উপর। শক্তিসিংহ সড়ক থেকে নেমে জঙ্গলের ভিতরের পথ ধরছিলো। সে আবিদ হুসেনকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

"আমি ভাবছি কিছুক্ষণ টহল দেবো খোজা ফিরোজার বাগের আশেপাশে," আবিদ হুসেন ঈষৎ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, "দরবারের

খিদমতে যখন বহাল হয়ে আছি, তখন আমার কাজে তো গাফিলতি করতে পারি না।”

একটি ঘোড়া মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে, আরেকটি সড়কের বাঁকে।

কৃষ্ণাজী আপ্তে উঠে বসলো কোনোরকমে। বামদিকের কাঁধের কাছটায় চেপে ধরলো ডান হাত দিয়ে। জামাটা রক্তে লাল হয়ে আছে। অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালো। তারপর টলতে টলতে পথের উপর থেকে নেমে এলো জঙ্গলের অন্ধকারে।

খোজা ফিরোজার বাগের যেদিকটায় শিবাজীর শিবির তারই কাছাকাছি এসে আবিদ হুসেন পথের ধারে একটি বড়ো গাছের নিচে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড় করালো তার ঘোড়াকে। এখান থেকে শিবাজীর শিবির একটু দূরে হলেও পরিষ্কার দেখা যায়। অনেকগুলো মশাল জ্বলছে চারদিকে, কয়েকটি এপাশে-ওপাশে গাছের গুঁড়িতে আটকে দেওয়া, কয়েকটি পিয়াদাদের হাতে। দরওয়াজার মুখে দুদিকে দুটো তোপ, কয়েকজন গোলন্দাজ সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। সড়কের সামনে পাহারায় মোতায়েন হয়ে আছে অনেক সিলাহদার ও বন্দুকচি।

ঘোড়ার পিঠে চেপে টহলদারেরা ঘুরছে পথের ওদিকের মোড় থেকে এদিকের মোড় পর্যন্ত।

মোগল লশকর পাহারা দিচ্ছে খোজা ফিরোজার বাগের চৌহদ্দির বাইরে। চৌহদ্দির ভেতরে আছে মহারাজকুমার রাম-সিংহের কছওয়া রাজপুত লশকর।

এদিন সন্ধ্যার ঠিক সাতদিন পরে, ষোলো শো ছেষট্টি খৃস্টাব্দের ছাব্বিশে আগস্ট অম্বর দরবারের খুফিয়ানবিস পরকালদাস্ আগ্রা থেকে একটি গোপনপত্র পাঠিয়েছিলো অম্বরের দিওয়ান কল্যাণ-দাসের কাছে। এই পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে জয়পুর রাজ্যের

দস্তাবেজখানায়। যারা যারা সেদিন সন্ধ্যায় শিবাজীর শিবিরে পাহারায় নিযুক্ত ছিলো, তাদের নাম পাওয়া গেছে সেই পত্রে। তেজসিংহ আর রণসিংহের নেতৃত্বে একদল কছওয়া পাহারায় মোতায়েন ছিলো শিবাজীর শিবিরের ঠিক সামনে। তাদের মধ্যে ছিলো গিরধরলাল উকীল, বল্লু শাহ, বলিরাম পুরোহিত, জীবো জোশী, শ্রীকিষণ আর হরিকিষণ।

আবিদ হুসেন এদের প্রত্যেককে দেখতে পেলো শিবাজীর শিবিরের সামনে। মশালের আলো পড়েছে তাদের মুখের উপর। তেজসিংহ আর রণসিংহ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। শ্রীকিষণ আর জীবো জোশী শিবিরের প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে আছে বর্শা হাতে। গিরধরলাল উকীল আর বল্লু শাহ খোলা তলোয়ার হাতে পায়চারি করছে শিবিরের সামনে। তিন চার কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে বলিরাম পুরোহিত আর হরিকিষণ। অন্যান্য রাজপুতেরা ছড়িয়ে আছে কয়েক হাত দূরে দূরে।

আবিদ হুসেন অন্তরাল থেকে পরিষ্কার দেখতে পেলো প্রত্যেকের মুখ। মশালের আলোয় রক্তিম হয়ে আছে সেসব চেহারা। প্রত্যেকেই গম্ভীর, কিন্তু বৈচিত্র্যবিহীন দৈনন্দিন পাহারার ক্লান্তি ফুটে উঠেছে প্রত্যেকের মুখের উপর।

সবাই স্তব্ধ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মহারাজকুমারের কড়া হুকুম, শিবাজীর বিশ্রামের যেন কোনো রকম ব্যাঘাত না হয়। আজ শিবাজী বেশীরকম অসুস্থ। সুতরাং কোনো রকম আওয়াজ যাতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি আছে সবারই।

তাঁবুর ভিতরে শিবাজীর কক্ষের ভিতর একটু মৃদু আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। সেখানে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আবিদ হুসেন দেখতে পেলো, তাঁবুর ভিতর থেকে ভারা কাঁধে বেরিয়ে এলো একজন বারবরদার। বলিরাম পুরোহিত আর হরিকিষণ তাকে থামিয়ে ঝুড়ি দুটোর ডালা তুলে ভালো করে ভিতরটা পরীক্ষা

করে দেখলো। মাথা নাড়লো বলিরাম। বারবরদার ভারা তুলে বেরিয়ে চলে গেল।

আবিদ হুসেন নিজের মনে একটু হাসলো।

শিবাজী চক্ষু মুদিত করে শায়িত ছিলো শয্যার উপর। একটু দূরে একটি মাত্র চিরাগ এমনভাবে রাখা ছিলো যাতে শিবাজীর মুখের উপর কোনো আলো না পড়ে। অসুস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে এরকম সাবধানতা কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

এপাশে এক কোণে গাঢ় ছায়ার আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, হীরাজী ফরজন্দ। তেজসিংহ কি রণসিংহ তাকে দেখতে পেলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হোতো। সেদিন তার গায়ের জামাহ্‌র রং, গলার ও হাতের ভূষণ অবিকল শিবাজীর অনুরূপ। দুজনের মধ্যে যে চেহারারও খানিকটা মিল ছিলো,—একথা জানাচ্ছেন ঐতিহাসিকেরা।

হীরাজী ফরজন্দ ছায়ার আড়াল থেকে কানাতের পর্দার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিলো বাইরের রাজপুতদের। খুব নিচু গলায় বললো, "বলিরাম আর হরিকিষণ ঝুড়ি দুটো দেখলো খুব ভালো করে।"

মেওয়া-মিঠাইয়ের ঝুড়ি পরীক্ষা করার ব্যাপারে পাহারাদারদের কড়াকড়ি তেমন নেই। একটি দুটি ভালো করে দেখে, তারপর তিন চারটি না দেখেই ছেড়ে দেয়। শিবাজী আর হীরাজী জানতো যে এর আগে আবদরখানা থেকে ঝুড়ির ভেতর লুকিয়ে বেরিয়ে গেছে কৃষ্ণাজী আপ্তে। অন্য ঝুড়িতে যে পান্নাকেও রাখা হয়েছিলো, একথা অবশ্যি এদের জানার কথা নয়। কৃষ্ণাজীর প্রতি তাদের নির্দেশ ছিলো, সেই ঝুড়িতে যেন রাখা হয় লাড্ডু মেওয়া মিঠাই। বারবরদার যে দুচারজন ছিলো, তাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিলো বাইরে, তাঁবুর পিছন দিকে। ঝুড়ি মিষ্টদ্রব্যে ভরে

সাজিয়ে দিচ্ছিলো কৃষ্ণাজী নিজে। তারপর বাইরের থেকে বারবরদারদের ডেকে আনছিলো এক একজন করে। বাসুদেব যখন মুনশী গিরধরলালের বাড়ির ওদিক থেকে একটি ঝুড়ি মাথায় তুলে নিয়ে এলো কেউ লক্ষ্য করলো না। কৃষ্ণাজী নিজে একটি ঝুড়ির ভেতর ঢুকে পড়বার পর বাসুদেব যখন তুটো ঝুড়ি ভারায় তুলে বেরিয়ে চলে গেল, কারো কোনো সন্দেহ হোলো না। তাঁবুর আবদরখানায় তখন আর কেউ ছিলো না। আর তুটি মিষ্টির ঝুড়ি তৈরী হোলো। এবার বারবরদার একজনকে ডেকে আনলো শম্ভুজী নিজে। সে ভারা তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তার ঝুড়ি তুটো পরীক্ষা করে ছেড়ে দিলো পাহারাদারেরা।

শিবাজী মৃত্নকণ্ঠে বললো, "আমাদের আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না। এবার নিশ্চয়ই ওরা আর ডালা তুলে দেখবে না।"

হীরাজী ফরজন্দ কোনো উত্তর দিলো না। ঝুঁকি আছে একাজে। কিন্তু প্রাণের ঝুঁকি তারা আগে অনেকবার নিয়েছে।

শিবাজী শয্যাত্যাগ করে উঠতে যাচ্ছিলো। হীরাজী হঠাৎ বলে উঠলো, "না, না, উঠবেন না। রণসিংহ আসছে।"

রণসিংহ এসে কানাতের পর্দা তুলে দেখলো। শিবাজী নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলো বিছানার উপর। রণসিংহ কোনো কথা না বলে ফিরে চলে গেল।

এটা পাহারাদারদের রেওয়াজ। মাঝে মাঝে এসে একবার করে দেখে যায়। সন্ধ্যার পর একবার কি তুবার আসে, রাত্তিরে আর আসে না। কিছুক্ষণ আগে আরেকবার এসেছিলো। আর হয়তো আসবে না।

"রণসিংহ চলে গেছে," ফিস ফিস করে বললো হীরাজী ফরজন্দ।

শিবাজী চকিতে উঠে পড়লো শয্যাত্যাগ করে। তুজনে তাঁবুর মাঝখানের কক্ষ পার হয়ে ঢুকে পড়লো পাশের আবদরখানায়। সেখানে একা অপেক্ষা করছিলো শম্ভুজী।

"মালোজী কোথায় ?"

"অন্য এক বারবরদারের সঙ্গে বাইরে অপেক্ষা করছে," উত্তর দিলো শম্ভুজী।

শিবাজী শম্ভুজীকে তুলে বসিয়ে দিলো একটি ঝুড়ির মধ্যে। তার উপর কয়েকটি শালপাতা দিয়ে ঢেকে কিছু লাড্ডু মেওয়া মিঠাই সাজিয়ে দিলো। তারপর আরো কয়েকটি শালপাতা চাপা দিয়ে ঝুড়ির মুখ চাপা দিলো একটি ডালা দিয়ে। দড়ি দিয়ে ঝুড়িটা বাঁধলো চারদিক থেকে।

তারপর হীরাজীর সহায়তায় শিবাজী নিজে ঢুকে পড়লো আরেকটি ঝুড়ির মধ্যে। হীরাজী শালপাতা ও মিষ্টি দিয়ে উপরটা সাজিয়ে ডালা দিয়ে ঢেকে দড়ি দিয়ে বাঁধলো।

কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বললো না। অন্য সবার মতো হীরাজী ফরজন্দকেও তার কর্মসূচীর বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে।

বাইরে বারবরদারের পোষাক পরে অপেক্ষা করছিলো শিবাজীর অতি বিশ্বস্ত অনুচর মালোজী চিটনিস। হীরাজী তাকে ভিতরে ডেকে আনলো। সেও জানতো তার কর্তব্য। নীরবে দড়ির ভিতর দিয়ে ভারা ঢুকিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিলো। হীরাজী আর মালোজী দুজনে তাকালো দুজনের দিকে। দুতিন মুহূর্তের জন্যে দুজনের দৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো পরস্পরের চোখের উপর। সে দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিশে আছে দৃঢ় সংকল্প আর আত্মবিশ্বাস। হীরাজী নীরবে মালোজীর কাঁধের উপর হাত রাখলো এক মুহূর্ত। তারপর হাত নামিয়ে নিলো। মালোজী ভারা নিয়ে দুলতে দুলতে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

হীরাজী কানাতের পর্দা একটুখানি সরিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। কাছেই একপাশে রাখা আছে একটি তলোয়ার। যদি প্রয়োজন হয় তলোয়ার হাতে ছুটে যেতে হবে এক্ষুণি। যদি ওরা তল্লাশ করে, যদি শিবাজী ধরা পড়ে যায়, তাহলে সবাইকে একসঙ্গে লড়তে হবে

পাহারাদারদের সঙ্গে। মরবার আগে খতম করতে হবে যতোজনকে সম্ভব। তাদের জীবন্ত ধরে ফেলার সুযোগ পাহারাদ্দারদের দেওয়া হবে না।

জীবনে অনেক সঙ্কটজনক পরিস্থিতি এসেছে,—কিন্তু এরকম উৎকণ্ঠা কোনোবার হয়নি। বাইরে খুব শান্ত থাকলেও হীরাজীর হৃদস্পন্দনের গতি খুব তীব্র হয়ে উঠলো।

মালোজী ভারা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে গেল জীবো জোশী আর শ্রীকিষণকে পেরিয়ে। গিরধরলাল উকীল আর বল্লু শাহ তখন দুজন দুজনকে অতিক্রম করে দুদিকে সরে যাচ্ছে টহল দিতে দিতে।

হীরাজী দেখলো মালোজী এগিয়ে যাচ্ছে বলিরাম পুরোহিত আর হরিকিষণের দিকে।

হীরাজীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। আর দুতিন মুহূর্ত,—তারপরই হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু।

বলিরাম পুরোহিত মাথা নাড়লো। হরিকিষণ তুড়ি দিতে দিতে হাই তুললো।

ওরা আটকালো না মালোজীকে। হাতের ইসারায় এগিয়ে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো।

হীরাজী সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললো।

মালোজী ভারা কাঁধে দরওয়াজাটা পেরিয়ে খোজা ফিরোজার বাগ থেকে বেরিয়ে এলো। আবিদ হুসেন অন্তরাল থেকে দেখলো মালোজী প্রধান সড়ক ছেড়ে অন্য সড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে।

আবিদ হুসেন নড়লো না। দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

আবদরখানায় আরো দুটো ঝুড়ি তৈরী ছিলো। বাইরে পেছন দিকে অপেক্ষা করছিলো আর মাত্র একজন বারবরদার।

হীরাজী তাকে ভিতরে ডেকে আনলো একটু পরে। সে এসে ঝুড়ি দুটো ভারায় তুলে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

হীরাজী তাড়াতাড়ি শিবাজীর কক্ষে গিয়ে শয্যার উপর শুয়ে গায়ের উপর রিজাই টেনে দিয়ে পড়ে রইলো নিশ্চল হয়ে।

আবিদ হুসেন দেখলো এগিয়ে আসছে আরো একজন বার-বরদার। বলিরাম তাকে জিজ্ঞেস করলো, "আর কতো বাকী আছে?"

বারবরদার বললো, "[illegible] মতো এই শেষ।" সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় তার কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেলো আবিদ হুসেন।

হরিকিষণ বললো, "আজকের মতো এটাই যখন শেষ, তখন এটা একবার তল্লাশ করে দেখা যাক।

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও," বলে উঠলো বলিরাম, "সবই ওই একই জিনিস, মেওয়া মিঠাই দেখে দেখে এই কদিনে আমার অরুচি ধরে গেছে।"

"আজ শেষবারের মতো দেখে নিই," উত্তর দিলো হরিকিষণ, "তাহলে আমাদের বিবেকটা সাফ থাকে এই বলে যে, আমাদের কর্তব্যে আমরা গাফিলতি করছি না।"

বলিরাম আর হরিকিষণ দুজনেই হাসলো। বারবরদার ভারা নামিয়ে রাখলো। দুজনে দুটো ঝুড়ির ডালা তুলে হাত দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলো।

"লাড্ডু, লাড্ডু আর লাড্ডু," বললো হরিকিষণ।

"এই কদিনে," বলিরাম বলে উঠলো, "এত লাড্ডু দেখেছি যে, জীবনে আর কোনোদিন বোধ হয় আমার মুখে লাড্ডু রুচবে না।"

বারবরদার ভারা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল খোজা [illegible] বাগ থেকে। প্রত্যেকটি কথা শুনতে পেলো আবিদ হুসেন।

রণসিংহ তেজসিংহকে বললো, "বলিরাম আর হরিকিষণ আজকের দিনে শেষবারের মতো তাদের কর্তব্য করলো। আমিও বা বাদ দিই কেন? আরেকবার দেখে আসি শিবাজীকে।"

"কী দরকার," তেজসিংহ মন্তব্য করলো।

"না, একবার দেখে আসি।"

রণসিংহ জীবো জোশী আর শ্রীকিষণকে পেরিয়ে গিয়ে কানাতের পর্দা তুলে দেখলো। তারপর ফিরে এলো তেজসিংহের কাছে। বললো, "ঘুমিয়ে আছে।"

তেজসিংহ উত্তর দিলো, "আর যেতে হবে না। উনি খুব অসুস্থ। ওঁকে ঘুমুতে দাও।"

খোজা ফিরোজার বাগের বাইরে যেখানে তোপের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো কয়েকজন গোলন্দাজ, সেখানে ঘোড়া হাঁকিয়ে হাজির হোলো কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ। সঙ্গে তিনচারজন সিলাহদার। একজনের হাতে মশাল।

"সব ঠিক আছে তো?" জিজ্ঞেস করলো ফুলাদ খাঁ।

গোলন্দাজদের দারোগা উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।"

"উনি খুব অসুস্থ বলে শুনছি," জানালো একজন পিয়াদা।

"এ অসুখ আর সারবে না," বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো ফুলাদ খাঁ। তারপরে চলে গেল ঘোড়া হাঁকিয়ে।

আবিদ হুসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সড়ক ধরে চললো পশ্চিম দিকে যেদিকে ভারা নিয়ে এগিয়ে গেছে মালোজী চিটনিস।

প্রদীপ জ্বালিয়ে এঘর ওঘর ঘুরে পান্না আর শক্তিসিংহ গিরধরলাল মুনশীকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলো পেছন দিকের একটা ছোটো কুঠরিতে। শিবাজীর শিবির থেকে বিভিন্ন জায়গায় মেওয়া-মিঠাইয়ের যেসব বড়ো বড়ো ঝুড়ি পাঠানো হয়েছিলো তেমনি একটি ঝুড়ির মধ্যে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে ছিলো মুনশী গিরধরলাল। সেই ঝুড়ির ডালা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিলো ভালো করে। বাইরের থেকে দেখে কিছু বুঝবার উপায় ছিলো না।

শক্তিসিংহ দড়ি কেটে ডালা তুলে গিরধরলালকে সেখান থেকে বার করে হাতের পায়ের ও মুখের বাঁধন খুলে দিলো। ভয়ে তখন গিরধরলালের গলা শুকিয়ে গেছে। কোনো রকমে বললো, "কৃষ্ণাজী আপ্তে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি," উত্তর দিলো শক্তিসিংহ, "এর প্রতিফল কৃষ্ণাজী পেয়েছে।" নিজের তলোয়ার বার করে রক্তের দাগ দেখালো।

পান্না বলে উঠলো, "কৃষ্ণাজী এভাবে ঝুড়িতে করে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো আমাকেও,—হাত-পা-মুখ বেঁধে। শক্তিসিংহ এসে না পড়লে আর হয়তো কেউ কোনোদিন আমার খোঁজ পেতে না।"

মুনশী গিরধরলাল শক্তিসিংহের হাত দুটো চেপে ধরলো, আবেগের আতিশয্যে কোনো কথা বেরোলো না তার মুখ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে কোনো রকমে বললো, "শক্তিসিংহ, কৃষ্ণাজী আপ্তের প্ররোচনায় কিছুকাল আগে আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। ওর উদ্দেশ্য তখন বুঝতে পারিনি। তুমি আমায় মার্জনা করো।"

"অপরাধ আমার," শক্তিসিংহ উত্তর দিলো, "আপনার কাছে অনুমতি না নিয়ে আমি গোপনে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম পান্নার সঙ্গে। আমিই আপনার কাছে মার্জনা চাইছি।"

"না," বলে উঠলো পান্না, "শক্তিসিংহ কোনো অপরাধ করেননি। আমার সম্মতি না থাকলে উনি ওভাবে গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না।"

মুনশী গিরধরলাল দুজনের মুখের দিকে তাকালো, তারপর বললো, "এখন আর আমার কাছে কিছু গোপন করার প্রয়োজন নেই, শক্তিসিংহ।"

শক্তিসিংহ পান্নার মুখের দিকে তাকালো। পান্না চুনরি ভালো করে টেনে দিলো মুখের উপর।

শক্তিসিংহ আস্তে আস্তে বললো, "গিরধরলালজী, আমি ভাবছি এরমধ্যে একদিন আমি আমার বন্ধু দুর্গাদাস রাঠোরকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে অনুরোধ করবো। সে আপনার কাছে এসে জিজ্ঞেস করবে, আপনি শক্তিসিংহকে আপনার পালিতাকন্যার যোগ্যপাত্র বলে বিবেচনা করেন কিনা।"

গিরধরলাল আবেগরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলো, "আমি দুর্গাদাস রাঠোরকে জানাবো যে, রাজপুতকন্যার সম্মান রক্ষা করে শক্তিসিংহ তার পানিগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সুতরাং তাকে কন্যাদান করে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।"

পান্না ব্রীড়াবনতা হয়ে এদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

"কুঁবর-সা যদি রাঠোরের সঙ্গে কছওয়া কন্যার বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন?" জিজ্ঞেস করলো শক্তিসিংহ।

"সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলে উনি কোনোদিনই অসম্মতি প্রকাশ করবেন না," গিরধরলাল মুনশী বললো, "আমি এখনই গিয়ে ওঁকে জানাচ্ছি কৃষ্ণাজী আপ্তের কথা। এক সামান্য মারাঠার এত সাহস রাজপুত-কন্যার গায়ে হাত দেয়? আমি এখনই গিয়ে অভিযোগ করছি। কুঁবর-সাকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো দিওয়ানখানায়—।"

গিরধরলাল মুনশী পা বাড়িয়েছিলো যাওয়ার জন্যে, কিন্তু পান্না চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে পথ আটকে বললো, "না, এখন আর যাবেন না।"

"কুঁবর-সাকে জানানো দরকার," বলে উঠলো গিরধরলাল।

"না। এই ঘটনা এখন জানাজানি না হওয়াই ভালো।"

"কেন?"

পান্না প্রথমটা কোনো উত্তর দিতে চাইলো না, কিন্তু গিরধরলাল আর শক্তিসিংহ দুজনেই পীড়াপীড়ি করবার পর বললো, "আপনারা আমাকে কথা দিন যে কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানাবেন না— "

কথা দিলো শক্তিসিংহ আর গিরধরলাল মুনশী।

পান্না খুব মৃদুকণ্ঠে বললো, "আপনারা কি লক্ষ্য করেননি যে এই সব ঝুড়ির ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ?"

গিরধরলাল মুনশী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললো, "আমি ভাবতেই পারিনি। আমাদের কুঁবর-সা জানতে পারলে মনে মনে খুবই খুশী হতেন। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছো, ওঁর এখন জানতে না পারাই ভালো। উনি দরবারের একজন মনসবদার। হয়তো উনি ভুলতে পারবেন না যে, বাদশাহ্‌র স্বার্থের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাই তাঁর প্রধান কর্তব্য।"

শক্তিসিংহ আনমনে কিছু একটা চিন্তা করছিলো গভীরভাবে। হঠাৎ বলে উঠলো, "আবিদ হুসেন এদিকে এলো কেন ? তার মনেও কি কোনোরকম সন্দেহ হয়েছে ?"

পান্না হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। "যদি তাই হয় তো খুব ভাবনার কথা," বললো সে।

"আমি গিয়ে দেখছি," বলে শক্তিসিংহ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

গিরধরলাল মুনশীও এলো সঙ্গে সঙ্গে। বললো, "আমিও যাচ্ছি শিবাজীর তাঁবুর ওদিকে। রণসিংহ আর তেজসিংহের সঙ্গে সঙ্গে থাকবো সর্বক্ষণ। যদি ওদের মনে কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক হয়, আমি চেষ্টা করবো যাতে সেই সন্দেহ দূর করে দিতে পারি। যদি কেউ আজ রাতে শিবাজীর তাঁবুর ভিতর তদারক করতে চায়, তাকে নিরস্ত করাই হবে আমার উপস্থিত দায়িত্ব।"

দুজন চলে গেল দুদিকে।

শহরের দিকে যাওয়ার সড়ক থেকে বেরিয়ে যে পথ নির্জন হয়ে চলে গেছে পশ্চিম শহরপ্রান্তের প্রাচীরের উদ্দেশে, সে পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে আবিদ হুসেন দূরে দেখতে পেলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে সেই বারবরদার। আবছা চাঁদের আলোয় তাকে

মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে সে মিলিয়ে যাচ্ছে পথের দুপাশের বড়ো বড়ো গাছের অন্ধকার ছায়ায়। আবিদ হুসেন ঘোড়া নিয়ে পথ ছেড়ে একপাশের ময়দানে নেমে গেল। এখানে ঘাসের উপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা আর অতো স্পষ্ট শোনা যায় না। একটা নিরাপদ দূরত্ব রেখে আবিদ হুসেন আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো সেই লোকটির পেছন পেছন।

মালোজী চিটনিস খুব সতর্ক ভাবে পথ চললেও বুঝতে পারেনি যে কেউ একটু দূরে তার অনুসরণ করছে। এক জায়গায় খুব ঘন ছায়া। সেখানে এসে সে কাঁধের উপর থেকে ভারা নামালো। দড়ি খুলে তুলে ধরলো ঝুড়ির ডালা। ঝুড়ি দুটোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো শিবাজী আর শম্ভুজী।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাচীর পার হয়ে শহরের বাইরে চলে যেতে হবে। যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ না হয়, এজন্যে তিনজনেরই খুব মোটা সুতির অতি সাধারণ আধময়লা পোশাক। দেখলে মনে হবে, এরা তিনজন আগ্রার বাইরের গ্রাম্যঅঞ্চলের সাধারণ দেহাতী। কাজের উপলক্ষে শহরে এসেছিলো, রাত্রি প্রথম প্রহরে শহরের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে শহর ত্যাগ করবার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে।

শহর থেকে তিন ক্রোশ দূরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে নীরাজী রাওজী, দত্ত ত্রিম্বক, রঘুমিত্র আর আরো কয়েকজন সহচর। পরিকল্পনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিই আগের থেকে স্থির হয়ে আছে। সেখানে পৌঁছে গায়ে ছাই মেখে গেরুয়া কাপড় পরে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে চলে যাবে মথুরার দিকে। খোজা ফিরোজার বাগের পাহারা-দারদের পেরিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে শিবির থেকে। এখন নিরাপদে শহরের প্রাচীরের বাইরে চলে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

শিবাজী,শম্ভুজী আর মালোজী চিটনিস দ্রুতগতিতে রওনা হোলো। বৃক্ষরাজির ছায়ার অন্ধকার পেরিয়ে এসে সামনে আবার কিছুদূর ফাঁকা পথ, আবছা চাঁদের আলো এসে পড়েছে চারদিকে। পথের একপাশে ঘন জঙ্গল।

কয়েকপা এগোতেই একটা মৃদু আওয়াজ কানে এলো—গাছের পাতা নড়ে উঠলো, একটা দুটো শুকনো ডাল ভাঙলো মটমট করে। পাশের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছু একটা যেন এগিয়ে গেল তাদের পেরিয়ে।

"কিসের শব্দ?" জিজ্ঞেস করলো শম্ভুজী।

"কোনো একটা জানোয়ার বোধ হয় চলে গেল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে," বললো মালোজী চিটনিস।

"যাই হোক, আমরা কেন বিচলিত হওয়ার ভাব দেখাবো," মৃদুকণ্ঠে বললো শিবাজী, "আমরা সাধারণ লোক, দেহাতী পথিক, গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি, সেভাবেই পথ চলবো নির্ভাবনায়।"

তিনজনে এগিয়ে গেল আরো কয়েক কদম।

জঙ্গলের ছায়া থেকে হঠাৎ একজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

তিনজনে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কোনোরকম বিচলিত ভাব না দেখিয়ে সামনে ঝুঁকে কপালে হাত ঠেকালো, যেমনি করে দেহাতী পথচারীরা অভিবাদন জানায় কোতোয়ালির লোকের সামনে পড়লে। তারপর সহজভাবে ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলো। কিন্তু ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

"খাঁ সাহাব, আমাদের পথ আটকালেন কেন," মালোজী বিনীতকণ্ঠে বললো, "আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেহাতের লোক, দরওয়াজা বন্ধ হওয়ার আগেই শহর থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।"

ঘোড়সওয়ার হেসে উঠলো, তারপর নেমে পড়লো ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে। ছাড়া পেয়ে ঘোড়া সরে গেল পথের একপাশে।

"আমি আপনাদের চিনি," বললো ঘোড়সওয়ার।

এরা তিনজন দাঁড়িয়ে পড়লো নিস্পন্দ হয়ে।

"আমায় চিনতে পারছেন না?" সে বলে উঠলো শিবাজীর দিকে তাকিয়ে, "আমি আবিদ হুসেন খাঁ।"

শিবাজী কোনো উত্তর দিলো না। মালোজী চিটনিস বললো, "আপনি ভুল করছেন খাঁ সাহাব, আমরা তিনজন দেহাতী কিসান—।"

আবিদ হুসেন আবার হাসলো। বললো, "সে তো কথা শুনেই বুঝতে পারছি। মারাঠার মুখে হিন্দুস্তানী উচ্চারণ ঠিক আসে না। আমার খুবই খুশকিসমতি যে এরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হোলো। কে ভাবতে পারে যে, মারাঠাদের রাজা শিবাজী দেহাতী কিসানের বেশ ধারণ করে আগ্রা শহরের নির্জন সড়কে এভাবে তফরী করছেন?"

শিবাজী আবিদ হুসেনকে কিছু বললো না। মালোজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "ওকে জিজ্ঞেস করো, ও কি চায়?"

আবিদ হুসেন বললো, "আমি কি চাই?" সে হেসে উঠলো। "প্রথমত আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। ফুলাদ খাঁকে এভাবে কেউ ধোঁকা দিতে পারে, আমি ভাবতে পারতাম না। হাঃ হা। এক হাজার লশকর খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে, তাঁবুর সামনে দু-দুটো তোপ, ফুলাদ খাঁ পাহারার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি রাখেনি। তাকে যিনি এভাবে ধোঁকা দিতে পারেন, তিনি সত্যি হিন্দুস্তানের বাদশাহ হওয়ার যোগ্য। মোতিজানকে যখন বলবো, সে শুনে খুশী হবে। সত্যি, কতো বড়ো বেওকুফ আমাদের ফুলাদ

মিঁয়া! আমি শুধু ভাবছি, কাল আমাদের বাদশাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে ফুলাদ খাঁর মুখের চেহারা কিরকম হবে। ওই চেহারা দেখবার জন্যে আমি এক হাজার আশরফি দিতে রাজী।"

শিবাজী মালোজী চিটনিসকে বললো, "ওকে জিজ্ঞেস করো, ওই দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে সে আমাদের কাছ থেকে এক হাজার আশরফি নিয়ে এখান থেকে চুপচাপ চলে যেতে রাজী আছে কিনা।"

মালোজী চিটনিস কিছু বলার আগেই আবিদ হুসেন বললো, "আমি কিছু না নিয়েই চুপচাপ চলে যেতাম। খাস দরবারে ফুলাদ খাঁ লড়াইতে-হেরে-যাওয়া পালক-উঠে-যাওয়া মুরগীর মতো দাঁড়িয়ে আছে, এরকম দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য জীবনে কবার হয়? কিন্তু রাজা, একটা বড়ো মুশকীল হোলো। আমার বদনসীব, ওই দৃশ্য আমি দেখতে পাবো না, কারণ আমি শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র একজন বিশ্বস্ত খাদিম। আপনাকে রুখে রাখাই আমার কর্তব্য।"

"দু-হাজার আশরফি," বললো মালোজী চিটনিস।

"আবিদ হুসেনকে আশরফি দিয়ে কেনা যায় না," আবিদ হুসেন শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলো। তারপর বার করলো তার তলোয়ার।

এরা তিনজন একটু শঙ্কিত হোলো। এরা বেরিয়েছে একেবারে নিরস্ত্র হয়ে। যেভাবে এরা বেরিয়ে এসেছে তাতে সঙ্গে হাতিয়ার রাখার কোনো সুযোগ ছিলো না। দেহাতী কিসান সেজে বড়ো হাতিয়ার সঙ্গে রাখলে শহরের দরওয়াজার চৌকির নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। শিবাজী আর মালোজী চিটনিসের সঙ্গে ছিলো শুধু দুটো ছোরা। তলোয়ারের মোকাবিলা করা যায় না ছোরা নিয়ে।

মালোজী আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছিলো। আবিদ হুসেন তলোয়ার উদ্যত করে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "কাছে আসবেন না। নইলে আপনাকে জখম করতে বাধ্য হবো। অকারণ রক্তপাত আমি পছন্দ করি না।"

"মালোজী," শিবাজী বললো, "ওকে জিজ্ঞেস করো ও কী চায় ?"

"আমি শুধু এটুকু চাই যে, আপনারা ফিরে চলুন খোজা ফিরোজার বাগে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে আসছি। কেউ আপনাদের কিছু বলবে না। আপনারা নিরাপদে আপনাদের তাঁবুতে পৌঁছে যাবেন।"

তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে।

"আমার খুব আফসোস হচ্ছে রাজা," আবিদ হুসেন বলে গেল, "আপনি খুব ভালো লোক, আপনাকে যেভাবে আগ্রায় আটক করে রাখা হয়েছে, সেটা খুবই অন্যায়। আপনি সাধারণ লোকের বাদশাহ্, তাই আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কারণ আমিও সাধারণ লোক। আপনি পালিয়ে যেতে পারলে আমি খুশী হতাম। আরো বেশী খুশী হতাম যদি আমার সামনে পড়ে না যেতেন। কিন্তু আমার বদনসীব, আমি দরবারের খিদমতে বহাল হয়ে আছি। বড়ো বড়ো উমরাহেরা আশরফি নিয়ে বেইমানী করতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে আমার বাদশাহ্‌র সঙ্গে বেইমানী করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমার কর্তব্য, আপনাকে খোজা ফিরোজার বাগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আপনারা যদি পালিয়ে যেতে চান, তাহলে আগে আমার জান নিতে হবে আপনাকে।"

দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে এলো।

আবিদ হুসেন বললো, "কোতোয়ালির কোনো লোক বোধ হয় এদিকে আসছে। আপনাদের নসীব সত্যিই ভালো নয়।"

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কাছে এসে গেল। ওদিকের অন্ধকার ছায়া পেরিয়ে ঘোড়সওয়ার তাদের কাছে এসে থামলো।

"আবিদ হুসেন ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ আমি," আবিদ হুসেন উত্তর দিলো শক্তিসিংহের কণ্ঠস্বর শুনে। শক্তিসিংহ তাকিয়ে দেখলো শিবাজীকে, শম্ভুজীকে, মালোজী চিটনিসকে। তারপর তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে।

"এঁদের পথ আটকে রেখেছো কেন আবিদ হুসেন, "জিজ্ঞেস করলো শক্তিসিংহ।

"আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করছি," আবিদ হুসেন উত্তর দিলো, "ভুলে যেও না আমি বাদশাহ্‌র একজন খাদিম।"

"পথ ছেড়ে দাও আবিদ হুসেন," শক্তিসিংহ বললো গম্ভীরকণ্ঠে, "আমি তোমার বন্ধু,—বন্ধু হিসেবে তোমায় এই অনুরোধ করছি।"

"বন্ধু কোনোদিন বন্ধুকে কর্তব্যপালনে মানা করেনা শক্তিসিংহ," গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলো আবিদ হুসেনও।

"শিবাজী রাজপুতের অতিথি হয়ে আগ্রায় এসেছেন," বললো শক্তিসিংহ, "সুতরাং তাঁকে রক্ষা করা রাজপুত হিসেবে আমারও কর্তব্য।"

"বেশ, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো, আমি আমার কর্তব্য করি।"

শক্তিসিংহ বুঝলো আবিদ হুসেন তার সংকল্পে অটল। সে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে বার করলো নিজের তলোয়ার। বললো, "আবিদ হুসেন, তুমি আমার বন্ধু। আজ যদি তলোয়ার নিয়ে তোমার সঙ্গে লড়তে হয়, তাহলে এর চাইতে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না।"

"আমার আফসোস তোমার চাইতে কম নয় শক্তিসিংহ, কিন্তু আমি নিরুপায়।"

"আবিদ হুসেন, অসিচালনায় আমার দক্ষতার কথা তুমি জানো।"

"আমি সম্প্রতি তলোয়ার ধরতে একটু একটু শিখেছি, শক্তি-সিংহ।"

শক্তিসিংহ শিবাজীর দিকে ফিরে বললো, "আবিদ হুসেনকে আমি রুখে রাখছি, আপনারা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।"

আবিদ হুসেন হাসলো। বললো, “আমার জান কবুল, কেউ আমায় পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেই আমি তাকে জখম করবো।”

শক্তিসিংহ দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেল। তার তলোয়ার ঝলসে উঠলো চাঁদের আলোয়। আবিদ হুসেন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার আঘাত প্রতিহত করলো। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু ঝন ঝন করতে লাগলো অসির সঙ্গে অসির সংঘাত।

শক্তিসিংহ অসিচালনায় অতি সুদক্ষ ও এধরণের দ্বন্দ্বে অভিজ্ঞ। আবিদ হুসেনের তালিম বেশীদিনের নয়। সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লড়তে লাগলো। তার ক্ষীপ্রতা ও কৌশল দেখে বিস্মিত হোলো শক্তিসিংহ। বুঝতে পারলো যে, আবিদ হুসেনকে কাহিল করে তুলতে পারবে না সহজে। তার উদ্দেশ্য ছিলো নানা কৌশলে আঘাত করে আবিদ হুসেনের তলোয়ার হস্তচ্যুত করবে। যখন দেখলো কিছুতেই পেরে উঠছে না, আবিদ হুসেন নিজের তলোয়ারের আঘাতে বার বার ফিরিয়ে দিচ্ছে তার তলোয়ারকে, শক্তিসিংহ একটু চিন্তিত হোলো। এখানে এভাবে বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কোতোয়ালির কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে, শিবাজীর দেরি হয়ে যেতে পারে শহরের দরওয়াজায় পৌঁছাতে, খোজা ফিরোজার বাগে শিবাজীর অনুপস্থিতি জানাজানি হয়ে যেতে পারে। নিজের মনকে শক্ত করে তীব্রভাবে আক্রমণ করলো আবিদ হুসেনকে। প্রয়োজন হলে তার জানও নিতে হতে পারে। আবিদ হুসেন এক পা এক পা করে পিছু হটতে লাগলো।

“বাঃ, এইবার বাহাদুরের মতো লড়ছো,” হাসিমুখে বলে উঠলো আবিদ হুসেন, “প্রয়োজন হলে আমার বুকে তলোয়ার বসিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ কোরো না। আমিও তোমার বুকে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেবো সুযোগ পেলে—।”

একটু একটু হাঁফাচ্ছে আবিদ হুসেন। শক্তিসিংহের মতো অতো বলবান সে নয়।

শিবাজী ও তার সঙ্গীরা স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে দেখছিলো এই দ্বন্দ্ব। শক্তিসিংহকে নিষ্করুণ ভাবে আক্রমণ করতে দেখে শিবাজী বলে উঠলো, "ওকে নিহত কোরোনা শক্তিসিংহ, শুধু ডান হাত অল্প জখম করে কিছুক্ষণের জন্যে অকর্মন্য করে দাও।"

দুজনে লড়তে লাগলো প্রাণপণে। শিবাজী সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাদের দ্বন্দ্ব নিরীক্ষণ করতে করতে বললো, "আহা, এদের দুজনের মতো বাহাদুর সহযোগী পেলে আমি হিন্দুস্তান জয় করতে পারি।"

শক্তিসিংহ নানা কৌশলে দ্রুত পদক্ষেপে এদিক ওদিক সরতে সরতে নানাভাবে আঘাত করছিলো আবিদ হুসেনকে লক্ষ্য করে। আবিদ হুসেন আশ্চর্য ক্ষীপ্রতার সঙ্গে আত্মরক্ষা করছিলো, বার বার চেষ্টা করছিলো প্রত্যাঘাত করবার। হঠাৎ সে একটু হেসে অসি-চালনার ফাঁকে থেমে থেমে বললো, "দোস্ত, একটা শের তৈরী করলাম এইমাত্র।—শুনবে?—শোনো।—মাশুক্ যখন পাশে বসে মধুর কণ্ঠে আলাপ করতো—মনে হোতো—সে কতো প্যার করে আমাকে—মাশুক্ যখন আমার দুশমন হয়ে গেল—তখন মনে হোলো—তাকে আমি প্যার করি—আরো বেশী···।"

"ওয়াহ—," বলে উঠলো শিবাজী।

শক্তিসিংহ কোনো কথা বললো না। সে রাজপুত, যুদ্ধের সময় শুধু বোঝে যুদ্ধ। তার এখন একমাত্র ভাবনা, কতো তাড়াতাড়ি শিবাজীকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়।

একটা মেঘ এসে ঢেকে ফেললো আধখানা চাঁদকে। ঈষৎ অন্ধকার হোলো চারদিক। কেউ লক্ষ্য করলো না যে, পথের পাশের নিবিড় অন্ধকার ছায়ার ভেতর থেকে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে আসছে আরেকটি আকৃতি।

মেঘ কেটে যেতে শিবাজী আর আবিদ হুসেন দুজনেই দেখতে পেলো তাকে। সে ততক্ষণে গুঁড়ি মেরে শক্তিসিংহের পেছন দিকে

এসে গেছে। চাঁদের আলো পড়তে ঝকমক করে উঠলো তার হাতের ছোরা।

শিবাজী আর আবিদ হুসেন একসঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হুঁশিয়ার করে দিলো শক্তিসিংহকে। শক্তিসিংহ লাফিয়ে সরে গেল একপাশে। সে লোকটা আবার এগিয়ে যাচ্ছিলো শক্তিসিংহের দিকে। আবিদ হুসেন তার সামনে এসে পড়লো তাকে নিরস্ত করতে। সে তলোয়ার তুলে আঘাত করতে যাচ্ছিলো লোকটিকে। কিন্তু সে আশ্চর্য ক্ষীপ্রতার সঙ্গে আবিদ হুসেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আবিদ হুসেনের বুক লক্ষ্য করে ছোরা দিয়ে আঘাত করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শক্তিসিংহ এসে তলোয়ার বসিয়ে দিলো সে লোকটির পেটে। লোকটি শেষ চিৎকার করে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। আবিদ হুসেনের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল ঝনঝন করে। আবিদ হুসেন পেটের একটু উপরে হুহাত দিয়ে চেপে ধরে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়লো। ·শক্তিসিংহ এসে তাকে তুলে ধরলো।

আবিদ হুসেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, "দোস্ত, তোমারই জিত।" তারপরই সে বেহুঁশ হয়ে গেল।

শিবাজী এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো, "আবিদ হুসেন মরে গেল?"

শক্তিসিংহ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নাড়ি পরীক্ষা করে বললো, "না, বেঁচে আছে। বুকের একটু নিচে ছোরার আঘাতে জখম হয়েছে। মনে হচ্ছে ক্ষত খুব গভীর নয়। নাড়ি বড় দুর্বল।"

রক্তে ভিজে গেছে আবিদ হুসেনের জামাহ্‌র সামনের দিকটা। শিবাজীর মুখের চেহারায় একটা বেদনা ফুটে উঠলো।

মালোজী চিটনিস ঝুঁকে পড়ে দেখছিলো অন্য লোকটিকে। হঠাৎ বলে উঠলো, "একি? এ যে আমাদের কৃষ্ণাজী আপ্তে!"

"কৃষ্ণাজী আপ্তে?" বিস্মিত হোলো শক্তিসিংহ।

আরো বেশী বিস্মিত হোলো শিবাজী নিজে। "কৃষ্ণাজী? সে

এখানে এলো কি করে? শক্তিসিংহের উপর চড়াও হয়েছিলো কেন?"

শক্তিসিংহ অল্প কয়েকটি কথায় কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাগুলো জানালো।

"পান্নাকে? ওর হাত পা মুখ বেঁধে?" বলতে বলতে শিবাজীর মুখের চেহারা কঠিন হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "এসব লোকের পরিণতি এরকমই হয়। যাই হোক, ওর জন্যে আমার কোনো সহানুভূতি নেই।—শক্তিসিংহ, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা এবার বিদায় নিচ্ছি। তুমি আমার চরম বিপদের সময় আমাকে বাঁচাতে এসেছিলে, একথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আবিদ হুসেনকে ওর মোতিজানের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো, তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করো এক্ষুণি। ও যদি সুস্থ হয়ে ওঠে আমি খুব খুশী হবো। আমাকে পরে পত্র লিখে জানাবে ওর খবর। আবিদ হুসেনকে আমার শ্রদ্ধা ও স্নেহ জানাবে।"

শিবাজী আর অপেক্ষা করলো না। শম্ভুজী ও মালোজী চিটনিসকে নিয়ে এগিয়ে চলে গেল আবছা সড়ক ধরে।

শক্তিসিংহ তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। একটু দূরে অন্ধকার ছায়ায় মিলিয়ে গেল ওরা তিনজন।

শক্তিসিংহ তাকালো আবিদ হুসেনের দিকে। অসুস্থ শিশুকে যেরকম কোলে তুলে নেয় তার জননী, তেমনি আবিদ হুসেনকে দুহাতে তুলে নিলো শক্তিসিংহ। খুব সন্তর্পণে তাকে নিয়ে উঠে পড়লো নিজের ঘোড়ার উপর। রাশ ধরলো না, ধরার প্রয়োজন হোলো না। সুশিক্ষিত অশ্ব শহরের দিকে ছুটে চললো অতি দ্রুতগতিতে অথচ সতর্কতার সঙ্গে, যাতে তার প্রভু ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে না যায় পিঠের উপর থেকে।

মুনশী গিরধরলাল তখন শিবাজীর শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো তেজসিংহ ও রণসিংহের সঙ্গে।

রণসিংহ জানালো,—শিবাজী ঘুমিয়ে আছে নিজের কক্ষে, সে একটু আগে দরজার কাছ থেকে দেখে এসেছে।

তেজসিংহ বললো,—শিবাজী আজ গুরুতর অসুস্থ। এজন্যে সকাল করেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিছু খাননি।

জীবো জোশী আর শ্রীকিষণ স্তব্ধ মর্মরমূর্তির মতো হাতিয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর প্রবেশপথে। গিরধরলাল উকীল আর বল্লু শাহ গম্ভীর মুখে খোলা তলোয়ার হাতে পায়চারি করছে শিবিরের সামনে। বলিরাম আর হরিকিষণ এসে মুনশী গিরধর-লালকে জানালো, সন্ধ্যার পর চারবার মেওয়া-মিঠাইয়ের ঝুড়ি বেরিয়েছে শিবির থেকে। শেষজন চলে গেছে একঘড়ি আগে। আজকের মতো এই শেষ।

নিচু গলায় কথাবার্তা বলতে বলতে,আরো একঘড়ি সময় কেটে গেল। দূরে ঘড়িয়ালিতে রাত্রি প্রথম প্রহরের ঘণ্টা পড়লো।

রণসিংহ বললো, "আরেকবার দেখে আসি শিবাজীকে।"

"না, না, কী দরকার," বলে উঠলো মুনশী গিরধরলাল, "উনি খুব অসুস্থ। হয়তো জেগে যাবেন।"

তেজসিংহ সায় দিলো মুনশী গিরধরলালের কথায়।

মুনশী গিরধরলাল সে রাতে আর বাড়ি ফিরলো না। ঠায় জেগে বসে রইলো সবার সঙ্গে।

॥ ছয় ॥

উনিশে আগস্টের সেই সোমবারের শান্ত স্নিগ্ধ রাত কেটে গেল, সকল বেলার সোনালী রোদ্দুরে ঝলমল করে মঙ্গলবার শুরু হোলো আগ্রা শহরের দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য দিনের মতো। যমুনার তীরে তাজমহলের শুভ্র গম্বুজে পড়লো গোলাপী উষার প্রথম আলো, নহবৎ বেজে উঠলো কেল্লার নাকার-খানায়। চওক মহল্লার দোকান-পাট খুলে গেল, ভিড় বাড়তে শুরু করলো আস্তে আস্তে। গরম-গরম তন্দুরী রুটি আর পায়ার সুরুয়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো খাবারের দোকান থেকে। কেল্লায় বাদশাহ্‌র বিভিন্ন কারখানার কারিগর আর মজুরেরা শুরু করলো তাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাটুনি।

শহরের এধারে খোজা ফিরোজার বাগে শিবাজীর শিবিরের সামনে মোগল ও রাজপুত পাহারাদারদের চোখ তখন নিশি-জাগরণের ক্লান্তিতে ভারী হয়ে আছে। শিবিরের ভিতর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সূর্যোদয়ের পর এক ঘড়ি সময় কেটে গেল। রণসিংহ বললো, "এবার একবার দেখে আসি।"

"না, না, ওদের ঘুমুতে দাও," বলে উঠলো মুনশী গিরধরলাল। সেও সারারাত জেগে বসে ছিলো সবার সঙ্গে।

তেজসিংহ বললো, "রেওয়াজের ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়। রণসিংহ গিয়ে দেখে আসতে পারে। তবে নিঃশব্দে। কারো যেন ঘুম না ভাঙে। শুধু পর্দা তুলে একটুখানি উ কি মেরে দেখবে।"

রণসিংহ এগিয়ে গেল তাঁবুর দিকে। মুনশী গিরধরলালের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। কানাতের পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলো

রণসিংহ। দেখতে পেলো, শিবাজীর শয্যার উপর রিজাইএর ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে শুধু একটি শুভ্র হাত। সে হাতের মণিবন্ধে ঝকমক করছে ভারী স্বর্ণবলয়, যেটি শিবাজী কখনো হাত থেকে খুলতো না, রাজচিহ্নরূপে পরে থাকতো সব সময়। মুখ অন্যদিকে ফেরানো। পায়ের দিকে মেঝের উপর বসে একজন ভৃত্য আস্তে আস্তে পা টিপে দিচ্ছে।

রণসিংহ ফিরে এসে জানালো, শিবাজীর ঘুম ভেঙেছে, তবে মনে হোলো বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

মুনশী গিরধরলাল দাঁড়িয়ে রইলো ভাবলেশবিহীন মুখ করে।

একটু পরে বেরিয়ে এলো সেই ভৃত্য।

"শিবাজী কেমন আছেন এখন?" জিজ্ঞেস করলো বলিরাম পুরোহিত।

ভৃত্য বিষণ্নমুখে উত্তর দিলো, "এখনো খুব জ্বর। সারা গায়ে এত ব্যথা যে নড়াচড়া করতে পারছেন না।"

সে চলে গেল। কোনদিক দিয়ে কোথায় গেল কেউ লক্ষ্য করলো না।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হীরাজী ফরজন্দ সারারাত নির্ভাবনায় ঘুমিয়েছিলো শিবাজীর শয্যার উপর। সে জানতো যে রাত্রে কেউ এসে আর বিরক্ত করবে না। খুব ভোরে ভোরেই ঘুম ভেঙেছিলো। কান খাড়া করে বুঝবার চেষ্টা করছিলো শিবিরের বাইরের পরিস্থিতি। একসময় রণসিংহ এসে যে পর্দা তুলে উঁকি মেরে দেখে চলে গেল, তাও বুঝতে পারলো। হীরাজী নিশ্চিন্ত হোলো। এখন পর্যন্ত কারো মনে কোনো সন্দেহ হয়নি। এক রাত অনেকখানি সময়। শিবাজী, শম্ভুজী, নীরাজী রাওজী, দত্ত ত্রিম্বক ও রঘুমিত্র পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই মথুরায় পৌঁছে গেছেন এতক্ষণে।

মুখ ফিরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে নিলো হীরাজী। আস্তে আস্তে উঠে পড়লো। হাত থেকে খুলে ফেললো শিবাজীর স্বর্ণবলয়। তার নিজের পরিকল্পনাও নির্ধারিত হয়ে আছে। শহরের বাইরে দুতিনজন অনুচর ঘোড়া সাজিয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সে তাদের কাছে উপস্থিত হলেই সবাই রওনা হবে গোয়ালিয়রের পথ ধরে। এখন তাকে চুপচাপ বেরিয়ে পড়তে হবে শহর থেকে। শিবাজীর সম্বন্ধেই যতো কড়াকড়ি, আর কারো জন্যে নয়। সুতরাং শহর থেকে বেরিয়ে পড়তে হীরাজীর কোনো অসুবিধে হবে না।

হীরাজী যখন জীবো জোশী আর শ্রীকিষণকে পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো শান্ত পদক্ষেপে, তখন দিনের প্রায় দুঘড়ি বেলা।

তাকে দেখে তেজসিংহ বললো, "রাম রাম।"

"রাম রাম," হাসিমুখে উত্তর দিলো হীরাজী ফরজন্দ।

"কোথায় যাচ্ছেন এত সকালে?"

"যমুনার তীরে এক সন্ন্যাসী এসে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছেন শুনেছি। কৃষ্ণাজী বলছিলো, উনি নাকি সিদ্ধ পুরুষ। ওঁর কাছে গিয়ে দেখি, যদি কৃপা করে শিবাজীর রোগ উপশমের কোনো ব্যবস্থা করে দেন।"

"শিবাজী কেমন আছেন?" জিজ্ঞেস করলো বল্লু শাহ।

"খুব অসুস্থ," হীরাজী ফরজন্দ করুণ মুখ করে বললো, "রোগ সারবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"

"খুবই আফসোসের কথা" বললো মুনশী গিরধরলাল।

হীরাজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো দু-চার কথা বললো সবার সঙ্গে। কোনোরকম ব্যস্ততা দেখালো না। তারপর চলে যাওয়ার আগে পাহারাদারদের বলে গেল, "আপনারা যদি অনুগ্রহ করে কোনোরকম আওয়াজ এখানে না করেন, আমরা খুবই বাধিত হবো। শিবাজীর এই নিদারুণ অসুখের মধ্যে তাঁকে যতোটা সম্ভব

শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে রাখবার বিধান দিয়েছেন আপনাদের দরবারের রাজবৈদ্য।"

তেজসিংহ ও রণসিংহ হীরাজীকে আশ্বাস দিলো যে, শিবাজীর শান্তির বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত হবে না। বাদশাহ্‌র হুকুম বলেই তাদের সবাইকে এখানে পাহারা দেওয়ার অপ্রীতিকর কর্তব্য সম্পাদন করতে হচ্ছে, তা নইলে যে কোনো রাজপুত শিবাজীকে নিজেদের মহা-রাজার মতোই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

হীরাজী ফরজন্দ চলে গেল। বল্লু শাহ ও গিরধরলাল উকীল এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করতে লাগলো গম্ভীর মুখে। তেজসিংহ, রণসিংহ, মুনশী গিরধরলাল, জীবো জোশী, হরিকিষণ, শ্রীকিষণ ও বলিরাম দাঁড়িয়ে রইলো যে যার নিজের জায়গায়। বাইরে দরওয়াজার ওপারে তোপ দুটোর পেছনে তখন ঘনঘন হাই তুলছে বক্সারিয়া গোলন্দাজেরা। ওদিকে গাছতলায় বসে জটলা করছে চৌকির মোগল লশকরেরা। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চেপে টহল দিচ্ছে এক একদল সিলাহদার। খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে চৌকির এক হাজার লোক তখন ক্লান্ত হয়ে আছে। কিন্তু আরো চারঘড়ি সময় এখানে থাকতে হবে। চৌকির বদল হবে বেলা দ্বিপ্রহরে। তখন এক হাজার লশকরের আরেকটি দল আসবে কেল্লা থেকে। তাদের হাতে পাহারার ভার দিয়ে এই এক হাজারের ছুটি।

কেটে গেল আর একঘড়ি সময়। দূরে ঘড়িয়ালিতে শোনা গেল বেলা প্রথম প্রহরের ঘণ্টা।

পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে মহারাজকুমার রামসিংহের খুফিয়ানবিস পরকাল দাস ও বল্লু শাহ কয়েকটি গোপনীয় পত্র লিখেছিলো মহারাজ জয়সিংহের দিওয়ান কল্যাণদাসকে। জয়পুরের দস্তাবেজখানায় সুরক্ষিত এ সমস্ত ডিঙ্গলভাষায় লেখা পত্র থেকে এবং মোগল দরবারের তৎকালীন ফারসী আখবারাত থেকে পাওয়া

যায় আগ্রা শহরের এই কয়েকটি উত্তেজনাময় দিনের বিস্তারিত বিবরণ।

প্রথম প্রহরের পর যখন আরো এক ঘড়ি সময় কেটে গেল, পাহারাদারদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত হোলো। শিবিরের ভিতর কোনো লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। অন্যান্য দিন এ সময় শুরু হয়ে যায় বারবরদারদের আনাগোনা। অভ্যাগতরা আসতে শুরু করে শিবাজীর খোঁজখবর করতে। ভৃত্যদের মধ্যে দেখা যায় ব্যস্ততা, কর্মচাঞ্চল্য। আজ কোথাও কারো চিহ্ন নেই। হীরাজী ফরজন্দ বেরিয়ে গেছে প্রায় দু-ঘড়ি আগে। তারও এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত।

তেজসিংহ, রণসিংহ আর বল্লু শাহ নিজেদের মধ্যে একটু পরামর্শ করলো। রণসিংহ বললো, "আমি গিয়ে দেখে আসছি কী ব্যাপার।"

মুনশী গিরধরলাল চুপচাপ শুনলো।

রণসিংহ তাঁবুর সামনে গিয়ে পর্দা তুলে উঁকি মারলো। তারপর হঠাৎ দ্রুতগতিতে ভিতরে ঢুকলো। তেজসিংহ ও বল্লু শাহ্‌র ভ্রূকুঞ্চিত হোলো। কয়েক মুহূর্ত পরে রণসিংহ ছুটে বেরিয়ে এলো। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, "কেউ নেই। সবাই পালিয়ে গেছে।"

তেজসিংহ, গিরধরলাল মুনশী, বল্লু শাহ ছুটে গিয়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকলো। তিনটি কক্ষই একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই কোথাও।

"পালিয়ে গেছেন শিবাজী? গেলেন কি করে? কখন?" প্রশ্ন করলো তেজসিংহ আর বল্লু শাহ। তারপর দুজনে গিরধরলাল মুনশীকে জড়িয়ে ধরে উল্লাসে লাফাতে লাগলো, "পালিয়ে গেছেন, শিবাজী পালিয়ে গেছেন।"

মুনশী গিরধরলাল দুজনকে থামালো, বললো, "এত উল্লাস প্রকাশ কোরো না। এই উল্লাস মোগলদের চোখে পড়লে মুশকিল

হবে। শিবাজীর জন্যে কাকে জবাবদিহি করতে হবে ভেবে দেখেছো? তোমরাই পাহারায় ছিলে—।"

হঠাৎ একথা খেয়াল হতেই তেজসিংহ আর বল্লু শাহর মুখ শুকিয়ে গেল। বলে উঠলো, "তাই তো, কি হবে? বাদশাহ আমাদের কোতল করবেন।"

"দেখা যাক, তোমাদের বাঁচানোর কি উপায় করা যায়," গিরধরলাল মুনশী বললো, "তোমরা কোতোয়ালকে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি এখনই যাচ্ছি মহারাজকুমার রামসিংহের কাছে।"

তৎক্ষণাৎ খবর চলে গেল বাইরের মোগল লশকরদের কাছে। কয়েকজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে কোতোয়ালিতে ফুলাদ খাঁর কাছে খবর দিতে ছুটলো। হৈ চৈ পড়ে গেল খোজা ফিরোজার বাগের চারদিকে।

তখন দিনের পাঁচঘড়ি সময়। আম-দরবার থেকে বাদশাহ্ চলে এসেছে দিওয়ান-ই-খাসে। সবে জাফর খাঁ কোনো এক সুবাদারের আরজ-দশ্ত পড়ে শোনাতে শুরু করেছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে হাজির হোলো কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদ খাঁ। বাদশাহ্কে তসলিম করে জানালো মর্মান্তিক খবর,—শিবাজীকে তাঁবুর ভিতর পাওয়া যাচ্ছে না, শিবাজী সম্ভবত পালিয়ে গেছেন।

আওরংজেব চট করে তখ্তএর উপর খোজা হয়ে বসলো। মুখ রাগে সাদা হয়ে গেল। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো অঙ্গারের মতো। কিন্তু শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "চারদিকে এত পাহারা, এক হাজার লোক, দরওয়াজায় দু-দুটো তোপ, পালালো কি করে?"

"আমার কোনো দোষ নেই জাহাঁপনাহ্," উত্তর দিলো ফুলাদ খাঁ, "আমি তো পাহারার নিখুঁত বন্দোবস্ত করেছিলাম। তার ভিতর থেকে কারো পালানো অসম্ভব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো

তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার আছে। শিবাজীর লোকেরা এই কদিন সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে খুব আনাগোনা করছিলো। তাদের অলৌকিক শক্তির কোনো খেল আছে এর মধ্যে।"

দরবারের সব উমরাহ তটস্থ হয়ে আছে। সবার মনে একটা ভীষণ উত্তেজনা। বাদশাহ ফুলাদ খাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "ওসব তন্ত্রমন্ত্র অলৌকিক শক্তির অলীক কাহিনী আমি শুনতে চাইনা। তুমি গিয়ে ভালো করে খোঁজ নাও। যারা পাহারায় ছিলো, তাদের সহায়তা ছাড়া শিবা পালাতে পারে না। কারা অপরাধী তাদের খুঁজে বার করো। একথা ভুলে যেওনা, পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো তোমাকে। অপরাধীদের খুঁজে পাওয়া না গেলে তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।"

ফুলাদ খাঁ চলে গেল। বাদশাহ উজিরের দিকে ফিরে বললো, "এখনই পরোয়ানা পাঠিয়ে দিন চারদিকে, সমস্ত ঘাট ও সড়কের উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়। সমস্ত ঘাটগুলো যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিলাহদার ও হরকরা পাঠিয়ে দিন চারদিকে। দক্কানে যাওয়ার সমস্ত সড়ক বন্ধ করে দিন। শিবা এরই মধ্যে নিশ্চয়ই বেশীদূর যেতে পারেনি।"

উজীরের সহকারী দিওয়ান-ই-তন হুকুম অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে চলে গেল।

বাদশাহ অবিচলিত ভাবে বললো জাফর খাঁকে, "হ্যাঁ, বাহাদুর খাঁর আরজ দশ্‌তটা এবারে শোনা যাক।"

সবার এত উত্তেজনা সত্ত্বেও বাদশাহ অবিচলিত ভাবে খাস-দরবারের দৈনন্দিন কর্মসূচী অব্যাহত রাখলো।

দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ আগে ফিরে এলো ফুলাদ খাঁ। বাদশাহকে জানালো যে জীবো জোশী, শ্রীকিষণ, বলিরাম পুরোহিত আর হরি-কিষণ, এই চারজন কছওয়া শিবাজীর তাঁবুর সামনে পাহারা দিচ্ছিলো। তাদের ধরে এনে কয়েদ করা হয়েছে। তাদের নাকে

নুন ঠেসে দিয়ে কোরা লাগানোর ভয় দেখানোর পর ওরা স্বীকার করেছে যে মহারাজকুমার রামসিংহ শিবাজীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

"কোতোয়ালির লোকের কোনো দোষ নেই জাহাঁপনাহ," বললো ফুলাদ খাঁ, "কুমার রামসিংহের পাহারাদারদের মধ্যে দিয়েই শিবাজী পালিয়েছেন। ওরা তাঁকে সাহায্য করেছে।"

"তুমি ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছো?" গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো আওরংজেব, "কুমার রামসিংহ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমার দরবারের পাঁচ হাজারী মনসবদার। তার সম্বন্ধে শুধু শোনা কথার উপর আমি নির্ভর করতে পারিনা।"

ফুলাদ খাঁ উত্তর দিলো, "জীবো জোশী আর ওর সঙ্গীরা বললো, —শুধু আমরা তো নয়, আরো কয়েকজন পাহারায় ছিলো। ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করা হোক। তখন আমার কাছে নিয়ে আসা হোলো তেজসিংহ, রণসিংহ, বল্লু শাহ, গিরধরলাল মুনশী আর গিরধরলাল উকীলকে। ওরাও আমার কাছে কবুল করলো শিবাজীর সঙ্গে কুমার রামসিংহের সহযোগিতার কথা। আমি এদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি ফৌজদার ফিদাই খাঁর কাছে।"

"আরো খবর নাও," হুকুম দিলো বাদশাহ, "আমি জানতে চাই এত লোকের নজর এড়িয়ে শিবা পালালো কি করে। আজকের মধ্যে সমস্ত বিবরণ আমার চাই। চারদিকে লোক লাগিয়ে অনুসন্ধান করো।"

ফুলাদ খাঁ চলে যাওয়ার পর আওরংজেব বললো, "কুমার রামসিংহ যে শিবাকে সাহায্য করেছে, এর কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু এই অনুমান অযৌক্তিক নয়। ওর সাহায্য ছাড়া এরকম ভাবে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমি কারো উপর কোনো অবিচার করতে চাইনা। বিনা প্রমাণে রামসিংহকে আমি কোনো সাজা দিতে চাইনা। তবে আমার অসন্তোষের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই হুকুম

জারি করা হোক যে, আজ থেকে কুমার রামসিংহকে দরবারে হাজির হতে মানা করে দেওয়া হোলো। ওর মনসব কমিয়ে দেওয়া হোক দু হাজার সওয়ার। রামসিংহের জায়গির থেকে কোটপুতলি পরগনা ও মন্দাওয়ার পরগনা বাজয়াফৎ করা হোক। এই মন্দাওয়ার পরগণা দাউদ খাঁকে জায়গির দিয়ে আমরা আমাদের মেহেরবানি প্রকাশ করলাম।"

সেদিন আম-দরবার চললো অনেকক্ষণ। দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ আগে হাজির হোলো আগ্রার ফৌজদার ফিদাই খাঁ। বাদশাহকে তসলিম করে জানালো, "জাহাঁপনাহ্, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। কুমার রামসিংহ শিবাজীকে সাহায্য করেছেন বলে মনে হয়না।"

"কেন? যে সব কছওয়াকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছিলো ওরা কি কবুল করেনি?" বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো।

"জাহাঁপনাহ্, ওরা এসে আমায় অনুরোধ করলো ফুলাদ খাঁর পিয়াদাদের সরিয়ে দিতে। তারপর গিরধরলাল মুনশী নিজের যজ্ঞোপবীত বার করে বললো,—আমরা ব্রাহ্মণ, মিথ্যা কথা বলবো না, ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাদের। যদি কুমার রামসিংহ শিবাজীকে সাহায্য করতেন, আমরা আপনাকে সেকথা জানাতে দ্বিধা করতাম না। কিন্তু কুমার রামসিংহ এ ব্যাপারের কিছুই জানতেন না।—আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে ফুলাদ খাঁর সামনে ওরা একথা কবুল করেছিলো কেন। বল্লু শাহ জানালো, ফুলাদ খাঁ তাদের উপর পীড়ন করার ভয় দেখিয়েছিলো। আমি তাদের নানারকম ভাবে জেরা করলাম। মনে হোলো, ওরা সত্যি কথাই বলছে। ওদের আমি কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ফুলাদ খাঁকে জানিয়েছি, এদের উপর যেন পীড়ন করা না হয়।"

"ফুলাদ খাঁ তাহলে জবরদস্তি করে এদের দিয়ে কবুল করিয়েছিলো তার মনের মতো কথা?" বলে উঠলো বাদশাহ। "তাহলে কুমার রামসিংহকে আজ অপরাহ্নেই খিলওয়াতগাহ্‌তে ইত্তলা দেওয়া

হোক। তবে তার জারগির বাজ্‌য়াফ্‌ৎ করা সম্বন্ধে যে হুকুম দিয়েছি সেটা বহাল থাকবে।"

আওরংজেব কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলো। তারপর হঠাৎ আকিল খাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "আবিদ হুসেন কোথায়? ওতো আজ সকালে খিলওয়াতগাহ্‌তে হাজির হয়নি।"

"আমার সঙ্গেও আজ দেখা হয়নি জাহাঁপনাহ্‌।"

"ওর খবর নিয়ে আমাকে জানানো হোক। ওতো কোনোদিন অনুপস্থিত থাকে না। আজকের এমন দিনে সে যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তাহলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরবারের কর্তব্য।"

অপরাহ্ণে খিলওয়াতগাহ্‌তে এসে কুমার রামসিংহ তসলিম জানালো বাদশাহ্‌কে। বাদশাহ গম্ভীরকণ্ঠে তাকে হুকুম দিলো সে যেন আগ্রায় অযথা কালক্ষেপ না করে শিবাজীর সন্ধানে লেগে যায়।

রামসিংহ জানালো যে, অবিলম্বে সে ঢোলপুর রওনা হবে, এবং নিজের লশকরদের পাঠিয়ে দেবে চারদিকে।

রামসিংহ বিদায় নেওয়ার পর হাজির হোলো ফুলাদ খাঁ। তার পেছন পেছন দুজন লোক বয়ে নিয়ে এলো দুটো খালি ঝুড়ি। ফুলাদ খাঁ জানালো, খোজা ফিরোজার বাগের ওদিক থেকে যে সড়ক চলে গেছে পশ্চিম দিকে, সেখানে এক নির্জন জায়গায় পথের পাশে পাওয়া গেছে এই দুটো ঝুড়ি। একটি ঝুড়ির ভিতর পাওয়া গেছে একটি রুমালি, অন্যটিতে একটি চাদর। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এই চাদর শম্ভুজীর।

"এতো বড়ো দুটো ঝুড়ি খোজা ফিরোজার বাগ থেকে বেরিয়ে গেল, চৌকির কোনো লোকের সন্দেহ হোলো না?" জিজ্ঞেস করলো বাদশাহ।

"এরকম ঝুড়ি তো প্রত্যেকদিন বেরোচ্ছিলো। এসব ঝুড়িতে করে শিবাজী সওগাত পাঠাতেন উমরাহদের কাছে।"

"এতবড়ো ঝুড়ি? একটি আস্ত মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে এর মধ্যে। দেখলেই মতলবটা বোঝা যেত। আমায় তো জানানো হয়নি যে এত বড়ো বড়ো ঝুড়িতে করে মেওয়ামিঠাই পাঠানো হচ্ছে।"

"আমাদের কসুর হয়ে গেছে জাহাঁপনাহ," ফুলাদ খাঁ আড়ষ্টস্বরে বললো, "আমরা ভাবতে পারিনি।"

"ঝুড়ি তল্লাশ করা হোতো না?"

"প্রথম দিকে হোতো। তারপর সব সময় তল্লাশ করা হোতো না। কিন্তু পাহারাদারেরা সব সময় তাঁবুর ভিতর গিয়ে একবার দেখে আসতো শিবাজীকে।"

আওরংজেব রাগে ঠোঁট কামড়ালো। তারপর বললো, "যাও এখান থেকে। তোমার মতো বেওকুফের মুখের দিকে তাকালেই আমার সারা শরীর জ্বলে উঠছে। হয়তো রাগ করে শেষ পর্যন্ত তোমাকেই কোতল করার হুকুম দেবো। আমার সামনে বেশীক্ষণ থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।"

ফুলাদ খাঁ একটু ইতস্তত করলো। তারপর বললো, "আরো একটা খবর আছে জাহাঁপনাহ্।"

"কি খবর বলো সংক্ষেপে।"

"ঝুড়ির কাছে পাওয়া গেছে কৃষ্ণাজী আপ্তের মুর্দা। কেউ তার পেটে তলোয়ার বসিয়ে দিয়েছে। পথের ধুলোয় দুজন লোকের পায়ের ছাপ। মনে হোলো তলোয়ার নিয়ে লড়াই হয়েছে কিছুক্ষণ। ঘোড়ার পায়ের ছাপও পেয়েছি। একটি ঘোড়া খুব দ্রুত শহরের দিকে চলে গেছে। পথের জায়গায় জায়গায় রক্ত শুকিয়ে আছে।"

আওরংজেব ভ্রূকুঞ্চিত করলো। জিজ্ঞেস করলো, "ঘোড়া চলে এসেছে শহরের দিকে! তাহলে শিবার লোক নিশ্চয়ই নয়। কৃষ্ণাজীকে শিবার লোক মারবে না। আমাদের কেউ কি সেখানে গিয়েছিলো বলে জানা গেছে?"

"জাহাঁপনাহ," ফুলাদ খাঁর মুখে একটু হাসি দেখা দিলো, "আবিদ হুসেন খাঁকে কাল সন্ধ্যায় দেখা গিয়েছিলো খোজা ফিরোজার বাগের কাছাকাছি। আমাদের একজন পিয়াদা লক্ষ্য করেছিলো যে, একজন বারবরদার ভারা নিয়ে শহরের দিকে না গিয়ে ওই নির্জন সড়কের দিকে যাচ্ছে। তার কিছুক্ষণ পরে সে দেখতে পেলো যে আবিদ হুসেন খাঁও সেদিকে যাচ্ছে ঘোড়া হাঁকিয়ে। এর আগে তাকে দেখা গিয়েছিলো একটি গাছের নিচে, সেখানে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলো শিবাজীর তাঁবুর দিকে। লক্ষ্য করছিলো লোকজনের যাওয়া আসা।"

আওরংজেব বললো, "আবিদ হুসেন দেখছি এবেলাও আমার কাছে হাজির হয়নি। কি হোলো ওর?" আকিল খাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ওকে ইত্তলা দেওয়া হয়েছে?"

আকিল খাঁ জানালো, একজন হরকরা পাঠানো হয়েছিলো আবিদ হুসেনের সন্ধানে। সে ফিরে এসে জানিয়েছে, মোতিবিবির বাড়িতে শয্যাশায়ী হয়ে আছে আবিদ হুসেন।

"শয্যাশায়ী হয়ে আছে?" আওরংজেবের চোখ দুটি কুঞ্চিত হোলো, "শয্যাশায়ী হয়ে আছে কেন?"

আকিল খাঁকে খুব ম্রিয়মান দেখালো। সে উত্তর দিলো, "আবিদ হুসেন জখম হয়েছে। কেউ ওর পেটের একটু উপরে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলো।"

আওরংজেব চট করে উঠে দাঁড়ালো।

আবিদ হুসেনের জ্ঞান ফিরেছিলো দ্বিপ্রহরের কিছু আগে। শক্তিসিংহ ঠিকই ধরেছিলো। তার ক্ষত খুব গভীর হয়নি। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণের দরুণ সে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো খুব। চোখ খুলে দেখতে পেলো পাশে বসে আছে মোতিজান।

আবিদ হুসেন মোতিজানের হাত ধরলো। তারপর একটু হেসে

ক্ষীণকণ্ঠে বললো, "কী মোহব্বতের টান! মরবারও উপায় নেই। ঘুরে ফিরে তোমার কাছে আসতেই হবে।"

"কথা বলবে না," তাড়া দিলো মোতিজান, "হাকিম সাহাব বলেছেন তোমায় কথা বলতে না দিতে। উনি দুবার এসে দেখে গেছেন। যেখানে জখম হয়েছে সেখানে ভালো করে ওষুধ লাগিয়ে মলমল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নড়াচড়া কোরো না।"

আবিদ হুসেন কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে রইলো। তারপর বললো, "আমি এখানে এলাম কি করে?"

"শক্তিসিংহ তোমায় নিয়ে এসেছিলো কাল রাত্রে।"

আবিদ হুসেন আবার কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "শহরের কোনো খবর জানো?"

"খুব জোর খবর," বললো মোতিজান, "সবাই বলছে, শিবাজী নাকি পালিয়ে গেছেন। খুব হৈচৈ পড়ে গেছে চারদিকে। কিন্তু তুমি এ খবর নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না বলে দিচ্ছি। যদ্দিন তুমি সুস্থ না হও, তদ্দিন তুমি আমার কাছে থাকবে।"

"একবার আকিল খাঁকে খবর দিতে হবে।"

"কাউকে খবর দিতে হবে না। তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো।"

আবিদ হুসেন আবার কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, "মোতিজান, আমায় যে এখানে নিয়ে এসেছে শক্তিসিংহ, একথা কাউকে জানিয়ো না। ওর বিপদ হতে পারে।"

"আচ্ছা।"

মোতিজান ওষুধ খাইয়ে দিলো আবিদ হুসেনকে, তারপর খাওয়ালো ফলের রস।

কিছুক্ষণ পরে আবিদ হুসেন ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আবিদ হুসেন চোখ খুলে দেখলো, মোতিজান তখনো পাশে বসে আছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে।

"মোতিজান!"

"এখন একটু আরাম লাগছে?"

"খুব আরাম লাগছে," উত্তর দিলো আবিদ হুসেন, "এরকম জখম না হলে কি এতক্ষণ তোমার কাছে পড়ে থাকার সুযোগ পেতাম? একটা শের বলছি শোনো—"

"না, আর শের বলতে হবে না। তুমি চুপ করে থাকো।"

"মোতিজান, বাদশাহ সলামত নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি কোথায় গেলাম। ওঁর কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে আকিল খাঁর মারফত।"

"খবর উনি নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন," বললো মোতিজান।

"কি করে খবর পেলেন?"

"আকিল খাঁ একজন হরকরা পাঠিয়েছিলো তোমায় খিলওয়াত-গাহ্‌তে হাজির হওয়ার ইত্তলা দিতে। আমি তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি।"

আবিদ হুসেন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "একবার বাদশাহ্‌র কাছে হাজির হতে পারলে ভালো হোতো।"

"না, এখন আর হাজির হতে হবে না বাদশাহ্‌র কাছে। তুমি আমার দরবারে হাজির থাকলেই হবে।"

আবিদ হুসেন হাসলো।

"শোনো মিয়াঁ," বললো মোতিজান, "তোমাকে আর দরবারের খিদমতে হাসিল থাকতে হবে না। কাল তুমি জখম হয়ে ফিরেছো, তারপর একদিন হয়তো ফিরবেই না।" বলতে বলতে মোতিজানের চোখে জল এলো, "তুমি ইস্তফা দাও মনসবদারি থেকে।"

"তারপর?"

"এই আগ্রা শহরে আমরা আর থাকবো না। অন্য কোথাও চলে যাবো, যেখানে দরবারের এসব ঝামেলা নেই," বললো মোতিজান।

আবিদ হুসেন কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো। কিন্তু কিছু বলা হোলো না। সিঁড়িতে শোনা গেল কয়েকজনের ভারী পদশব্দ।

মোতিজান মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

চার পাঁচজন লোকের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো ফুলাদ খাঁ।

মোতিজানের মুখ শুকিয়ে গেল।

"আবিদ হুসেন," ফুলাদ খাঁ খুব আনন্দিত কণ্ঠে বললো, "শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র হুকুমে তোমায় গিরফতার করা হোলো। তুমি প্রতিরোধ না করে আত্মসমর্পণ করো। তা নইলে আমরা তোমার উপর জবরদস্তি করতে বাধ্য হবো।"

আবিদ হুসেন ম্লান হাসি হাসলো। বললো, "আমি জখম হয়ে পড়ে আছি, প্রতিরোধ করতে যাবো কেন?"

"আমাদের যা বলার রেওয়াজ, তাই বললাম," উত্তর দিলো ফুলাদ খাঁ।

"কিন্তু গিরফ্‌তার করা হচ্ছে কেন?" মোতিজান ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "ওর কি কসুর?"

"শিবাজীর পলায়নের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আবিদ হুসেন খাঁর সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করার কারণ আছে মনে করা হচ্ছে।"

"সে কি?" আবিদ হুসেন বলে উঠলো, "না, না, এ হতে পারে না, বাদশাহ সলামত কি করে আমার সম্বন্ধে এরকম সন্দেহ করতে পারেন?"

"আমি শুধু হুকুম তামিল করতে এসেছি আবিদ হুসেন," গম্ভীর-কণ্ঠে উত্তর দিলো ফুলাদ খাঁ, "তুমি আমাদের সঙ্গে আসবার জন্যে তৈরী হও।"

মোতিজানের কণ্ঠস্বর হঠাৎ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল। কোনো-রকমে বললো, "কিন্তু ও যাবে কি করে? ও যে অত্যন্ত দুর্বল!"

"আমরা পাল্কি নিয়ে এসেছি।"

সেদিন সন্ধ্যায় দিওয়ান-ই-খাসের দরবার সমাপ্ত হবার পর সবাই যখন বাইরে বেরিয়ে এলো, উজীর জাফর খাঁ মহারাজ জসবন্ত সিংহের হাত ধরে নিয়ে গেল একপাশে। মহম্মদ আমিন খাঁও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলো।

জাফর খাঁ চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে হাসিমুখে বললো, "জসবন্ত সিংহ, আর ভাবনা কি, এবার দক্কানের মোগল ফৌজের মির বকশী হয়ে আওরঙ্গাবাদ রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।"

"ব্যাপার এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না," জসবন্ত সিংহ বললো, "বাদশাহ আমাদের বন্ধু জয়সিংহকে দক্কানের সুবাদারের পদ থেকে বরত্‌রফ্‌ করবেন কিনা তার নিশ্চয়তা কি?"

"কোনো ভাবনা নেই দোস্ত্‌, শিবাজী যখন একবার পালাতে পেরেছে, তখন জয়সিংহ আর নিজের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে দক্কানে থাকতে পারবেনা।"

মহম্মদ আমিন খাঁ বললো, "শিবাজী পালাতে পেরেছে বলে যে কী আনন্দ হচ্ছে আর বলার নয়। ও খুব শরীফ লোক, নানারকম সওগাত পেয়েছি ওর কাছ থেকে।"

"আনন্দ আমারও হচ্ছে," জসবন্ত সিংহ বললো, "জয়সিংহ আর জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, দরবারে মুখ দেখাতে পারবে না।"

"আনন্দ আমাদের সবারই হচ্ছে," বলে উঠলো উজীর জাফর খাঁ, "কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, আমাদের বাদশাহ টের পেলে এই আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ আর পাবে না।"

"শুনছি আবিদ হুসেনকে কয়েদখানায় নিয়ে আসা হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো জসবন্তসিংহ।

"ভালোই হয়েছে," উত্তর দিলো জাফর খাঁ, "ওরকম ভুঁইফোড় লোকের এই পরিণতিই হয়। আমি তিন বছরে যা পারিনি,

এ লোকটা ছ মাসের মধ্যেই তাই হোলো ? একেবারে এক হাজারী মনসবদার ?"

মহম্মদ আমিন খাঁ বললো, "বাদশাহ সলামত খুব রেগে আছেন। আবিদ হুসেনের মামলা সামনে থাকায়, ওরই উপর দিয়ে সব ঝড় বয়ে যাবে। অন্য সবাই বেঁচে গেল।"

"কিন্তু ওর কোনো দোষ আছে বলে মনে হয়না," জসবন্ত সিংহ মন্তব্য করলো, "ও সামান্য লোক। এ ব্যাপারে ওর কি হাত থাকতে পারে ? আমি বিশ্বাস করি না।"

জসবন্ত সিংহ বিস্তারিত খবর পেয়েছিলো শক্তিসিংহের কাছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজপুতবীর মুখ ফুটে সত্যিকথা কাউকে জানাতে সাহস পেলো না। তাতে নিজের লোকের জড়িয়ে পড়বার ভয় আছে।

"কার হাত আছে, কার হাত নেই, এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়," বললো জাফর খাঁ, "অপরাধ চাপানোর জন্যে একজন লোকের দরকার ছিলো। আবিদ হুসেনকে সুবিধে মতো পাওয়া গেল।"

আকিল খাঁ এদিকে আসছিলো। জাফর খাঁ তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ শুরু করলো।

সেদিন সন্ধ্যায় রংমহলেও খুব উত্তেজনা। শিবাজী পালিয়ে গেছে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সবার মুখে মুখে। খোজারা বেগমদের কাছে নানারকম খবর নিয়ে আসছে কেল্লার বিভিন্ন স্থান থেকে। সবার মুখে একই বিষয়ের আলোচনা। শিবাজী কি করে পালিয়ে যেতে পেরেছে সে সম্বন্ধে এক একজন এক একরকম অনুমান করে শোনাচ্ছে পরস্পরকে।

জেব-উন-নিসার মহলে শুধু চুপ করে বসেছিলো জিন্নত-উন্নিসা বেগম। সে কোনো কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছিলো না।

সেখানে রোশনআরা এলো খুব হাসিমুখে। জেব-উন-নিসাকে বললো, "মহারাজ জয়সিংহের ভবিষ্যৎ নিয়ে এরই মধ্যে নানারকম

জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। শাহ্-ইন-শাহ হয়তো ওঁকে ফিরে আসবার হুকুম দেবেন। আমাদের বরাত ফিরে গেল। এখন যারা দরবারে প্রাধান্য পাবে, সবাই আমার লোক।"

"শুনলাম, আবিদ হুসেন খাঁকে গিরফতার করা হয়েছে," জানালো জেব-উন-নিসা।

"আবিদ হুসেন খাঁ? সে আবার কে? ওসব সামান্য লোকের নাম মনে রাখার ফুরসত আমার নেই," বলে উঠলো রোশন-আরা, "ওদিকে গিয়ে দেখে এসো কী অবস্থা। নবাববাঈ, উদিপুরী, গওহর-আরা সবাই হায় হায় করছে চিড়িয়া উড়ে গেছে বলে। আমাদের জাহান-আরা বেগম সাহিবা নাকি ফুলাদ খাঁকে তাঁর মঞ্জিলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বেচারা ফুলাদ খাঁ! সবাই ওকে গালিগালাজ করছে। জসবন্ত সিংহের সুদিন এসে গেল। জয়সিংহকে সরিয়ে হয়তো এবার ওকেই মির বকশী করে আওরঙ্গাবাদ পাঠানো হবে।"

"এখনো কিছুই বলা যায় না," উত্তর দিলো জেব-উন-নিসা।

"হ্যাঁ, যতোক্ষণ না জানা যাচ্ছে যে শিবাজী নিজের এলাকায় পৌঁছে গেছে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি না," বললো রোশনআরা, "চারদিকে লশকর পাঠানো হয়েছে ওকে ধরতে। সুতরাং এখনো ভাবনা তো অল্পবিস্তর আছেই। কি বলো?" বলে রোশনআরা জিন্নত-উন-নিসার দিকে তাকালো।

জিন্নত-উন-নিসা কোনো উত্তর দিলো না। মুখ নামিয়ে নিলো। ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো ওর চোখ থেকে।

রোশনআরা ওর কাঁধে হাত রেখে খুব স্নেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, "আজ তোমার খুব কষ্ট হয়েছে,—না?"

"না ছোটী ফুফীজান," জিন্নত-উন-নিসা রুদ্ধকণ্ঠে বললো, "আজ আমার মনে খুব আনন্দ, এত আনন্দ যে আপনি ভাবতে পারবেন না।"

রোশনআরা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, "হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাহজাদীদের জিন্দগী। কারো কিছু করবার নেই।"

তারপরদিন একুশে আগস্ট, বুধবার।

সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মধ্যে বুধবার হোলো একটা বিশেষ দিন। এদিন দিওয়ান-ই-আমে আম-দরবার হয় না, তারপর খাস-দরবারও হয় না। সকালবেলা প্রত্যেকদিনকার রেওয়াজ মতো ঝরোকা-ই-দরশন-এ কিছুক্ষণ কাটানোর পর বাদশাহ সোজা চলে আসে দিওয়ান-ই-খাসে। কিন্তু বুধবার দিন দিওয়ান-ই-খাসের নাম অন্য,—সেদিন বলা হয় দিওয়ান-ই-মজালিম। এখানে বসে বাদশাহ্‌র বিচার-সভা। শুধু বিচারের জন্যেই এদিন নির্দিষ্ট। দরবারের উমরাহেরা কেউ সেদিন আসতে পারে না, উপস্থিত থাকে শুধু আদালতের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা,—যেমন, কাজি-উল-কুজাৎ আব্দুল ওয়াহাব বোরাহ্‌, দারোগা-ই-আদালত, মুফতি, অন্যান্য উলেমারা এবং শহরের কোতোয়াল।

এই বুধবার শুধু বিশেষ হুকুমে হাজির ছিলো আকিল খাঁ।

বাদশাহ এসে তখ্‌ৎ-এ উপবিষ্ট হওয়ার পর নিয়ে আসা হোলো আবিদ হুসেন খাঁকে। তার শরীর খুব দুর্বল। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিলো। তবু মুখে কোনোরকম কষ্টের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দিলো না। অবিচলিত ভঙ্গিতে তসলিম করলো বাদশাহ্‌কে। তারপর দুদিকে দেখলো। বাদশাহ, কাজি-উল-কুজাৎ, মুফতি, উলেমা, কোতোয়াল, দারোগা-ই-আদালত, কারো মুখে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখতে পেলো না। শুধু একটা স্নিগ্ধ চাউনি দেখলো আকিল খাঁর চোখে।

আবিদ হুসেন বুঝলো, আকিল খাঁ এখানে হাজির হয়েছে তার পক্ষসমর্থন করবার জন্যে।

বাদশাহ চোখ তুলে তাকালোও না তার দিকে। আবিদ হুসেন নিজের মনে একটু হাসলো।

দারোগা-ই-আদালত বাদশাহ্‌র সামনে এগিয়ে এসে তসলিম করে বললো, "জাহাঁপনাহ্, দরবারের মুফতি আপনার কাছে আবিদ হুসেনের নামে এক ফরিয়াদ পেশ করতে চায়। অপরাধী আবিদ হুসেনকে আপনার সামনে দাখিল করার হুকুম হোক।"

"আবিদ হুসেনকে আমার সামনে দাখিল করা হোক," হুকুম দিলো বাদশাহ।

"কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ আবিদ হুসেনকে জাহাঁপনাহ্‌র সামনে দাখিল করতে পারে," ঘোষণা করলো দারোগা-ই-আদালত।

ফুলাদ খাঁ আবিদ হুসেনকে নিয়ে কক্ষের মাঝখানে দাঁড় করালো, তসলিম করলো বাদশাহকে, তারপর সরে গেল একপাশে। আবিদ হুসেনের পেছনে খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে রইলো কোতোয়ালির দুজন পিয়াদা।

এবার এগিয়ে এলো দরবারের মুফতি। বাদশাহকে তসলিম করে বললো, "জাহাঁপনাহ, আবিদ হুসেনের বিরুদ্ধে আমার এই ফরিয়াদ যে, তার গাফিলতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে বাগী মারাঠা শিবা ভোঁসলের পক্ষে দরবারের বিনা হুকুমে শহরের কোতোয়ালের হিফাজত থেকে পলায়ন করা সম্ভব হয়েছে। আবিদ হুসেনের এই ইচ্ছাকৃত গাফিলতির ফলাফল যে কতো সুদূরপ্রসারী হতে পারে সে কথা যে তার অজানা ছিলো তা নয়। সুতরাং তার অপরাধ আরো গুরুতর। এই অপরাধ প্রমাণ করবার জন্যে আমি দুজন সাক্ষীকে এখানে দাখিল করছি। তাদের ইজাহার শুনলে আবিদ হুসেনের অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকবে না।"

দারোগা-ই-আদালতের নির্দেশে প্রথমে হাজির হোলো ফৌজের একজন পিয়াদা, আব্দুল হাকিম। মুফতির জেরার উত্তরে সে জানালো যে, সোমবার সন্ধ্যায় সে আবিদ হুসেনকে ঘোড়ার পিঠে

সওয়ার হয়ে দুতিনবার শিবাজীর তাঁবুর সামনের পথ দিয়ে যাওয়া আসা করতে দেখেছে। তারপর একসময় দেখেছে যে, আবিদ হুসেন কিছু দূরে একটি গাছের নিচে ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে একজন মারাঠা বারবরদার ভারায় বেঁধে দুটি বড়ো ঝুড়ি নিয়ে শিবাজীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে চলে গেল সড়ক ধরে। সড়ক সোজা চলে গেছে শহরের দিকে। কিছুটা এগিয়ে আরেকটি সড়ক। সেটি চলে গেছে পশ্চিম দিকে। বারবরদার শহরের পথ ছেড়ে সেদিকে চলে গেল। একটু পরে আবিদ হুসেনও ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সেদিকে।

দারোগা-ই-আদালত উচ্চকণ্ঠে জানালো যে, আবিদ হুসেনের পক্ষ নিয়ে যদি কেউ আব্দুল হাকিমকে জেরা করতে চায় সে শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র সামনে হাজির হয়ে তসলিম জানাতে পারে।

আকিল খাঁ এগিয়ে এসে তসলিম করলো বাদশাহকে। তারপর আব্দুল হাকিমকে কয়েকটি প্রশ্ন করলো। আব্দুল হাকিম জানালো যে, আবিদ হুসেন ঘোড়া নিয়ে গাছতলায় উপস্থিত হওয়ার পর অন্তত তিনজন বারবরদার বেরিয়ে এসেছে তাঁবু থেকে। এই তিনজন গেছে তিন দিকে। আবিদ হুসেন শেষ লোকটির বেরিয়ে আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলো। সে লোকটি একজন পাহারা-দারকে জানিয়েছিলো যে, তার পরে আর কেউ ঝুড়ি নিয়ে বেরোবে না। আবিদ হুসেন যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে এসব কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যায়। সে আরো জানালো যে,—কোনো বিশেষ ঝুড়ি দেখে তার ভিতর যে একজন মানুষ লুকিয়ে আছে একথা মনে করার কোনো কারণ ছিলো না। আবিদ হুসেনের চলে যাওয়ার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা ছিলো না। আকিল খাঁর প্রশ্নের উত্তরে সে এই অভিমত জানালো যে, শহরের দিকে ফিরে যাওয়ার আগে একটি সড়ক ছেড়ে অন্য সড়ক ধরে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে তফরি করতে যাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

আব্দুল হাকিমের জেরা শেষ হওয়ার পর মুফতি বাদশাহ্‌র সামনে দাখিল করলো কোতোয়াল ফুলাদ খাঁকে। মুফতির প্রশ্নের

খাঁ জানালো কি গিয়ে

পাশে দুটো পারিত্যক্ত ঝুড়ি দেখতে পেলো। একটির ভিতর ছিলো রুমালি, অন্যটির ভিতর একটি চাদর। সেই চাদর শম্ভু ভোঁসলের বলে শনাক্ত করা হয়েছে। সে আরো জানালো, পথের অন্য পাশে পাওয়া গেছে কৃষ্ণাজী আপ্তের মুর্দা। তার ঘাড়ে কাঁধে এবং পেটে তলোয়ারের আঘাত। পথের পুরু ধুলোর উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পদচিহ্ন। দুজন লোক তলোয়ার হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করলে সেরকম পায়ের ছাপ পড়তে পারে। তারপরে দেখা গেছে একটি ঘোড়ার খুরের ছাপ। সেটি চলে গেছে শহরের দিকে। আর দেখা গেছে অন্য তিনজন লোকের পায়ের ছাপ। সেগুলো চলে গেছে পশ্চিম দিকে, খানিকটা গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কঠিন মাটির উপর। সেপথে লোকচলাচল কম বলে এসমস্ত পায়ের ছাপ তার পরদিনও মুছে যায়নি।

আকিল খাঁ জেরা করলো ফুলাদ খাঁকে। ফুলাদ খাঁ স্বীকার করলো যে, কৃষ্ণাজী আপ্তের কাছে কোনো তলোয়ার পাওয়া যায়নি। আবিদ হুসেনের বুকের একটু নিচে যেখানে জখম হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটি ছোরার ক্ষত। পথের মাঝখানে একটি রক্তাক্ত ছোরা পাওয়া গেছে।

আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো, "পায়ের যে ছাপগুলো দেখে আপনি দুজন লোকের তলোয়ারের লড়াই অনুমান করেছেন, একজন ছোরা আরেকজন তলোয়ার নিয়ে লড়লে সেরকম পায়ের ছাপ হতে পারে কিনা একথা কি আপনি শাহ-ইন-শাহকে জানাবেন?"

ফুলাদ খাঁ একটু ইতস্তত করে বললো, "আমি যা দেখেছি, তাই জানিয়েছি। এর বেশী কিছু আমি বলতে পারছি না।"

আকিল খাঁ বললো, "আচ্ছা, আরেকটি কথা বলুন। দু আঙুল পরিমিত একটি ক্ষত দেখে সেটি তলোয়ারের আঘাত না ছোরার, একথা কি নিশ্চিত ভাবে বলা যায়? তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে খোঁচা দিলেওতো ওরকম একটা ক্ষত হতে পারে।"

"আমি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই," ফুলাদ খাঁ উত্তর দিলো, "দরবারের হাকিম আবিদ হুসেনকে পরীক্ষা করে আমায় যা জানিয়েছেন, আমি তাই বলছি।"

"আপনি কয়েদখানায় আবিদ হুসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওকে কোনো প্রশ্ন করেছেন এ ব্যাপারে?"

"না, করিনি।"

"কেন?"

"পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে আমরা যখন অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি, তখন তাকে কোনো প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করিনা, কারণ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যে মিছে কথা বলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

"যাই হোক, আপনি আবিদ হুসেনকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?"

"না।"

"ফরিয়াদ পেশ করা হয়েছে সম্পূর্ণ আপনার অনুমানের উপর ভিত্তি করে?"

"আমার অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে।"

"আচ্ছা ফুলাদ খাঁ, আরেকটি প্রশ্ন আমি করতে চাই। এটিই শেষ। আবিদ হুসেনের মাশুক মোতিবিবিকে আপনি চেনেন?"

"হ্যাঁ চিনি।"

"তার ওখানে আপনার যাতায়াত আছে?"

"এখন আর নেই। একসময় মাঝে মাঝে ওর গান শুনতে যেতাম।"

"একথা কি সত্যি যে, মোতিজান আপনাকে আজকাল আর ওর মাইফিলখানায় ঢুকতে দেয়না ?"

ফুলাদ খাঁর মুখ লাল হয়ে গেল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু আওরংজেব গম্ভীরকণ্ঠে বললো, "এসব তুচ্ছ ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা দিওয়ান-ই-মজালিমে হতে পারে না।"

আকিল খাঁ তসলিম করে সরে দাঁড়ালো। ফুলাদ খাঁও সরে গেল তার নিজের জায়গায়।

এরপর বাদশাহর সামনে হাজির করা হোলো সেই হরকরাকে, যাকে আকিল খাঁ মোতিবিবির ওখানে পাঠিয়েছিলো আবিদ হুসেনকে দরবারে ইত্তলা দিতে। তার বেশী কিছু বলার ছিলো না। সে শুধু জানালো যে, মোতিবিবি তাকে বলেছে আবিদ হুসেন ছোরার ঘায়ে মামুলীরকম জখম হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছে। সে জানতে চেয়েছিলো আবিদ হুসেন কখন জখম হয়েছিলো। মোতিবিবি জানিয়েছিলো,—আবিদ হুসেন জখম হয়েছে সোমবার সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে।

আকিল খাঁ জানতে চাইলো,—আবিদ হুসেন কিভাবে মোতিজানের বাড়িতে পৌঁছেছিলো, সে সম্বন্ধে কি মোতিবিবি কিছু বলেছে ? হরকরা উত্তর দিলো,— মোতিবিবি বলেছে, আবিদ হুসেন তার ওখানে এসেছিলো ঘোড়ায় চেপে।

আর কোনো সাক্ষী ছিলো না। মুফতি নানা যুক্তির অবতারণা করে অভিযোগ প্রমাণিত করার চেষ্টা করলো, তারপর বললো, "জাহাঁপনাহ, আবিদ হুসেন শিবা ভোঁসলেকে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনোরকম সাহায্য করেছে, এরকম কোনো অনুমান প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। তবে আমরা একথা প্রমাণ করতে পেরেছি যে, সে হয়তো সন্দেহ করেছিলো, ঝুড়ির ভিতর আত্মগোপন করে শিবাজী পালিয়ে যাচ্ছে। ফুলাদ খাঁর ব্যাপক অনুসন্ধান ও অন্যান্য প্রমাণ

থেকে জানা যাচ্ছে, আবিদ হুসেন শিবাজীর অনুসরণ করেছিলো। এরকম পরিস্থিতিতে যে কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি এসে আমাদের লশকরদের জানাতো। কিন্তু আবিদ হুসেন একাই গেল।—কেন? হয়তো শিবাজীকে গিরফতার করার তারিফ একাই পেতে চাইলো। তারপরের ঘটনার কোনো বিবরণ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি কি হয়েছে। শিবাজী যখন নিরিবিলি জায়গায় এসে ঝুড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, আবিদ হুসেন তাকে রুখতে গেল। কৃষ্ণাজী নিশ্চয়ই সেখানে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলো শিবাজীর জন্যে। সে এসে আবিদ হুসেনকে আক্রমণ করলো। তার হাতে তলোয়ার নিশ্চয়ই ছিলো। তলোয়ার নিয়েই লড়াই হয়েছিলো কিছুক্ষণ। তারপর হয়তো একসময় তলোয়ার কৃষ্ণাজীর হস্তচ্যুত হোলো। সে ছোরা বার করে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো আবিদ হুসেনের উপর। আবিদ হুসেন জখম হলো। কিন্তু নিজের হাতে তলোয়ার থাকায় সে কৃষ্ণাজীকে নিহত করতে সক্ষম হোলো। হয়তো কৃষ্ণাজীর তলোয়ার তুলে নিয়েছিলো শিবাজী। কিন্তু আবিদ হুসেন জখম হওয়ায় তাঁকে আর রুখতে পারলো না। শিবাজী পালিয়ে যেতে সক্ষম হোলো। আবিদ হুসেন তখন চলে গেল মতিবিবির বাড়িতে। কিন্তু তার উচিত ছিলো খোজা ফিরোজার বাগে এসে আমাদের লশকরদের জানানো। সে কেন সেখানে যায়নি,—এর একমাত্র কারণ হতে পারে তার দায়িত্ববোধের অভাব,—কিংবা হয়তো সে শিবাজীর কাছ থেকে অনেক আশরফি পেয়েছে, যে অর্থ সে লুকিয়ে রেখেছে মোতিবিবির কাছে। কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ যাই হোক, এর জন্যে তার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত, যা চিরকালের জন্যে নজির হয়ে থাকবে।”

মুফতির বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আকিল খাঁ জবাব দিতে এগিয়ে এলো। মুফতির বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডন করবার চেষ্টা করবার পর

বললো, "জাহাঁপনাহ, শুধু এরকম সব অনুমানের উপর নির্ভর করে আবিদ হুসেনকে অভিযুক্ত করা চলে না। শিবাজীর তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করবার সময় যদি আবিদ হুসেনের সন্দেহ হয়ে থাকে যে, তিনজন বারবরদারের মধ্যে মাঝের লোকটির ঝুড়িতেই শিবাজী লুকিয়ে আছে, সে লশকরদের না জানিয়ে তার অনুসরণ করতে যাবে কেন? শুধু একলা তারিফ পাবার জন্যে? সে তার সন্দেহ যাচাই করে নিতে পারতো সেখানেই। এর জন্যে নিশ্চয়ই সে তারিফ পেতো, ইনাম পেতো। তার মনে সন্দেহ হয়েছিলো বলেই যে সে কাউকে না বলে চলে গেল বারবরদারের অনুসরণ করে, একথা আমি মেনে নিতে পারিনা। তিনজন বারবরদারের মধ্যে প্রথমজন নয়, শেষের জন নয়, মাঝের লোকটিই লুকিয়ে বার করে নিয়ে যাচ্ছে শিবাজীকে, এরকম অনুমান করার কোন কারণ ছিলো কি? কোনো জিন এসে নিশ্চয়ই আবিদ হুসেনের কানে কানে বলে দিয়ে যায় নি। আব্দুল হাকিম বলেছে, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় সে আবিদ হুসেনকে দেখেছে শিবাজীর তাঁবুর সামনে। দুতিন বার সে সামনের পথে টহল দিয়েছে, পরে কিছুক্ষণ একটি গাছের নিচে ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মুফতি এই ব্যাপারটাকে সন্দেহজনক মনে করেছেন। কিন্তু আমি তো এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না। ওদিকে টহল দেওয়া এবং পর্যবেক্ষণ করাই ছিলো আবিদ হুসেন খাঁর কাজ। তাকে একাজের ভার দেওয়া হয়েছে দরবারের হুকুমে। আমার ধারণা, আবিদ হুসেন খাঁ তার দৈনন্দিন রেওয়াজ অনুযায়ী টহল দিয়েছে, নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে চারদিকের অবস্থা। তারপর শহরে ফেরার সময় এমনিই একটুখানি তফরি করবার জন্যে অন্য সড়কের দিকে চলে গিয়েছিলো। তার কিছুক্ষণ আগে যদি শিবাজীকে সেদিকেই নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, সেটা আবিদ হুসেন খাঁর অপরাধ নয়।"

"কিন্তু সেই সড়কের যে জায়গায় শিবাজী ঝুড়ির ভিতর থেকে

বেরিয়ে পড়েছিলো, সেখানে দুজন লোকের মধ্যে যে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিলো, তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি," বললো কাজি-উল-কুজাৎ আব্দুল ওয়াহাব বোরাহ্, "সেখানে পাওয়া গেছে কৃষ্ণাজী আপ্তের মুর্দা। আর দেখতে পাচ্ছি আবিদ হুসেন খাঁ জখম হয়ে ফিরে এসেছে মোতিবিবির বাড়িতে। এর কি কৈফিয়ত থাকতে পারে?"

আকিল খাঁ উত্তর দিলো, "একথা কেউ অস্বীকার করছে না যে, সড়কের ধুলোর উপর এমন একজোড়া পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে যার থেকে সন্দেহ হয় কেউ তলোয়ার নিয়ে লড়াই করেছে। কৃষ্ণাজীর মুর্দা পাওয়া গেছে, রক্তমাখা ছোড়া পাওয়া গেছে, এমন কি একটি ঘোড়ার খুরের ছাপও পাওয়া গেছে। কিন্তু আবিদ হুসেন খাঁ যে সেখানে উপস্থিত ছিলো এমন কোনো প্রমাণ কি আছে?"

"আবিদ হুসেন খাঁ জখম হয়েছে," বললো কাজি-উল-কুজাৎ।

"তার জন্যে আমরা আবিদ হুসেন খাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি হয়েছিলো, সে কিভাবে কোথায় জখম হয়েছে। তার কথা যাচাই করে দেখতে পারি। কিন্তু ফুলাদ খাঁ নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে, আবিদ হুসেন খাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, এখানে এখন পর্যন্ত কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। ফুলাদ খাঁ ধরে নিয়েছে যে আবিদ হুসেন খাঁ সত্যি কথা বলবে না। সে নিজে কতকগুলো অনুমান করে নিয়েছে, তারপর অনুমান যে সত্য সে কথা প্রমাণ করবার জন্যে কতকগুলি যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেছে। এ ভাবে ন্যায়বিচার হতে পারে না। আমি বলতে চাই মুফতির প্রত্যেকটা অনুমান ভুল। উনি বলছেন কৃষ্ণাজীর সঙ্গে আবিদ হুসেনের তলোয়ারের লড়াই হয়েছিলো। কিন্তু কৃষ্ণাজীর মুর্দার পাশে কোনো তলোয়ার পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে ছোরা। মুফতি বলেছে তলোয়ার শিবাজী তুলে নিয়ে গেছেন। আমার প্রশ্ন, সেটি তুলে নিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিলো? ছোরাটাই বা ফেলে গেলেন কেন? মুফতি বলছেন, লড়াই করবার সময় তলোয়ার

কৃষ্ণাজীর হস্তচ্যুত হয়েছে।—কি ভাবে? হাত কি জখম হয়েছিলো? মুর্দার হাতে তেমন কোনো চিহ্ন নেই। তাহলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণাজীর প্রতিপক্ষ কৌশলের সঙ্গে তার তলোয়ারের উপর নিজের তলোয়ার দিয়ে এমন ভাবে আঘাত করেছিলো যাতে তলোয়ার হস্তচ্যুত হয়। ধরে নিচ্ছি এই প্রতিপক্ষ আবিদ হুসেন। মুফতি বলেছেন, কৃষ্ণাজী এর পর ছোরা বার করে আবিদ হুসেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অনুমান বিবেচনা করে দেখা যাক। এখানে আমরা সবাই অল্পবিস্তর তলোয়ার ধরতে জানি। আমাদের কি একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে যখন একজন তার প্রতিপক্ষকে সামান্যতম সুযোগেও জখম করতে প্রস্তুত, তখন সেই প্রতিপক্ষ ছোরা হাতে ছুটে এসে তাকে জখম করতে পারে? যে তলোয়ারের আঘাতে সুদক্ষ প্রতিপক্ষের তলোয়ার হস্তচ্যুত করার কৌশল জানে, সে অভিজ্ঞ এবং অভ্যস্ত যোদ্ধা। তার হাতে যখন খোলা তলোয়ার, তখন একজন প্রতিপক্ষ ছোরা হাতে ছুটে এলে সে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে রুখতে পারেনা, একথা আমি মানতে চাই না। মুফতি বলছেন, আবিদ হুসেন খাঁ আহত হওয়ার পর শিবাজী পালিয়ে গেল, এবং আবিদ হুসেন খাঁ ঘোড়ায় চেপে চুপচাপ চলে গেল মোতিবিবির বাড়িতে,—একথার মধ্যে কোনো নির্ভরযোগ্য যুক্তি নেই। খোজা ফিরোজার বাগ সেখান থেকে বেশী দূরে নয়, কিন্তু মমতাজ-আবাদে মোতিবিবির বাড়ি অনেক দূর। হাতের কাছে লশকরদের কাছে না এসে আবিদ হুসেন খাঁ চুপচাপ মোতিবিবির বাড়িতে চলে যাবে, একথা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। যদি মুফতি বলতেন যে, আবিদ হুসেন খাঁ ঘোড়ায় চড়বার পর রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতার দরুণ মুর্ছিত হয়ে পড়লো ঘোড়ার উপরই, এবং সেই ঘোড়া কোথায় যাবে স্থির করতে না পেরে নিজের পরিচিত জায়গা মোতিবিবির বাড়িতে চলে গেল,—আমি তবু বিশ্বাস করতে পারতাম একথা। কিন্তু আবিদ হুসেন খাঁ নিজে এরকম

গাফিলতি করবে? এ অসম্ভব। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আবিদ হুসেন খাঁ নিজের দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের জন্যে অতি অল্পকালের মধ্যে দরবারের উমরাহ্‌র পদমর্যাদা অর্জন করেছে। তার সততার পরিচয় আমরা এর আগে অনেকবার পেয়েছি। শিবাজী পালিয়ে যাচ্ছেন এরকম সন্দেহের কোনো কারণ ঘটলে সে যে লশকরদের কাছে এসে জানাতো না, একথা আমরা মেনে নিতে পারি না।"

"তবু সন্দেহের অনেক কারণ থেকে যাচ্ছে," বলে উঠলো কাজি-উল-কুজাৎ, "শিবাজীর বারবরদার ঝুড়ির ভিতর শিবাজীকে নিয়ে যে সময় সেই সড়কের দিকে চলে যায়, আবিদ হুসেন খাঁ সেখানে যায় প্রায় সেসময়েই। তার কিছু সময় পরে সে জখম অবস্থায় ফিরে আসে মোতিবিবির বাড়িতে। সুতরাং কৃষ্ণাজীর সঙ্গে আবিদ হুসেন খাঁর যে লড়াই হয়েছে এটা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করতে না পারলেও আমি এরকম অনুমান না করে পারবো না যে আবিদ হুসেন খাঁ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক শিবাজীর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলো।

"আমরা আবিদ হুসেন খাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি।"

"না," বললো কাজি-উল-কুজাৎ, "ফুলাদ খাঁর সঙ্গে আমি একমত। আবিদ হুসেন খাঁ সত্য গোপন করতে পারে। তাকে কোনো কথা এখন জিজ্ঞেস করা হবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে যুক্তিসম্মত অনুমান করে নিয়ে তার নামে ফরিয়াদ পেশ করা হয়েছে, সুতরাং তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে যুক্তিসম্মত কোনো অনুমানের ভিত্তিতে এই পরিস্থিতির একটা কৈফিয়ত শাহ-ইন-শাহকে জানাতে হবে।"

"যুক্তিসম্মত অনুমান নানারকম হতে পারে," উত্তর দিলো আকিল খাঁ, "আমার মনে হয় আবিদ হুসেন খাঁ এমনিই বেড়াতে বেড়াতে সেই সড়ক ধরে খানিকটা গিয়েছিলো বটে, কিন্তু শিবাজীকে সে

দেখেনি। হয়তো কৃষ্ণাজী আপ্তেকে সেখানে পাহারায় রাখা হয়েছিলো যাতে কেউ অনুসরণ করতে না পারে। সে আবিদ হুসেনকে দেখে তাকে রুখতে এলো। রাত্রির অন্ধকারে তাকে আবিদ হুসেন খাঁ হয়তো চিনতে পারেনি। আগ্রায় চোর ডাকাতের উপদ্রব যথেষ্ট। হয়তো তাদেরই একজন বলে ধরে নিয়েছিলো আবিদ হুসেন খাঁ। সে হয়তো আবিদ হুসেনকে চিনতে পেরেছিলো। অকস্মাৎ এসে তাকে ছোরা মারে। কিন্তু জখম গুরুতর হয়নি। আবিদ হুসেন খাঁ তাকে নিহত করতে সক্ষম হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আবিদ হুসেন খাঁ এরপর তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাইবে নিজের প্রিয়জনের কাছে, চিকিৎসা ও শুশ্রুষার জন্যে। হয়তো একটু সুস্থ হয়েই সে কোতোয়ালিতে জানাতো। কিন্তু তার আগেই ফুলাদ খাঁ গিয়ে তাকে গিরফতার করে কয়েদখানায় নিয়ে এলো। আমরা যদি এভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করি, তাহলে আবিদ হুসেন খাঁ কেন খোজা ফিরোজার বাগে না ফিরে মমতাজআবাদে চলে গেল, তার কারণ যথাযথ ভাবে অনুমান করতে পারি। জাহাঁপনাহ, আমার এখন বক্তব্য শুধু এই,—মুফতি তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেন নি। সুতরাং আমার আরজ, এই মামলা খারিজ করা হোক।"

"জাহাপনাহ," জানালো মুফতি, "আমার আরজ,—আবিদ হুসেনের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তাকে সাজা দেওয়া হোক।"

আবিদ হুসেন এতক্ষণ চুপচাপ সবার কথা শুনছিলো। এবার সে হঠাৎ বলে উঠলো, "জাহাপনাহ্, আমারও একটা আরজ আছে।—"

দারোগা-ই-আদালত তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "যতক্ষণ না অপরাধীকে কিছু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ততক্ষণ তার নিজের থেকে কোনো কথা বলার অধিকার নেই।"

আবিদ হুসেন চুপ করে রইলো। একবার তাকালো বাদশাহ্‌র

দিকে। বাদশাহ্ চোখ বুঁজে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। মনে হচ্ছে যেন চুপচাপ ঝিমোচ্ছে।

রায় দেওয়ার অধিকার কাজি-উল-কুজাতের। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো, "মুফতির ফরিয়াদ যে প্রধানত অনুমানের উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছে, আমাদের সেকথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এসব অনুমান ঠিক মত প্রমাণিত না হলেও আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এবিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে ঘটনাটা রহস্যময়। সুতরাং ঘটনাটা গুরুতর। যে জায়গায় শিবাজীর পরিত্যক্ত ঝুড়ি পাওয়া গেছে, সেখানে কৃষ্ণাজী আপ্তের মুর্দাও পাওয়া গেছে। সেই মুর্দার পাশে পাওয়া গেছে একটি রক্তাক্ত ছোরা। তার কাছে দেখা গেছে ঘোড়ার খুরের ছাপ। ওরকম সময় আবিদ হুসেনকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওই সড়কের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেছে। তার কিছুক্ষণ পরে আবিদ হুসেন জখম হয়ে মোতিবিবির বাড়িতে ফিরে এসেছিলো বলে জানা গেছে। সুতরাং কৃষ্ণাজী আপ্তের মুর্দার কাছে দেখতে পাওয়া ঘোড়ার খুরের ছাপের সঙ্গে আবিদ হুসেনের ঘোড়ার খুরের সম্পর্ক আছে, অতএব কৃষ্ণাজীর মুর্দার কাছে পাওয়া ছোরার সঙ্গে আবিদ হুসেনের জখম হওয়ার সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণাজীর মুর্দার সন্নিকটস্থ ঝুড়ির সঙ্গে শিবাজীর সম্পর্ক আছে। সুতরাং শিবাজীর পলায়নের সঙ্গে কৃষ্ণাজীর মৃত্যুর সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণাজীর মৃত্যুর সঙ্গে আবিদ হুসেনের জখমের সম্পর্ক আছে। অতএব, এসব ঘটনা বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আবিদ হুসেন খাঁ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক শিবাজীর পলায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলো। ঘোড়ায় চেপে সেখান থেকে চলে আসবার মতো জ্ঞান তার ছিলো। সুতরাং খোজা ফিরোজার বাগে আমাদের লশকরদের কাছে ফিরে না এসে সে যে চলে গেল মমতাজআবাদে মোতিবিবির বাড়িতে, এতে সে গুরুতর গাফিলতি করেছে। এই গাফিলতিই ঘোর অপরাধ।

কেন সে চুপচাপ ছিলো? কেন সে কাউকে জানায় নি? নিশ্চয়ই তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিলো যা আমরা জানিনা। বাদশাহ্ সলামতের দরবারের একজন উমরাহ্‌র পক্ষে এরকম গাফিলতি ঘোর অপরাধ। সুতরাং দরবারের মুফতির আরজ মঞ্জুর করা যেতে পারে। উলেমাদের ফতোয়া পেলে আমি যথাযোগ্য সাজা দেওয়ার জন্যে জাহাঁপনাহ্‌র কাছে সুপারিশ করতে পারি।"

উলেমারা পরামর্শ করলো নিজেদের মধ্যে। তারপর তাদের মুখপাত্র জানালো, "সাজার ধরণ নির্ভর করে অপরাধের গুরুত্বের উপর। অপরাধের গুরুত্ব নির্ভর করে অপরাধের কৃতকর্মের ফলাফলের উপর। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অপরাধীর গাফিলতির ফলে একজন বিদ্রোহী আমাদের মেহেরবান বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরবার সুযোগ পেয়ে যাবে। এর ফলে হবে যুদ্ধ, তার থেকে হবে লোকক্ষয়। যুদ্ধে আমাদের বাহাদুর লশকরেরা অনেকে জান দেবে, অনেকে জখম হবে। সুতরাং আবিদ হুসেনের গাফিলতি মাফ করা যায় না। তার অপরাধ গুরুতর। তাই সাজাও হওয়া উচিত অত্যন্ত কঠোর। আমরা এই সিদ্ধান্তে একমত যে, আবিদ হুসেন খাঁকে কোতল করা যেতে পারে।"

কোতল করা যেতে পারে! আবিদ হুসেনের মুখ এক মুহূর্তের জন্যে বিবর্ণ হোলো। তারপর আবার নিজেকে সামলে নিয়ে সে একটু হাসলো।

কাজি-উল-কুজাত বললো, "আমি জাহাপনাহ্‌র কাছে সুপারিশ করছি যে আবিদ হুসেন খাঁকে কোতল করার হুকুম হোক।"

আকিল খাঁ হতাশ হয়ে ঠোঁট কামড়ালো।

বাদশাহ্ আওরংজেব চোখ বুঁজে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো এতক্ষণ। এবার চোখ খুলে সোজা হয়ে উঠে বসলো। শান্ত কণ্ঠে বললো, "কাজি-উল-কুজাৎ যে রায় দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। তবে যেকথা বিশেষ করে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিলো

সেকথা মুফতিও বলেন নি, কাজি-উল-কুজাৎও বলেননি, আকিল খাঁও বুঝতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়না। আবিদ হুসেন খাঁ যে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, অত্যন্ত দায়িত্ববোধসম্পন্ন, তার প্রমাণ আমি আগে অনেকবার পেয়েছি। সে যে ইচ্ছে করে কোনো গাফিলতি করেছে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা। শিবার পালিয়ে যাওয়ায় যে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে পারে একথাও আমি বিশ্বাস করিনা। মুফতি অনুমান করেছেন, আবিদ হুসেন খাঁ সম্ভবত কিছু আশরফি পেয়েছে শিবার কাছ থেকে। কিন্তু এ অসম্ভব। আমি আবিদ হুসেন খাঁর চরিত্র যতটা জানি, তাতে একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি যে, আজকের দিনে আগ্রা শহরে যে অল্প কয়েকজন লোক আছে যাদের আশরফি দিয়ে কেনা যায়না, আবিদ হুসেন খাঁ তাদের মধ্যে অন্যতম। এমন লোকের জন্যে দরবার গর্ববোধ করতে পারে।”

আবিদ হুসেন খাঁর মন আবার হাল্কা হয়ে গেল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আকিল খাঁর চোখ মুখ। ফুলাদ খাঁর মুখের চেহারায় দেখা গেল হতাশা ও ক্রোধ।

আওরংজেব আবার চোখ বুঁজলো আস্তে আস্তে। গভীর কণ্ঠে বলে গেল, “কিন্তু গাফিলতি হয়েছে। আবিদ হুসেন খাঁ জানতো শিবা পালিয়ে যাচ্ছে। অথচ সে আমার লশকরদের জানায়নি। কেন এরকম একটা গাফিলতি করলো আবিদ হুসেনের মতো এক-জন কর্তব্যপরায়ণ দায়িত্বশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি? সেটাই হোলো প্রশ্ন। সমস্ত বিবরণ শুনে আমি এর কারণ অনুমান করতে পারছি।”

সবাই ব্যগ্র হয়ে শুনতে লাগলো বাদশাহ্‌র ভাষণ। এমনকি আবিদ হুসেনের মুখের উপরও দেখা গেল সেই ব্যগ্রতা।

“শিবা ভোঁসলে এমন এক ব্যক্তি,” আওরংজেব বলতে লাগলো, “যার সম্বন্ধে,—আমাদের দুর্ভাগ্যবশত,—আজকাল নানারকম কিংবদন্তী ও অলীক কাহিনী প্রচলিত হচ্ছে। এক শ্রেণীর লোকের

মনে অনুরাগ গড়ে ওঠে এসব কিংবদন্তীর নায়কের জন্যে, কারণ এসব নায়কের রোমাঞ্চকর জীবনে ওরা দেখতে চায় তাদের নিজেদের জীবনের ব্যর্থতার ও হতাশার প্রতিকার। এমন হতে পারে যে ওসব ভাবপ্রবণ ব্যক্তির মতো আবিদ হুসেনও মনে মনে শিবার প্রতি অনুরক্ত। তেমন ব্যক্তি যে এই শহরে কয়েকজন নেই তা নয়। আমরা তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর রাখি। শিবা পালিয়ে যেতে পারলে ওদের মতো খুশী হয় আবিদ হুসেনও। কিন্তু,—কিন্তু একথাও সত্যি যে আবিদ হুসেন আমার দরবারের একজন বিশ্বস্ত উমরাহ। সে আমাদের সঙ্গে বেইমানী করতে পারেনা, সে শিবাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারেনা। তার কর্তব্য শিবাকে রুখে রাখা। সে এই কর্তব্য পালন করতে বাধ্য।"

আকিল খাঁ আবিদ হুসেনের দিকে তাকালো। দেখতে পেলো, আবিদ হুসেন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বাদশাহ্‌র কথাগুলো শুনছে।

বাদশাহ বলতে লাগলো, "আবিদ হুসেনের বিবেক আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে। সে বেইমান নয়। তাই সে একাই পালন করলো তার এই কর্তব্য, কিন্তু আর কাউকে খবর দিলো না। যে মুহূর্তে সে জখম হলো, সে ভাবলো তার কর্তব্য সে যথাযথভাবে পালন করেছে। সে শহরে ফিরে এলো। তার বিবেক সাফ রইলো। সে আমাদের সঙ্গে বেইমানি করলো না, অথচ শিবাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হোলো। এই হোলো আমার অনুমান।"

একটু থামলো বাদশাহ। চোখ খুলে একজন একজন করে তাকালো সবার দিকে। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, "সুতরাং আমার ধারণা কাজি-উল-কুজাৎ ভুল করেছে, মুফতিও ভুল করেছে। আবিদ হুসেনের অপরাধ তার গাফিলতি নয়, তার দায়িত্বজ্ঞানের অভাব নয়।"

আবিদ হুসেন খুব খুশী হয়ে বুক ফুলিয়ে কাজি-উল-কুজাতের

দিকে মুফতির দিকে আর ফুলাদ খাঁর দিকে তাকালো। ওদের মুখ বিমর্ষ হয়ে আছে।

কিন্তু আকিল খাঁর বুক কেঁপে উঠলো। আবিদ হুসেনের মতো উৎফুল্ল বোধ করার কোনো কারণ সে পেলো না। এত বছর ধরে সে আওরংজেবের সঙ্গে সঙ্গে আছে। বাদশাহ্‌কে সে চেনে খুব ভালো করেই।

"আবিদ হুসেনের অপরাধ হোলো আরো গুরুতর,"—গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বাদশাহ বলতে লাগলো।

এই কণ্ঠস্বর শুনে শুধু আবিদ হুসেন নয়, দিওয়ান-ই-মজালিমে সমুপস্থিত অন্যান্য সবার বুকের স্পন্দনও খুব দ্রুত হয়ে উঠলো।

"আবিদ হুসেনের অপরাধ হোলো আরো গুরুতর," বললো বাদশাহ, "তার অপরাধ, বাগী মারাঠা শিবা ভোঁসলের প্রতি গোপন শ্রদ্ধা, গোপন অনুরাগ। আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মুফতির অভিযোগ ঠিক মতো প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু একথাও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, কাজি-উল-কুজাত আবিদ হুসেনের জন্যে যে সাজার সুপারিশ করেছেন, সেটা মোটেও অসঙ্গত নয়। এখন আবিদ হুসেনের সাজার হুকুম জারি হওয়ার আগে সে যদি ইচ্ছে করে, কিছু বলতে পারে।"

আবিদ হুসেন তসলিম করলো, তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, "জাহাঁপনাহ্‌, আমাকে কি কোতল করার হুকুম হবে?"

"কাজি-উল-কুজাৎ তো এই সাজাই সুপারিশ করেছেন।"

"আমাকে কি কোনোরকম অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে না?"

"এধরণের অপরাধের জন্য আমি আজ পর্যন্ত কাউকে কোনো রকম অনুকম্পা প্রদর্শন করিনি," শীতল কণ্ঠে উত্তর দিলো আওরংজেব।

"আমি আমার জন্যে কোনো অনুকম্পা চাই না," ক্ষীণ কণ্ঠে বললো আবিদ হুসেন, "আমি ভাবছিলাম আমার মোতিজানের কথা। ওরই জন্যে আমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু

আপনার জন্যে আমার মরে যাওয়া প্রয়োজন বলে প্রমাণিত হোলো। আজকাল সাধারণ মানুষের জীবন সত্যিই একটা বিরাট প্রহসন বলে মনে হয়। যাই হোক্—" গা ঝাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো আবিদ হুসেন। কিছুক্ষণের জন্যে সে ভুলে গেল তার দুর্বলতা। মুখ তুলে অকম্পিত কণ্ঠে শুরু করলো তার বক্তব্য।

"জাহাঁপনাহ," সে বললো, "ফরিয়াদ আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু কাজি-উল-কুজাৎ রায় দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমাকে একটি কথাও বলার সুযোগ দেওয়া হোলো না। মুফতি অনুমানের উপর ভিত্তি করে ফরিয়াদ পেশ করলেন। আকিল খাঁ অনুমানের বিপক্ষে অন্য অনুমান খাড়া করে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। কাজি-উল-কুজাৎ অনুমানের উপর নির্ভর করে রায় দিলেন। শিবাজী ভবিষ্যতে লড়াই করলে আমাদের কতো লশকর মরতে পারে, জখম হতে পারে, সেটা অনুমান করে উলেমারা ফতোয়া দিলেন। আর আপনি নতুন অনুমান তৈরী করে আমার,সাজার হুকুম জারি করতে প্রস্তুত হলেন। আবার একথাও স্বীকার করলেন যে, অভিযোগ ঠিক মতো প্রমাণিত হয়নি। অথচ নিঃসংশয়ে মেনে নিলেন যে, আমার জন্যে যে সাজার সুপারিশ করা হয়েছে সেটা মোটেও অসঙ্গত নয়। সুতরাং আমার মনে হচ্ছে, আমি এখন আপনাকে যা বলবো, তাও বলতে হবে আমার নিজস্ব কতকগুলো অনুমানের ভিত্তিতে।

আকিল খাঁ একটা কথা অনুমান করেছেন বুদ্ধিমানের মতো। হয়তো আমি ঘোড়ার পিঠে ছিলাম মুর্ছিত অবস্থায়। সুতরাং ঘোড়া হয়তো তার নিজের বুদ্ধিতে আমায় নিয়ে গেছে মমতাজআবাদে। তাহলে শিবাজীর পালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা সফল হওয়ার কারণ সেই ঘোড়া। ফুলাদ খাঁ সেই ঘোড়াকে বিচারের জন্যে আপনার সামনে হাজির করলে আপনি কিংবা আমি বিস্মিত হতাম না। কিন্তু ফুলাদ খাঁ সে কাজ করেনি। তাতে মনে হয়, আপনি আর আমি

ফুলাদ খাঁকে যতোটা বেওকুফ মনে করি, ততো বেওকুফ সে নয়। জাহাঁপনাহ্, আমার প্রথম অনুমান হোলো এই,—ফুলাদ খাঁ বুদ্ধিমান লোক।

এই ফুলাদ খাঁ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এজন্যে যে, আপনার স্বার্থ সে ঠিক অনুমান করে নিতে পেরেছে। জাহাঁপনাহ্, শিবাজী এত পাহারার ভিতর থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ার পেছনে যেই জটিল পটভূমিকা সৃষ্টি হয়েছিলো, তার স্বরূপ বুঝতে গেলে আপনাকে দরবারের এমন সব বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে কৈফিয়ত চাইতে হবে যারা আপনার প্রতি বিশ্বস্ত বলে ভান করে। আপনি যে একথা জানেন না তা নয়। আপনি বেশ ভালো করেই জানেন। কিন্তু আপনি যে জানেন একথা আপনি প্রকাশ করতে চাননা। আপনি যে তাদের বিশ্বাস করেন না, একথা আপনি কাউকে জানতে দিতে চান না, কারণ হুকুমত চালানোর জন্যে আপনাকে তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই তাদের ছোটো বড়ো অনেক অন্যায় আপনি অন্ধের মতো অবহেলা করেন। কিন্তু হুকুমত চালাতে হলে দিওয়ান-ই মজালিমে কোনো না কোনো মামলা চাই। সুতরাং আপনার মুখ রক্ষা করবার জন্যে চাই কোনো দুর্বল নিঃসহায় সামান্য লোক, যাকে নিরাপদে অপরাধী সাজানো যায়। ফুলাদ খাঁ আপনার এই প্রয়োজন ঠিক অনুমান করেছে। সর্বত্র দেখা যায় ওর মতো লোকেরা জীবনে উন্নতি করে, আমার মতো লোকেরা যায় কয়েদখানায়। এটাই যে জঙ্গীশাহীর অস্তিত্বের গোড়ার কথা,—এ হোলো আমার আরেকটি অনুমান।

জাহাঁপনাহ্, মানুষ চিরকাল বাঁচে না। সুতরাং আমি যে বাঁচবো না তাতে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আমার একমাত্র দুঃখ হোলো আমার এই মূল্যবান জীবন মোতিজানের কোনো কাজে লাগলোনা,—কাজে লাগলো শুধু আপনার। আমি ঈর্ষা করি আপনার সৌভাগ্যকে।

আমাকে কোতল করা হবে। তাও শুধু একবার, দুবার কোতল করার সুযোগ আপনি পাবেন না। সুতরাং আমি নির্ভয়ে আপনাকে আমার শেষ অনুমানের কথা বলতে পারি,—যেকথা সাধারণ অবস্থায় কেউ বলতে সাহস করবে না যদি সে নিজের মুণ্ডু তার ঘাড়ের উপর যথাস্থানে নিরাপদ অবস্থায় রাখতে চায়।"

"জাহাঁপনাহ্—" ফুলাদ খাঁ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো আবিদ হুসেনের কথার মাঝখানে।

"না, ওকে বলতে দাও," শান্ত কণ্ঠে বললো আওরংজেব।

আবিদ হুসেন তসলিম করলো কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, তারপর বলে গেল, "জাহাঁপনাহ্, আমার শেষ অনুমান হোলো এই,—এরকম হুকুমত চিরকাল চলে না। আপনার হুকুমতের মেয়াদও একদিন শেষ হবে। আপনি বৃদ্ধ হবেন। আপনার শেষ সময় উপস্থিত হবে। আর আপনি সেটা আগের থেকেই বুঝতে পারবেন। আমি আশা করি, আমি আজ যেরকম নির্ভয়ে নির্ভাবনায় আমার কবরের দিকে এক পা বাড়িয়েছি, আপনিও সেভাবে নির্ভয়ে নির্ভাবনায় শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করবেন। কিন্তু সত্যিই কি আমার মতো নির্ভয়ে নির্ভাবনায় আপনি যেতে পারবেন? আমি অনুমান করতে পারি, আপনার খানদানের যা রেওয়াজ, তেমনি আপনার চারদিকেও সব কিছু ভেঙে পড়বে, আপনার পুত্রেরাও তলোয়ারে শান দিতে শুরু করবে আপনার চোখের সামনে। সেদিন কি আপনার খেয়াল হবে যে, ইতিহাসের দরবারে আমি আর আমার মতো হাজার হাজার লোক আপনার মতো বাদশাহ্দের নামে ফরিয়াদ জানিয়ে যাচ্ছি বছরের পর বছর? সে সময় একদিন যখন আপনার মনে হবে যে, ইতিহাস আপনার বিচার করে আপনাকে সাজা দিয়েছে, সেদিন কি আজকের মতো এমনি নির্বিকার কণ্ঠে বলতে পারবেন যে, আপনার বেলায়ও অভিযোগ ঠিক মতো প্রমাণিত হয়নি, অথচ আপনার যে সাজা হয়েছে সেটা অসঙ্গত নয়?"

আবিদ হুসেন থামলো। দিওয়ান-ই-মজালিম নিসাড়, নিস্তব্ধ। একটুখানি নিঃশ্বাস নিতেও যেন কেউ সাহস করছে না।

অর্ধনিমীলিত নেত্রে বাদশাহ ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে?"

"আমার আর কিছু বলার নেই জাহাঁপনাহ্। এবার আপনি বলুন, আমি শুনছি।"

কমবখ্ত্! বেতমিজ!—মনে মনে বললো অন্যান্য সবাই। কিন্তু বাদশাহ্র মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

আওরংজেব আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসলো, তারপর বললো, "ফুলাদ খাঁ!"

"জাহাঁপনাহ্," ফুলাদ খাঁ সামনে এগিয়ে এসে তসলিম করলো।

"আবিদ হুসেন খাঁ এখনো অত্যন্ত দুর্বল। তার শরীর ও মন, কোনোটাই সুস্থ নয়। ওকে পাল্কি করে মমতাজআবাদে মোতিবিবির কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক।"

সবাই সবিস্ময়ে তাকালো বাদশাহ্র দিকে। ফুলাদ খাঁর চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হোলো। আবিদ হুসেন এতক্ষণ নিজের সমস্ত দুর্বলতা বিস্মৃত হয়ে যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতির মতো উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবার তার শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল। মনে হোলো ঘরটা যেন দুলছে।

"জাহাঁপনাহ্," সবিস্ময়ে বলে উঠলো কাজি-উল-কুজাৎ।

"হ্যাঁ, এই আমার হুকুম," বললো আওরংজেব, "এর এই দীর্ঘ প্রলাপ আপনারা এতক্ষণ শুনলেন। একে কোতল করলে এই কথাগুলো সর্বসাধারণের কাছে এক নাটকীয় গুরুত্ব অর্জন করবে। এ লোকটাই হয়ে উঠবে শিবা ভোঁসলের অন্তর্ধানের কিংবদন্তীর নায়ক। এর মতো একজন তুচ্ছ ব্যক্তিকে অতোখানি গুরুত্ব অর্জন করার সুযোগ আমি দিতে চাইনা। লোকে জানুক এ একটা বেওকুফ, এ একটা উন্মাদ, সুতরাং বাদশাহ মেহেরবানি করে তাকে

চরম শাস্তি দেননি। কিন্তু অপরাধ এ করেছে, বেওকুফি করে অবহেলা করেছে নিজের কর্তব্য। অতএব তার মনসব্ খারিজ করে দেওয়া হোলো, তাকে বরতরফ করা হোলো দরবারের খিদমত থেকে। তার সমস্ত জায়গির বাজ্য়াফ্ৎ করা হোলো। তার ওয়ালিদের যে অর্থ আমি বইত-উল্-মাল-ওয়া-আমুয়াল থেকে খালাস করে দিয়েছিলাম, সেসবও আবার বাজ্য়াফ্ৎ করে নেওয়া হোক।"

আবিদ হুসেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দু-তিন মুহূর্ত। তারপর অবনত হয়ে তসলিম করলো।

দিওয়ান-ই-মজালিমে সেদিন আর কোনো কাজ হোলো না। চিক ফেলে দিয়ে উঠে চলে গেল বাদশাহ্ আওরংজেব।

চার পাঁচ দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় আকিল খাঁ যখন দিওয়ান-ই-খাসে যাচ্ছিলো, জেব-উন-নিসার খোজা খাদিম মির হাসান মাঝ-পথে তাকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল। একটি ছোটো বটুয়া তার হাতে দিয়ে বললো, "বেগম সাহিবা এটি আপনাকে দিতে বলেছেন।"

"কি আছে এর মধ্যে?" বটুয়া হাতে নিলো আকিল খাঁ। ঝিন-ঝিন্ করে মৃদু শব্দ হোলো। "আশরফি?" আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

মির হাসান উত্তর দিলো, "বেগম সাহিবা জানতে পেরেছেন যে আবিদ হুসেন খাঁ সাহাবের মনসব খারিজ হয়ে গেছে। এবং ওঁর সমস্ত অর্থ আবার বাজ্য়াফ্ৎ করা হয়েছে। এখবর শুনে তাঁর খুব আফসোস হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে আবিদ হুসেন খাঁ নিশ্চয়ই এখন খুব দুঃস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি এখন থেকে আবিদ হুসেন খাঁকে মাসে মাসে একশো টাকা করে সাহায্য করবেন স্থির করেছেন। প্রথম মাসের জন্যে বিশেষ করে পাঠিয়ে দিলেন পঁচিশটা আশরফি।"

"বেগম সাহিবা মেহেরবান," বললো আকিল খাঁ। "তাঁকে আমার তসলিম জানাবেন।"

মির হাসান জানালো, "বেগম সাহিবার এই ইচ্ছে যে, এ আশরফি আপনি নিজের হাতে আবিদ হুসেন খাঁর হাতে দেবেন।"

আকিল খাঁ ম্লান হাসি হাসলো। তারপর ফিরিয়ে দিলো আশরফির বটুয়া। বললো, "বেগম সাহিবাকে বলবেন, আবিদ হুসেন এখানে নেই।"

"নেই? কোথায় গেছেন উনি?"

"জানিনা। কাল একবার খবর নিতে গিয়েছিলাম। কাউকে পেলাম না। বাড়ি খালি পড়ে আছে। আশপাশের লোকেরা বললো, মোতিবিবি আবিদ হুসেনকে নিয়ে আগ্রা শহর ছেড়ে দেহাতের দিকে কোথাও চলে গেছে। কোথায় গেছে কাউকে বলে যায় নি।"

মির হাসান বিষণ্ণ হোলো একথা শুনে। বললো, "আবিদ হুসেন খাঁ তো এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। তাঁকে এ অবস্থায় শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হোলো কেন?"

"জানিনা। তবে পথে কোনো কষ্ট হবে বলে মনে হয়না। ওরা গেছে নৌকো করে। যমুনা বেয়ে পূব দিকে কোথাও গেছে বলে শুনেছি।"

মির হাসান চলে গেল।

আকিল খাঁ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো দিওয়ান-ই-খাসের দিকে। চারদিক মশাল, শামা ও ঝাড়ফানুসে ঝলমল করছে। বহু বিচিত্র-বর্ণের পোশাক পরে হাজির হয়েছে উমরাহেরা। খাস-দরবার শুরু হতে এখনো একটু দেরি আছে। সবাই এদিক ওদিক জড়ো হয়ে জটলা করছে, আলোচনা করছে নানারকম সাময়িক প্রসঙ্গ। ওদের চোখে মুখে ফুটে উঠছে মোগল দরবারের নানারকম আভ্যন্তরীন সম্পর্কের অভিব্যক্তি,—সহযোগিতা, শত্রুতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রণয়,

আনুগত্য, দম্ভ, উচ্চাভিলাষ, সব কিছুই। আকিল খাঁর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে যায় সবারই মনোভাব।

নানারকম আলোচনা হচ্ছে চারদিকে। বাদশাহ সলামত মাস দেড়েকের মধ্যে আগ্রা ত্যাগ করার কথা ভাবছেন। দু-একদিনের মধ্যে খবরটা আম দরবারে ঘোষণা করা হবে। খাঁ-ই-সামান ইফিতিকর খাঁ এরই মধ্যে হুকুম পেয়েছে যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে। মির্জা রাজা জয়সিংহের পত্র এসেছে দাক্ষিণাত্য থেকে। বিজাপুরের খবর ভালো নয়। মারাঠাদের সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়া হবে। পেশোয়ারের ওদিকে ইউসুফজাইদের বিদ্রোহ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। নিকোলো ম্যানুচি নাকি প্রত্যেকদিন রাত্রে কাজি-উল-কুজাৎ আব্দুল ওয়াহাব বোরাহ্‌র সঙ্গে বসে শরাব পান করে। মুলচাঁদ সাহুকারের যেসব হরকরা শিবাজীর মণিমাণিক্য মুক্তো, সোনার হুন ও আশরফি নিয়ে দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছিলো, শিবাজীর আগ্রা থেকে পলায়নের সংবাদ পেয়ে সবাই মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে। মুলচাঁদ সাহুকার শিবাজীর ধনরত্ন দাখিল করেছে ফৌজদার ফিদাই খাঁর কাছে। বাদশাহ খবর পেয়ে হুকুম দিয়েছেন সমস্ত অর্থ যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয় খাঁ-ই-সামান ইফতিকর খাঁকে। শিবাজীর সভাকবি পরমানন্দ কবিশ্বরের সন্ধানে একদল লশকর রওনা হয়েছে দওসার দিকে,—এমনিতরো নানারকম টুকরো টুকরো কথা আকিল খাঁর কানে ভেসে এলো।

এধারে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলো ফৌজদার ফিদাই খাঁ আর কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ। একগাল হেসে ফুলাদ খাঁ বললো, "ভাই ফিদাই খাঁ, লোকে কি বলছে? মুলচাঁদ সাহুকার শিবাজীর যেসব মণিমাণিক্য আশরফি তোমায় দিয়েছে, তুমি নাকি তার থেকে কিছু সরিয়ে রেখেছো?"

ফিদাই খাঁ হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "লোকের কথায় কান দাও কেন ভাই? ওরা তোমার নামেও কতো কি বলছে। আবিদ

হুসেন যখন কয়েদখানায় ছিলো, তুমি নাকি মোতিবিবির ওখানে গিয়েছিলে একদিন রাত্রে, আর সে নাকি পা থেকে পয়জার খুলে তোমার মুখের উপর কয়েক ঘা বসিয়ে খাতিরদারী করেছিলো—।"

"কার এত সাহস আমার নামে এরকম মিছে কথা বানিয়ে বলে,—" ক্রুদ্ধকণ্ঠে আঙুল নেড়ে ফুলাদ খাঁ বললো।

হাসতে লাগলো ফিদাই খাঁ।

ওরা আকিল খাঁকে দেখতে পায়নি। আকিল খাঁ ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো উজীর-উল-মুল্‌ক জাফর খাঁ, মহারাজা জসবন্ত সিংহ আর মহম্মদ আমিন খাঁ। এমন সময় রদ-অন্দাজ খাঁ আর ইফতিকর খাঁ এগিয়ে এলো তাদের কাছে। আকিল খাঁ শুনতে পেলো রদ-অন্দাজ খাঁ জিজ্ঞেস করছে জসবন্ত সিংহকে, "রাঠোর আর কছওয়াদের ঝগড়া মিটে গেল?"

"কেন রদ-অন্দাজ খাঁ?"

"শুনছি আপনার দরবারের শক্তিসিংহ রাঠোর শাদী করছে কুমার রামসিংহের মুনশী গিরধরলালের পালিতা কন্যাকে।"

জসবন্ত সিংহ একটা ভারিক্কী হাসি হেসে উত্তর দিলো, "আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? আজকাল বাদশাহ্‌র দরবারে রাঠোরদের ইজ্জত অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তাই কছওয়ারা আমাদের কন্যাদান করে নিজেদের সামাজিক মানমর্যাদা একটু বাড়াতে চায়। এতে আর বিস্মিত হওয়ার কি আছে?"

জসবন্ত সিংহের কথাগুলো শুনতে পেলো আকিল খাঁ। সে নিজের মনে একটু হাসলো। তারপর সবাইকে পেরিয়ে ঢুকে গেল দিওয়ান-ই-খাসে।

— শেষ —